অর্থশাস্ত্র-পরিচয়

(AN INTRODUCTION TO ECONOMIC THEORY)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, এম. এ., পি. এইচ-ডি., (লণ্ডন),
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্র বিভাগের অধ্যাপক

ও

শ্রীশিশিরকুমার দাস, এম এ., এল. এল. এম , (লণ্ডন),
বার-এট্-ল., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিবিজ্ঞান
বিভাগের অধ্যাপক

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা
কলিকাতা-৬

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড

১, শঙ্কর ঘোষ লেন,

কলিকাতা-৬

বিক্রয় কেন্দ্র :

২১১।১, বিধান সরণী

কলিকাতা-৬

শাখা :

৪৪, জনস্টনগঞ্জ, এলাহাবাদ-৩

অশোক রাজপথ, পাটনা-৪

প্রথম সংস্করণ—জুলাই, ১৯৫৭

দ্বিতীয় সংস্করণ—অক্টোবর, ১৯৫৭

তৃতীয় সংস্করণ—আগস্ট, ১৯৫৮

চতুর্থ সংস্করণ—নভেম্বর, ১৯৫৯

পঞ্চম সংস্করণ—সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

শ্রীজানকীনাথ বসু কর্তৃক বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীপরিমলকুমার বসু কর্তৃক বসুশ্রী প্রেস হইতে ৮০।৬, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা ও অন্যান্য বিষয়

(Definition and other allied topics)

অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Economics) : অর্থ সম্বন্ধীয় আলোচনাকেই অর্থশাস্ত্র বলিয়া মনে করা স্বাভাবিক। সাধারণত অর্থ বলিতে টাকাকড়ি বুঝায়। অর্থশাস্ত্রের আদিমযুগে কোন কোন লেখক যে ঠিক এই অর্থেই এই শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মতে টাকাকড়ি উপার্জন ও ব্যয়ের মূলে আছে মানুষের স্বার্থবুদ্ধি এবং এই স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনায় মানুষ কেবলই অর্থের সন্ধানে ঘোরে এবং সর্বপ্রকারে আর্থিক ক্ষতি এড়াইবার চেষ্টা করে। এই ধরনের অর্থান্বেষী স্বার্থপর মানুষের কার্যকলাপের আলোচনাকেই তাঁহারা অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু বলিয়া মনে করিতেন। এইজন্য উনবিংশ শতাব্দীতে মহামতী কার্লাইল, রাস্কিন প্রভৃতি ইংরাজ লেখকেরা অর্থশাস্ত্রকে অতি নীচ জাতীয় শাস্ত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে এই ধারণা অত্যন্ত ভুল। কেবলমাত্র স্বার্থান্বেষী মানুষের অর্থানুসন্ধান অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় নহে। বর্তমান যুগের লেখকদের মতে এই শাস্ত্রের বিষয়বস্তু হইতেছে সাধারণ মানুষের কর্মসম্বন্ধীয় তথ্যানুসন্ধান। অধিকাংশ লোকই সাধারণভাবে স্বার্থান্বেষী সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা যে সব সময়েই কেবল স্বার্থের সন্ধানে ব্যস্ত ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ইহা ঠিক যে বহু কাজেই আমরা লাভক্ষতি ও টাকাকড়ির হিসাব করিয়া চলি। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা যে সব বিষয়েই এইভাবে চলাফেরা করি তাহা বলা অন্যায় হইবে। স্বার্থনিঃস্বার্থ, লাভক্ষতির হিসাব ও বেহিসাব—সব কিছুতে জড়ান সাধারণ মানুষের কাজের আলোচনাই অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু।

কিন্তু মানুষ জীবনে বহু প্রকারের কাজ করে। তাহার সমস্ত কাজের তথ্যানুসন্ধানই কি অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়? কোন লেখকই ইহা দাবি

করেন না। তাঁহারা কতকগুলি বিশিষ্ট ধরনের কর্মের তথ্যালোচনাই তাঁহাদের শাস্ত্রের বিষয়বস্তু বলিয়া মনে করেন। মানুষের কোন্ কোন্ কর্মের আলোচনা অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত ? ইংরেজ লেখক অধ্যাপক রবিন্‌সের মতে এই সমস্ত কর্মের তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, মানুষের অভাব-বোধ হইতেই এই সমস্ত কর্মের উদ্ভব হইয়াছে। অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে মানুষকে যে যে কর্মে লিপ্ত থাকিতে হয় ইহার আলোচনাই অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু। দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত দ্রব্য আমাদের অভাব মিটাইতে পারে ইহাদের যোগান প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর। সকল লোকের সমস্ত অভাব মিটাইতে যত জিনিসের প্রয়োজন তাহা আমাদের নাই। এই না থাকার কারণ জিনিস তৈয়ারির উপকরণগুলির অপ্রাচুর্য। প্রয়োজনমত জমি, মূলধন প্রভৃতি উৎপাদনের উপকরণ আমাদের নাই। তৃতীয়ত, উৎপাদনের উপকরণগুলি শুধু যে অপ্রচুর তাহা নহে, এই অপ্রচুর উপকরণগুলিও আবার বিভিন্ন প্রকারে বা কাজে ব্যবহার করা যায়। ভারতবর্ষে চাষের উপযোগী জমির পরিমাণ লোকসংখ্যার তুলনায় কম। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ জমির প্লটই নানা কাজে ব্যবহার করা যায়। বাংলা দেশের অনেক জমিতে পাট কিংবা ধান দুই-ই চাষ করা চলে ; কিন্তু পাট চাষ করিলে ধান চাষ করা যায় না, কিংবা ধান লাগাইলে পাট চাষ চলে না। পাট ও ধান দুইটি শস্য একই সময়ে একই জমিতে চাষ করা সম্ভব নহে বলিয়া কোন্‌টির চাষ করিব, কোন্‌টি করিব না ইহা আমাদের ঠিক করিতে হইবে। আমাদের অভাবের সীমা নাই। কিন্তু অল্প সময় ও অপ্রচুর উপকরণের জন্য সমস্ত অভাব পুরাপুরি মেটান সম্ভব হয় না। সেইজন্য কোন্ অভাবটি পূরণ করিব কোন্‌টি করিব না প্রত্যেককেই এই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। সুতরাং বহুক্ষেত্রেই দুইটির মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইবার প্রশ্ন উঠে। যেটুকু মূলধন আমরা কষ্ট করিয়া সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি বা পারিব ইহার মধ্যে কতটুকু বা কৃষির উন্নতিতে লাগাইব এবং কতটুকু শিল্পপ্রসারের কাজে বিনিয়োগ করিব এবং রেলওয়ে ও অন্যান্য যানবাহনের উন্নতির জন্যই বা কি ব্যয় করা যাইবে—এই সমস্ত সমস্যার সমাধান খুঁজিতে হয়। এইরূপ বিভিন্ন পথের মধ্যে কোন্‌টিতে আমরা চলিব তাহা ঠিক করিতে হইলে কোন্ পথে গেলে কি হইতে পারে

তাহা জানা দরকার হয়। আরো ১০০ কোটি টাকা কৃষিকার্যে লাগাইব না শিল্পপ্রসারে ব্যয় করিব? তাহা ঠিক করিতে হইলে কৃষিকার্যে কত বেশি মূল্যের ফসল মিলিতে পারে ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন কত পরিমাণ বাড়িতে পারে তাহা জানিতে হইবে। অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে কোন্‌টিকে বাছাই করিয়া লইব তাহা ঠিক করিতে হইলে জিনিসগুলির লাভলোকসানের খতিয়ান দেখিতে হইবে। এই হিসাব দেখিতে হইলে ইহাদের মূল্যনির্ধারণের প্রয়োজন আছে। অধ্যাপক রবিন্‌সের মতে এই মূল্যনির্ধারণ পদ্ধতি (pricing process) অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু। অভাব মোচনের উপযোগী উপকরণের অপ্রাচুর্য বা স্বল্পতার জন্য সাধারণ মানুষ যে ভাবে নানা ধরনের কাজ করে অর্থশাস্ত্রে ইহারই আলোচনা করা হয়।

অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞালোচনার সময় আরো কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। অভাব মোচনের উপযোগী উপকরণের অপ্রাচুর্যকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার কথা অর্থশাস্ত্রে আলোচনা করে। কিন্তু এই উপকরণ বা তাহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্যকে যে বাস্তব (material) হইতে হইবে ইহা নহে। বহু অবাস্তব দ্রব্য আছে যাহার দ্বারা আমাদের অভাব মেটে অথচ যাহার যোগান অপ্রচুর। অর্থশাস্ত্রে এই সমস্ত অবাস্তব দ্রব্য লইয়াও আলোচনা হয়। ওস্তাদ ফৈযাজ খাঁ সাহেবের সুমধুর কণ্ঠসংগীতে সংগীতজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই মুগ্ধ। ইহার জন্য অনেকেই সাধ্যানুসারে অর্থব্যয় করিতে রাজী আছেন। কিন্তু ইহাকে বাস্তব পদার্থের পর্যায়ে ফেলা চলে না। অর্থশাস্ত্রে বাস্তব, অবাস্তব সর্বপ্রকারের দ্রব্য বা উপকরণের আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয়ত, মানুষের কল্যাণ যাহা দ্বারা বাড়ে শুধু কেবল এই শ্রেণীর কর্ম আলোচনা করা অর্থশাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। দেশের ধনসম্পদ বাড়িলে কল্যাণও বাড়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা সব সময়ে সত্য নহে। এমন অনেক অর্থনৈতিক কর্ম আছে যাহাতে মানুষের ও সমাজের কল্যাণ কমে, বাড়ে না। মদ তৈয়ারি ও বিক্রয় করার কাজ সাধারণভাবে অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য। কারণ মদের জন্য চাহিদা আছে ও সকল মদ্যপায়ীর আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার মত মদ তৈয়ারি হয় না। সুতরাং মদকে কেন্দ্র করিয়া যে কর্ম তাহা অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এই কর্মের ফলে মানুষের

তথা সমাজের কল্যাণ হয় একথা বলা যায় না। সুতরাং মানবসমাজের যাহাতে কল্যাণ হয় কেবলমাত্র এইরূপ কর্মের আলোচনা যে অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু তাহা ঠিক নয়। সুতরাং যে সমস্ত বাস্তব দ্রব্যের দ্বারা সমাজের কল্যাণ হয় কেবলমাত্র তাহাদের কারণ অনুসন্ধানকে (causes of material welfare) অর্থশাস্ত্র বলে না। দ্রব্যটি বাস্তব কিংবা অবাস্তব, কর্মটি কল্যাণময় কিংবা অকল্যাণময়,—ইহার কোনটির প্রতিই অর্থ-শাস্ত্রানুধ্যায়ীর বিশেষ কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর হইলেই তাহা অর্থশাস্ত্রের আলোচনার বিষয়।

অধ্যাপক রবিন্সের মতে নানাভাবে ব্যবহারোপযোগী অপ্রচুর দ্রব্যাদিকে কেন্দ্র করিয়া যে কর্ম ইহার আলোচনাই অর্থশাস্ত্র। মানুষের অভাব অনন্ত। কিন্তু অভাব মোচন করিতে পারে এইরূপ উপকরণ অপ্রচুর। সুতরাং এই উপকরণগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের রীতিমত হিসাব করিয়া চলিতে হয়। অপ্রচুর বলিয়াই কোন জিনিস স্বচ্ছন্দে ব্যবহার বা ব্যয় করা যায় না। প্রতিপদে হিসাব করিয়া পরিমিত ব্যয় করিতে হয়। অপ্রচুর উপকরণের পরিমিত ব্যয়ের সমস্যাসম্বন্ধীয় আলোচনাই অর্থশাস্ত্র (Economics is the study of the problems of economising)। কিন্তু কোন কোন লেখক অর্থশাস্ত্রের এই সংজ্ঞাকে পূর্ণ সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে মিতব্যয়ের সমস্যা বহু প্রকারের এবং ইহাদের মধ্যে সকল সমস্যাকে অর্থনৈতিক বলা যায় না। আমাদের অনেক সময়েই হিসাব করিয়া কম কথা বলিতে হয়;—যাহা বলিতে চাই তাহা বলিবার সময় বা সুযোগ থাকে না। এই যে বেশি কথাকে কম করিয়া বলিবার সমস্যা—ইহাকে অর্থনৈতিক সমস্যা বলে না। সুতরাং মিতব্যয়িতার সমস্যামাত্রই অর্থনৈতিক সমস্যা নয়। এই সমস্ত কর্মের মধ্যে যেগুলি অর্থের বিনিময়ে কেনাবেচা হয় ইহাদের আলোচনাই অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু।

নানা কারণে বহু বিষয়ে লোককে হিসাব করিয়া চলিতে হয়। ইহার সমস্ত কিছু লইয়া আলোচনা করা অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু নয়। অভাব মিটাইবার উপযোগী উপকরণের অপ্রাচুর্যের জন্য মানুষকে বহু ধরনের কাজ করিতে হয়। এই সমস্ত কর্মের মধ্যে যেগুলি অর্থের বিনিময়ে কেনাবেচা হয়, কেবলমাত্র তাহাদের আলোচনাই অর্থশাস্ত্রে করা হয়।

সুতরাং অর্থশাস্ত্রে আমরা সেই সব সমস্যার আলোচনা করি, যাহা আমাদের অভাব মিটাইবার উপযোগী জিনিসের অপ্রাচুর্যের জন্য গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের অভাবের সীমা নাই। কিন্তু সেই অনুপাতে জিনিসপত্র এবং উৎপাদনের উপাদানগুলির সরবরাহ অনেক কম। আবার বহু জিনিস নানাভাবে ব্যবহার করা যায়, উৎপাদনের উপাদান নানা শ্রেণীর জিনিস উৎপাদনের কাজে লাগান যায়। কাজেই আমাদের প্রতিপদে হিসাব করিয়া চলিতে হয়—কোন্ জিনিসটি কিভাবে কতটুকু ব্যবহার করিব ও কোন উপাদান কি দ্রব্য উৎপাদনে লাগাইব। আমাদিগকে প্রতিদিন এই ধরনের বহু সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। এই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য আমরা নানা প্রকারের কাজ করি। অবশ্য এই ধরনের সব কাজই অর্থশাস্ত্রের পঠিতব্য বিষয়ে পড়ে না। যে সমস্ত কাজে অর্থের ব্যবহার করা হয় তাহাই অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

সাধারণত জিনিসপত্রের বিনিময়ে অর্থের ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। কেনাবেচা করিতে গেলেই টাকা লাগে। এইজন্য কোন কোন লেখক বলিয়াছেন যে, অর্থশাস্ত্রের মূল পাঠ্য বিষয় হইতেছে টাকা। টাকাকে কেন্দ্র করিয়া জিনিসপত্র কেনাবেচার আলোচনাই অর্থশাস্ত্র। কিন্তু ইহার দ্বারা অর্থশাস্ত্রের ঠিকমত ব্যাখ্যা করা যায় না এবং ইহা করা উচিতও হইবে না। জিনিসপত্রের সরবরাহ অভাবের তুলনায় অপ্রচুর বলিয়া আমরা পরস্পরের মধ্যে দ্রব্য বিনিময় করিয়া অভাব মিটাইবার চেষ্টা করি। এই বিনিময়ের মাধ্যম হইতেছে টাকা। সেইজন্য অর্থশাস্ত্রী অনেক সময় টাকার কথা আলোচনা করেন। কিন্তু তাই বলিয়া টাকা সম্বন্ধীয় বিষয় আলোচনা করাই অর্থশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য—ইহা বলিলে ভুল করা হইবে। জিনিসপত্র বিনিময় করিতে টাকার ব্যবহার করিতে হয়। আবার অনেক সময়ে টাকার পরিমাণ কমবেশি হওয়ার ফলে জিনিস বিনিময়ে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র টাকার কথা আলোচনা করাই অর্থশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। অপ্রচুর দ্রব্যসামগ্রী দিয়া প্রচুর অভাব মিটাইতে হইলে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয়, সেই সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের যে কাজ তাহাই অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। ঠিকমত অভাব মিটাইতে গেলে বহু জিনিস বিনিময় করিতে হয়। এই বিনিময়ের উদ্দেশ্য

অভাবের সম্যক পরিপূর্তি। টাকা থাকিলে বিনিময়ের কাজ সহজ হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু টাকা না থাকিলেও বিনিময় করা চলে। সুতরাং অর্থশাস্ত্র কেবল টাকার শাস্ত্র নহে। অভাবের প্রাচুর্য ও দ্রব্যসামগ্রীর অপ্রাচুর্যের জন্য আমাদের বহু বিষয়ে হিসাব করিতে হয় এবং এই হিসাব ঠিকমত করিতে গেলে নানাভাবে নানা দ্রব্য ও উপকরণ বিনিময় করিতে হয়। এই প্রাচুর্য ও অপ্রাচুর্য, হিসাব ও বিনিময়—ইহাদের কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত কাজ আমরা করি ও যে সমস্যা আমাদের সমাজে উপস্থিত হয়—ইহাদের আলোচনাই হইল এই শাস্ত্রের আসল লক্ষ্য।

অর্থশাস্ত্র ও নীতিনির্ধারণ (Economics and policy) ঃ অধ্যাপক রবিন্সের মতে অর্থশাস্ত্রী কোন্ ব্যবস্থা উচিত কোনটি অনুচিত ইহার আলোচনা করিবেন না। তাঁহার কাজ হইতেছে বিভিন্ন পন্থা বা নীতির ফলাফল বিচার করা। আমাদের প্রচুর অভাব। কিন্তু অভাব মিটাইবার উপযোগী সামগ্রা অপ্রচুর এবং এই অপ্রচুর সামগ্রী বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়। ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহার করিলে কি ফল পাওয়া যাইবে—অর্থশাস্ত্রী ইহারই আলোচনা করেন বা তাঁহার করা উচিত। কোন ব্যবস্থা ভাল কি কোনটি মন্দ—কিংবা কোন বিশেষ বিষয়ে কি নীতি অবলম্বন করা উচিত—ইহা অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় নয়। সে বিচার নেতা বা দেশের কর্ণধার স্বরূপ ব্যক্তিরা করিবেন। নীতি নির্ধারণ অর্থশাস্ত্রীর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

বহু লেখক এই মতের সমর্থন করেন না। অর্থশাস্ত্রী শুধু জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে শাস্ত্র আলোচনা করেন না। দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান কিভাবে করা যায়—লোকের দুঃখ দারিদ্র্য কি ভাবে নিবারণ করা যায়—অর্থশাস্ত্রীর উচিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া নিজের সুচিন্তিত মত প্রকাশ করা। কি নীতি অবলম্বন করিলে এই সমস্যাগুলির আশু সমাধান মিলিতে পারে—এই পরামর্শ দেওয়া অর্থশাস্ত্রীর পক্ষে যতটা সহজ অন্য লোকের পক্ষে ততটা নহে। "সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশার দিকে যখন আমরা তাকাই তখন আমাদের মনে দার্শনিকের মত জ্ঞান লাভের ইচ্ছা হয় না। বরঞ্চ শরীর-বিজ্ঞানীর মত দুঃখ নিবারণের জন্য জ্ঞান লাভের ইচ্ছাই হওয়া স্বাভাবিক।"

অর্থশাস্ত্র কি বিজ্ঞান? (Is economics a science ?) ঃ অর্থশাস্ত্র বিজ্ঞান না কলা (arts) এই বিতর্ক বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। বহিঃপ্রকৃতি অথবা অন্তঃপ্রকৃতির কোন বিষয়ের পরীক্ষা, প্রমাণ, যুক্তি ইত্যাদি দ্বারা শৃঙ্খলিত জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলে। প্রকৃতির কোন বিভাগের সমরূপতা বিচার করাই বিজ্ঞানের কাজ এবং এইগুলিকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে। পদার্থবিদ্যা একটি বিজ্ঞান। বহিঃপ্রকৃতির কতকগুলি নিয়ম আলোচনা করাই ইহার কাজ। মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু মনোজগতের নিয়মগুলির বিশদ আলোচনা করা। মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপের নিয়মকানুনগুলি বিচার করা অর্থশাস্ত্রের কাজ। সুতরাং ইহাকেও বিজ্ঞান বলা উচিত।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীরা যে সব বিষয় লইয়া আলোচনা করেন সেগুলি মাপ করা সম্ভব। তাঁহারা গবেষণা করিয়া নিজেদের সিদ্ধান্ত যথার্থ কিনা স্থির করিতে পারেন। মানুষের যে সব কাজকর্ম লইয়া অর্থশাস্ত্রে আলোচনা করা হয় তাহাদের আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করা যায়। সেইজন্য সামাজিক বিজ্ঞানগুলির মধ্যে অর্থশাস্ত্রই সর্বাপেক্ষা নির্ভুল। কিন্তু এই মাপ নির্ভুল নয়। নির্ভুলভাবে মানুষের মন মাপা যায় না। অতএব যদিও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের তুলনায় অর্থশাস্ত্র নির্ভুল, তবুও ইহা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির মত অতটা নির্ভুল নয়। কারণ মানুষের মন অত্যন্ত জটিল। টাকা পয়সার দ্বারা মনকে কখনও নির্ভুলভাবে মাপা যায় না।

অর্থশাস্ত্রের সূত্রগুলি সর্বাবস্থায় ঠিক হয় না বলিয়া অনেকে ইহাকে বিজ্ঞান বলিতে চাহেন না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলিতে অনেক সাধারণ নিয়ম পাওয়া যায়। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে নির্ভুল কোন নিয়ম নাই। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে। সুতরাং একই অবস্থায় সকলে একই রকম কাজ করে না। ইহা সত্ত্বেও যে কয়েকটি নিয়ম বাহির করা যায় ইহার তিনটি কারণ আছে। প্রথমত, মানুষের সব কাজ তাহার ইচ্ছার অধীন নয়। ইচ্ছা করিয়া আমরা সুখী অথবা দুঃখী হইতে পারি না। আহার করিলে ক্ষুধা মিটিবেই। এই সব অনিবার্য অভিজ্ঞতাগুলিই অর্থনৈতিক নিয়মের ভিত্তি। দ্বিতীয়ত, আমাদের কয়েকটি অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যেমন ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম।

তৃতীয়ত, স্বাধীন ইচ্ছা মানে অযৌক্তিক ইচ্ছা নহে। আর অযৌক্তিক কোন কিছু করিলেও সম্ভাব্যতার গাণিতিক নিয়ম অনুসারে ইহার হিসাব আমরা করিতে পারি। কিন্তু সাধারণত মানুষ যুক্তিসম্মত কাজই করে। যেখানে সস্তা সেইখানেই আমরা জিনিসপত্র কিনি। সেইজন্য ভবিষ্যতে মানুষ কি করিবে তাহার আভাস পাওয়া যায় এবং কয়েকটি সাধারণ নিয়মের সন্ধান পাই।

অর্থশাস্ত্রীর ভবিষ্যদ্বাণী সব সময়েই সত্য হয় না। কিন্তু তাহার অর্থ ইহা নহে যে অর্থশাস্ত্র অবৈজ্ঞানিক আলোচনা। যে ঘটনা ঘটিল ইহার পিছনকার কারণগুলি সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার জন্যই ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক হয় নাই। জীববিদ্যা বা বায়ুবিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণীগুলিও অনেক সময়ে সত্য হয় না। সেইজন্য কেহ জীববিদ্যা বা বায়ুবিজ্ঞান বিজ্ঞান নয় একথা বলেন না। ঘূর্ণিবাত্যার কথা যতদিন আগে বলা যায় ইহার অনেক আগেই ব্যবসায়ে মন্দার ভাব আসিবে কিনা তাহা বলা যায়। বৈজ্ঞানিক ও অর্থশাস্ত্রীর কাজ একই—প্রদত্ত বিষয়ে যুক্তির প্রয়োগ করিয়া সাধারণ নিয়ম বাহির করা। অতএব নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে না বলিয়া অর্থশাস্ত্র বিজ্ঞান নয় একথা বলা চলে না।

অর্থশাস্ত্রের সূত্র (Economic laws): প্রত্যেক বিজ্ঞানের কতকগুলি নিয়ম আছে। অর্থশাস্ত্রেও কতকগুলি নিয়মের কথা উল্লেখ করা হয়। এই নিয়মগুলির প্রকৃতি কি? নিয়ম কথাটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা সমাজের কতকগুলি বিধিনিষেধকে বুঝাইতে পারে। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের অলিখিত আইনগুলি এই পর্যায়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, ক্রিকেট অথবা অন্যান্য খেলার পদ্ধতির মত ইহার কতকগুলি পদ্ধতিকে নিয়ম বলা হয়। তৃতীয়ত, কার্যকারণ সম্পর্ককেও নিয়ম বলে, যথা পদার্থবিদ্যার নিয়মাবলী।

অর্থশাস্ত্রে নিয়ম কথাটি তৃতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলে নিম্নলিখিত ফল দেখা যাইবে ইহাই এই শাস্ত্রের নিয়মের বক্তব্য। পদার্থবিজ্ঞানেও এই অর্থেই নিয়ম কথাটি ব্যবহার করা হয়। অন্য কোন পরিবর্তন না ঘটিলে উদ্‌জান ও অম্লজানের সংমিশ্রণে জল পাওয়া যায়। ইহা রসায়নের নিয়ম। অর্থশাস্ত্রেও বলে যে অন্য কোন কারণ না

থাকিলে দাম বাড়ার ফলে চাহিদা কমিবে। রসায়নের নিয়ম যদি প্রাকৃতিক নিয়ম হয়, তাহা হইলে অর্থশাস্ত্রের নিয়মই ঐ অর্থে প্রাকৃতিক নিয়ম।

কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর মত অর্থশাস্ত্রের নিয়মাবলী নির্ভুল নয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অণুপরমাণু লইয়া আলোচনা করে। অণুপরমাণুর কোন পরিবর্তন নাই। অর্থশাস্ত্রে মানুষের কার্যকলাপের আলোচনা করা হয়। একই অবস্থায় একজন লোক হয়ত যে ভাবে কাজ করে, অন্য লোক সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে কাজ করিতে পারে। সুতরাং মানুষের কার্যকলাপ সম্পর্কে কোন সাধারণ নিয়ম সর্বাবস্থায় বহাল থাকিবে ইহা বলা সম্ভব নয়। মানুষ চেষ্টার দ্বারা অর্থনৈতিক অবস্থায় পরিবর্তন করিতে পারে। কিন্তু অণুর গুণাবলী মানুষের চেষ্টায় পরিবর্তিত হইবে না। এইজন্য অর্থশাস্ত্রের নিয়ম প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মাবলীর মত নির্ভুল নয়।

"অর্থশাস্ত্রের নিয়মাবলীকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চেয়ে জোয়ারভাঁটার নিয়মের সহিত তুলনা করা চলে।" মানুষের প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল এবং তাহার কার্যকলাপ নিত্য পরিবর্তনশীল। মানুষের এই পরিবর্তনশীল কার্যকলাপই অর্থশাস্ত্রের নিয়মগুলির ভিত্তি। অতএব এই নিয়ম সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে বলে যে অন্য কোন কারণ না থাকিলে দুইটি বস্তু একটি নির্দিষ্ট গতিতে পরস্পরকে আকর্ষণ করিবে। এই নিয়ম এত নির্ভুল যে গাণিতিকেরা গ্রহ-উপগ্রহের গতি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারেন। এই হিসাব কদাচিৎ ভুল হয়। অর্থশাস্ত্রে এইরূপ কোন নির্ভুল নিয়ম নাই।

অর্থশাস্ত্রের নিয়মগুলিকে জোয়ারভাঁটার নিয়মের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সূর্য ও চন্দ্রের প্রভাবে দিনে দুইবার জোয়ারভাঁটা হয়। পূর্ণিমা এবং অমাবস্যায় জোয়ারের বেগ বাড়ে। হাওড়া পুলের নিকট কখন জল সবচেয়ে উঁচু হওয়া সম্ভব তাহা পূর্ব হইতে জানা যায় বটে, কিন্তু তাহা সব সময়ে ঠিক নাও হইতে পারে। কেননা অজ্ঞাত কারণে ঠিক সময়ে জোয়ার না আসিতে পারে। বঙ্গোপসাগরের প্রবল বাতাসের ফলে জোয়ার অস্বাভাবিকভাবে বাড়িতে পারে। মানুষের ব্যবহারের বেলাও এই কথা খাটে। নানাপ্রকার অজ্ঞাত কারণে মানুষের ব্যবহারে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে।

অর্থশাস্ত্রের নিয়মাবলী প্রধানত আনুমানিক (Economic laws are essentially hypothetical)**ঃ** অর্থশাস্ত্রের সব নিয়মেই "অন্যান্য-বিষয় স্থির থাকিলে" এই ধারাটি যোগ করা থাকে। অর্থাৎ আমরা বলি যে বিশেষ কারণে বিশেষ একটি কার্য ঘটিবে যদি ইত্যবসরে অন্য বিষয়ে কোন পরিবর্তন না হয়। কিন্তু এই বিশেষ কার্য ঘটিবার পূর্বেই অন্য বিষয়ে কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটেই। সুতরাং কোন ঘটনার ফলে যে এইরূপ ঘটিবেই এ সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। সেইজন্য অর্থশাস্ত্রের নিয়মগুলিকে অনেকে আনুমানিক বলেন। আনুমানিক এইজন্য যে ইহাদের সত্যতা অনেকাংশে পরিবর্তনশীল ও অনিশ্চিত কারণের উপর নির্ভর করে। হ্রাসমান উপযোগিতার নিয়মের কথাই ধরা যাক। এই নিয়ম অনুসারে জিনিসের সংখ্যা অথবা পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উপযোগিতা হ্রাস পায়। কিন্তু কোন সংখ্যা হইতে প্রান্তিক উপযোগিতা হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিবে একথা এই নিয়ম হইতে জানা যায় না। এমনও হইতে পারে যে রুচির পরিবর্তনের ফলে প্রান্তিক উপযোগিতা না কমিয়া বাড়িতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু আনুমানিক বলিয়াই নিয়মগুলি অবাস্তব অথবা প্রয়োগের অযোগ্য নহে। অন্যান্য বিজ্ঞানের নিয়মগুলিও আনুমানিক। অবস্থার কোন পরিবর্তন হইবে না এই কথা ধরিয়া লইয়াই বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ধারণ করে। একটি কারণকে আলাদা করিয়া লইয়া ইহার ফল কি তাহা অনুসন্ধান করা হয় এবং ইত্যবসরে অন্য কোন পরিবর্তন হয় নাই এই কথা ধরিয়া লওয়া হয়। এই অর্থে সব নিয়মই আনুমানিক। পদার্থবিদ্যায় বলা হয় যে দুইটি বস্তু নির্দিষ্ট শক্তিতে পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নাও হইতে পারে। মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম অনুসারে সব জিনিস নীচে নামে না। বায়বীয় চাপ বাধা দিতে পারে। বিশেষ চাপ এবং তাপ বর্তমান না থাকিলে উদ্‌জান ও অম্লজানের সংযোগে জল না পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেইজন্য কেহ মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অথবা রাসায়নিক নিয়মকে অবাস্তব অথবা অব্যবহার্য বলে না। অবস্থার জটিলতার জন্য নিয়মিত ফল না ফলিতে পারে। সুতরাং সব বিজ্ঞানের নিয়মাবলীই আনুমানিক। শুধু পার্থক্য এই যে অর্থশাস্ত্রে অনুমানের পরিমাণ অধিক। পদার্থবিদ্যায় জটিল কারণ থাকিলেও তাহাদের গতি নির্দিষ্ট করিয়া বলা যায়। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে অনেক

জিনিসই সঠিকভাবে মাপা যায় না। সুতরাং নির্ভুল কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানও সম্ভব নয়। অতএব অর্থশাস্ত্রের নিয়মগুলি মোটামুটি ঠিক।

অর্থশাস্ত্রের সব নিয়মই আনুমানিক নয়। কতকগুলি নিয়ম আছে যাহা প্রাকৃতিক নিয়মের মতই সত্য, আবার কতকগুলি নিয়ম স্বতঃসিদ্ধ। হ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম বহিঃপ্রকৃতির উপর নির্ভর করে। উদ্ভাবন অথবা উন্নত ধরনের চাষ-আবাদের দ্বারা এই নিয়মকে অল্পদিনের জন্য ঠেকাইয়া রাখা যায়; কিন্তু কালক্রমে এই নিয়ম বলবৎ হইবে। সুতরাং এই নিয়ম কিছুটা প্রাকৃতিক নিয়মের মত। আবার কতকগুলি নিয়ম স্বতঃসিদ্ধ, তাহাদের কোন প্রমাণ প্রয়োজন হয় না। যথা, ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি হইলে সঞ্চয় করা সম্ভব অথবা কার্যদক্ষতার উপর জীবনধারণের মান নির্ভর করে এই সব নিয়ম স্বতঃসিদ্ধ। ইহারা আনুমানিক নয়।

অর্থনৈতিক আলোচনার পদ্ধতি (Methods of study): প্রত্যেক বিজ্ঞানের আলোচনার বিশেষ একটি প্রণালী আছে। অর্থশাস্ত্রালোচনায় কোন্ প্রণালী অবলম্বন করা হয় তাহাই আমরা আলোচনা করিব। আলোচনার দুইটি প্রণালী আছে। একটির নাম অবরোহ, অপরটির নাম আরোহ। অবরোহ প্রণালীতে প্রথমত প্রধান কারণগুলি বাছিয়া লওয়া হয়। বিশেষ অবস্থায় এই কারণগুলির কি ফল তাহা যুক্তির দ্বারা স্থির করা হয়। প্রাচীন অর্থশাস্ত্রীরা অবরোহ প্রণালী অবলম্বন করিতেন এবং অর্থশাস্ত্রের বিশেষ নিয়মগুলি মানুষের স্বভাব সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ তত্ত্ব হইতে নিরূপণ করিতেন। তাঁহারা কোন সাধারণ তত্ত্ব হইতে আলোচনা আরম্ভ করিতেন; যেমন, মানুষ যেখানে সস্তায় পায় সেখানেই কেনে ইত্যাদি। এই সমস্ত অভ্যাস ও প্রেরণাকে সাধারণ সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া অর্থনৈতিক নিয়ম বাহির করিতেন। এই প্রণালী ও সিদ্ধান্তগুলিকে অনেকেই সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু অবরোহ প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রাচীনেরা কোন ভুল করেন নাই; অতি অল্প সংখ্যক প্রদত্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করাই তাঁহাদের ভুল হইয়াছিল। তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলি সর্বত্র প্রযোজ্য এই ধারণা ভুল।

গাণিতিক পদ্ধতি অবরোহ প্রণালীর চরম উদাহরণ। জেভন্সের (Jevons) মতে অর্থশাস্ত্রে অঙ্কের প্রয়োগ সম্ভব, কেন না ইহাতে বিষয়বস্তুর

পরিমাণ নির্ধারণ করা, ইহার একটি মৌলিক সমস্যা। গাণিতিক পদ্ধতির সুবিধা এই যে ইহার দ্বারা অতি নিভুর্ল সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়। আর একটি সুবিধা এই যে চাহিদা, যোগান ও দাম কিভাবে পরস্পরের উপর নির্ভর করে তাহা এই পদ্ধতির দ্বারা সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। ইহার প্রধান দোষ এই যে অর্থনৈতিক সমস্যার কথা ভুলিয়া গিয়া এই পদ্ধতির সমর্থকেরা উচ্চতর গাণিতিক সমস্যা লইয়া ব্যস্ত হন।

জার্মানির ঐতিহাসিক প্রণালীর সমর্থকেরা অবরোহ প্রণালীর সমালোচনা করিতেন। তাঁহারা আরোহ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং বলিতেন যে অর্থনৈতিক জীবনের ইতিহাস হইতে অর্থনৈতিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করা যায়। অতীত ইতিহাস অথবা বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাবা তত্ত্ব নির্ধারণের চেষ্টা করিতেন। এই তত্ত্ব সত্য কিনা তাহা পরের ঘটনায় পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। সংখ্যাতত্ত্ব ও সরকারী পবিসংখ্যান বিভাগের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রণালীর প্রভূত উন্নতি হইযাছে। সংগৃহীত সংখ্যার দ্বারা বহু মূল্যবান নিভুর্ল সিদ্ধান্ত পাওযা গিযাছে। কিন্তু তাঁহারা অবরোহ পদ্ধতির যে সমালোচনা করেন তাহা ঠিক নয়। সত্য বটে, যে প্রথমে তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। তথ্য ছাড়া কোন বিজ্ঞানের উন্নতি সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলিয়া অবরোহ পদ্ধতি ভুয়া একথা বলা চলে না। "শুধু তথ্যের দ্বারা কিছু জানা যায় না। তথ্যের বিশ্লেষণ, তুলনা ও অনুমানের দ্বারাই সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব।" যুক্তি ও অনুমান ছাডা কোন বিজ্ঞান অগ্রসর হইতে পারে না। যুক্তির প্রয়োগ না করিলে ঐতিহাসিক-পদ্ধতি কেবলমাত্র বর্ণনায় পর্যবসিত হয়। ইহার ফলে কতকগুলি অসংলগ্ন তথ্য জড় হয়। ঐতিহাসিক-পদ্ধতি অর্থনৈতিক চিন্তাধারাব কোন পরিবর্তন আনে নাই; ইহা এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তিত করিয়াছে মাত্র।

আধুনিক লেখকেরা এ বিষয়ে এক মত যে আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতি পরস্পরের পরিপূরক ও উভয় প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা আছে। অর্থনৈতিক জগতে নিয়ম আবিষ্কার করাই অর্থশাস্ত্রের লক্ষ্য। আরোহ হউক অথবা অবরোহ হউক যে উপায়ে এই লক্ষ্যে পৌঁছান যায় তাহাই গ্রহণীয়। "ডান ও বাম পা যেমন হাঁটার জন্য প্রয়োজন তেমনি আরোহ ও অবরোহ দুই

পদ্ধতিই বিজ্ঞানের প্রয়োজন।" অর্থশাস্ত্রে উভয় পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। কিন্তু উদ্দেশ্য অনুসারে ইহাদের পরিমাণ ভিন্ন হইবে।

অর্থশাস্ত্র ও অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক: সমস্ত বিজ্ঞান যে মূলত এক, একথা সকলেই আজকাল বলিতেছেন। বিভিন্ন বিজ্ঞানের সংযোগ ক্রমশ বাড়িতেছে। অর্থশাস্ত্রের সহিত যে সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, নীতিশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস ও গণিতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে সেকথা সকলে স্বীকার করিয়াছেন। যদিও কোন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য তবুও সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য মূলক একটি দর্শনের কথা অনেকে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছেন।

অর্থশাস্ত্র ও সমাজবিজ্ঞান (Economics and Sociology): সমাজের সব সমস্যার আলোচনা সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত। অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি সব বিষয় সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। সমাজ সংগঠনের প্রাথমিক নিয়মগুলি সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। কোঁতের (Comte) মতে অর্থশাস্ত্র একটি পৃথক বিষয় নয়; ইহা সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত। এই মতবাদ সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে, যে অর্থশাস্ত্র ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক। সামাজিক সব সমস্যার আলোচনা সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি প্রভৃতি সব বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি সমাজবিজ্ঞান গ্রহণ করে এবং সেইগুলিকে ভিত্তি করিয়া আরও নূতন সিদ্ধান্ত বাহির করে। সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি সামাজিক শাস্ত্রগুলির কেবলমাত্র যোগফল নয়। ঐ সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সমাজ-বিজ্ঞানের নিজস্ব সিদ্ধান্ত খাড়া করে। সমাজবিজ্ঞান সমাজ সম্বন্ধে মূল শাস্ত্র, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলি ইহার শাখা। অর্থশাস্ত্রের ও সমাজ-বিজ্ঞানের পরিধি পৃথক। ইহারা ব্যাপক সমাজশাস্ত্র নয়। ইহা সমাজ-বিজ্ঞানের শাখা মাত্র। শাখা হইলেও অর্থশাস্ত্রের লক্ষ্য ও পরিধি সমাজ-বিজ্ঞানের লক্ষ্য ও পরিধি হইতে ভিন্ন। অর্থশাস্ত্রে আমরা জীবনের এক শ্রেণীর সমস্যা আলোচনা করি, সব রকমের সমস্যা আলোচনা করি না। ইহার লক্ষ্য, পদ্ধতি ও পরিধি সবই পৃথক। সুতরাং অর্থশাস্ত্র একটি পৃথক বিষয়।

অর্থশাস্ত্র ও রাজনীতি (Economics and Politics): অর্থশাস্ত্র ও রাজনীতি উভয়ই সমাজ-বিজ্ঞানের শাখা। ইহাদের যোগাযোগ অত্যন্ত

ঘনিষ্ঠ। অতীতে অনেকে অর্থশাস্ত্রকে রাজনীতির শাখা মনে করিতেন। গ্রীকরা অর্থশাস্ত্রকে রাষ্ট্রের আয়বৃদ্ধির কৌশল মনে করিতেন। অ্যাডম স্মিথ প্রভৃতি লেখকেরা মনে করিতেন যে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাই অর্থশাস্ত্রের লক্ষ্য। Political Economy কথাটি হইতে বোঝা যায় যে রাজনীতি ও অর্থশাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। Political Economyর স্থলে অর্থশাস্ত্র বা Economics কথাটি ইচ্ছা করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহা হইতে বোঝা যায় যে রাষ্ট্রের সহিত অর্থশাস্ত্রের প্রাথমিক কোন যোগ নাই। অর্থশাস্ত্র কথাটি ব্যবহার করিলেও রাজনীতির সহিত সংযোগের কথা এই শাস্ত্রে লেখকগণ অস্বীকার করেন না। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিচার করিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হইবে।

রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি নির্ভর করে। আধুনিক সব রাষ্ট্র, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা করে। শ্রমিক ও মালিকের বিরোধ, শুল্ক, বেকার সমস্যা ইত্যাদি শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় আইনসভায় আলোচিত হয়। রাষ্ট্রের নিয়মে বৈষয়িক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের প্রশ্ন দুই শাস্ত্রে আলোচিত হয় এবং ইহাতে ইহাদের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় মেলে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক অবস্থা অনেকাংশে অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে। সম্পদের ভিত্তিতে অ্যারিস্টটল (Aristotle) রাষ্ট্রকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন, যথা,—স্বৈরতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র। অর্থনৈতিক কারণে রাজনৈতিক আন্দোলন গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত হয়। স্টেট সোস্যালিজম, সিণ্ডিক্যালিজম, ফ্যাসিজম, বলশ্যাভিজম প্রভৃতি আন্দোলন শুধু অর্থনৈতিক নয়, ইহাদের রাজনৈতিক গুরুত্বও আছে।

এই সমস্ত কারণে বোঝা যায় যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই দুইটি বিষয় ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র (Economics and Ethics): এই দুইটি বিষয়েরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। নীতিশাস্ত্র একটি মান বা আদর্শ নির্ধারণ করে। বৈষয়িক কার্যকলাপ সেই আদর্শ অনুসরণ করে। সম্পদ ও কল্যাণ সম্পর্কে যে আলোচনা অর্থশাস্ত্রে করা হয় তাহা হইতে এই দুইটি বিষয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা বোঝা যায়। অর্থশাস্ত্র নীতিশাস্ত্রের সহচর এবং

মানুষের কল্যাণ বৃদ্ধিই অর্থশাস্ত্রের লক্ষ্য। সুতরাং নীতিশাস্ত্র মানুষের বৈষয়িক কার্যকলাপের একটি মান স্থির করিয়া দেয়।

নীতিশাস্ত্র অর্থশাস্ত্র হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছে। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তিতে নীতিশাস্ত্র অনেক নূতন সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে। অর্থশাস্ত্র বলে যে বিচার না করিয়া দান করিলে অনেক সময় অলসতার প্রশ্রয় পায়। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নীতিশাস্ত্র বলে যে বিবেচনাশূন্য দান অন্যায় এবং দান করার সময় কয়েকটি নীতি অনুসরণ করা উচিত। এইভাবে দেখা যায় যে অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রের যোগ অতীব ঘনিষ্ঠ। প্রকৃত অর্থনৈতিক কাজ নীতিসঙ্গত হওয়া উচিত।

Exercises

Q. 1. What is the subjectmatter of Economics? (C. U. 1939, 1947; Pun. 1940). "Economics is a study of man's actions in the ordinary business of life." Discuss. (C. U. 1940, '34; Bom. 1942; All. 1933). "Political Economy is, on the one side, a study of wealth and on the other and more important side, a part of the study of man." Discuss. (C. U. 1932; Agra 1931).

"Economics is a study of business in its social aspects." Explain and illustrate. (C. U. B. Com. 1931, '41; Patna 1945).

Q. 2. "Economics is a social science studying how people attempt to accommodate scarcity to their wants and how these attempts interact through exchange." Explain. "Economics is the study of human behaviour as a relationship between ends and means which have alternative uses." Explain this statement.

Q. 3. What are the types of problems to which economists attempt to find answers? (C. U. B. Com. 1951).

Q. 4. "Economics studies the part played by money in human affairs." Critically examine this statement. (C. U. 1959; B. Com. 1954; Viswa. 1953).

Q. 5. "From the point of view of Society's interest it is very desirable that businessmen should study economics." Elucidate the statement. (C. U. B. Com. 1943).

Q. 6. Discuss the claim of Economics to be regarded as science. "Economics cannot be a science because economists disagree." Comment. (C. U. B. Com. 1946).

Q. 7. Comment on the following :—

"Economic laws are essentially hypothetical." (C. U. 1931). Explain what is meant by economic law and compare it with (a) Moral law, (b) Law administered in courts of Justice, and (c) Law of Natural Science. (C. U. 1929, 1926 ; Dacca 1943). What is an economic law ? "The laws of economics are to be compared with the laws of tides rather than with simple and exact law of gravitation." Explain the nature of the laws of economics and discuss the view of Marshall. (Ag. 1939 ; Bana. 1930 ; C. U. 1926 ; Delhi. 1934 ; Mad. 1936 ; Pat. 1945 ; Pun. 1940).

Q. 8. "There is not any one method which can properly be called the method of economics but every method must be made serviceable in its proper place." (Marshall). Explain and Illustrate. (C. U. B. Com. 1933 ; C. U. 1935 ; All. 1935). What are the methods of economics ? Explain the relative advantages and disadvantages of the deductive and the inductive method in the investigation of economic phenomena. (Agra 1937 ; Pun. 1937). "Induction and Deduction are both needed for walking." Explain fully the above statement. (Agra 1945, '40, '36, '30).

Q. 9. Discuss the relation of Economics to Sociology, Politics and Ethics. (C. U. 1939 ; C. U. B. Com. 1931).

দ্বিতীয় অধ্যায়

কয়েকটি সংজ্ঞা

(On Some Definitions)

দ্রব্য (Goods) : যাহা দিয়া মানুষ অভাব মিটাইতে পারে তাহাকে দ্রব্য বলে। দ্রব্য বাস্তব বা অবাস্তব দুই প্রকারের হইতে পারে।

দ্রব্য দুই প্রকারের—প্রচুর ও অপ্রচুর। যে দ্রব্যের যোগান চাহিদার তুলনায় বেশি তাহাকে প্রথম শ্রেণীর দ্রব্য বা অর্থনৈতিক দ্রব্য বলা হয়। সূর্যরশ্মি, বাতাস, সমুদ্রের জল, মরুভূমির বালি প্রভৃতি এইরূপ দ্রব্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

যাহার যোগান চাহিদার তুলনায় কম তাহাকে অপ্রচুর বা অর্থনৈতিক দ্রব্য বলে। সুতরাং প্রচুর ও অর্থনৈতিক দ্রব্যের পার্থক্য সুনির্দিষ্ট নয়। শহরবাসীদের নিকট জল অর্থনৈতিক দ্রব্যের পর্যায়ে পড়ে, কিন্তু যাহারা নদীতীরে বাস করে তাহাদের নিকট জল প্রথমশ্রেণীর দ্রব্যভুক্ত। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর জিনিস অর্থনৈতিক দ্রব্য পর্যায়ভুক্ত হইতেছে। অল্পতা কোন একটি নির্দিষ্ট গুণ নয়, আমাদের অভাববোধের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও পরিবর্তিত হয়।

ধন (Wealth) : অর্থনৈতিক দ্রব্যমাত্রকেই ধন বলে। ধনের চারিটি লক্ষণ আছে :—(১) উপযোগ অর্থাৎ অভাব মিটাইবার ক্ষমতা, (২) অপ্রাচুর্য, (৩) হস্তান্তর করণের যোগ্যতা এবং (৪) বহিরঙ্গতা অর্থাৎ ইহা বাহ্যবস্তু। সুতরাং ধন বলিতে আমরা সেই সব জিনিসকে বুঝি যাহা হস্তান্তর করা যায় এবং যাহা বাহ্য, যেমন জমিজমা, আসবাবপত্র, বাড়িঘর ইত্যাদি। ব্যবসায়ের সুনাম, বই ছাপাইবার স্বত্ব, ইত্যাদি অবাস্তব পদার্থ যাহা বাহ্য এবং হস্তান্তরের যোগ্য তাহাদিগকেও ধন বলা হয়। কিন্তু যে সব জিনিস হস্তান্তর করা যায় না সেইগুলি ধন নয়। যেমন মুক্ত বাতাস। আবার যে সব জিনিস বাহ্য নয় তাহাকেও ধন বলা চলে না, যেমন শিল্পীর সহজাত কৌশল অথবা মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলী।

ঐকত্রিক ধন (Collective wealth) ঃ সাধারণের ব্যবহার্য বাহ্য, হস্তান্তর যোগ্য বাস্তব ও অবাস্তব দ্রব্যদিগকে ঐকত্রিক ধন বলে। রাস্তাঘাট, সরকারী অফিস, শিল্পশালা ইত্যাদি ঐকত্রিক ধনের উদাহরণ।

জাতীয় ধন (National wealth) ঃ সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত ও ঐকত্রিক ধনের যোগফলই জাতীয় ধন। কিন্তু সরকারী ঋণপত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইলেও ইহা জাতীয় ঋণ। ধার করিয়া অনেক সরকারী কাজ করা হয়। জাতীয় ধনের হিসাবের সময় এই ঋণকে বাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু বিদেশীর নিকট যে টাকা আমাদের প্রাপ্য তাহা জাতীয় ধনের অন্তর্গত।

মূল্য (Value)

ব্যবহারমূল্য ও বিনিময়মূল্য (Value-in use and value-in-exchange) ঃ মূল্য কথাটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা,—উপযোগ অথবা ক্রয়ক্ষমতা। ব্যবহারমূল্য বলিতে উপযোগ এবং বিনিময়মূল্য বলিতে ক্রয়-ক্ষমতাকে বুঝায়। বিনিময়মূল্যের জন্য উপযোগই যথেষ্ট নয়, দ্রব্যটির যোগান চাহিদা অপেক্ষা কম হওয়া চাই। অর্থশাস্ত্রে আমরা প্রধানত বিনিময়মূল্য লইয়া আলোচনা করি।

এমন কয়েকটি দ্রব্য আছে যাহা অতীব প্রয়োজনীয়, কিন্তু তাহাদের কোন বিনিময়মূল্য নাই, যেমন জল। সোনা অপেক্ষাও মানুষের কাছে জলের প্রয়োজনীয়তা বেশি ; কিন্তু জলের কোন বিনিময়মূল্য নাই, কিংবা থাকিলে তাহা খুব কম। অর্থাৎ সোনা অপেক্ষা জলের ব্যবহারমূল্য বেশি, কিন্তু বিনিময়মূল্য কম। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। জলের যোগান অপেক্ষা সোনার যোগান অনেক কম। সুতরাং সোনার বিনিময়মূল্য জলের বিনিময়-মূল্য অপেক্ষা বেশি। উপযোগ থাকিলেই বিনিময়মূল্য থাকে না, যোগানও অল্প হওয়া চাই। সাধারণত যোগান যত কম হইবে বিনিময়মূল্য তত বাড়িবে।

ভোগ (Consumption)

ভোগ ঃ ভোগ কাহাকে বলে ? অভাব মিটাইবার উদ্দেশ্যে দ্রব্যের ব্যবহারকে ভোগ বলা হয়। ভোগের ফলে জিনিসের উপযোগ নষ্ট হয়।

কিন্তু জিনিসটি নষ্ট নাও হইতে পারে। ঘরে বাস করাকে ভোগ করা বলে। কিন্তু তাহাতে ঘরটি নষ্ট হইয়া যায় না। আবার ভোজনবিলাসী যখন অতিভোজন করে তখনও ভোগ করা বলে।

ভোগই মানুষের সর্ববিধ কাজের লক্ষ্য। অভাবের তাড়নায় মানুষ অর্থনৈতিক কর্মে ব্যাপৃত হয়। সে কি পরিমাণ অর্থ নিতে চায় তাহাতেই অভাবের পরিমাণ স্থির করা যায়। ক্রেতারা কোন্ কোন্ জিনিস এবং কত পরিমাণে কিনিতে চায় ইহার দ্বারা উৎপাদকেরা কোন জিনিস তৈয়ারি করিবে, কোন্‌টি করিবে না তাহা স্থির করে। ক্রেতারা যে জিনিসের জন্য বেশি পয়সা দেয়, উৎপাদকেরা তাহাই বেশি করিয়া তৈয়ারি করে।

অভাবের তাড়নায় যেমন মানুষ কাজ করে, তেমনি আবার কাজের ফলেও অভাব বাড়ে। সভ্যতার আদিম যুগে শুধু দৈহিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই মানুষ কাজ করিত। সভ্য মানুষ দৈহিক অভাব মিটাইবার জন্য কাজ করে বটে; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাহার কাজের ফলে নূতন নূতন অভাব দেখা দেয়। সাইকেল অথবা টেলিফোনের উদ্ভাবন কোন অভাব বোধ হইতে হয় নাই। কিন্তু এই যন্ত্রগুলি ব্যবহারের ফলে মানুষের নূতন অভাব দেখা দিয়াছে। এইরূপ অনেকক্ষেত্রে উৎপাদনের ফলে ভোগ বাড়িয়াছে। সুতরাং ভোগ ও উৎপাদন পরস্পর নির্ভরশীল।

উৎপাদন (Production)

সাধারণত জিনিসপত্র তৈয়ারি করাকে উৎপাদন বলে। ঠিকমত ভাবিলে দেখা যায় যে মানুষ আসলে কোন জিনিস তৈয়ারি করে না। জিনিসমাত্রই প্রকৃতিদত্ত। ভূগর্ভে কয়লার খনিতে কয়লা থাকে। মানুষ কলকব্জা খাটাইয়া পরিশ্রম করিয়া খনি হইতে কয়লা উপরে তোলে। ইহাকেই কয়লা উৎপাদন করা বলে। মানুষ জিনিস তৈয়ারি করে না—জিনিসের আকার বা রূপ প্রভৃতির পরিবর্তন করে মাত্র। সুতরাং উৎপাদনের অর্থ জিনিস তৈয়ারি করা নয়, জিনিসের রূপ বা আকারের পরিবর্তন করা। জিনিসের রূপ পরিবর্তন করার ফলে ইহার উপযোগ বাড়ে—মূল্য বৃদ্ধি পায়। বনের মধ্যস্থিত গাছের মূল্য আছে সন্দেহ নাই। সেই গাছ কাটিয়া লোকালয়ে চালান দিলে ইহার মূল্য আরো বাড়ে। আবার

যখন সেই কাঠ কাটিয়া চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি তৈয়ারি করা হয় তখন ইহাদের উপযোগ আরো বাড়ে, মূল্য আরো বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জিনিসের উপযোগ বাড়ানকে উৎপাদন বলে। যে কাজের ফলে জিনিসের উপযোগ বাড়ে, মূল্য বৃদ্ধি পায়, সেই কাজকেই উৎপাদন বলে।

উপযোগ তিন প্রকারের হইতে পারে—আকারগত, স্থানগত ও কালগত। জিনিসের আকার, রং, গন্ধ বা অন্য কোন রকম পরিবর্তন করিয়া তাহার উপযোগ বাড়ান যায়—যেমন, কাঠ হইতে চেয়ার-টেবিল তৈয়ারি করা। ইহাকে আকারগত উপযোগ (Form utility) বলে। আবার কোন জিনিসকে শুধু একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া গেলে তাহার উপযোগ বাড়ে —যেমন রানীগঞ্জের কয়লার খনি হইতে কয়লা কলিকাতায় চালান দেওয়া। ইহার ফলে কয়লার উপযোগ ও মূল্য বাড়ে। ইহাকে স্থানগত উপযোগ (Place utility) বলে। তৃতীয়ত, কোন জিনিস হয়ত একসময়ে বেশি, অন্য সময়ে কম পাওয়া যায়। যদি কেহ সেই জিনিসটি রাখিয়া দিয়া অসময়ে বিক্রয় করে, তবে সে কালগত উপযোগ (Time utility) সৃষ্টি করিয়াছে বলা হয়। এই সমস্ত প্রকারের কাজকেই উৎপাদন বলা হয়।

উৎপাদক ও অনুৎপাদক শ্রম (Productive and Unproductive labour): প্রাচীনকালে অর্থশাস্ত্রীরা 'কোন্ প্রকারের কাজ উৎপাদক ও কোন্‌টি অনুৎপাদক এই শ্রেণী বিভাগ করিতেন। গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল বলিয়াছেন যে, কৃষি কাজ প্রভৃতি কতকগুলি কাজ বিশেষ প্রয়োজনীয়, অন্যগুলি ইহা অপেক্ষা কম প্রয়োজনীয়। ফরাসী দেশে ফিজিওক্রোট নামে পরিচিত একদল লেখকের মত ছিল যে, একমাত্র কৃষি-কাজই উৎপাদক। কারণ কৃষিকাজের ফলে বাড়তি উৎপাদন হয়। অর্থাৎ যে পরিমাণ পরিশ্রম করা হয় তাহার তুলনায় বেশি শস্য উৎপাদিত হয়। ব্যবসায়ীর কাজ অনুৎপাদক—সেখানে পরিশ্রমের তুলনায় বাড়তি উৎপাদন হয় না—যেটুকু কাজ হয় সেই পরিমাণ উৎপাদন হয় মাত্র। পরবর্তীকালে বিখ্যাত ইংরাজ লেখক আডম স্মিথ বলিয়াছেন যে শুধু কৃষি-কর্ম নয়, ব্যবসায়-বাণিজ্যের কাজও উৎপাদক। তাঁহার মতে যে কাজের ফলে কোন বাস্তব দ্রব্য তৈয়ারি হয় সেই কাজ উৎপাদক। যেমন, যে চেয়ার, টেবিল, হারমোনিয়ম এই সমস্ত বাস্তব দ্রব্য তৈয়ারি করে, তাহার শ্রমই উৎপাদক

শ্রম। কিন্তু গায়ক, শিক্ষক, নর্তক, অভিনেতা, বিচারক, চিকিৎসক, উকিল, ব্যারিস্টার সকলেই অনুৎপাদক শ্রম করে। কারণ তাঁহাদের শ্রমের ফলে কোন বাস্তব পদার্থের উৎপাদন হয় না। কেবলমাত্র যে জিনিস তৈয়ারি করে, বা জিনিস তৈয়ারি করিতে সাহায্য করে, তাহার শ্রমই উৎপাদক। পরবর্তীকালের লেখক জে. এস. মিলেরও একই মত ছিল।

কিন্তু বর্তমান কালের লেখকেরা আর এই মত সমর্থন করেন না। কারণ ইহার ফলে নানা অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। গায়কদের কথাই ধরা যাক। গায়কেরা কোন বাস্তব পদার্থ তৈয়ারি করে না সত্য। সেইজন্য তাহাদের শ্রমকে অনুৎপাদক বলা হইতেছে। অথচ যে শ্রমিক হারমোনিয়ম তৈয়ারি করিয়াছে তাহার শ্রম উৎপাদক। হারমোনিয়াম বাজান যদি অনুৎপাদক কাজ হয়, তবে তাহা তৈয়ারি করিবার প্রয়োজন কি? ইহা যে তৈয়ারি করিয়াছে তাহার শ্রমকেই বা উৎপাদক বলা চলে কি প্রকারে? অপ্রয়োজনীয় জিনিস তৈয়ারি করার পরিশ্রমকে উৎপাদক শ্রম বলা চলে না যদিও এই শ্রমের ফলে বাস্তব পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে।

সুতরাং উৎপাদক ও অনুৎপাদক শ্রমের মধ্যে যদি প্রভেদ করিতে হয়, তবে ইহার মাপকাঠি হইতেছে উপযোগের সৃষ্টি। মনে রাখা দরকার যে মানুষ কোন জিনিস তৈয়ারি করিতে পারে না। জিনিস প্রকৃতিদত্ত। মানুষ পরিশ্রমের দ্বারা প্রকৃতিদত্ত জিনিসের আকার, রূপ প্রভৃতির পরিবর্তন করে, যাহার ফলে জিনিসটির উপযোগ বাড়ে। যে শ্রমের দ্বারা জিনিসের উপযোগ বৃদ্ধি পায় তাহাকেই উৎপাদক শ্রম বলা উচিত। মানুষের অভাব বা প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যাহারা পরিশ্রম করিতেছে, নানা প্রকারের কাজ করিতেছে তাহাদের সকলেরই শ্রম উৎপাদক। কেবলমাত্র অবাঞ্ছিত জিনিসের উৎপাদনকে অনুৎপাদক বলা হয়। জিনিসটি বাস্তব কি অবাস্তব, ভাল কি মন্দ ইহার সহিত উৎপাদক অনুৎপাদক বিভেদের কোন সম্বন্ধ নাই। মদ যে তৈয়ারি করে তাহার শ্রমও উৎপাদক, যদিও মদ খাওয়া যে মন্দ এ সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। বিচারক, শিক্ষক, গায়ক—ইহাদের সকলের শ্রমই উৎপাদক। কারণ ইহাদের কাজের চাহিদা আছে। যদিও ইহাদের শ্রমের ফলে কোন বাস্তব পদার্থের উৎপাদন হয় না।

উৎপাদনের উপকরণ (Factors of Production) : উপকরণের সাহায্যে উৎপাদন করা হয়। উৎপাদনের এই উপকরণগুলি কি? প্রাচীন লেখকেরা তিনটি উপকরণের কথা বলিয়াছেন যথা, জমি, শ্রম ও মূলধন। জমি বলিলে শুধু ভূপৃষ্ঠ বোঝায় না। ভূপৃষ্ঠ ছাড়াও মাটির উর্বরতা, আলো-হাওয়া, দেশের আবহাওয়া, সমস্ত কিছুকেই 'জমি' এই ব্যাপক নাম দেওয়া হইয়াছে। শারীরিক ও মানসিক সব রকমের কাজকে শ্রম বলে। কেবলমাত্র আনন্দের জন্য যে কাজ করা হয় তাহা অবশ্য অর্থনৈতিক অর্থে শ্রম নয়। অর্থশাস্ত্রীর নিকট শিক্ষক বা দিনমজুর সকলেই শ্রমিক। প্রাকৃতিক জিনিসগুলির উপর শ্রম প্রয়োগ করিয়া আমরা কতকগুলি উপকরণ পাই। সেগুলিকে আবার উৎপাদনের কাজে লাগাই। এই উপকরণগুলি অতীত শ্রমের ফল এবং বর্তমান উৎপাদনের সহায়ক। এইগুলিকে মূলধন বলে। জমি, শ্রমিক ও মূলধন থাকিলেই উৎপাদন হয় না। এই তিনটিকে একত্র করিয়া ঠিকমত কাজে লাগাইলে তবেই উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। চালক না থাকিলে গাড়ি চলে না। চালক গাড়িতে বসিয়া ঠিকমত কল টিপিলে তবে গাড়ি চলিতে শুরু করে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই চালকের কাজ যাহারা করে, তাহাদের উদ্যোক্তা বা (entrepreneur) বলে। বর্তমানে উদ্যোক্তার কাজের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়িতেছে। উৎপাদনের উপকরণগুলি যথার্থ পরিমাণে কাজে লাগাইয়া সর্বাপেক্ষা কম খরচে সর্বাপেক্ষা বেশি উৎপাদন করাই তাহার প্রধান কাজ।

আধুনিক লেখকেরা অনেকেই জমি ও মূলধনের কোন পার্থক্য স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে জমি একপ্রকারের মূলধন মাত্র।

ইহার পরের কয়েকটি অধ্যায়ে উৎপাদনের উপকরণগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হইতেছে।

Exercises

Q. 1. Write notes on : (a) Consumer's goods, (b) producer's goods.

Q. 2. Define wealth and distinguish between Individual wealth, Collective wealth, and National wealth. Wealth is

fundamentally the same thing as utility. Discuss whether, the following ought to be regarded as wealth :—(a) A gold coin, (b) Gold ore in a mine, (c) Gold in the Planet Mars, (d) An autograph of Poet Rabindranath, (e) A healthful climate, (f) Executive ability, (g) A farm the ownership of which is disputed, (h) B. A Diploma (i) Fresh Air, (j) The copyright of a Book, (k) Intoxicating Liquor, (l) The dexterity of a mechanic.

Q. 3. What is consumption ?

Q. 4. What are the characteristics of wants ?

Q. 5. Describe the relation between wants and utility.

Q. 6. Distinguish between Necessaries, Comforts and Luxuries Is the consumption of luxaries beneficial to society from the economic point of view ?

তৃতীয় অধ্যায়

উৎপাদনের উপাদান

জমি (Land)

প্রাচীন অর্থশাস্ত্রীরা জমি বলিতে দেশের জলবায়ু, খনিজসম্পদ, বনসম্পদ, জলশক্তি প্রভৃতি প্রকৃতিদত্ত সম্পদকেই বুঝিতেন। এই সমস্ত প্রকৃতিদত্ত সম্পদের যোগান নির্দিষ্ট বলিয়া তাহারা জমিকে উৎপাদনের একটি স্বতন্ত্র উপকরণ মনে করিতেন। অন্যান্য উপাদান মানুষের শ্রমের ফল। মানুষ পরিশ্রম করিয়া যন্ত্রপাতির উৎপাদন বাড়াইতে পারে। কিন্তু জমির পরিমাণ বাডান বা কমান যায় না। ইংরাজ লেখক রিকার্ডোর মতে জমির কতকগুলি আদিম ও অবিনাশী গুণ আছে। এইজন্য উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম (Law of Diminishing Return) নামে একটি বিশেষ নিয়ম জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু আধুনিক লেখকদের মধ্যে অনেকে এই মত গ্রহণ করেন না। তাঁহারা জমি ও অন্যান্য উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখেন না। তাঁহারা বলেন যে শুধু কেবল জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট নহে, বলিতে গেলে পৃথিবীর সব কিছুরই পরিমাণ নির্দিষ্ট। মরুভূমির মত উর্বর জমিকে মানুষ উপযুক্ত সেচব্যবস্থার দ্বারা কৃষিযোগ্য করিয়াছে। ইহার ফলে জমির পরিমাণ বাড়ে, যেমন নূতন ইস্পাতের কারখানা বসাইলেও ইস্পাতের যোগান বাড়ে। জমি তৈয়ারির কোন খরচ নাই একথা বলা ভুল হইবে। ভূমিকে কর্ষণযোগ্য করিতে বহু পরিশ্রম করিতে হয়। বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। এই হিসাবে জমি ও মূলধনের কোন পার্থক্য নাই। অল্প সময়ের মধ্যে জমির মত অনেক জিনিসেরেই যোগান বাড়ান সম্ভব নয়; আবার দীর্ঘ সময়ে অন্যান্য উপকরণের ন্যায় জমির পরিমাণও বাড়ান যায়। উৎপাদনহ্রাসের নিয়ম শুধু যে জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহা নহে; অন্যান্য উপকরণের বেলায়ও তাহা সমান ভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং তাহারা জমিকে পৃথক উপকরণ বলিয়া গণ্য করেন না।

উৎপাদনহ্রাসের নিয়ম (Law of Diminishing Returns) : প্রাচীন অর্থশাস্ত্রীরা এই নিয়মটি বিশেষভাবে জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলিয়া মনে করিতেন। অভিজ্ঞ কৃষকমাত্রেই জানে যে একখণ্ড জমিতে যত খুশি ফসল উৎপাদন করা চলে না। একই জমিতে যতই পরিশ্রম করিয়া চাষ করা যাক না কেন উৎপাদন ঠিক পরিশ্রমের অনুপাতে বাড়ে না। দ্বিগুণ শ্রম ও মূলধন দিয়া চাষ করিলে প্রথমে হয়ত উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ বা ইহারও বেশি হইতে পারে। কিন্তু এইভাবে ক্রমে ক্রমে সেই জমিতে শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ আরো বাড়াইলে ফসল আর সেই পরিমাণ বেশি পাওয়া যায় না। যে পরিশ্রমে ১০ মণ ধান পাওয়া যায় দ্বিতীয়বার সেই পরিশ্রমে আরও দশমণ ধান ফলে না। হয়ত মাত্র ৮ মণ ধান বেশি পাওয়া যায়। যদি চাষের পদ্ধতির উন্নতি না হয় তবে একই জমিতে বেশি পরিমাণ পরিশ্রম ও মূলধন লাগাইলেও ফসলের পরিমাণ সমান অনুপাতে বাড়ে না।

একটি উদাহরণ দিয়া নিয়মটি বুঝান যাক। তিন বিঘা জমি প্রথমে একজন চাষী তারপর দুইজন এইভাবে আবাদ করিতেছে। প্রত্যেক চাষীর লাঙ্গল ও অন্যান্য সরঞ্জাম আছে। জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে সার ও সেচের ব্যবস্থাও আছে। তৃতীয় কলমে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ দেখান হইয়াছে। শেষ কলমে আরও একজন শ্রমিক নিয়োগের ফলে অতিরিক্ত কত ফসল পাওয়া গেল দেখান হইয়াছে।

জমি	শ্রমিক	মোট উৎপাদন	অতিরিক্ত উৎপাদন
৩ বিঘা	১ জন	৩৫ মণ	
৩ বিঘা	২ জন	৭৫ মণ	৪০ মণ
৩ বিঘা	৩ জন	১১২ মণ	৩৭ মণ
৩ বিঘা	৪ জন	১৪২ মণ	৩০ মণ

এই তালিকা হইতে বোঝা যায় যে, একজনের জায়গায় দুইজন শ্রমিক নিয়োগ করিলে উৎপাদন প্রথমে দ্বিগুণের বেশি বাড়ে। কিন্তু তিনজন লোক নিয়োগ করিলে অতিরিক্ত উৎপাদন সমান অনুপাতে বাড়ে না। ইহার পর উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমিতে থাকে। ১ জন লোক দিয়া জমি

চাষ করিলে মাত্র ৩৫ মণ ফসল পাওয়া যায়। সেই জমিতে যদি আর একজন শ্রমিক লাগান হয় তবে মোট ফসলের পরিমাণ হয় ৭৫ মণ অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রমিক নিয়োগের ফলে ফসল বাড়িয়াছে ৪০ মণ, এবং ইহা প্রথম বারের ফসল অপেক্ষা বেশি। যখন তিনজন শ্রমিক দিয়া জমি চাষ করা হইল তখন মোট ফসলের পরিমাণ হইল ১১২ মণ। অর্থাৎ ৩য় শ্রমিকের পরিশ্রমের ফলে ফসল বাড়িয়াছে ৩৭ মণ। দ্বিতীয়বার যাহা বাড়িয়াছিল ইহা তাহা অপেক্ষা কম। চতুর্থ শ্রমিক লাগাইলে ফসল বাড়িল মাত্র ৩০ মণ অর্থাৎ ২য় শ্রমিকের বেলাতে যাহা পাওয়া গিয়াছিল তাহার কম।
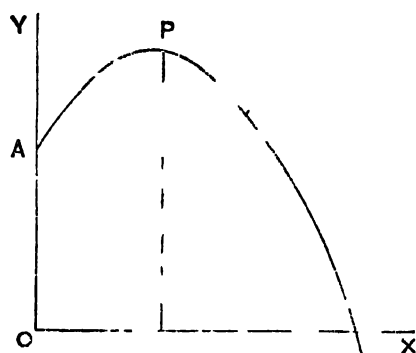
১নং চিত্র।

উপরের চিত্রে রেখার দ্বারা উৎপাদনহ্রাসের নিয়মটি বোঝান যায়। OX রেখা শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ এবং OY রেখা অতিরিক্ত উৎপাদনের পরিমাণ নির্দেশ করিতেছে। প্রথমে জমিটি হয়ত ভালভাবে আবাদ করা হয় নাই। সুতরাং শ্রম ও মূলধন বাড়াইলে ফসল সেই অনুপাতে বেশি হারে বাড়িবে। রেখাটি তাই A হইতে P পর্যন্ত উপরের দিকে উঠিতেছে। ইহার অর্থ এই প্রথম প্রথম বেশি শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিলে জমি হইতে ক্রমেই বেশি অনুপাতে ফসল পাওয়া যাইবে। কিন্তু সেই জমিতে যদি ইহার বেশি শ্রম ও মূলধন দিয়া চাষ করা হয় তবে অতিরিক্ত ফসলের পরিমাণ ক্রমেই কমিতে থাকিবে। সেইজন্য P বিন্দুটির পর হইতে অতিরিক্ত উৎপাদনের রেখা নীচের দিকে নামিতেছে।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এই নিয়মটি উৎপন্ন ফসল সম্পর্কে প্রযোজ্য, ফসলের মূল্য সম্পর্কে নহে। জমিতে কম ফসল হইয়াও যদি ফসলের

মূল্যবৃদ্ধি হইতে থাকে তবে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে পারে। ইহাকে এই নিয়মের ব্যতিক্রম বলা হইবে না। আরও মনে রাখিতে হইবে যে, এই নিয়মে এ কথা বলে না যে মোট উৎপাদনের পরিমাণ কমে। জমি বেশি করিয়া চাষ করিলে উৎপাদন বাড়ে, কিন্তু বৃদ্ধির হার কমিতে থাকে। যখন জমিতে তিনজনের স্থলে চারজন শ্রমিক লাগান হয় তখন মোট উৎপাদন ১১২ মণ হইতে ১৪২ মণ হয়। কিন্তু বৃদ্ধির হার কমে। অর্থাৎ ২ জনের স্থলে তিনজন মজুর লাগাইলে ফসলের পরিমাণ বাড়িবে ৩৭ মণ। কিন্তু তিনজনের স্থলে চারজনের পরিশ্রমে মাত্র ৩০ মণ বেশি ফসল পাওয়া গেল। এ ক্ষেত্রে মোট ফসলের পরিমাণ বাড়িতেছে। কিন্তু বৃদ্ধির হার কম হইতেছে। আরও একটি কথা এই যে জমির উৎপাদিকাশক্তি কমে বলিয়া উৎপাদন কমে না উৎপাদিকাশক্তি বাড়ে-কমে না ইহা ধরিয়া লইয়াই এই নিয়মটি বলা হয়। জমির উৎপাদন-শক্তি ঠিক থাকিলেই একখণ্ড জমিতে অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধন লাগাইলে উৎপাদনবৃদ্ধি কম হারে হইতে থাকে।

দুইটি কারণে উৎপাদনের হার কমিতে পারে। প্রথমত, অধিক ফসলের জন্য প্রয়োজন হইলে কৃষক ভাল জমি আরও না পাইলে নিকৃষ্ট জমি চাষ করে। ইহার ফলে উৎপাদন কমে। ইহাকে ব্যাপক কর্ষণ (extensive cultivation) বলে। দ্বিতীয়ত, কৃষক একই জমি বেশি পরিশ্রম করিয়া ও বেশি মূলধন লাগাইয়া চাষ করিতে পারে। ইহাকে অতিকর্ষণ (intensive cultivation) বলে। চাষীরা বেশি পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিলে অতিরিক্ত ফসলের পরিমাণ কমিতে থাকে। অবশেষে এমন অবস্থা আসিবে যখন অতিরিক্ত ফসলের পরিমাণ এবং শ্রম ও মূলধন বাবদ যাহা ব্যয় হয় তাহার সমান হইয়া যাইবে। ধরা যাক যে একজন চাষা ও একটি লাঙ্গল যেন শ্রম ও মূলধনের একটি মাত্রা বা ডোজ এবং ইহাদের মাহিনা ইত্যাদি বাবদ মোট ৩০০ টাকা ব্যয় হয়। জমিতে একজন লোক একটি লাঙ্গল দিয়া চাষ করিলে ফসল হয় ৩৫ মণ ও খরচ পড়ে ৩০০ টাকা তাহা হইলে এক মণ ফসলের উৎপাদনব্যয় পড়ে ৮·৬০ টাকা। বাজারে ফসলের দাম মণ প্রতি দশ টাকা পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মাত্রা বা ডোজ প্রয়োগ করিলে —অর্থাৎ আর একজন লোক ও লাঙ্গল দিয়া জমি বেশি করিয়া চাষ করিলে

এই বাবদ অতিরিক্ত ব্যয় হয় ৩০০ টাকা। কিন্তু অতিরিক্ত ফসল পাওয়া যায় ৪০ মণ (পূর্বের উদাহরণ দেখ) ও ইহার মূল্য ৪০০ টাকা। তৃতীয় মাত্রার শ্রম ও মূলধন (অর্থাৎ সর্বশুদ্ধ তিনজন লোক ও লাঙ্গল) দিয়া জমি চাষ করিলে এবারেও অতিরিক্ত ব্যয় হয় ৩০০ টাকা। তৃতীয় মাত্রার শ্রম ও মূলধন (অর্থাৎ সর্বশুদ্ধ তিনজন লোক ও লাঙ্গল) দিয়া জমি চাষ করিলে এবারেও অতিরিক্ত ফসল পাওয়া যায় ৩৭ মণ ও ইহার দাম ৩৭০ টাকা। চতুর্থ মাত্রায় শ্রম ও মূলধন অর্থাৎ জমিতে মোট চারজন লোক ও লাঙ্গল দিলে অতিরিক্ত ফসল পাওয়া যায় ৩০ মণ। ইহার দাম ৩০০ টাকা। চতুর্থ লোক ও লাঙ্গলের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় পড়ে ৩০০ টাকা। এইবার দেখা যাইতেছে যে চতুর্থ লোক দিয়া চাষের ফলে অতিরিক্ত যে ফসল পাওয়া যায় ইহার মূল্য অতিরিক্ত উৎপাদনব্যয়ের সমান হয়। শ্রম ও মূলধনের এই শেষ মাত্রাটিকে প্রান্তিক মাত্রা (marginal dose) বলে। যে জমিতে প্রান্তিক মাত্রা লাগান হয় ইহাকে প্রান্তিক জমি (marginal land) বলে।

এই নিয়মটির মূলে কতকগুলি জিনিস আছে। প্রথমত সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হইতেছে, অর্থাৎ সর্বাবস্থায় জমি ঠিকমত চাষ করা হইতেছে ইহা অনুমান করা হইয়াছে। জমি যদি প্রথমে ঠিকমত চাষ না করা হইয়া থাকে তবে শ্রম ও মূলধন বাড়াইবার ফলে প্রথম প্রথম ফসলের পরিমাণ বাড়িতে পারে। দ্বিতীয়ত, নূতন উন্নততর চাষের পদ্ধতি অবলম্বন করা হইতেছে না, ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। যদি বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে এমন ব্যবস্থা করা হয় যাহাতে জমির উৎপাদিকাশক্তি বাড়ে, তবে এই নিয়ম সাময়িকভাবে প্রযুক্ত হইবে না। ১৯১৯-২০ সালের পর পশ্চিমের বহু দেশে কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়াছে। ইহার ফলে ফসলের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়াছিল। এই অবস্থায় উৎপাদনহ্রাসের নিয়ম প্রযুক্ত নাও হইতে পারে। কিন্তু ইহা সাময়িকমাত্র। কিছুদিন পরে আবার এই নিয়ম কার্যকরী হইবে।

কৃষিছাড়া অন্যত্র উৎপাদনহ্রাসের নিয়ম প্রয়োগ: উৎপাদন-হ্রাসের নিয়ম যে বিশেষভাবে কৃষিতে প্রযোজ্য এই কথা আলোচনা করা হইল। ক্ল্যাসিকাল লেখকদের মতে এই নিয়ম কৃষিছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও যেমন খনি, শহরের জমি, মাছের বিল ইত্যাদিতে প্রযোজ্য।

উন্নত ধরনের উৎপাদনব্যবস্থা অবলম্বন করা না হইলে খনিতে উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পায়। যত বেশি কয়লা উৎপাদন করা হয় ততই মাটির নীচে যাইতে হয় এবং কয়লা উপরে তুলিবার খরচা বাড়ে। অর্থাৎ একই পরিশ্রম ও খরচে ক্রমেই কম কয়লা উৎপাদন হয়।

শহরের জমিতেও এই নিয়মটি খাটে। আধুনিক যুগে আট তলা বাড়ি প্রায়ই তৈয়ারি করা হইতেছে। এমন এক সময় আসে যখন আরো তলা বাড়াইবার সুবিধা কমিয়া যায়। তলার উপর তলা বাড়াইয়া গেলে নীচের ঘরগুলির আলো-বাতাস কমিয়া যায়, ঘর তৈয়ারির সাজসরঞ্জাম উপরে উঠাইবার খরচ বাড়িয়া যায়, তত্ত্বাবধান করারও অসুবিধা দেখা দেয়। তখন উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে।

মাছের চাষেও এ নিয়ম খাটে। এই ব্যবসায়েও শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বাড়াইলে উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে। বেশি মাছ ধরিতে হইলে নদীতে বেশি দূরে যাইতে হয়। ফলে পরিশ্রম বাড়ে, কিন্তু মাছ সেই পরিমাণ ধরা পড়ে না।

অনুপাত পরিবর্তনের নিয়ম (Law of Variable Proportions): বর্তমানে অনেকেই স্বীকার করেন যে, উৎপাদনহ্রাসের নিয়মটি শুধু জমির বেলায় প্রযোজ্য নয়। নিয়মটি ব্যাখ্যা করিবার সময় আমরা বলিয়াছি যে একই জমি বেশি শ্রমিক দিয়া চাষ করান হইতেছে ও মূলধনের পরিমাণ বাড়ান হইতেছে। ইহার ফলে উৎপাদন বাড়ে বটে, কিন্তু ক্রমেই ফসল বৃদ্ধির পরিমাণ কমিয়া যায়। এখানে জমির পরিমাণ সমান রাখিয়া অন্য উপকরণের পরিমাণ বাড়ান হইতেছে। ঠিকমত এইরূপ ব্যবস্থা করিলে এই নিয়মটি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সমস্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রেই একটি উপকরণের পরিমাণ স্থির রাখিয়া অন্যগুলির পরিমাণ বাড়াইলে কিছুকাল পরে উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমিয়া যায়।

সেইজন্য আধুনিক লেখকেরা উৎপাদন হ্রাসের কথা না বলিয়া আনুপাতিক পরিবর্তনের নিয়মের কথা আলোচনা করেন। কোন কারণে বিশেষ একটি উপকরণের যোগান বাড়ান সম্ভব না হইতে পারে। উৎপাদন বাড়াইতে হইলে উক্ত উপকরণের নির্দিষ্ট পরিমাণের সহিত অন্যান্য উপকরণ অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে। ইহার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ সেই

অনুপাতে বাড়ে না। জমির ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ভাল জমির যোগান সীমাবদ্ধ। ফসলের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে নিকৃষ্ট জমি চাষ করিতে হইবে, অথবা ভাল জমিকে বেশি পরিশ্রম করিয়া চাষ করিতে হইবে; সুতরাং মোট উৎপাদন সমান অনুপাতে বাড়িবে না। একথা মূলধন ইত্যাদি অন্যান্য উপকরণের বেলায়ও খাটে। মূলধনের পরিমাণ সমান রাখিয়া অন্যান্য উপকরণের পরিমাণ বাড়াইলেও উৎপাদন সমান অনুপাতে বাড়ে না। অধিক উৎপাদন করিতে গেলে প্রান্তিক ব্যয় (marginal cost) বাড়িবে। একটি উপকরণের পরিমাণ ঠিক রাখিয়া অন্য উপকরণ বেশি পরিমাণে ব্যবহার করিলেই এই নিয়ম দেখা যায়। সুতরাং উৎপাদন-হ্রাসের নিয়ম উৎপাদনের সব বিভাগেই প্রযোজ্য। শিল্প, কৃষি সর্বত্রই যদি কোন অবস্থায় একটি বা কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের সঙ্গে অন্য উপাদানে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করিতে হয় তবে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ কম হারে বাড়িবে। অর্থাৎ এই অবস্থায় দ্রব্যটির উৎপাদনব্যয় বাড়িয়া যাইবে।

Exercises

Q. 1. Explain the Law of Diminishing Returns as applicable to a (a) Agriculture and (b) Industries. (Viswa. 1956; C. U. 1955, '37; B. Com. 1942).

Q. 2. Explain the conditions which lead to the operation of the law of diminishing returns. Is this law incompatible with the economies of large-scale production? (C. U. B. Com. 1951).

Q. 3. "The Law of Diminishing Returns is only one phase of the universal law of variable proportions." Discuss. (C. U. B. Com. 1932).

Q. 4. "Labour and capital cannot be withdrawn from a part of the land and concentrated on the rest without causing a reduction of social income". Bring out the significance of this statement. (C. U. 1942).

Q. 5. "Reflection on the characteristics of Land gave us one of the most famous Economic Laws—the Law of Diminishing Returns"—Explain.

Is the operation of the Law restricted to Land alone? (C. U. B. Com. 1958).

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রমিক সরবরাহ ও জনসংখ্যা তত্ত্ব

(Supply of Labour and Theories of Population)

কাহারা উৎপাদন করে এবং কিভাবে উৎপাদন হয়? আমরা এইবার এই প্রশ্নগুলির আলোচনা করিব। উৎপাদন উপকরণগুলির বৈশিষ্ট্য এবং উৎপাদন ব্যবস্থার কথাও আলোচিত হইবে।

উপকরণগুলির মধ্যে শ্রমিকের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। শ্রমিকদের সংখ্যার উপর দেশের উৎপাদনের হার নির্ভর করে। মানুষ শুধু উৎপাদন করে না, ভোগও করে। অর্থশাস্ত্রে মানুষকে শুধু উৎপাদক হিসাবে দেখে না, ভোক্তা হিসাবেও দেখে। লোকসংখ্যা সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ও কি কি জিনিসের উপর শ্রমিকদের কার্যদক্ষতা নির্ভর করে সেই কথা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে। কেননা শ্রমের পরিমাণ শুধু শ্রমিকের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, তাহাদের কার্যদক্ষতার উপরও নির্ভর করে। দেশের লোকসংখ্যা জন্ম ও মৃত্যুর হার, বিদেশ হইতে আসা ও বিদেশে যাওয়ার উপর নির্ভর করে। ইহার মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুর হারই গুরুত্বপূর্ণ।

ম্যাল্‌থাসের জনতত্ত্ব: ১৭৯৮ সালে টমাস ম্যাল্‌থাস নামক একজন ইংরাজ লেখক তাঁহার "Essay on the Principle of population as it affects the future improvement of society." নামক গ্রন্থে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্বন্ধে তথ্য আলোচনা করেন। তাঁহার মতে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়। বিয়ে হলেই পুত্রকন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা—ইহাই স্বাভাবিক এবং ফলে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু খাদ্য উৎপাদন সেই হারে বাড়ান সম্ভব হয় না। তিনি বলেন যে লোকসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়ে (Geometrical Progression) অর্থাৎ যেমন ১, ৪, ১৬, ৬৪ এই হিসাবে বাড়ে এবং খাদ্য উৎপাদন পাটীগণিতিক নিয়মে (Arithmetical Progression) অর্থাৎ ১, ৫, ৯, ১৩ এই হারে বাড়ে। আমেরিকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব হইতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, প্রতি ২৫ বৎসরে লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হয়,

কিন্তু খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ হয় না। সুতরাং কালক্রমে লোকসংখ্যার পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণকে ছাড়াইয়া যাইবে। অতীতে এইরূপ ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতেও ঘটিবে।

সুতরাং লোকসংখ্যার এই অতি বৃদ্ধি বন্ধ করিতে না পারিলে খাদ্যাভাব ঘটিবে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি দুইভাবে কমান যায়। হয় জন্মের হার কমাইতে হইবে, নয়ত মৃত্যুর হার বাড়িয়া যাইবে। ব্রহ্মচর্যপালন এবং বিলম্বে বিবাহ ইত্যাদির ফলে জন্মের হার কমিতে পারে। এইগুলিকে "নিরোধমূলক পন্থা" (Preventive Checks) বলা হয়। মহামারী, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির ফলে মৃত্যুর হার বাড়ে। এইগুলিকে বিনাশমূলক পন্থা (Positive Checks) বলে। লোকসংখ্যাবৃদ্ধি যদি দ্বিতীয় পন্থার দ্বারা বন্ধ না হয়, তবে মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির দ্বারা লোকক্ষয় বাড়িবে। মানুষ যত সভ্য হয় ততই অভাব অপেক্ষা অভাবের আশঙ্কায় জন্মের হার কমাইবার চেষ্টা করে। খুব অনুন্নত সমাজ ছাড়া সর্বত্রই জন্মের হার কমাইয়া (অর্থাৎ নিরোধমূলক উপায়ের দ্বারা) লোক সংখ্যা বৃদ্ধি কমাইবার চেষ্টা হয়। লোকসংখ্যা কমাইবার জন্য ম্যাল্‌থাস নিরোধমূলক পন্থা অবলম্বন করার উপদেশ দিয়াছেন।

ইহাই ম্যাল্‌থাসের তত্ত্ব। হ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মের (Law of Diminishing Returns) সঙ্গে ইহার যোগ আছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জমি যত বেশি চাষ করা যায় ততই ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমিতে থাকে। ইহাতেই জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। জনসংখ্যা দ্বিগুণ হইলে জমি দ্বিগুণ পরিমাণ চাষ করা যায়, তাহাতে কিন্তু উৎপাদন দ্বিগুণ হয় না। অতএব খাদ্যাভাব দেখা দেয়।

সমালোচনা : অনেকের মতে উনবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক ইতিহাস ম্যাল্‌থাসের তত্ত্বকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। যখন ম্যাল্‌থাস তাঁহার তত্ত্ব লিখিতেছিলেন ইহার পূর্বেই ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল। শিল্প বিপ্লবের ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে উৎপাদনের পরিমাণ বহুগুণ বাড়িল। সব দেশেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি আরো বেশি হারে হইবার ফলে জনবৃদ্ধি সত্ত্বেও ইউরোপে সাধারণ জীবনযাত্রার মান উন্নত হইল। কৃষিকর্মে যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে বিংশ শতাব্দীতে ফসল

উৎপাদন খুব বেশি পরিমাণে বাড়িয়াছে। কৃষিকার্যে ও শিল্পে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রয়োগের ফলে ভোগ্য জিনিসের উৎপাদনহার, ম্যাল্‌থাস যাহা মনে করিয়াছিলেন ইহা হইতে অনেক বেশি বাড়িয়াছে। অন্যদিকে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করার ফলে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে লোকসংখ্যা সেই অনুপাতে বাড়ে নাই এবং কোন কোন দেশ, লোকসংখ্যা-হ্রাস সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে।

কোন কোন সমালোচক বলিয়াছেন যে ম্যাল্‌থাসের ভবিষ্যদ্বাণী যে শুধু মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে তাহা নয়, তাঁহার তত্ত্বে মৌলিক ত্রুটি আছে। ম্যাল্‌থাস বলিয়াছেন যে খাদ্য উৎপাদন পাটীগণিতিক 'নিয়মে এবং লোকসংখ্যা জ্যামিতিক নিয়মে বাড়ে' এ কথা ঠিক নয়। বস্তুতঃ খাদ্য উৎপাদনের হার ইহা হইতে অনেক বেশি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, খাদ্য উৎপাদনের সঠিক হার ধরিলেও ম্যাল্‌থাসের তত্ত্বের ভুল প্রমাণ হয় না। বিশেষ করিয়া অনেক অনুন্নত দেশেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খাদ্যশস্য বৃদ্ধির হার অপেক্ষা অধিক।

দ্বিতীয়ত, শুধু খাদ্য উৎপাদন নহে, মোট উৎপাদনের সহিত লোক-সংখ্যার তুলনা করা উচিত। উন্নত অর্থশালী দেশে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন কম হইতে পারে। কিন্তু ঐ দেশ শিল্পজাত জিনিসের বিনিময়ে বিদেশ হইতে খাদ্য কিনিতে পারে। ইংলণ্ডে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম খাদ্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু দেশ কয়লা প্রভৃতি এবং অন্যান্য শিল্পজাত জিনিসের রপ্তানি করিয়া বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করে।

তৃতীয়ত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ে একথা ম্যাল্‌থাস বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন। মানুষ শুধু পেট লইয়া জন্মগ্রহণ করে না, তাহার হাত পাও থাকে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকের সরবরাহ বাড়ে এবং তাহার দ্বারা কৃষি ও শিল্পে বর্ধিতহারে উৎপাদন করা যায়। শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িলে শ্রমবিভাগ করা সম্ভব হয় এবং কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার করা সম্ভব হয়; ফলে কৃষিজাত ফসলের উৎপাদন বাড়ে। তাহা ছাড়া লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যদিও কৃষিজাত জিনিসের উৎপাদন কমে, তবুও অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ার জন্য লোকসংখ্যাবৃদ্ধি কাম্য হইতে পারে।

এইজন্য আমেরিকান লেখক সেলিগম্যান বলিয়াছেন, যে লোকসমস্যা সংখ্যাগত সমস্যা নহে, ইহা উৎপাদনবৃদ্ধি ও সমবণ্টনের সমস্যা। লোক-সংখ্যা বাড়িলে শ্রমবিভাগ করা সম্ভব হয়। ইহার ফলে যে উৎপাদনবৃদ্ধি পাইবে তাহার দ্বারা জীবনযাত্রার মান বাড়ে। তাহা ছাড়া জাতীয় আয় সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করিয়া দিলে অনেক বেশি লোকের ভরণপোষণ করা সম্ভব হয়।

সুতরাং অনেকে মনে করেন যে ম্যাল্‌থাসের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথার বহুল প্রচারের ফলে জন্মের হার কমিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ফলে বিবাহের বয়স বাড়িয়াছে। শিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরা সাধারণত বহুসন্তানের মাতা হইতে পছন্দ করেন না। জীবনযাত্রার মানের উন্নতির ফলে জন্মের হার কম হয়। কেন না যথেষ্ট পরিমাণ আয় না করা পর্যন্ত লোকে বিবাহ করে না। জীবনযাত্রার মান নামিয়া যাইবে বলিয়া লোকে বৃহৎ পরিবার চায় না।

কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্ব (Optimum Theory of Population): আধুনিক যুগের লেখকেরা জনসংখ্যা সম্বন্ধে আর একটি তত্ত্ব আলোচনা করেন। তাঁহারা বলেন যে প্রত্যেক দেশের জনসংখ্যা কত হওয়া উচিত তাহা নির্ণয়ের একটি পথ আছে। জনসংখ্যা যে পরিমাণ থাকিলে সে দেশে মাথা পিছু আয় সর্বাধিক হইতে পারে ইহাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে। কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা আসল জনসংখ্যা যদি কম বা বেশি হয় তাহা হইলে মাথা পিছু আয় কমিয়া যাইবে।

কোন দেশে লোকসংখ্যা যদি অত্যন্ত কম হয়, তবে ঠিকমত শ্রমবিভাগ করা যায় না। ঠিকমত শ্রমবিভাগ করিতে না পারিলে উৎপাদন কম হয়। এইরূপ অবস্থায় লোকসংখ্যা বাড়াই ভাল। লোকসংখ্যা বাড়িলে বিভিন্ন জিনিসের চাহিদা বাড়ে। তখন শ্রমবিভাগ করার ও বৃহদায়তন উৎপাদন করার সুযোগও বাড়ে। এই অবস্থায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন বেশি বাড়িয়া যাইতে পারে। সুতরাং প্রথম প্রথম লোকসংখ্যা বৃদ্ধি অপেক্ষা উৎপাদন বৃদ্ধি বেশি হারে হয় বলিয়া গড়পড়তা আয় বাড়ে। ক্রমে অবশ্য এমন অবস্থায় আসিবে যখন আর লোক বাড়িলে উৎপাদন সেই অনুপাতে বাড়ান সম্ভব হইবে না। ইহার পূর্বেকার অবস্থায় যে জনসংখ্যা তাহাকে

কাম্য জনসংখ্যা বলে। লোকসংখ্যা এইরূপ থাকিলে মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয়। প্রত্যেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান জমি, শ্রমিক, মূলধনের সংযোগ এমনভাবে করা যায় যাহাতে উৎপাদনের হার সর্বাপেক্ষা বেশি হয়। তেমনি প্রত্যেক দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ মূলধন প্রভৃতির অনুপাতে একটি কাম্য জনসংখ্যা আছে যাহা থকিলে মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হয়। ইহাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে। আসল লোকসংখ্যা, সেই সংখ্যা অপেক্ষা কম বা বেশি হইলে মাথা-পিছু আয় কম হইবে। যদি কোন সময়ে দেখা যায় যে বর্তমানে দেশে যতলোক আছে ইহা হইতে জনসংখ্যা কিছু কমিলে মাথাপিছু আয় বাড়িবে তবে সে দেশে অতিপ্রজা সমস্যা দেখা দিয়াছে বলা হইবে। লোকসংখ্যা কমিলে যদি মাথাপিছু আয় বাড়ে, তবে কোটীপতির দেশেও অতিপ্রজা সমস্যা (overpopulation) থাকিতে পারে। আবার লোকসংখ্যা বাড়িলে যদি মাথাপিছু আয় বাড়ে তবে সে দেশে উল্‌টা সমস্যা অর্থাৎ অল্পপ্রজা সমস্যা (underpopulation) রহিয়াছে।

কাম্য জনসংখ্যা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা নহে। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাম্য জনসংখ্যাও বাড়িতে ও কমিতে পারে। কৃষি ও শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাম্য জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং কাম্য জনসংখ্যা কোন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা নহে।

অধ্যাপক হিউ ডলটন অতিপ্রজা ও অল্পপ্রজার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কাম্য জনসংখ্যার সহিত আসল জনসংখ্যার অসামঞ্জস্য, দুইটি জিনিসের উপর নির্ভর করে। মনে কর M অসামঞ্জস্যের পরিমাণ, O কাম্য জনসংখ্যা এবং A আসল জনসংখ্যাকে বোঝায়। তাহা হইলে—

$$M = \frac{A - O}{O}$$

M যদি পজিটিভ হয় তবে বুঝিতে হইবে যে, দেশে অতিপ্রজা-সমস্যা বর্তমান আছে। আর যদি নিগেটিভ হয় তবে অল্প প্রজা সমস্যা দেখা দিয়াছে। O-কে নির্দিষ্টভাবে মাপা যায় না। ইহাই এই নিয়মের অসুবিধা। কিন্তু যে পদ্ধতিতে এই নিয়মটি বাহির করা হইয়াছে, তাহাতে জানিবার অনেক বিষয় আছে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থনৈতিক সহযোগ ব্যবস্থার উপর O নির্ভর করে। A অর্থাৎ জনসংখ্যা যখন বাড়িতে থাকে তখন মাথাপিছু

প্রাকৃতিক সম্পদ (যেমন জমি) কমিতে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয়টি হইতে বহু সুবিধা পাওয়া যায় এবং গোড়ার দিকে সেই সুবিধা প্রথম অসুবিধা অপেক্ষা বেশি হয়। কিন্তু A অর্থাৎ বর্তমান জনসংখ্যা যখন O বা কাম্য জনসংখ্যাকে ছাড়াইয়া যায়, প্রথমটি তখনও কমিতে থাকে এবং দ্বিতীয় হইতে প্রাপ্য সুবিধা কমিয়া যায়।" সুতরাং মাথাপিছু আয় কমিয়া যায়। অর্থনৈতিক উন্নতির সময় দ্বিতীয় সুবিধাটি দ্রুতগতিতে বাড়ে এবং সে সময় O (কাম্য জনসংখ্যা) বাড়ে। যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির ফলে অর্থনৈতিক সহযোগ-ব্যবস্থার অনেক ক্ষতি হয়। ইহার ফলে O কমিয়া যায়। সুতরাং O বাড়িতেও পারে, কমিতেও পারে। O যে বাড়িবেই এমন কোন কথা নাই।

লোকসংখ্যাবৃদ্ধির ফল ভাল কি মন্দ তাহা কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্ব হইতে বোঝা যায়। ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুসারে লোকসংখ্যাবৃদ্ধি কোন সময়েই কাম্য নয়। কিন্তু কাম্য সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে তাহা ঠিক নয়। বর্তমান জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যা হইতে কম হইলে লোকসংখ্যাবৃদ্ধি ভাল। এই বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও শ্রমবিভাগের সুযোগ বাড়ে। কিন্তু কাম্য-সংখ্যা অপেক্ষা বর্তমান জনসংখ্যা বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ভালও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে। কাম্যসংখ্যার তুলনায় ইহা বিচার করিতে হইবে।[১]

নীট পুনরুৎপাদনের হার (Net Reproduction rate) : শুধু কেবল জন্ম ও মৃত্যুর হিসাব করিলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা হয় না। মৃত্যুর হার হইতে জন্মের হার বেশি হইলেই লোকসংখ্যা বাড়িতেছে একথা বলা চলে না। লোকসংখ্যা বাড়িবে, না কমিবে ইহার সন্তোষজনক মাপকাঠি হইতেছে নীট পুনরুৎপাদনের হার। নিম্নলিখিত উপায়ে ইহা স্থির করা যায়। একশত স্ত্রীলোক ১৫ হইতে ৪৫ বৎসর বয়সের মধ্যে কয়টি শিশুকন্যার জন্ম দেয়, তাহা হিসাব করিতে হয়। যদি তাহারা ১০০টি শিশুকন্যার জন্ম দেয়, তবে বুঝিতে হইবে বর্তমান লোকসংখ্যা পুনরুৎপাদিত

১। এই তত্ত্বের প্রধান অসুবিধা এই কাম্য সংখ্যাটি কি তাহা জানা যায় না। মাথাপিছু সামগ্রিক (real) আয় কত তাহা হিসাব করা সহজ নয়। তাহা ছাড়া উৎপাদন ব্যবস্থা ও মূলধনের পরিমাণ নিয়তই পরিবর্তন করে। অতএব কাম্যসংখ্যা তত্ত্বের ব্যবহারিক মূল্য কিছু নাই।

হইতেছে। এই অবস্থায় পুনরুৎপাদনের হার ১ হইবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে জনসংখ্যা একই থাকিবে, কমিবে অথবা বাড়িবে না। আবার ১০০ স্ত্রীলোকের উপরোক্ত বয়সের মধ্যে যদি মাত্র ৮০টি শিশুকন্যা হয় তবে পুনরুৎপাদনের হার '৮ বলা হয়। ইহার অর্থ ভবিষ্যতে এ দেশে প্রজাসংখ্যা কমিয়া যাইবে। যদি ১৫০টি শিশুকন্যার জন্ম হয়, তবে নীট্ পুনরুৎপাদনের হার ১'৫। অর্থাৎ ভবিষ্যতে লোকসংখ্যা শতকরা ১'৫ হারে বাড়িবে।

শ্রমিকের কর্মদক্ষতা

শ্রমের পরিমাণ শুধু শ্রমিকের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। তাহাদের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। শ্রমিকেরা দক্ষ হইলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে। শ্রমবিভাগ, বৃহদায়তন উৎপাদন, যন্ত্রপাতির ব্যবহারে দক্ষতা ইত্যাদি অনেক জিনিসের উপর উৎপাদন দক্ষতা নির্ভর করে।

শ্রমিকের কর্মদক্ষতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? প্রথমত, শ্রমিকের দক্ষতা তাহাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। একদিকে যেমন স্বাস্থ্য ও শক্তির উপর দক্ষতা নির্ভর করে, অন্যদিকে আবার বুদ্ধি ও ইচ্ছার উপরও দক্ষতা নির্ভর করে। অনেক সময়েই দেখা যায় যে, একটি জাতির শ্রমিকেরা, অন্য জাতির শ্রমিক অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী হয়। জলবায়ুর উপরেও দক্ষতা কিছু কিছু নির্ভর করে। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু কার্যদক্ষতা বাড়ায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কার্যক্ষমতা কমে। যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য না পাইলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকে না। ভারতের শ্রমিকেরা পুষ্টিকর খাদ্য পায় না। পুষ্টিকর খাদ্য পাইলে তাহাদের দক্ষতা বাড়িবে। স্বাস্থ্যকর বাসস্থান, উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্রাদি এবং জীবনযাত্রার অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উপরেও কর্মদক্ষতা নির্ভর করে। এই সব ঠিকমত থাকিলে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বাড়ে।

কারখানা ও কর্মস্থলের ব্যবস্থার উপরেও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তি নির্ভর করে। কারখানার আলো-হাওয়ার সুবন্দোবস্ত থাকিলে শ্রমিকেরা ভালভাবে কাজ করিতে পারে। এমনকি শব্দ কমাইতে পারিলে এবং প্রাচীরগুলি সুরঞ্জিত করিয়া কর্মস্থলে মনোরম পরিবেশ রাখিলে অনেক সময়ে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বাড়ে।

কত ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয় ইহার উপরও শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে। বেশিক্ষণ কাজ করিলে পেশীগুলি শিথিল হয়, মনোযোগ দেওয়া কষ্টকর হয়। এইসব অসুবিধা দূর করার জন্য কাজের সময় কমাইয়া দেওয়া এবং কাজের মাঝে বিশ্রামের ব্যবস্থা করা উচিত।

শ্রমিকদের বিদ্যা ও বুদ্ধির উপর দক্ষতা নির্ভর করে। আজকাল অনেক শিল্পেই অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সহযোগে উৎপাদন করা হয়। এইসব যন্ত্র চালনার জন্য বুদ্ধি ও শিক্ষা থাকা দরকার। অশিক্ষিত শ্রমিকের তুলনায় শিক্ষিত শ্রমিকেরা বেশি উৎপাদন করিতে পারে। সুতরাং সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার, কর্মদক্ষতা বাড়াইতে সাহায্য করে।

অবশ্য অনেক রকমের কাজ আছে যাহাতে বিদ্যাবুদ্ধির দরকার হয় না। লেখাপড়া না শিখিয়া হাতে কলমে কাজ করিয়াও অনেকে দক্ষতা লাভ করিতে পারে। তবু একথা স্বীকার করিতে হইবে যে শিক্ষার প্রসার শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। উৎপাদনের বৈজ্ঞানিক ও অভিনব উপায়গুলি শিক্ষিত লোকেরা সহজে শিখিয়া ফেলিতে পারে।

কারিগরী শিক্ষার দ্বারাও দক্ষতা বাড়ে। সুতরাং কারিগরী শিক্ষার প্রসার বাঞ্ছনীয়।

ভবিষ্যতে উন্নতির আশা, স্বাধীনতা ও কর্মের পরিবর্তনের উপর শ্রমিকের কাজ করার ইচ্ছা নির্ভর করে। সফল হইলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এ কথা শ্রমিকদের জানা চাই। দাসদের কোন আশা বা স্বাধীনতা ছিল না। সুতরাং তাহারা কাজ করার প্রেরণা পাইত না। কাজ একঘেঁয়ে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তাই কাজের পরিবর্তন করিলে নূতন উদ্যম ও উৎসাহ আসে।

আবার মালিকের দক্ষতার উপরও শ্রমিকদের দক্ষতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। দক্ষ মালিক ভাল যন্ত্রপাতি, ভাল কাঁচামাল ব্যবহার করে। সে উৎপাদনের উপকরণগুলি লইয়া এমন ব্যবস্থা করে যে, যখন যাহা প্রয়োজন তখনই তাহা পাওয়া যায়। সুতরাং ইহার ফলে শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ে। ভারতবর্ষে শ্রমিকদের দক্ষতা হ্রাসের একটি কারণ বোধ হয় এই যে, মালিকেরা ভাল ও বেশি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে না।

Exercises

Q. 1. Fully explain the Malthusian theory of population. How far is the teaching of Malthus relevant to the problem of population of the world in our days ? (Agra 1944, 1942, 1941, 1934 ; C. U. B. Com. 1934 ; Bana. 1935 ; Dacca 1937 ; Pun. 1910 ; Nag. 1942 ; Pat. 1935).

Q. 2. Write a note on the Optimum Theory of population. (Pun. 1935).

Is an increasing population always beneficial to a country ? (C. U. 1932, 1936).

Define over-population and under-population in the light of Optimum theory. (Bana. 1938 ; Dacca 1943, '42, '41).

Q. 3. What do you mean by the efficiency of labour ? Examine the chief factors which determine the efficiency of a worker in modern industry. (C. U. 1939, '29 ; Agra 1940, '35 ; Bana. 1931 ; Dacca 1937 ; Nag. 1942 ; Pat. 1915 ; Pun. 1938).

পঞ্চম অধ্যায়

মূলধন

(Capital)

মূলধনের সংজ্ঞা (Definition of Capital) : মূলধন কাহাকে বলে? মূলধন সম্বন্ধে বহু প্রকার মত প্রচলিত আছে। অবশ্য সকলেই একমত যে মূলধন উৎপাদনের উপকরণ এবং ইহা প্রকৃতিদত্ত দ্রব্য নহে। কিন্তু মূলধন কাহাকে বলে, এ সম্পর্কে দ্বিমত আছে।

প্রথমে প্রচলিত সংজ্ঞাগুলি আলোচনা করা যাক। কোন ব্যবসায়ীকে যদি প্রশ্ন করা যায় যে, তাহার মূলধন কত, তবে কারখানাব বাড়ি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতিতে তাহার যত লগ্নী আছে সে ইহাদের হিসাব করিয়া বলিবে যে ব্যবসায়ে আমার এত মূলধন খাটিতেছে। ব্যবসাযে যত টাকা খাটে ইহাকেই ব্যবসায়ীরা মূলধন বলিয়া ধরে। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে টাকা ও মূলধন এক অর্থে ব্যবহার করা হয় না। টাকা যদি মূলধন হইত তবে দেশে টাকা বাড়িলে মূলধন বাড়িত। গত দুই বৎসরে আমাদেব দেশে মোট টাকার পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগেরও বেশি বাড়িয়াছে। কিন্তু মূলধন সেই অনুপাতে বাড়িয়াছে একথা কেহ বলেন না। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য (ভোগের জন্য নহে) যে সমস্ত উপকরণ আছে, ইহার মধ্যে মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন উপকরণগুলিকে মূলধন বলে। ধরা যাক, কোন রূপকথার পরী, পৃথিবীর সবাইকে ঘুম পাড়াইয়া দিয়াছে। এই ঘুমন্ত পৃথিবীতে রাজকুমার রাজকুমারীকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন। রাজকুমার দেখিবেন যে এমন বহু জিনিস আছে যাহা এখনই ভোগের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। যেমন, রান্নাঘরে অথবা টেবিলে রাখা খাওয়ার জিনিস, ঘুমন্ত সখীদের অঙ্গের পোষাক ইত্যাদি। এইগুলি ভোগ্যবস্তু। আর কতকগুলি জিনিস আছে যাহা ভোগের জন্য ব্যবহার করা চলে না, কিন্তু ভবিষ্যৎ উৎপাদনবৃদ্ধির কাজে ব্যবহার হয়। রাজকুমার যদি অর্থশাস্ত্র জানেন, তবে এইগুলিকে মূলধন বলিবেন। কারখানার ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, উৎপাদনের সময় শ্রমিকদের ভরণপোষণের জন্য যে খাদ্য লাগে,—ইহাদের মূলধন বলে। সুতরাং মূলধনের পরিমাণ, টাকার অঙ্কে নির্ণয় করা হইলেও টাকা মূলধন

নয়। মূলধন হইতেছে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি সেই সমস্ত দ্রব্য, যাহা উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাগান হয়।

উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণকে মূলধন বলে। উৎপাদিত কথাটি লক্ষ্য করা দরকার। সব মূলধনই অতীত শ্রমের ফল। কিন্তু জমি প্রকৃতিদত্ত সম্পদ, মানুষের শ্রমের ফল নয়। এইজন্য বহু লেখক মূলধনের সহিত জমির পার্থক্য করিয়াছেন। অবশ্য অনেকে জমিকেও মূলধন বলেন। শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদ সহযোগে মূলধন সৃষ্ট হয়। সুইডেনের বিখ্যাত অর্থশাস্ত্রী উইকসেল বলিয়াছেন যে "সঞ্চিত শ্রম ও সঞ্চিত প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্ত ফলই মূলধন। বহু শ্রমিক লাগাইয়া ও লোহা ইস্পাতের ব্যবহার করিয়া একটি যন্ত্র তৈয়ারি করা হইল। ইহা মূলধন। লোহা প্রাকৃতিক সম্পদ; সুতরাং যন্ত্রটির মধ্যে শ্রমিকের শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্ত ফল বলা যায়। পূর্বেকার শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদ যন্ত্রের মধ্যে জমা রহিল।

মূলধন ভবিষ্যৎ উৎপাদনের কাজে লাগে। এইখানে ভোগ্যবস্তুর সহিত ইহার পার্থক্য। কিন্তু মূলধন ও ভোগ্যবস্তুর পার্থক্য প্রকৃতগত নহে। একথা সব সময়ে বলা চলে না যে, এই জিনিস সর্বাবস্থায় মূলধনের পর্যায়ে পড়ে ও এইটি সব সময়েই ভোগ্যবস্তু। অবশ্য অনেক জিনিস আছে যাহাদের সম্বন্ধে একথা বলা চলে। যেমন ইস্পাত তৈয়ারির ব্লাস্ট ফার্ণেস। ইহা সব সময়েই মূলধন। কিন্তু বহু দ্রব্য সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। দ্রব্যটি মূলধন হইবে কি ভোগ্যবস্তু হইবে ইহা তাহার ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। একই জিনিস মূলধন হইতে পারে, আবার অবস্থা বুঝিয়া নাও হইতে পারে। জিনিসটি কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইতেছে ইহা তাহার উপর নির্ভর করে। যে বাড়িতে বাস করা যায় তাহা মূলধন নয় ভোগ্যবস্তু। কিন্তু ঐ বাড়িতে যদি কোন কারখানা বসান হয় তবে ইহাকে মূলধন বলিতে হইবে। টাটা কোম্পানীর ব্লাস্ট-চুল্লীতে যে কয়লা পুড়িতেছে তাহা মূলধন বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু সেই কয়লাই যখন আমাদের ঘরে রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয় তখন মূলধন নয় ভোগ্যবস্তু।

মূলধনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Capital): মূলধনকে নানাভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। প্রথমত, সামাজিক ও ব্যক্তিগত,— মূলধনকে এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। লোকেরা যে জিনিস

হইতে আয় করে,—যেমন বাড়ি, কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতিকে ব্যক্তিগত মূলধন (Personal Capital) বলে। সেইরূপ সমষ্টিগতভাবে সমাজ যে যে জিনিস হইতে আয় করে তাহাকে সামাজিক মূলধন (Social Capital) বলে। কোম্পানীর কাগজ ব্যক্তিগত মূলধন, কিন্তু সামাজিক মূলধনের পর্যায়ে পড়ে না। কারণ, কোম্পানীর কাগজ বেচিয়া সরকার ঋণ গ্রহণ করে। সুতরাং সমাজের দিক দিয়া কোম্পানীর কাগজ ঋণের নিদর্শন, মূলধন নহে।

সামাজিক মূলধনকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—(১) ভোক্তাদের মূলধন এবং (২) উৎপাদনের মূলধন। উৎপাদনের সময় ভোক্তারা খাদ্য, বাড়িঘর, পোষাক ইত্যাদি যাহা কিছু ভোগ করে ইহাকে ভোক্তাদের মূলধন (Consumers' Capital) বলা হয়। যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ইত্যাদি উৎপাদকের মূলধন (Producers' Capital)।

সামাজিক মূলধনকে আবার স্থায়ী (fixed) এবং চল্‌তি (circulating) মূলধনের ভাগ করা হয়। যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যে সমস্ত জিনিসের আকার একবার ব্যবহারে পরিবর্তিত হয় না এবং যেগুলি দীর্ঘকাল ধরিয়া উৎপাদন কার্যে ব্যবহার করা হয় ইহাকে স্থায়ী মূলধন বলে। চল্‌তি মূলধন একবার-মাত্র ব্যবহার করা যায়, যেমন তুলা, চামড়া ইত্যাদি। একবার ব্যবহারের পর ইহা ভিন্ন দ্রব্যে পরিণত হয়।

আর এক প্রকার মূলধনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। কতকগুলি বিশেষ জাতীয় মূলধন আছে তাহা একটি কাজ ছাড়া অন্য কিছুতে ব্যবহার করা যায় না। এই সব যন্ত্রপাতিতে একবার মূলধন লগ্নী করা হইলে তাহা কেবল একই কাজে লাগান যায়। ইহাকে একজাতীয় বা বিশিষ্ট (specific) মূলধন বলে। আবার অন্য মূলধন আছে যাহা সামান্য অদলবদল করিয়া নানা কাজে ব্যবহার করা যায়। ইহাকে অবশিষ্ট বা non-specific মূলধন বলে।

মূলধন ব্যবহারের লাভ : মূলধন সহযোগে উৎপাদন সময়সাপেক্ষ। অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত অর্থশাস্ত্রী বোমওয়ার্ক (Bohm Bawerk) সুন্দরভাবে জিনিসটি বুঝাইয়াছেন। আদিম সমাজে কেহ তৃষ্ণার্ত হইলে নিকটবর্তী ঝরণায় গিয়া জল পান করিত। তাহার ঘরে জল সংগ্রহ করিয়া রাখার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং যতবারই তাহার জলপানের ইচ্ছা হইত

ততবারই তাহাকে ঝরণার নিকট যাইতে হইত। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কোন এক সময়ে সারাদিন খাটিয়া সে একটি কাঠের বালতি তৈয়ারি করিল এবং ঝরণা হইতে সেই বালতিতে জল ভরিয়া আনিত। বালতি তাহার মূলধন এবং ইহা ব্যবহারের জন্য তাহার প্রতিবারই ঝরণার নিকট যাওয়ার অসুবিধা দূর হইল। তারপর ধর হঠাৎ তাহার মনে হইল যদি কাঠের একটি নল ঝরণার সঙ্গে যোগ করিয়া ঘর পর্যন্ত আনা যায় তবে আরো বেশি জল পাওয়া যাইবে। অবশ্য বালতির চেয়ে নল তৈয়ারি করিতে বেশি সময় দরকার হইবে। সুতরাং বেশি মূলধন বিনিয়োগের অর্থ প্রথম উৎপাদন হইতে শেষের ভোগ পর্যন্ত বেশি সময় অতিবাহিত হয়। বেশি মূলধন নিয়োগ করার অর্থ উৎপাদন ব্যবস্থাকে দীর্ঘতর করা। এইরূপ অধিকতর সময় দিয়া উৎপাদন করিলে সাধারণ উৎপাদন বাড়ে।

মূলধনের কাজ (Functions of Capital): মূলধনের প্রধান কাজ শ্রমিকের উৎপাদন-শক্তি বাড়ান। মূলধন নিয়োগের ফলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায ও গড়পড়তা উৎপাদনব্যয় কম হয়। গ্রামের মুচী সারাদিন পরিশ্রম করিয়া হয়ত একজোড়া জুতা তৈয়ারি করিতে পারে। কিন্তু বর্তমানকালের বাটার কারখানায় বহু মূলধন নিয়োগ করা হয় ও প্রতিদিন বহু জুতা তৈয়ারি হয়। মূলধন বিনিয়োগের ফলে শুধু যে উৎপাদন বাড়ে তাহা নহে, জিনিসেব দামও অনেক কম হয়। কারণ জিনিসের উৎপাদনব্যয় কমিয়া যায়। ফলে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। মূলধনের সাহায্যে উৎপাদন করার ফলে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর-ভাবে শ্রমবিভাগ করা সম্ভব হইয়াছে। এই শ্রমবিভাগের ফলও হইতেছে কম ব্যয়ে অধিক উৎপাদন। কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি কেনা, কলকারখানার জন্য বাড়ি-ঘর তৈয়ারি করা, শ্রমিকের বেতন দেওয়া, প্রয়োজন মত মাল মজুত রাখা ইত্যাদির জন্য সব সময়েই মূলধন দরকার হয়। বর্তমানের উন্নত উৎপাদন প্রণালী বহু পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগের উপর নির্ভর করে। ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতি আমরা যে ভাবে করিতে চাই তাহার প্রধান প্রতিবন্ধক হইতেছে আমাদের মূলধনের অভাব। মূলধন বেশি বিনিয়োগ করিতে পারিলে আমরা আরো বেশি আর্থিক উন্নতি করিতে পারিতাম। ইহা হইতেই মূলধনের কাজ ও প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়।

মূলধন বৃদ্ধি (Growth of Capital): মূলধন বৃদ্ধি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? কি করিলে এ দেশের মূলধন বাড়িবে? মূলধনের ভিত্তি হইল সঞ্চয়। সঞ্চয় হইলে তবেই মূলধন বাড়ে। জেলে ছিপ দিয়া মাছ ধরে ও প্রতিদিন যত মাছ পায় তাহা বাজারে বেচিয়া সে টাকা দিয়া নিজের নানা অভাব মিটাইতে চেষ্টা করে। ভাল জাল তৈয়ারি করিতে পারিলে সে অনেক বেশি মাছ ধরিতে পারিবে ও এইভাবে অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবে। কিন্তু একটি জাল তৈয়ারি করিতে হয়ত সাতদিন সময় লাগিবে ও এই সাতদিন সে আর মাছ ধরিবার সময় পাইবে না। মাছ না বিক্রয় করিতে পারিলে এই সাতদিন সে কি খাইয়া বাঁচিবে? সে কিছুদিন ধরিয়া হয়ত কম খাইয়া কি অন্যভাবে কষ্ট করিয়া সাতদিনের প্রয়োজন মত অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে—তবে সেই সাতদিন ধরিয়া জাল বুনিতে পারে। ও সেই সপ্তাহের খরচ সঞ্চিত অর্থ হইতে চালাইতে পারে। সে যে পূর্বে সঞ্চয় করিয়াছিল—তাহার ফল স্বরূপ পাইল মাছ ধরার জাল। এই জাল তাহার মূলধন এবং ইহার উৎপাদন সঞ্চয়ের ফলেই সম্ভব হইয়াছে। এই উদাহরণ হইতে বুঝা যায় যে মূলধনের ভিত্তি হইল সঞ্চয়। ইহা ব্যক্তির (micro) পক্ষে যেমন সত্য, সমষ্টির (macro) পক্ষেও সেইরূপ প্রযোজ্য। দেশের মধ্যে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িলেই তবেই মূলধন বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। এমন একটি দেশের কথা ভাবা যাক যেখানে শ্রমিকেরা শুধু ভোগ্যবস্তু প্রস্তুত করে এবং নিজেরাই ইহা সমস্ত ভোগ করে। সে দেশে নূতন যন্ত্রপাতি তৈয়ারি হয় না ও ফলে ভবিষ্যতের উৎপাদনবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ ব্যবহারের ফলে যন্ত্রপাতির ক্ষয় হইবে এবং পুরাতন ও ভাঙ্গা যন্ত্রের পরিবর্তে নূতন যন্ত্র বসান হইবে না। কারণ কেহই যন্ত্র নির্মাণ করে না, ফলে ভবিষ্যতে উৎপাদনের পরিমাণ কমিতে বাধ্য। ধর, কর্তৃপক্ষ ঠিক করিল যে একদল শ্রমিককে ভোগ্যবস্তু উৎপাদনে নিযুক্ত না করিয়া যন্ত্রপাতি তৈয়ারির কাজে লাগান হইবে। ইহার ফলে সেই বৎসর ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন কমিয়া যাইবে। কারণ সব শ্রমিক ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন করিতেছে না—মাত্র একদল ইহা করিতেছে। আর যে দল যন্ত্রপাতি তৈয়ারির কাজে নিযুক্ত আছে তাহাদের চাহিদামত ভোগ্যবস্তু দিতে হইবে। দেশে মোট যত ভোগ্যবস্তু উৎপন্ন হইতেছে ইহার সমস্তই

এই কাজে নিযুক্ত শ্রমিকেরা ভোগ করিতে পারিবে না। তাহাদের ভাগ হইতে কিছু অংশ আলাদা করিয়া যন্ত্রপাতি উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইবে বা বিক্রয় করিতে হইবে। অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকেরা সঞ্চয় করিলে তবেই যন্ত্রপাতি তৈয়ারি সম্ভব হইবে। কারণ সঞ্চয়ের অর্থ হইতেছে আমরা যতটুকু ভোগ করিতে পারিতাম তাহা না করিয়া কিছু অংশ ভবিষ্যতের জন্য জমাইয়া রাখা। ভোগ নিবৃত্তি হইতেই সঞ্চয় হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মূলধন বাড়াইতে হইলে সঞ্চয় প্রয়োজন ও সঞ্চয় করিতে হইলে ভোগ হইতেও নিবৃত্ত হওয়া দরকার। কিন্তু প্রশ্ন এই যে মানুষ ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইবে কেন? প্রধান কারণ এই যে, ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইলে সঞ্চয় হইবে ও সঞ্চয় হইতে যন্ত্রপাতি তৈয়ার করা যায় এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে উৎপাদন বাড়ে। সুতরাং সবকিছু ভোগ না করিয়া সঞ্চয় করিলে ভবিষ্যতে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে।

সঞ্চয়ের উপর মূলধন বৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। সঞ্চয়ের পরিমাণ আবার লোকের আয়ের উপর নির্ভর করে। আয় যদি কম হয়, তবে খাওয়াপরার খরচ যোগাইয়া কিছু বাঁচে না। সুতরাং কিছু বেশি আয় না হইলে সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। গরিব অনুন্নত দেশে এইজন্য সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হয় ও সঞ্চয়ের পরিমাণ কম বলিয়া তাহারা গরিব থাকিয়া যায়। আয় বেশি হইলে সঞ্চয়ও বেশি করা সম্ভব হয়। কিন্তু আয় বেশি হইলেই যে সব সময় লোকেরা সঞ্চয় করিবে তাহা বলা যায় না। সঞ্চয়ের পরিমাণ কতকগুলি প্রেরণা ও অবস্থার উপর নির্ভর করে।

মানুষ কেন সঞ্চয় করে? প্রথমত, লোকে পরিবারের কথা চিন্তা করিয়া সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। পুত্রকন্যার শিক্ষা ও বিবাহের ব্যয়নির্বাহ, মৃত্যুর পর স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ প্রভৃতি নানাবিধ কার্যের জন্য গৃহী মাত্রেই সঞ্চয় করে। দ্বিতীয়ত, যাহারাই ভবিষ্যত সম্বন্ধে চিন্তাশীল তাহারা বিপদ-আপদ, রোগ-পীড়ার জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করে। আবার অনেকে শুধু কৃপণ-স্বভাবের জন্য সঞ্চয় করে। তৃতীয়ত, টাকা থাকিলে লোকসমাজে সম্মান বাড়ে,—প্রতাপপ্রতিপত্তি হয়। সেই লোভেও অনেকে সঞ্চয় করে। এই সমস্ত বহু ধরনের প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া লোকেরা সঞ্চয় করে। সুতরাং সঞ্চয়ের

পরিমাণ আয়ের পরিমাণের উপর, পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য চিন্তার উপর, বড়লোক হইবার আকাঙ্ক্ষার উপর, কৃপণ অকৃপণ স্বভাব ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।

যৌথ কোম্পানী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিও বহু অর্থ সঞ্চয় করে এবং তাহাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ মোট সঞ্চয়ের এক বৃহৎ অংশ কলকব্জার ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করা, মন্দার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া, কারখানার যন্ত্রপাতি বাড়ান ইত্যাদি বহু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, কোম্পানীর পরিচালকেরা লাভের একটি মোটা অংশ সঞ্চয় করে।

এই প্রেরণাগুলির গুরুত্ব কতকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে। জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা না থাকিলে কম লোকই সঞ্চয় করে। ভবিষ্যতে সঞ্চয়ের ফল ভোগ করিতে পারিবে কি না এ নিশ্চয়তা না থাকিলে সঞ্চয় করিয়া লাভ কি? দেশে মূলধন নিয়োগের ভাল ব্যবস্থা, যেমন ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি থাকিলে সঞ্চয় বাড়ে। সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে গচ্ছিত রাখা যাইবে ও উপরন্তু তাহা হইতে কিছু কিছু সুদ বা আয়ও হইবে। এই ব্যবস্থায় লোকের সঞ্চয়ের প্রবৃত্তিও অনেক সময়ে বাড়িয়া যায়। শিক্ষা প্রসারের উপর সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে।

সুদের হার ও সঞ্চয়ঃ সঞ্চয়ের উপর সুদের হারের প্রভাব কি? বেশি হারে সুদ দিলে কি সঞ্চয় বাড়ে? মার্শাল (Marshall) প্রমুখ পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, সঞ্চয়ের পরিমাণ অনেকটা সুদের হারের উপর নির্ভর করে। সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করিলে যদি ভাল সুদ পাওয়া যায় তবে লোকে বেশি সঞ্চয় করিতে চাহিবে। সুদের হার বাড়িলে সঞ্চয় বাড়ে এবং সুদের হার কমিলে সঞ্চয় কমে। অবশ্য এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা ভবিষ্যতে একটি বাঁধা আয়ের ব্যবস্থা করিতে চায়, অর্থাৎ এমন টাকা জমাইতে চায় যাহার সুদ হইতে ধর মাসে ১০০৲ টাকা আয় হইবে। সুদের হার বেশি থাকিলে তাহাদের পক্ষে কম টাকা সঞ্চয় করিলে চলিবে। এই শ্রেণীর লোক সুদের হার বাড়িলে কম সঞ্চয় করিবে। আবার সুদ যাহাই হউক না কেন এদিকে লক্ষ্য না করিয়া অনেকে সঞ্চয় করে। ধনী ও কৃপণেরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাহারা সুদের কথা চিন্তা করিয়া সঞ্চয় করে না। ইহাছাড়া কোম্পানীগুলি মুনাফা হইতে যে টাকা সঞ্চয় করে

তাহার উপর সুদের প্রভাব নাই বলিলেই চলে। সুতরাং লর্ড কেইনস্ প্রভৃতি অনেক লেখক মনে করেন যে সঞ্চয়ের উপর সুদের কোন প্রভাব দেখা যায় না। তাঁহারা বলেন যে সুদের হার বেশি হইলে ব্যবসায়ে মূলধন নিয়োগের পরিমাণ কমিয়া যায়। তাহার ফলে আয় কমে। আয় কমিলে সঞ্চয়ও কমিয়া যায়। মোট সঞ্চয় দুইটি জিনিসের উপর নির্ভর করে—আয়ের পরিমাণ এবং সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি। আয় কম হইলে সঞ্চয়ের পরিমাণও কম হয়। যদি সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি থাকে তবে আয় বাড়িলে সঞ্চয়ও বাড়িবে।

আসল কথা এই যে, সকলে যদি যুক্তি অনুসারে চলে, তবে তাহারা সুদ বাড়িলে বেশি সঞ্চয় করিত। সুদ বৃদ্ধি মানে আয় বৃদ্ধি। সুতরাং সাধারণভাবে লোকের বেশি সঞ্চয় করা উচিত। কিন্তু এত বিবেচনা করিয়া কেহ সঞ্চয় করে না। নানাপ্রকার মনোবৃত্তি ও সামাজিক রীতিনীতির উপর সঞ্চয়প্রবৃত্তি নির্ভর করে।

Exercises

Q. 1. Define capital and discuss its main functions. (C. U. 1955).

On what lines would you define capital ? "Capital is a class of goods and not a fund or value." Explain. (C. U. B. Com. 1932).

Describe the part played by capital in modern industry and commerce. (C. U. B. Com. 1930).

Q. 2. Distinguish between fixed capital and circulating capital.

Discuss if (a) the goodwill of a business, (b) patent right, (c) money in circulation, (d) the skill of a musician or a surgeon, (e) saving accumulated in the forms of a deposit at a Savings Bank, (f) the Government of India War Loans are Capital. (C. U. 1934, '3[illegible]).

Q. 3. Distinguish between the different senses in which the word capital is used in popular and economic language. (C. U. 1944).

Q. 4. On what does the growth of capital devoted to productive purposes depend ? (C. U. 1936).

ষষ্ঠ অধ্যায়

উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান

(Organisation of Business)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের পূর্বে উৎপাদনব্যবস্থা অনেক সহজ ছিল। তখন কম মূলধনে ব্যবসায় করা যাইত। বিভিন্ন উপকরণগুলির ঠিকমত সংযোগসাধন তত কঠিন ছিল না। শিল্পবিপ্লবের ফলে এই অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। এখন বৃহদায়তন কারখানায় উৎপাদন হয়, জটিল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, আন্তর্জাতিক বাজারের কেনা-বেচা, দাম ওঠা-নামার কথা ভাবিতে হয়। উৎপাদনের গুরুতর ঝুঁকি বহন করিতে হয়। ফলে উপযুক্ত পরিমাণে উপকরণগুলির ব্যবহার করা কঠিন কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং যাহারা ব্যবসায় চালায় তাহাদের কাজের গুরুত্ব বাড়িয়াছে। ব্যবসায় যাহারা পরিচালনা করে, তাহাদের উদ্যোক্তা (entrepreneur) বলা হয়।

উদ্যোক্তার কাজ (Functions of the entrepreneur) : বর্তমানকালে উদ্যোক্তার গুরুত্ব খুব বেশি। কোন্ জিনিস, কোথায় এবং কি ভাবে উৎপাদন করা হইবে ইহা স্থির করা উদ্যোক্তার কর্তব্য। আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়ের সমস্ত পরিকল্পনা সে স্থির করে। কত পরিমাণ এবং কি প্রকারের জিনিস তৈয়ারি হইবে তাহা সে স্থির করে। কি কি ধরনের যন্ত্রপাতি এবং কাঁচা মাল ব্যবহার করা হইবে, কোন পদ্ধতিতে উৎপাদন করিলে ভাল লাভ হইবে, কত লোককে কাজে লাগাইতে হইবে এবং কাহাকে কোন কাজ দিতে হইবে, ইহা সমস্তই উদ্যোক্তা ঠিক করিয়া থাকে।

ক্ল্যাসিক্যাল লেখকদের মতে এইগুলিই উদ্যোক্তার প্রধান কাজ। ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিকে লক্ষ্য রাখা তাহার কাজ। কিন্তু যৌথ কোম্পানীর উদ্ভবের পর হইতে বেতনভোগী ম্যানেজারদের দ্বারা এরূপ ব্যবস্থাপনার কাজ চালান যায়। বর্তমানে যাহারা ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করে, তাহারা অনেক সময়েই নিজেরা ব্যবসায় চালায় না। এইখানে উদ্যোক্তার সহিত

বেতনভোগী ম্যানেজারদের তফাৎ উদ্যোক্তারাই ব্যবসায়ের নীতি স্থির করে, সমস্ত ঝুঁকি বহন করে, লাভ লোকসানের ফলাফল ভোগ করে।

উদ্যোক্তার আর একটি কাজ ব্যবসায়ের আয় বণ্টন করা। ব্যবসায়ের সব আয় তাহার হাতে আসে। সে জমির মালিককে খাজনা, শ্রমিকদের বেতন ও মূলধনের মালিককে সুদ দেয়। ব্যবসায়ে ক্ষতি হইলে অন্যদের সে ক্ষতি ঘাড়ে লইতে হয় না। চুক্তি অনুসারে তাহাদের প্রাপ্য উদ্যোক্তাকে মিটাইয়া দিতে হয়। সমস্ত খরচ মিটাইয়া উদ্বৃত্ত থাকিলে তবেই তাহার লাভ হয়। ব্যবসায়ের ঝুঁকি নেওয়াই উদ্যোক্তার প্রধান কাজ। অবশ্য প্রত্যেক উপকরণের মালিককে কিছু কিছু ঝুঁকি লইতে হয়। যেমন ব্যবসায় উঠিয়া গেলে শ্রমিক বেকার হইতে পারে। কিন্তু উদ্যোক্তার ঝুঁকি নেওয়া অন্য ধরনের। তাহার ঝুঁকি অনিশ্চিত ও অপরিমেয়। ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে সমস্ত জিনিস উৎপাদন করা হয়। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। হয়ত এক বৎসর পরে বাজারে চাহিদার ও যোগানের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিয়া উদ্যোক্তাকে আজ উৎপাদন শুরু করিতে হয়। যদি তাহার হিসাব ভুল হয় তবে লাভ হওয়া দূরে থাকুক, ক্ষতি হইবে। আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থা যতই জটিল হইয়াছে ততই ব্যবসায়ে ঝুঁকি বাড়িতেছে। চাহিদার পরিবর্তন অথবা উৎপাদনপদ্ধতির উন্নতির ফলে তাহার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। উদ্যোক্তা এই সব ঝুঁকি নেয় বলিয়া আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় তাহার গুরুত্ব এত বেশি।

অনেকে বলেন যে উৎপাদনব্যবস্থায় উদ্যোক্তার আর একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে। তাহার প্রধান কাজ উদ্ভাবন (innovation) করা। ব্যবসায় সংক্রান্ত সব ব্যাপারে সে অগ্রণী এবং নূতন পদ্ধতি ও কৌশলের প্রবর্তক হওয়াই তাহার প্রধান কর্তব্য।

Exercises

Q. 1. Discuss the functions of the entrepreneur and his importance in the modern industrial organisation. (C. U. 1954, '52, '49).

সপ্তম অধ্যায়

ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানের সংগঠন

(Organisation of Firms)

ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান (Firm) : যে সকল লোক বা প্রতিষ্ঠান জিনিস উৎপাদন ও ক্রয় বিক্রয়ের কার্যে নিযুক্ত আছে তাহাদের এক কথায় ফার্ম বা ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান বলা হয়। ফার্ম নানা প্রকারের হইতে পারে। যে লোক রাস্তার এককোণে বাদাম ভাজা কিংবা ঝালমুড়ি বেচিতেছে এবং যে বিরাটকায় ইস্পাত শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতেছে—ইহাদের সকলকেই ফার্ম বলা হয়। ফার্মের কাজ হইতেছে যে কোন দ্রব্য উৎপাদন, ক্রয় ও বিক্রয় করা।

ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানের গঠন (Forms of Business Organisation) : ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানগুলির গঠনকৌশল নানাপ্রকারের যথা, একক ব্যবসায়, অংশীদারী ব্যবসায়, যৌথ কোম্পানী, সমবায় এবং সরকারী ব্যবসায়।

একমালিকী কারবার : একজন লোক যখন ব্যবসায় চালায় ইহাকে একমালিকী কারবার বলে। ব্যবসায়ে সাফল্য অসাফল্যের জন্য মালিক একা দায়ী। নিজস্ব জমি আবাদ করে এমন কৃষক, মুদীর দোকানী এই প্রকারের প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ। এই প্রকার ব্যবসায়ের অনেক সুবিধা। মালিক নিজে সমস্ত দিকে নজর রাখে বলিয়া উৎপাদন বাড়ে। দ্বিতীয়ত, এই প্রকার ব্যবসায়ে অংশীদার বা শেয়ারহোল্ডারদের সহিত আলোচনা না করিয়াই মালিক ব্যবসায়ের নীতি স্থির করিতে পারে। তাই অতি দ্রুত নীতি স্থির করা সম্ভব হয়। তৃতীয়ত, যে সব ব্যবসায় সহজ এবং বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয় না সেই সব ব্যবসায়ে এই ব্যবস্থাই কার্যকরী। এই প্রকার ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী সৌখীন জিনিস তৈয়ারি করা যায়।

এই প্রকার ব্যবসায়ের প্রধান অসুবিধা এই যে, একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে কারবারে বেশি মূলধন নিয়োগ করা সম্ভব হয় না এবং ইহা বাঞ্ছিত

নয়। বর্তমান যুগের ব্যবসায়ে বহু মূলধন খাটাইবার প্রয়োজন হয়। একজন লোকের পক্ষে এত বেশি মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। আর যদি মূলধন যোগাড় করা সম্ভবও হয়, তবু একজনের পক্ষে ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি হয়। কোন কারণে কারবার যদি ফেল করে তবে তাহাকে যথাসর্বস্ব হারাইতে হইবে। সেই জন্য এই প্রকার ব্যবসায়ের পরিবর্তে যৌথ কোম্পানী দেখা দিয়াছে। কেবল কৃষিতে আজও একক ব্যবসায়ের প্রাধান্য আছে।

অংশীদারী কারবার (Partnership): ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত কয়েকজন লোক কিছু মূলধন সংগ্রহ করিয়া একত্র ব্যবসায় করিলে ইহাকে অংশীদারী কারবার বলে। এই প্রথা অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কারবারের সম্পূর্ণ দায়ের জন্য অংশীদারেরা যুক্ত এবং একক-ভাবে দায়ী। এই ব্যবসায়ের উত্তমর্ণেরা যে কোন একজন অংশীদারের নিকট হইতে তাহাদের প্রাপ্য সমস্ত টাকা আদায় করিতে পারে। অবশ্য একজন অংশীদার যদি সব ধার শোধ করে তবে সে আবার মোকদ্দমা করিয়া অন্যান্য অংশীদারের নিকট হইতে তাহাদের দেয় অংশের টাকা আদায় করিয়া লইতে পারে। পূর্বে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে একজন উদ্যোক্তা ব্যবসায় আরম্ভ করে। যখন কোন দক্ষ কর্মচারী উক্ত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করিতে চায় তখন সে হয়ত এই কর্মচারীকে অংশীদার করিয়া নেয়। এই ভাবেও অনেক সময়ে অংশীদারী কারবারের জন্ম হইয়াছে।

একক ব্যবসায় অপেক্ষা অংশীদারী কারবারে বেশি মূলধন যোগাড় করা যায়। একজনের পক্ষে যত মূলধন খাটান সম্ভব হয়, চার পাঁচজন অংশীদার অনেক বেশি মূলধন তুলিতে পারে। অংশীদারী কারবার বাজারে বেশি টাকা ধার পাইতে পারে। কারণ প্রত্যেক অংশীদারের দায়িত্ব অসীম হওয়ার ফলে পাওনাদারের টাকা আদায় না হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে। আর একটি সুবিধা এই যে এই প্রকার ব্যবসায়ে একাধিক দক্ষ ব্যক্তি যুক্তভাবে ব্যবসায় করে। এক একজন অংশীদার ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিকে নজর দেয় ও ফলে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সুতরাং বিভিন্ন বিভাগের কাজ দক্ষভাবে চলে। প্রয়োজন হইলে নূতন অংশীদার লইয়া ব্যবসায়কে

শক্তিশালী করা যায়। কয়েকজন চিন্তা ও পরামর্শ করিয়া কাজ করে বলিয়া কাজের ভুল কম হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু এই ব্যবসায়ে অসুবিধাও অনেক। অংশীদারদের মধ্যে অনেক সময় মতানৈক্য দেখা দিতে পারে। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। অংশীদারী কারবারের স্থায়িত্ব কম। কোন অংশীদার মারা গেলে, অথবা দেউলিয়া অথবা উন্মাদ হইয়া গেলে কারবার বন্ধ হইয়া যায়। অংশীদারদের দায়িত্ব অসীম হওয়ায় ধনী লোকেরা এই ধরনের কারবারে অংশ গ্রহণ করা পছন্দ করে না। কারণ অন্য কোন অংশীদারের ভুলে যদি কারবার ফেল করে তবে পাওনাদারেরা ধনীর সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারে।

যৌথ কোম্পানী (Joint-stock company or Corporation) : বহু শেয়ারহোল্ডার বা স্টকহোল্ডার যখন মিলিতভাবে মূলধন তোলে এবং ব্যবসায় চালায় তখন ইহাকে যৌথ কোম্পানী বলে। প্রতিষ্ঠাতারা একটি অনুষ্ঠানপত্র (Articles of Association) রচনা করে। তাহাতে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য, মূলধনের পরিমাণ ও প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে। এই অনুষ্ঠানপত্রটি সরকারের কাছে পেশ করা হয় ও যৌথ কোম্পানীর রেজিস্ট্রার অনুমতি দিলে ব্যবসায় আরম্ভ করা হয়। আইনের চোখে কোম্পানী একটি ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হয়। অংশীদারী কারবার হইতে ইহার দুইটি পার্থক্য আছে। প্রথমত, বহু অংশীদার লইয়া কোম্পানী গঠিত হইলেও কোন অংশীদারের জীবনের উপর কোম্পানীর দায়িত্ব নির্ভর করে না। কোন অংশীদার মারা গেলে যৌথ কোম্পানীর কারবার বন্ধ হয় না। দৈবদুর্বিপাকে সমস্ত অংশীদার একসঙ্গে মারা গেলেও তাহাদের উত্তরাধিকারীরা ঐ সব শেয়ার পায় এবং ব্যবসায় পূর্ববৎ চলিতে থাকে। এইরূপ ব্যবসায় ব্যক্তির মিলনের ফল নয়, মূলধনের মিলনের ফল। অংশীদারী কারবারের সঙ্গে যৌথ কোম্পানীর দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে অংশীদারী কারবারে অংশীদারদের দায়িত্ব অসীম, কিন্তু যৌথ কোম্পানীর অংশীদারের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ (limited liability)। সাধারণত প্রত্যেক অংশীদার কোম্পানীতে যত টাকার শেয়ার কিনিয়াছে, তাহার বেশি টাকা তাহাকে লোকসান দিতে হয় না। কোম্পানী যদি ফেল করে তবে

অংশীদার তাহার শেয়ারের টাকা হারায়। কোম্পানীর পাওনাদার অংশীদারের অন্য কোন সম্পত্তিতে হাত দিতে পারে না।

কোম্পানী কি ভাবে মূলধন তোলে? প্রথমত সবচেয়ে বড় উপায় হইতেছে জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া টাকা তোলা। সাধারণত, যে যত ইচ্ছা শেয়ার কিনিতে পারে। অবশ্য কোন ক্ষেত্রে এক নামে বেশি শেয়ার কিনিতে দেওয়া হয় না। অংশীদারেরা কোম্পানীর মালিক। তাহারা ভোট দিয়া কারবার কি ভাবে চলিবে তাহা ঠিক করে ও একটি বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্ বা পরিচালকসভা নির্বাচন করে।

দুই শ্রেণীর অংশীদার থাকিতে পারে—সাধারণ (ordinary) ও বিশেষ সুবিধা ভোগী অংশীদার (preferential shareholder)। সাধারণ শেয়ারের লভ্যাংশ নির্দিষ্ট থাকে না; কিন্তু বিশেষ সুবিধাভোগী অংশীদারের লভ্যাংশ শেয়ার বিক্রয়ের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। ধরা যাক, কোন কোম্পানী বিশেষ সুবিধাভোগী অংশীদারদের বৎসরে ছয় পারসেণ্ট হিসাবে লভ্যাংশ দিবে বলিয়া শেয়ার বিক্রয় করিয়াছে। কোম্পানী যতই লাভ করুক না কেন, বিশেষ সুবিধাভোগী অংশীদারদের ছয় পারসেণ্ট লভ্যাংশ দিতেই হইবে। ইহা ছাড়া সাধারণ শেয়ারের লভ্যাংশ দেওয়ার পূর্বে বিশেষ সুবিধাভোগী অংশীদারদের লভ্যাংশ বিতরণ করিতে হইবে। অবশ্য কোম্পানীর লাভ না হইলে বিশেষ সুবিধাভোগী অংশীদাররাও কিছু পায় না। কখনও কিউমুলেটিভ সুবিধাভোগী (cumulative preference share) শেয়ার বিক্রয় করা হয়। তাহা হইলে কোন বৎসর এই প্রকারের শেয়ারের লভ্যাংশ বিলি করা না গেলে পরের বৎসর সাধারণ শেয়ারের লভ্যাংশ দেওয়ার পূর্বে এই অংশীদারদের বকেয়া লভ্যাংশ শোধ দিতে হইবে। বিশেষ সুবিধাভোগী অংশীদারের আর একটি সুবিধা এই যে ব্যবসায় উঠিয়া গেলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া আগে সুবিধাভোগী অংশীদারদের টাকা শোধ করা হয়। ইহার পর যদি কিছু বাকী থাকে তবেই তাহা সাধারণ অংশীদার পায়।

দ্বিতীয়ত, কোম্পানী বণ্ড বা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়াও টাকা তুলিতে পারে। বণ্ড কোম্পানীর ঋণপত্র। ইহার জন্য নির্দিষ্ট সুদ দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের পরে এই ঋণ শোধ করা হয়। কোম্পানীর

পরিচালনার ব্যাপারেও বণ্ডহোল্ডারদের কোন হাত নাই। তাহারা কোম্পানীর পাওনাদার, মালিক নয়। কারবার উঠিয়া গেলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া আগে বণ্ডহোল্ডারদের টাকা শোধ দেওয়া হয়। এইজন্য শেয়ার অপেক্ষা বণ্ড বেশি নিরাপদ। কিন্তু কোম্পানীর যতই আয় হউক, বণ্ডের সুদ একই থাকে। কিন্তু অংশীদার বেশি হারে লভ্যাংশ পায়। নানা ধরনের লোক টাকা খাটায় বলিয়া তাহাদের সুবিধার জন্য মূলধনকে এইরূপ নানা ভাগ করা হয়। যাহারা ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করিতে চাহে না তাহারা সাধারণত বণ্ড কেনে, নির্দিষ্ট সুদ পায় ও সময়মত টাকাও শোধ হয়। যাহারা ইহা অপেক্ষা কিছু বেশি ঝুঁকি লইতে রাজী, কিন্তু আয়ের পরিমাণ অনেকটা নির্দিষ্ট রাখিতে চায়, তাহারা সুবিধাভোগী শেয়ার কেনে। যাহারা পুরাপুরি ঝুঁকি লইতে রাজী তাহারা শেয়ার কেনে।

অংশীদারেরা মালিক হইলেও তাহারা কারবার চালায় না। দৈনন্দিন পরিচালনার ভার বেতনভোগী ম্যানেজারদের উপর ন্যস্ত থাকে। অংশীদারেরা পরিচালকসভার সভ্যদের নির্বাচন করে। এই পরিচালকসভা কারবার তত্ত্বাবধান করে এবং সাধারণ নীতি স্থির করে। এই শ্রেণীর ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানে ঝুঁকি বহন ও পরিচালনার কাজ পৃথক করা হইয়াছে। অংশীদার ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করে। কোম্পানীর লাভ না হইলে সে কিছুই পায় না। কিন্তু সে পরিচালনার কাজে অংশ গ্রহণ করে না। পরিচালনা করে বেতনভোগী ম্যানেজার। সে ঝুঁকি বহন করে না—লাভ না হইলেও তাহারা নির্দিষ্ট মাহিনা পায়। যদিও আপাতদৃষ্টিতে যৌথকোম্পানী প্রথাকে গণতান্ত্রিক মনে হয়, আসলে ইহা মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা পরিচালিত হয়। অধিকাংশ অংশীদারই সভায় যোগ দেয় না বা অন্যভাবে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে না। অতএব মুষ্টিমেয় লোক কোম্পানী চালায়।

যৌথকোম্পানীর সুবিধা ও অসুবিধা: যৌথকোম্পানী গঠনের ফলে বৃহদায়তন শিল্প পরিচালনার সুবিধা হইয়াছে। যে সব কারবারে কোটি কোটি টাকার মূলধনের প্রয়োজন হয়, তাহা একজন বা কয়েকজন লোকের পক্ষে করা সম্ভব হইত না। যৌথকোম্পানী প্রতিষ্ঠার ফলে বেশি মূলধন সংগ্রহ করা এবং বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠন সম্ভব হইয়াছে।

বৃহদায়তন উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে উৎপাদনব্যয় কমিয়াছে, জিনিস সস্তা হইয়াছে এবং ক্রেতারা উপকৃত হইয়াছে।

যৌথকোম্পানী প্রচলনের ফলে ঝুঁকি বহনের কাজ ও কারবার পরিচালনার কাজের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হইয়াছে। এক-মালিকী কারবারে মালিকই নিজের মূলধন কারবারে খাটায়, কারবার পরিচালনা করে ও সমস্ত ঝুঁকি বহন করে। যাহারা ঝুঁকি বহিতে ভয় পায় তাহারা এইরূপ কারবারে নামিবে না। ফলে সে দেশে শিল্পপ্রসার কম হইতে পারে। যৌথকোম্পানীর প্রচলন হওয়াতে এই অসুবিধা দূর হইয়াছে। যাহাদের মূলধন নাই কিন্তু ব্যবসায় পরিচালনার দক্ষতা আছে তাহারা যৌথকোম্পানীতে নির্দিষ্ট বেতনে পরিচালকের কাজ নেয়। যাহারা ঝুঁকি নিতে চায় না কিন্তু টাকা আছে তাহারা যৌথকোম্পানীর বণ্ড কেনে। আবার যাহারা ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে ভয় পায় না তাহারা শেয়ার কেনে। যৌথকোম্পানী প্রতিষ্ঠার ফলে সব রকম লোকেরই সুবিধা হইয়াছে। ইহার ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে।

যৌথকোম্পানী প্রচলনের ফলে সঞ্চয়ের পরিমাণও বাড়ে। যাহারা অতি অল্প টাকা সঞ্চয় করে, তাহারাও শেয়ার কিনিয়া টাকা খাটাইতে পারে ও ডিভিডেণ্ড বাবদ কিছু কিছু আয় করে। ইহার ফলে তাহাদের সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বাড়ে। তৃতীয়ত, শেয়ার বাজার থাকার ফলে যে কোন সময় শেয়ার বিক্রয় করা যায়। অংশীদারী কারবারে যে টাকা খাটান হয় তাহা সহসা তুলিয়া লওয়া যায় না। ইহা করিলে হয়ত ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতে পারে। কিন্তু কেহ যদি যৌথকোম্পানীতে দশ হাজার টাকার শেয়ার কিনিয়া থাকে, সে প্রয়োজনমত শেয়ার বিক্রয় করিয়া টাকা তুলিয়া লইতে পারে। কাজেই দেখা যাইতেছে যৌথকোম্পানীর শেয়ারে টাকা লগ্নী করিলে ইহা চিরকালের জন্য আটক থাকে না। প্রয়োজনমত আবার টাকা ফেরত আনা যায় বলিয়া লোকে যৌথকোম্পানীর শেয়ার কিনিতে রাজী থাকে। চতুর্থত, হস্তান্তর করার সুবিধা থাকায় কোম্পানীর কর্তৃত্ব উপযুক্ত লোকের হাতে যায়; তাহারা অজ্ঞ ও অকর্মণ্য লোকদের নিকট হইতে শেয়ার কিনিয়া লয় ও এইভাবে নিজেদের হাতে কারবার তুলিয়া নেয়।

যৌথকোম্পানী প্রতিষ্ঠার ফলে যে সব কারবারের ঝুঁকি বেশি সেখানে মূলধনবিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়াছে। যৌথ কারবারে প্রত্যেক অংশীদারের দায়িত্ব নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং যে সব কারবারের ঝুঁকি অনেক বেশি সেখানেই লোকেরা শেয়ার কিনিতে ভয় পায় না। কারণ কারবার উঠিয়া গেলে তাহারা শেয়ারের টাকা লোকসান দিবে। অন্য কিছুর ক্ষতি হইবে না। কিন্তু বহু ঝুঁকির কারবারে বহু লাভেরও সম্ভাবনা থাকে। লাভ বেশি হইলে তাহারা বেশি টাকা পাইবে। ফলে এই সমস্ত কারবারের উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। যৌথকোম্পানী স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। সব অংশীদার একসঙ্গে মারা গেলেও কোম্পানী বন্ধ হয় না। পরিচালনার দায়িত্ব প্রয়োজন মত পরিবর্তন করা যায়। আর্থিক সংগতি থাকায় ভাল ভাল লোককে মোটা মাহিনা দিয়া ম্যানেজার পদে নিয়োগ করিয়া ব্যবসায়কে সাফল্যমণ্ডিত করা যায়।

শেয়ার হস্তান্তরকরণের সুবিধা হইতেই কতকগুলি অসুবিধা দেখা দেয়। অনেক সময় অসৎ লোকের হাতে ব্যবসায়ের কর্তৃত্ব চলিয়া যায়। ব্যবসায়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কর্তৃপক্ষস্থানীয় লোকেরা ব্যবসায়ের অবস্থা খারাপ দেখিলে নিজেদের শেয়ার বিক্রয় করিয়া দেয়। সাধারণ অংশীদার কিছুই জানিতে পারে না এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথবা বেশি লভ্যাংশ দেওয়া হইবে জানিতে পারিয়া কর্তৃপক্ষস্থানীয় লোকেরা আগে হইতেই অনেক শেয়ার কিনিয়া রাখে। পরে দাম বাড়িলে সেগুলি বিক্রয় করিয়া লাভ করে। এই প্রকার নীতি গর্হিত। এইভাবে শেয়ার কেনা-বেচার ফলে ব্যবসায়ের প্রকৃত স্বার্থের হানি হয়।

অনেক সময়েই একই উদ্দেশ্যে, মিলিতভাবে কাজ করার ভাব এই ব্যবসায়ে দেখা যায় না। কেননা অনেক অংশীদার দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে এবং শেয়ার অনবরত হস্তান্তরিত হইতেছে। বিপদের সূচনামাত্রই অংশীদারেরা শেয়ার বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে এবং ইহার ফলে শেয়ারের দাম পড়িয়া যায় এবং সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সকলেই নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়, মিলিতভাবে কোন কাজে কেহ অগ্রসর হয় না।

এই প্রথার আর একটি অসুবিধা এই যে, দায়িত্ব বিভক্ত হওয়ায় পরিচালনায় শৈথিল্য দেখা দিতে পারে। পরিচালকেরা যতই কর্মদক্ষ হউন

না কেন, অধস্তন কর্মচারীদের উপর নির্ভর করা ছাড়া তাঁহাদের কোন উপায় নাই। তাঁহারা এক একটি বিভাগ এক একজনের হাতে ছাড়িয়া দেন। এইসব বিভাগগুলির মধ্যে সহযোগিতার অভাব দেখা দিতে পারে ও ফলে কারবারে অসুবিধা হয়।

অনেক সময় পরিচালকেরা গতানুগতিক ভাবে কাজ চালাইয়া যান, কোন রকম ঝুঁকি লইতে চান না। অবশ্য নামযশের আকাঙ্ক্ষা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সেই জন্য সে ব্যবসায়ের ঝুঁকি লয়।

মোটের উপর অসুবিধার চেয়ে যৌথকোম্পানীর সুবিধাই বেশি! ইহা ছাড়া বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হইত না। অন্যান্য ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতিই ইহার প্রমাণ।

সমবায় (Co-operation) : ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রধান দোষ এই যে, কালক্রমে শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থের বিরোধ ঘটে। বলশেভিকবাদ, সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ এবং অন্য নানাপ্রকারের আন্দোলন এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফল। সমবায় প্রথায় পুঁজিবাদীদের কোন স্থান নাই। শ্রমিকেরাই মূলধন যোগায়, পরিচালনা করে ও লভ্যাংশ বণ্টন করিয়া লয়। পরিচালক হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ শ্রমিক পর্যন্ত সকলেই ব্যবসায়ের মালিক। শ্রমিক ন্যায্য মর্যাদা পায় এবং প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক উঠিয়া যায়।

সমবায় প্রধানত দুই প্রকারের, যথা—উৎপাদকের সমবায় এবং ক্রেতার সমবায়। শ্রমিকেরা যদি সমবেতভাবে ব্যবসা করে এবং লভ্যাংশ বণ্টন করিয়া লয়, তবে তাহাকে উৎপাদকের সমবায় বলে। অনেক লেখকের মতে উৎপাদক-সমবায় সাধারণত সফল হয় না। কৃষি, কুটিরশিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে উৎপাদক সমবায় কিছু পরিমাণ সফল হইয়াছে বটে, কিন্তু বৃহদায়তন শিল্পে ইহা কার্যকরী হয় না। সুদক্ষ পরিচালকের অভাবই ইহার প্রধান কারণ। উৎপাদক-সমবায়ে শ্রমিকদের মধ্য হইতে ম্যানেজার নিযুক্ত হয়। সে তেমন দক্ষও নয় এবং শ্রমিকেরা অনেক সময় তাহার কর্তৃত্ব মানিয়া লয় না। ফলে শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। "উৎপাদকের ক্ষেত্রে সমবায়ের প্রধান অসুবিধা এই যে ইহাতে পরিচালকের উপযুক্ত স্থান নাই। এই প্রথার অসাফল্য পরিচালকের কার্যের গুরুত্ব প্রমাণ করে।" ইহাতে মূলধন যোগাড় করাও খুব কঠিন। তবু ইহার সুবিধাগুলির কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না।

ইহাতে শ্রেণী সংগ্রামের অবসান হয়। শ্রমিকদের মনে আত্মসম্মানবোধ জাগে এবং রীতিমত পরিচালনা করিলে শ্রমিকদের আয়ও বাড়ে।

খুচরা অথবা পাইকারী খরিদ্দারের সমবায়কে ক্রেতা-সমবায় বলা হয়। সমবায় দোকান হইতে যে, যে পরিমাণ জিনিস কিনিয়াছে সেই অনুপাতে তাহার লভ্যাংশ বণ্টন করা হয়। ইহাতে প্রতিষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ক্রেতারা মিলিত হইয়া মূলধন সংগ্রহ করে এবং দোকান চালায়। প্রয়োজনীয় জিনিস উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করাই এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। পাইকারী দরে জিনিস কিনিয়া খুচরা দরে বিক্রয় করা হয়। যে লাভ হয় তাহা ক্রেতাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়, অথবা অংশীদারদের সস্তাদরে জিনিস বিক্রয় করা হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কোন ব্যাপারী থাকে না। এই প্রথায় কোন সময়ে ক্রেতার অভাব হয় না এবং বিজ্ঞাপনের খরচ বাঁচিয়া যায়। এই প্রকার কয়েকটি সমবায় সমিতির শাখা পৃথিবীর সর্বত্র আছে। অনেক সময় ইহারা নিজেদের অধীনে উৎপাদন-সমবায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

সরকারী ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান (Concerns under state management) : বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশের সরকার নানাপ্রকারের ব্যবসায় চালায়। ভারত সরকারের অধীনে রেলপথ, পোস্ট অফিস, টেলিফোন ইত্যাদি আছে। ইউরোপের অনেক মিউনিসিপ্যালিটির রেলপথ, জলসরবরাহ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদি আছে। যাহাতে ব্যবসায়গুলি রাজনৈতিক দলাদলির উর্ধ্বে থাকে সেইজন্য ব্যবসা পরিচালনার ভার একটি বোর্ড বা সমিতির হাতে দেওয়া হয়। রেলপথ পরিচালনার ভার ভারতে রেলবোর্ডের উপর আছে।

সরকারী ব্যবসায় পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। অনেক সময়ে ইহা সরকারী দপ্তর হইতে চালান হয়। যেমন আমাদের দেশে ডাকঘর, টেলিফোন ও বেতারের কাজ পরিচালনা করে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া তাহার উপর ব্যবসায় পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। সরকার বা পার্লামেণ্ট সাধারণত এই প্রতিষ্ঠানের কাজে হস্তক্ষেপ করে না। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় যৌথপ্রতিষ্ঠান বা পাবলিক করপোরেসন নাম দেওয়া হইয়াছে। ডি-ভি সি

(দামোদর ভ্যালী করপোরেসন) ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাধারণ যৌথ কোম্পানী শুধু নিজেদের লাভের কথা বিবেচনা করিয়া ব্যবসায় চালায়। জনসাধারণ বা দেশের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি নাও দিতে পারে। কিন্তু এই জাতীয় যৌথপ্রতিষ্ঠানগুলি সব সময়েই যে লাভক্ষতির হিসাব করিয়া চলে তাহা নহে। দেশের জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করা ইহাদের একটি প্রধান কর্তব্য। আবার সরকারী কর্মচারারা সাধারণত ব্যবসাযে দক্ষ হয় না এবং সরকারী কর্মচারীদের উন্নতি ও কাজের যে সমস্ত নিয়ম থাকে ইহা ব্যবসায় পরিচালনার পক্ষে সুবিধাজনক নহে। যৌথ কোম্পানীর ব্যবসায় পরিচালনদক্ষতা সরকারী বিভাগীয় দক্ষতা হইতে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য এইরূপ জাতীয় যৌথপ্রতিষ্ঠানে সরকারী বিভাগীয় পরিচালনা ও সাধারণ যৌথ কোম্পানী পরিচালনা—উভয়েরই গুণ পাওয়া যায়।

Exercises

Q. 1. Examine the merits and demerits of the following forms of business organisation,- (a) Individual Proprietorship, (b) Partnership, (c) Corporation or Joint-stock Company, and (d) Co-operation. (C. U. 1946, '33 ; B. Com. 1945, '43).

Q. 2. Examine the reasons for the predominance of the joint-stock companies, (or corporate forms of business organisation) over other. forms of business organisation. (C. U. B. Com. 1952 ; Viswa. 1952).

অষ্টম অধ্যায়

উৎপাদন ব্যবস্থার প্রকৃতি

শ্রমবিভাগ ও শিল্পকেন্দ্রীকরণ

(Division of Labour and Localisation)

শ্রমবিভাগ (Division of Labour) : কোন কাজ ভাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকের হাতে দেওয়াকে শ্রমবিভাগ বলে। অতি আদিম সমাজেও শ্রমবিভাগ ছিল। স্বর্গোদ্যানে আদম জমি কোপাইতেন এবং ইভ কাপড় বুনিতেন। ইহা শ্রমবিভাগের নিদর্শন। আধুনিক সমাজে এই নীতির ব্যাপক প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রথমে শ্রমবিভাগ পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কালক্রমে গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া অর্থনৈতিক জীবন গড়িয়া উঠিল। গ্রামের এক একটি পরিবার এক একটি কাজে নিযুক্ত রহিল। সভ্যতার উন্নতি, যন্ত্রের ব্যবহার, এবং বাজারের বিস্তারের ফলে শ্রমবিভাগ আরও জটিল হইয়াছে।

শ্রমবিভাগের জন্য দুইটি জিনিস দরকার—(ক) বাজারের বিস্তার এবং (খ) অব্যাহত উৎপাদন। শ্রমবিভাগের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। বাজারে এই জিনিসগুলির খরিদ্দার না থাকিলে বেশি করিয়া উৎপাদনে লাভ নাই ও শ্রমবিভাগের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সুতরাং বাজার বড না হইলে শ্রমবিভাগ লাভজনক হয় না। দ্বিতীয়ত, অব্যাহত উৎপাদন না হইলে শ্রমবিভাগ করা যায় না। উৎপাদন বন্ধ হইয়া গেলে শ্রমিক অন্য কাজ খুঁজিয়া লইতে বাধ্য হয় এবং শ্রমবিভাগের সুবিধা পাওয়া যায় না।

শ্রমবিভাগের শ্রেণীভেদ আছে। সহজ শ্রমবিভাগ ব্যবস্থায় একটি শ্রমিক একটি কাজ করে যেমন, মুচি, ছুতার। জটিল শ্রমবিভাগে একটি কাজকে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হয়। জুতার কারখানায় একজন লোক সমস্ত জুতাটি তৈয়ারি করে না—সে হয়ত শুধু চামড়া ট্যান করে। শ্রমবিভাগ ভৌগোলিকও হইতে পারে। রেলপথ ও জলপথের বিস্তারের ফলে এক একটি অঞ্চল বা দেশ এক এক শিল্পে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। যেমন বাংলা দেশে পাট হয় এবং বেরারে তুলা হয়।

শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and disadvantages of division of labour): উৎপাদন বৃদ্ধিই শ্রমবিভাগের প্রধান সুবিধা। আদম স্মিথ লিখিয়াছেন যে, একটি শ্রমিক যদি একা পিন তৈয়ারি করে তবে সারাদিন কাজ করিয়া সে হয়ত ২০টির বেশি পিন তৈয়ারি করিতে পারে না। কিন্তু পিন তৈয়ারির কাজ ১০।১২ জন শ্রমিকের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলে অর্থাৎ ঠিকমত শ্রমবিভাগ করিয়া দিলে তাহারা হয়ত ৪৮০০ শত পিন তৈয়ারি করিতে পারে। শ্রমবিভাগের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির অনেক কারণ আছে। প্রথমত, যে কাজের জন্য যে ব্যক্তি উপযুক্ত তাহাকে সেই কাজ দেওয়া হয়। সাধারণ শ্রমিক যে কাজ করিতে পারে সেই কাজের জন্য দক্ষ শ্রমিকের সময় নষ্ট হয় না। নানা ধরনের কাজ আছে বলিয়া যে, কাজের যোগ্য তাহাকে সেই কাজ দেওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, শ্রমবিভাগে শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ে। প্রতিদিন একই কাজ করিলে সকলেই সেই কাজে দক্ষতা অর্জন করে। ফলে প্রত্যেকের দক্ষতা বাড়ে ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। শ্রমবিভাগের আর একটি সুবিধা আছে। একজন লোক অন্যের অপেক্ষা সব কাজেই দক্ষ হইতে পারে, কিন্তু তাহার দক্ষতা এক বিষয়ে খুব বেশি ও অন্য কাজে কম হইতে পারে। শ্রমবিভাগের ফলে, সে যে বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বেশি দক্ষ তাহাকে সেই কাজে লাগান যায়। এই নীতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তৃতীয়ত, ইহার দ্বারা সময় বাঁচে এবং যন্ত্রপাতির সদ্ব্যবহার হয়। শ্রমিক একই কাজে নিযুক্ত থাকায় তাহাকে এককাজ হইতে অন্য কাজে যাওয়ার সময় নষ্ট করিতে হয় না। কাজটি শিখিয়া লইতেও বেশিদিন শিক্ষানবিশীর প্রয়োজন হয় না, যন্ত্রপাতির সদ্ব্যবহার হয়। একটি যন্ত্রের দ্বারা একই কাজ হয়। সুতরাং অন্য কাজের জন্য ইহাকে রদবদল করিতে হয় না। চতুর্থত, শ্রমবিভাগের ফলে নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করা সম্ভব হইয়াছে। খেলার সময় করার জন্য যে বালক বাষ্পীয় যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছিল, স্মিথ তাহার কথা বলিয়াছেন। উৎপাদনপদ্ধতি বিভক্ত হইলে প্রত্যেক কাজ সোজা হয়। তখন তাহা যন্ত্রের দ্বারা করা সম্ভব হয়। এইভাবে শ্রমবিভাগের ফলে উৎপাদন বাড়ে ও ব্যয় কমে।

কিন্তু শ্রমবিভাগের অনেক অসুবিধাও আছে। ইহার ফলে কোন

শ্রমিক একটি সম্পূর্ণ জিনিস তৈয়ারি করে না। সে হয়ত সারাদিন ধরিয়া জুতার বোতাম সেলাই করে। নিজের হাতে গড়া বা সৃষ্টি করার আনন্দ হইতে সে বঞ্চিত হয়। কোন একজন লোকের উপর সম্পূর্ণ জিনিসটি সুন্দরভাবে তৈয়ারি করার দায়িত্ব থাকে না। সুতরাং কেহই সেটিকে সুন্দর করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। দ্বিতীয়ত, শ্রমবিভাগ করিলে কাজ একঘেঁয়ে মনে হয়। দিনের পর দিন একই কাজ করিলে মানুষ যন্ত্রে পরিণত হয়। তৃতীয়ত, শ্রমিক যদি একটি কাজ শিখে, তবে সেই কাজের চাহিদা কমিয়া গেলে সে বেকার হয়।

অতিশয় ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের ফলে নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলি দেখা দেয়। কোন জিনিসের জন্য যদি বিশেষ একটি অঞ্চলের উপর নির্ভর করা যায় তবে সেই এলাকায় কোন কারণে উৎপাদন বন্ধ হইয়া গেলে সারা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্য সরবরাহের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিলে যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় অসুবিধা হয়। দ্বিতীয়ত, শ্রমবিভাগের ফলে স্থানবিশেষে শিল্প কেন্দ্রীভূত (localisation) হয়। স্থানবিশেষে শিল্প কেন্দ্রীভূত হইলে একশ্রেণীর শ্রমের চাহিদা বাড়ে। লৌহ-শিল্প এলাকায় শক্তিশালী পুরুষেরা কাজ পায়। স্ত্রীলোক ও বালকেরা কাজ পায় না। সুতরাং ব্যক্তিগত আয় বেশি হইলেও পারিবারিক আয় কম হয়। পার্শ্বশিল্পের উন্নয়নই ইহার একমাত্র প্রতিকার।

শ্রমবিভাগের সীমা (Limits to Division of Labour): শ্রমবিভাগের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, উৎপাদনব্যয় কমে। কাজেই যতই শ্রমবিভাগ করা যায় ততই সকল দিক হইতে লাভ হইতে পারে। কিন্তু সব সুবিধা সত্ত্বেও শ্রমবিভাগ ইচ্ছামত করা সম্ভব হয় না।

ইচ্ছামত শ্রমবিভাগ করিবার পথে সর্বাপেক্ষা বড় বাধা হইতেছে বাজারের আয়তন। একথা আদম স্মিথ বহু পূর্বেই বলিয়াছেন। শ্রমবিভাগ বাজারের আয়তন দ্বারা সীমাবদ্ধ (Division of labour is limited by the extent of the market)। কোন জিনিস তৈয়ারির কাজে কতদূর শ্রমবিভাগ করা যাইবে ইহা জিনিসটির বাজারের উপর নির্ভর করে। শ্রমবিভাগের ফলে উৎপাদন বাড়ে। জিনিসটির বাজার যদি ছোট হয়—

অর্থাৎ বেশি জিনিসের খরিদ্দার না পাওয়া যায়—তবে বেশি উৎপাদন করিয়া লাভ কি হইবে? বেশি শ্রমবিভাগ করিয়া বেশি উৎপাদন করিলে মাল অবিক্রিত হইয়া ঘরে জমা থাকিবে। ফলে ব্যবসায়ীর লোকসান হইবে। সুতরাং যে জিনিসের বাজার ছোট সেখানে বেশি শ্রমবিভাগ করিয়া উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা কোন ব্যবসায়ীই করিবে না। কোন জিনিসের উৎপাদনে কতখানি শ্রমবিভাগ করা হইবে—ইহা জিনিসটির বাজারের আয়তনের উপর নির্ভর করে।

অবশ্য এ বিষয়ে কেবলমাত্র মোট বাজারের আয়তন দেখিলে চলিবে না,—প্রত্যেক ব্যবসায়ীর বাজার কত বড় তাহাই দেখিতে হইবে। দেশে বৎসরে হয়ত কয়েক লক্ষ জোড়া জুতা বিক্রয় হইতে পারে। অর্থাৎ জুতার মোট বাজার বেশ বড়। কিন্তু সকল খরিদ্দারই যদি নিজেই পায়ের মাপ দিয়া আলাদা করিয়া জুতা তৈয়ারি করিয়া নেয়, তবে কোন একটি জুতা ব্যবসায়ীর বাজার বড় নাও হইতে পারে। এই ক্ষেত্রে জুতার বাজার বড় হইলেও কোন একটি ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানে বেশি শ্রমবিভাগ করা যাইবে না। কিন্তু লোকে যদি রেডিমেড্ জুতা কিনিতে এবং পায়ে একটু আধটু ফিটিং না হইলেও আপত্তি না করে তবে যন্ত্র ব্যবহার করিয়া একই ছাঁচে বহু জুতা তৈয়ারি করা সম্ভব হয়। এই অবস্থায় কোন উদ্যোগী ব্যবসায়ী বড় কারখানা স্থাপন করিয়া অনেক জুতা তৈয়ারি করিতে পারে। সে অনেক বেশি শ্রমবিভাগ করিতে পারিবে যাহা গ্রামের মুচির পক্ষে করা সম্ভব নয়। কারণ গ্রামের মুচির তৈয়ারি জুতার বাজার অনেক ছোট,—এক গ্রাম কি বড় জোর দুইতিন গ্রামের লোক তাহার নিকট হইতে জুতা কিনিবে। সুতরাং বড় বড় যন্ত্র বসাইয়া অনেক লোক লাগাইয়া বহু জোড়া জুতা তৈয়ারি করিয়া তাহার কোন লাভ নাই। কারণ সে যে বাজারে জুতা বিক্রয় করে সেখানে খুব বেশি জুতা বিক্রয়ের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বাটা কোম্পানী বহু অঞ্চলে জুতা বিক্রয় করে। তাহার বাজার অনেক বড় এবং সেইজন্য এই কোম্পানী নিজেদের কারখানায় বহু শ্রমবিভাগ করিয়াছে। সুতরাং শ্রমবিভাগ মোট বাজারের আয়তন এবং প্রত্যেক ব্যবসায়ীর নিজস্ব বাজারের আয়তনের উপর নির্ভর করে।

বেশি শ্রমবিভাগের অর্থ বেশি অর্থাৎ বৃহদায়তন উৎপাদন। সুতরাং

বৃহদায়তন উৎপাদনের যে সীমা—শ্রমবিভাগেরও তাহাই সীমা। বৃহদায়তন উৎপাদনের সীমা পরের অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

শিল্পের কেন্দ্রীকরণ (Localisation of industry): অনেক সময়েই দেখা যায় যে একটি বিশিষ্ট অঞ্চলে একই ধরনের বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। যেমন কলিকাতার আশেপাশে হুগলী নদীর তীরে পাটের কলগুলি স্থাপিত আছে। আবার পূর্ববঙ্গে নারায়ণগঞ্জে বহু পাটের কল আছে। বোম্বাই ও আমেদাবাদ শহরের আশেপাশে বহু কাপড়ের কল বসিয়াছে। পাটের কলগুলি বাংলা দেশের সর্বত্র না ছড়াইয়া কেন কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে? চিনির কলগুলি এত সংখ্যায় কেন বিহার উত্তরপ্রদেশে প্রতিষ্ঠিত আছে? যে ব্যবসায়ী নূতন চিনির কল বসাইবার চেষ্টা করিতেছে সে কেন প্রথমেই বিহার ও উত্তর-প্রদেশের কথা ভাবে? কি কি বিষয়ের আকর্ষণে চিনির কলওয়ালা বিহারে যায়, আবার পাটের কলওয়ালা হুগলী নদীর পারে জমি খোঁজে? প্রশ্নটি আরো ব্যাপকভাবে দেখা যায়। কেন পাটের কল বাংলাদেশে স্থাপিত হয় আর জাহাজ তৈয়ারির কারখানা ইংলণ্ডেই বেশি সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত আছে?

কি কি কারণে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি কোন বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়? যেখানে উৎপাদন ও যানবাহনের খরচ সর্বাপেক্ষা কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, ব্যবসায়ী সেখানেই কারবার খোলে। কোথায় কারখানা খুলিবে তাহা ঠিক করিবার পূর্বে ব্যবসায়ী কি কি জিনিসের দিকে লক্ষ্য রাখে? এই বিষয়গুলিকে প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। কারখানা খুলিবার পূর্বে ব্যবসায়ীরা প্রথমে দেখে যে দরকারী কাঁচামাল নিকটে পাওয়া যাইবে কি না। যেমন ধাতুশিল্প খনির নিকটে প্রতিষ্ঠা করাই উচিত। ছোটনাগপুর ও বিহারের কাছাকাছির মধ্যে লোহার খনি ও কয়লার খনি আছে বলিয়া, টাটা জামসেদপুরে আয়রণ ও ষ্টীল কোম্পানী খুলিয়াছেন। ঠিক এই কারণেই দুর্গাপুরে, রুরকেলা ও ভিলাইতে লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা বসানো হইয়াছে। কাঁচামাল নিকটেই পাওয়া গেলে উৎপাদনব্যয় কম পড়িবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত কারখানায় ইঞ্জিন চালাইবার জন্য কয়লা, বিদ্যুৎ, পেট্রোল প্রভৃতি শক্তির প্রয়োজন। যেখানে এইগুলি সস্তায় পাওয়া যায়

সেখানে কারখানা বসাইলে কম খরচ হইবার সম্ভাবনা থাকে সেইজন্য কয়লার খনির নিকটে কিংবা যেখানে সস্তায় জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহার আশেপাশে বর্তমান যুগের কারখানাগুলি গড়িয়া উঠিতেছে।

অর্থনৈতিক কারণগুলির মধ্যে বাজারের নৈকট্যই প্রধান। নদী ও বন্দরের অবস্থান ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণের সহিত ইহার যোগ আছে। কিন্তু বন্দর অথবা নদীতীরে সব শিল্প কেন্দ্রীভূত হয় না। বড় বড় শহরে অনেক মাল বিক্রয় হইতে পারে বলিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি শহরের কাছাকাছি প্রতিষ্ঠিত হয়। একই কারণে বড় বড় রেল জংশনের নিকট শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। যথেষ্ট সংখ্যায় শ্রমিক যেখানে পাওয়া যায় সেখানেও শিল্প গড়িয়া উঠে। কলিকাতায় অনেক শ্রমিক পাওয়া যায় বলিয়া এখানে অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোন কারণে, সুদক্ষ শ্রমিকেরা বিশেষ এক জায়গায় বাস করে, তবে সেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিলে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়।

সুতরাং ব্যবসায়ীরা দেখে যে কারখানা চালাইবার শক্তি (যেমন বিদ্যুৎ, কয়লা (প্রভৃতি) কোথায় পাওয়া যায়? কাঁচামাল নিকটেই মেলে কিনা কিংবা দূর হইতে আনাইতেও বা কি খরচ পড়ে? জিনিসটির আসল বাজার যেখানে, সেখানেই কারখানা বসাইবে না দূরে গেলেও লোকসান হইবে না? এমন খুব কম সময়েই হয় যখন জিনিসটির বাজারের নিকটেই কাঁচামাল ও শক্তি পাওয়া যায়। এই তিনটি বিষয়ের টান ভিন্ন ভিন্ন দিকে হইতে পারে। যেমন কাঁচামাল যেখানে পাওয়া যায়—জিনিসটির বাজার হইতে সেস্থান বহু দূরে। কারখানা কাঁচামালের নিকটবর্তী অঞ্চলে বসাইলে বাজার বহু দূরে থাকিবে। আবার বাজারের নিকটে বসাইলে কাঁচামাল আনাইবার খরচ বেশি পড়ে। বাজারের নিকট কারখানা করিলে তৈয়ারি জিনিস বাজারে পৌঁছাইতে কম ভাড়া লাগে। কিন্তু কাঁচামাল আনিবার রেল খরচ বাড়ে। আর কাঁচামালের নিকটবর্তী অঞ্চলে কারখানা থাকিলে কাঁচামাল আনিবার ভাড়া কম লাগে, কিন্তু তৈয়ারি জিনিস বাজারে পাঠাইবার খরচ বেশি হয়। যেখানে কারখানা বসাইলে খরচ সর্বাপেক্ষা কম পড়ে দক্ষ ব্যবসায়ী সেইখানেই কারখানা খোলে।

রাজনৈতিক কারণের মধ্যে রাজদরবারের সহায়তা প্রধান। ঢাকার মসলিন ও মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্প হিন্দু রাজা ও মুসলমান নবাবদের সাহায্যে এত উন্নত হইয়াছিল। নবাবেরা বা রাজারা দক্ষ শিল্পীদের আহ্বান করিয়া নিজেদের রাজধানীর আশেপাশে বসাইয়াছেন ও ফলে নানাস্থানে নানা শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। পুরাকালে শিল্প কেন্দ্রীকরণের ইহাও একটি প্রধান কারণ ছিল।

কয়েকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান কোন এক জায়গায় স্থাপিত হইলে অনেক সময়ে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান সেখানে গড়িয়া উঠে। স্থান বিশেষের সুনামের জন্য শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়। যেমন ইংলণ্ডের শেফিল্ড শহরের ছুরী ও কাঁচির ও সুইট্জারল্যাণ্ডের ঘড়ির পৃথিবীব্যাপী নাম আছে। সুতরাং এই সুনামের সুবিধা পাওয়ার জন্য নূতন নূতন কোম্পানী সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং "শেফিল্ডে তৈয়ারি" 'সুইট্জারল্যাণ্ডে তৈয়ারি" এই সুনামের সুযোগ লইয়া মাল বিক্রয় করে।

পাটের কল বাংলাদেশে আছে, কারণ এদেশে প্রচুর পরিমাণে পাট জন্মায়। পূর্বে পাটের থলি বিদেশেই বেশি বিক্রয় হইত। কাজেই ব্যবসায়ীরা কলিকাতার বন্দরের আশেপাশে কল বসাইয়াছে। এই বন্দর হইতে প্রথমে বিদেশের সর্বত্র মাল পাঠান যায়। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে চিনির কল থাকার কারণ এই দুই রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে আখের চাষ হয়। অনেক সময়ে দেখা যায় যে কোন একটি জিনিস উৎপাদনে একজনের বিশেষ দক্ষতা আছে। সেইরূপ এক একটি বিশেষ অঞ্চলে কোন বিশিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠার পক্ষে বহু সুবিধা পাওয়া যায়। এই সুবিধাগুলির আকর্ষণেই বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি সেই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়।

এই ধরনের শিল্প কেন্দ্রীকরণে নানা প্রকারের সুবিধা পাওয়া যায়। কোন অঞ্চলে একটি শিল্প গড়িয়া উঠিলে নূতন কারবারী সেই শিল্পের সুনামের সুযোগ লইতে পারে। নূতন কোম্পানীর ঘড়িও সুইস ঘড়ি বলিয়া বাজারে সহজে বিক্রয় হইবে। দ্বিতীয়ত, শ্রমিকেরা বাল্যকাল হইতে ঐ শিল্পের আবহাওয়ায় মানুষ হইয়া বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করে। তৃতীয়ত, দক্ষ শ্রমিকেরা জানে যে তাহাদের উপযুক্ত কাজ সহজেই সেই অঞ্চলে পাওয়া যায়। তাই তাহারা এখানে দল বাঁধিয়া আসে। সুতরাং এই শিল্পের পক্ষে

দক্ষ কারিগর পাওয়া সহজ হয়। চতুর্থত, আশেপাশে অনেক গৌণ (subsidiary) শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গৌণ শিল্পগুলি মুখ্য শিল্পের সরঞ্জাম ইত্যাদি সরবরাহ করে অথবা পরিত্যক্ত জিনিসগুলি লইয়া অন্য জিনিস তৈয়ারি করে। পঞ্চমত, কেন্দ্রীয়করণের ফলে বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করা যায় এবং প্রতিযোগিতার ফলে উদ্ভাবনের বিশেষ সুবিধা হয়। ষষ্ঠত, কেন্দ্রীভূত শিল্পে, সহজে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। কেননা বহু ব্যাঙ্ক ইত্যাদি ঐ স্থানে শাখা খোলে।

কিন্তু শিল্প কেন্দ্রীকরণের অনেক অসুবিধাও আছে। প্রথমত, এক ধরনের কাজ পাওয়া যায় বলিয়া পরিবারের কয়েকজন লোক কাজ পায়, অন্যেরা বেকার থাকে। যেমন লৌহ শিল্পে পুরুষেরা কাজ পায়, বালক ও স্ত্রীলোকেরা পায় না। শ্রমিকেরা হয়ত বেশি বেতন পায়, কিন্তু পারিবারিক আয় কম হয়। বেশি বেতন দিতে মালিকদেরও অসুবিধা হয়। অবশ্য গৌণ শিল্পের উন্নতি করিয়া এই অসুবিধা দূর করা যায়। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীকরণের ফলে দেশের এক অংশকে অন্য অংশের উপর নির্ভর করিতে হয়। কোন কারণে এই শিল্পে মন্দা দেখা দিলে শ্রমিকেরা বেকার হয়। নানাপ্রকারের শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া এই অসুবিধা কিছুটা দূর করা যায়।

শিল্পে কেন্দ্রীকরণ ও রাষ্ট্র (The State and the location of industry): শিল্পের কেন্দ্রীকরণের কারণ আলোচনা করা হইয়াছে। নিকটেই প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, সস্তায় শক্তি, শ্রমিক সরবরাহ ও জিনিসটির বাজার আছে কিনা—এই সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করিয়া তবে ব্যবসায়ীরা কোথায় কারখানা বসাইবে তাহা ঠিক করে। কিন্তু বাস্তব জীবনে দেখা যায় যে, ব্যবসায়ীরা সব সময়ে অত হিসাব করিয়া কারখানার স্থান ঠিক করে না। তাহারা দুই একটি জায়গা সাধারণভাবে পরীক্ষা করিয়া স্থান নির্ণয় করে। এমন কি অনেক সময়ে ইহাও করা হয় না। ফলে ব্যবসায়ীরা ঠিকমত জায়গা বাছিয়া কারখানা নাও করিতে পারে। ইংলণ্ডের এক বিখ্যাত কারখানার মালিককে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, আপনি কি কি জিনিসের বিচার করিয়া ইংলণ্ডের উত্তরাঞ্চল ছাড়িয়া দক্ষিণাঞ্চলে কারখানা স্থাপন করিয়াছেন? তিনি ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, উত্তরাঞ্চলে আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে না, সেইজন্য দক্ষিণে কারখানা হইয়াছিল। অবশ্য

সকলেই যে স্ত্রীর স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করিয়া কারখানার জায়গা ঠিক করেন তাহা নহে। বিভিন্ন বিষয়ের মোটামুটি একটা হিসাব করিয়া যেখানে সে মনে করে যে উৎপাদনব্যয় সবচেয়ে কম হইবে সেইখানেই সে কারবার বসায়।

এই হিসাবের ফল সব সময়ে যে ঠিক হয় ইহা ভাবিবার কোন কারণ নাই। আর ব্যবসায়ীদের দিক হইতে যে জায়গা সর্বাপেক্ষা ভাল হইতে পারে,—সমগ্র দেশের কথা বিচার করিলে তাহা নাও হইতে পারে। কলিকাতা শহরে কারখানা বসাইলে নানা সুবিধা পাওয়া যায় এবং ব্যবসায়ীর নিজের দিক দেখিলে এইখানে কারখানা বসাইলে উৎপাদনব্যয় সর্বাপেক্ষা কম হইতে পারে। কিন্তু দেশের দিক দিয়া দেখিলে এই ব্যবস্থা ঠিক নাও হইতে পারে। এত জনবহুল শহরে আবার কারখানা বসাইলে নানা-সমস্যা দেখা দিবে। কারখানার চিম্‌নির কালো ধোঁয়ায় শহরের হাওয়া আরো দূষিত হইবে। একেই যা জলকষ্ট এর উপর আরো কারখানার শ্রমিক আসিলে জলকষ্ট, যাতায়াতে বাস ট্রামের ভীড় আরো বাড়িবে। এইজন্য সরকার শহরের লোক যতদূর সম্ভব বাহিরে ছড়াইয়া দেওয়ার নীতি অবলম্বন করিয়াছে।

এই সমস্ত কারণের জন্য নূতন কারখানার জায়গা ঠিক করার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার হয়। আমাদের দেশে কারখানা আইনে ও শিল্পোন্নতি নিয়ন্ত্রণ আইনে সরকারের হাতে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। যে নূতন কারখানা বসাইতে চায় তাহাকে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হয় এবং লাইসেন্স দেওয়ার সময় সরকার বলিয়া দিতে পারে যে, প্রস্তাবিত স্থানে কারখানা করা যাইবে না। অবশ্য এই ব্যবস্থারও ভালমন্দ আছে। ব্যবসায়ীরা সে সব ক্ষেত্রে ঠিকমত জায়গা বাছিয়া লইবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই—একথা ঠিক। কিন্তু সরকারী কর্মচারীরা যে স্থান ঠিক করিবে তাহা ভাল হইবে ইহাও বলা চলে না।

Exercise

Q. 1. "Specialisation introduces two inevitable risks into production." What are the risks ? What are the methods that have been developed to deal with these risks ? (C. U. B. Com. 1950).

Q. 2. What are the factors leading to localisation of industry ? Mention the consequence of such localisation.

Q. 3. Describe the advantages and disadvantages of division of labour.

"Division of labour is limited by the extent of the market." Discuss. (C. U. 1915 ; B. Com. 1953)

নবম অধ্যায়

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান

(Largescale and Smallscale Industries)

বৃহৎ আকারের শিল্পপ্রতিষ্ঠান বর্তমান যুগের প্রতীক। ইহার কারণ শ্রমবিভাগ ও যন্ত্র ব্যবহারের সঙ্গে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠনের যোগ আছে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আকার বড না হইলে বেশি শ্রমবিভাগ ও যন্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। কাজেই আজকাল নানা শিল্পে কারখানার আয়তন ক্রমেই বড় হইতেছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও প্রত্যেক দেশেই বহু ছোট আকারের কারখানাও রহিয়াছে দেখা যায়। বড কারখানায় বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয়। মূলধন বেশি না লগ্নী করিতে পারিলে কারখানার আকার বড় করা যায় না, বেশি যন্ত্র ব্যবহার ও লোক নিয়োগ করা যায় না। ছোট কারবারে কম মূলধন লাগে। আমাদের মত দরিদ্র দেশে মূলধনের পরিমাণ কম। কাজেই আমাদের অনেক মূলধন লাগে। এই ধরনের বড কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করিব, না কম মূলধনের ছোট কারখানা খুলিয়া শিল্পোন্নতির চেষ্টা করিব? এই সমস্যা লইয়া আজকাল এদেশে বহু আলোচনা হইতেছে। এই অধ্যায়ে এবিষয় সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা হইবে। প্রথমে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে কি সুবিধা পাওয়া যায় ও ইহার কোন সীমা আছে কিনা ইহার আলোচনা হইবে। পরে ছোট কারখানার সুবিধা ও অসুবিধা পরীক্ষা করা হইবে।

বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সুবিধা : শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন বড় হইলে কি সুবিধা পাওয়া যায়? বৃহদায়তন উৎপাদনে বেশি জিনিস উৎপন্ন হয় এবং গড়পড়তা উৎপাদনব্যয় কম পড়ে। যে যে কারণে উৎপাদনব্যয় কমিতে পারে, ইহাদিগকে অধ্যাপক মার্শাল বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ,—এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন।

ব্যয়সংকোচের বাহ্যিক কারণ (External economies) : বৃহদায়তন উৎপাদনে কতকগুলি সুবিধা পাওয়া যায় যাহার ফলে উৎপাদন-

ব্যয় কম হয়। এই সুবিধা বা উৎপাদনব্যয় কমিবার কারণগুলিকে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ছোট ছোট কারখানা আরো বেশি মূলধন, বেশি লোক কিংবা বেশি যন্ত্র লাগাইয়া বড় আকার ধারণ করিতে পারে। এই আয়তনবৃদ্ধির ফলে সেই কারখানার মালিক যে যে সুবিধা পায় ইহাকে উৎপাদনব্যয় কমিবার "আভ্যন্তরীণ" কারণ (Internal economies) বলা হয়। কারখানার আয়তনবৃদ্ধির ফলে কারখানার ভিতরেই এই সব সুবিধা পাওয়া। কিন্তু কারখানার আয়তন না বাড়িয়া শুধু যদি শিল্পটির প্রসার বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলেও প্রত্যেক কারখানার মালিক কতকগুলি সুবিধা পায় এবং তাহার উৎপাদনব্যয় কমিয়া যায়। এই ধরনের কারণগুলিকে ব্যয় কমিবার "বাহ্যিক" কারণ (External economies) বলা হয়। এই কারণগুলি কারখানার আয়তন-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে না, শিল্পটির প্রসার বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরা যাক, কোন দেশে মাত্র ১০০টি কাপড়ের কল ছিল। কিন্তু পরে কাপড়ের চাহিদা বাড়িবার ফলে আরো ১০০টি কল বসান হইল। অর্থাৎ এখন ২০০টি কাপড়ের কল হইয়াছে। বস্ত্রশিল্পের এই প্রসারবৃদ্ধির ফলে প্রত্যেক কলের মালিক পূর্বাপেক্ষা কম দামে যন্ত্রপাতি কিনিতে পারিবে। যে কারখানায় কাপড়ের কলের যন্ত্রাদি তৈয়ারি হয় সে পূর্বে ১০০টি কাপড়ের কলের জন্য ১০০টি যন্ত্র বিক্রয় করিত। এখন সে ২০০টি যন্ত্র বিক্রয় করিতে পারিতেছে। বেশি সংখ্যায় যন্ত্র তৈয়ারি হইতেছে বলিয়া প্রত্যেক যন্ত্রের উৎপাদনব্যয় কম পড়িবে। কারণ যন্ত্রনির্মাণ শিল্পেও বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা পাওয়া যায়। কাপড়ের কলগুলি কম দামে যন্ত্র কিনিতে পারে বলিয়া তাহাদের উৎপাদনব্যয় কম হইবে। কাপড়ের কলগুলির পক্ষে উৎপাদনব্যয় কমিবার এই কারণ বাহ্যিক। শিল্পের localisation বা কেন্দ্রীকরণের ফলে যে সুবিধা পাওয়া যায় ইহার অধিকাংশই বাহ্যিক কারণের মধ্যে পড়ে। অনেকগুলি কাপড়ের কল এক জায়গায় স্থাপিত হইলে এই কেন্দ্রীকরণের সুবিধা প্রত্যেক কলের মালিকই ভোগ করে। যেমন দক্ষ তাঁতীরা সেই অঞ্চলেই চাকুরীর খোঁজে যাইবে। ফলে ভাল শ্রমিক পাওয়া অনেক সহজ হয়। রেলওয়ে হইতে সেই শিল্পের উপযুক্ত সাইডিং করিয়া দেওয়া হয় এবং সেই শিল্পের মাল লইয়া যাইবার

উপযোগী ওয়াগান তৈয়ারি করে। মাল আনা-নেওয়ার এই সুবিধা প্রত্যেক কাপড়ের কলই ভোগ করে। একটি দুইটি কুলের জন্য রেল-কোম্পানী এত সুবিধাজনক ব্যবস্থা নাও করিতে পারে। এই সুবিধাগুলি থাকার ফলে কাপড়ের উৎপাদনব্যয় কম হয়। এইগুলি উৎপাদনব্যয় কমিবার বাহ্যিক কারণ। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বস্ত্রশিল্পের পক্ষে যে কারণগুলি বাহ্যিক তাহা আবার অন্য শিল্পের পক্ষে আভ্যন্তরীণ হইতে পারে। যেমন কাপড়ের কলের সংখ্যা বাড়িবার ফলে কাপড় তৈয়ারির কলের দাম কমা, কাপড়ের কলের মালিকের পক্ষে বাহ্যিক কারণ। কিন্তু যে কারখানায় কল তৈয়ারি হয় ইহার পক্ষে হয়ত আভ্যন্তরীণ কারণ।

ব্যয়সংকোচের আভ্যন্তরীণ-কারণ (Internal economies) : উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িলে যে ব্যয় কমে তাহাকে আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচ বলে। শিল্পের সাধারণ উন্নতির সহিত ইহার কোন সংযোগ নাই। কারখানার আয়তনবৃদ্ধির ফলে এই কারণগুলির জন্য উৎপাদনব্যয় কমে। এই কারণগুলিকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমটিকে যন্ত্র ব্যবহারের সুবিধা বলা চলে। বড় বড় কারখানায় ভাল ও দামী যন্ত্র ব্যবহার হয়। মেসিন চালাইবার জন্য বিদ্যুতের ব্যবহার করিতে পারে। ফলে তাহার উৎপাদনব্যয় কম হয়, কাঁচামালের খরচও কমে। ছোট কারখানায় অনেক জিনিস ব্যবহার করা সম্ভব নয় বলিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। কিন্তু বড় কারখানায় সব জিনিস ব্যবহার করা যায়। বড় বড় চিনির কলে চিনি তৈয়ারি হইবার পর যে চিটাগুড় পড়িয়া থাকে তাহা হইতে বহুমূল্যবান যন্ত্রাদি বসাইয়া স্পিরিট তৈয়ারি করার ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু ছোট চিনির কলের পক্ষে ইহা সম্ভব নয়। ছোট চিনির কলের চিটাগুড় ফেলিয়া দিতে হয়, নয়ত জলের দামে বেচিয়া দিতে হয়। আনুষঙ্গিক জিনিস (by-product) তৈয়ারি সম্ভব হইলে মূল জিনিসটি কম দামে বিক্রয় করা যায়। বড় কারখানায় যেমনভাবে শ্রমবিভাগ করা যায়, ছোট কারখানায় সেইরূপ যায় না। সুতরাং বড় কারখানায় শ্রমিকেরা বিশেষ বিশেষ কাজে পারদর্শী হইয়া উঠে। ছোট কারখানায় ইহা সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়ত, ছোট ছোট কারখানায় পরিচালকদের কাঁচা মাল কেনা, জিনিস বিক্রয় করা, শ্রমিক নিয়োগ করা ইত্যাদি নানাপ্রকারের কাজ একসঙ্গে করিতে হয়। নানা রকমের কাজ করে বলিয়া সে সব বিষয়ে সমান দক্ষতা অর্জন করিতে পারে না। ব্যবসায় বাড়িলে সে ছোটখাট অনেক কাজ কর্মচারীদের হাতে ছাড়িয়া দেয় এবং ব্যবসায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিজে পরিচালনা করিতে পারে। বড় ব্যবসায়ে প্রত্যেক বিভাগ বিশেষজ্ঞদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া যায়। এইভাবে পরিচালনার কাজ বিশেষ দক্ষতার সহিত চলে ও ফলে ব্যয়সংকোচ হয়।

বেচা-কেনার ব্যাপারেও বড ব্যবসায়ীর অনেক সুবিধা আছে। বহু পরিমাণে মাল কেনে বলিয়া সে পাইকারী দরে কাঁচামাল কিনিতে পারে। কাজেই তাহার জিনিস কিনিবার খরচ কিছু কম পড়ে। বিক্রয়ের খরচও কম হয়। কাঁচামাল কেনার জন্য অভিজ্ঞ ক্রেতা ও পণ্য বিক্রয়ের জন্য অভিজ্ঞ বিক্রেতা নিয়োগ করিতে পারে। বড় চা-বাগান অভিজ্ঞ চা-শ্রমিককে (tea blender) নিয়োগ করিতে পারে। সে অনেক বেশি টাকা বিজ্ঞাপনে ব্যয় করিতে পারে। ফলে জিনিসটির বিক্রয় বাড়ে।

অর্থসংগ্রহ ব্যাপারেও বড় ব্যবসায়ীর অনেক সুবিধা আছে। ছোট ব্যবসায়ের তুলনায় বড় ব্যবসায়ের পরিচিতি বিস্তৃত। সুতরাং ইহা সহজে অপেক্ষাকৃত কম সুদে ধার পায়। ইহা বাজারে সহজেই শেয়ার এবং বণ্ড বিক্রয় করিতে পারে। ছোট কারখানার পক্ষে ইহা সম্ভব হয় না।

ব্যবসায় মাত্রেই ঝুঁকি আছে। কিন্তু বড় কারবারী নানাভাবে তাহার ঝুঁকি কমাইবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। বড় কারবারী বহু অঞ্চলে বিক্রয় করে। কোন অঞ্চলে মন্দা দেখা দিলে, অন্য জায়গায় হয়ত বিক্রয় বাড়িতে পারে। সুতরাং জিনিসের মোট চাহিদা স্থির থাকিতে পারে। বড় ব্যাঙ্ক বিভিন্ন জায়গায় শাখা খোলে এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ে টাকা ধার দিয়া ঝুঁকি কমাইতে পারে। বিশেষ কোন অঞ্চলে অথবা শিল্পে মন্দা দেখা দিলে ইহা বিপদগ্রস্ত হয় না। বড় ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন প্রকারের জিনিস তৈয়ারি করে। একরকম জিনিসের চাহিদা কমিলে অন্যটির চাহিদা হয়ত বাড়ে এবং মোটের উপর পোষাইয়া যায়।

এইভাবে বড় বড় কারখানায় কম ব্যয়ে জিনিস উৎপাদন করা যায়। ইহাই বৃহদায়তন উৎপাদনব্যবস্থার সুবিধা।

বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার সীমা (Limits to large-scale production) : বৃহদায়তন কারবারে এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কি করিয়া এত ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান টিঁকিয়া আছে? নিশ্চয়ই বড় কারবারের এমন কতকগুলি অসুবিধা আছে যাহার জন্য ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় টিঁকিয়া থাকে।

বস্তুত বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, কারবার বড় হইলে প্রথম প্রথম বেশ লাভ হয়। কিন্তু বড় হইতে হইতে ক্রমে এমন অবস্থা আসে যখন উৎপাদনব্যয় না কমিয়া বাড়িতে থাকে। কারণ তখন নানাবিধ বাধা দেখা দেয়।

প্রথমত, শ্রমবিভাগ ও যন্ত্র ব্যবহারের সুবিধা চিরকাল পাওয়া যায় না। কিছুদিন পরে আর আয়তন বাড়ার ফলে বিশেষ সুবিধা মেলে না। বড় চুল্লীতে ছোট চুল্লী অপেক্ষা কম খরচ হয় বটে, কিন্তু একটা অবস্থার পরে সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধাই বেশি হয়।

দ্বিতীয়ত, মানুষের ক্ষমতারও একটা সীমা আছে। বিরাট কারবার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই থাকে। কারবারের আয়তন বাড়িলে পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করার নানা অসুবিধা দেখা দেয়। যতই শ্রমবিভাগ করা যায়, যতই নূতন শাখা খোলা যায়, যতই বিভাগ বাড়ান যায়, ততই বিভিন্ন বিভাগের ভিতর সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন হইয়া পড়ে। বড় ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানে বিভাগের পর বিভাগ সাজান থাকে। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে হইলে একজনের সঙ্গে আলোচনা করিতে হয়, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জানাইতে হয়, তৃতীয় ব্যক্তির অনুমতি দরকার হয়, অপর একজনের সহিত একমত হইতে হয়। সুতরাং সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে খুব দেরি হয়। এমন এক অবস্থা আসে যখন কারবার চালান কষ্টকর হয় এবং অসংখ্য বিভাগের সামঞ্জস্য বিধান করার অসুবিধা বৃহৎ আয়তনের সুবিধাকে নষ্ট করিয়া দেয়। বড় কারবার চালাইবার মত ক্ষমতা বা বুদ্ধি কম লোকেরই আছে। 'বড় বড় বানরের বড় বড় পেট। লঙ্কা ডিঙ্গাইতে মাথা করে হেঁট।' লঙ্কা শুধু কেবল হনুমানজী ডিঙ্গাইতে পারিয়াছিলেন। বড়

কারবার চালাইবার মত লোকের অভাব আছে বলিয়াও অনেক সময়ে কারবারের আয়তন বড় হইতে পারে না।

তৃতীয়ত, বৃহদায়তনে উৎপাদন করিতে হইলে, প্রচুর মূলধনের দরকার। ব্যবসায়ীর নিজের যদি টাকা না থাকে, তবে ব্যাঙ্কের নিকট ধার করিতে হয়। ইহা সব সময়ে সম্ভব নাও হইতে পারে। তাহা ছাড়া যে ধার দিবে সেও উপযুক্ত জামিন (security) দাবি করিবে। কিন্তু উপযুক্ত জামিন তাহার নাও থাকিতে পারে। অবশ্য যৌথ কোম্পানী গঠন করিয়া টাকা তোলা যাইতে পারে। কিন্তু যৌথ কোম্পানী গঠন করিলে, ব্যবসায়ীর স্বাধীনতা ও উদ্যম নষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং মূলধনের অভাবে কারবার আর বড করা সম্ভব নাও হইতে পারে।

চতুর্থত, পণ্যের চাহিদা কখনও বাড়ে, কখনও কমে এ বিষয়ে বড় কারবারের অসুবিধা আছে। বড কারবারের ব্যবস্থা ও যন্ত্রপাতিকে হঠাৎ বাড়ান অথবা কমান যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আয়তন বৃদ্ধির এমন কতকগুলি অসুবিধা আছে যাহার জন্য সব সময় কারবার বড় করিয়া লাভ হয় না। অতিরিক্ত পণ্য বিক্রয় করার জন্য প্রচুর ব্যয় করিতে হয়। বিক্রয়ব্যবস্থার জন্য এত খরচ হয় যে ইহার ফলে মোট উৎপাদনব্যয় অনেক বাড়ে। প্রতিযোগিতার অভাব ও ক্রেতাদের অলসতার জন্যও আয়তন বৃদ্ধি করিয়া কোন লাভ হয় না। কারখানার আয়তন বড় করিয়া তখনই লাভ হয় যখন বেশি জিনিস বাজারে সুবিধামত দরে বিক্রয় করা যায়। কিন্তু মোট বাজারের আয়তন যদি ছোট হয়, কিম্বা কোন একটি ব্যবসায়ীর তৈয়ারি জিনিসের বাজার যদি ছোট থাকে, তবে বড় কারখানা বসাইয়া লাভ হয় না।

ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান (Small-scale industries) : আমরা এতক্ষণ বৃহদায়তন উৎপাদনব্যবস্থার সুবিধার কথা আলোচনা করিয়াছি। বর্তমানে সর্বত্রই খুব বড় আয়তনের কারখানা বসান হইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ছোট কারখানার সংখ্যাও কোন দেশেই কম নয়। ইংলণ্ডের মত শিল্পোন্নত দেশেও দেখা গিয়াছে যে ১৯৩৫ সালে মোট [illegible]৭'৪ হাজার কারখানার মধ্যে ২৩৫'৯ হাজার কারখানা ৫০ জনের কম শ্রমিক নিয়োগ করে। অর্থাৎ ইহারা ছোট কারখানার পর্যায়ে পড়ে। আমাদের দেশে ছোট

কারখানার সংখ্যা আরো বেশি। National Income Committeeর রিপোর্টে দেখা যায় যে এদেশে জাতীয় আয়ের শতকরা ১২ ভাগ বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান হইতে ও ৬১·৩ ভাগ ছোট কারখানা বা কুটিরশিল্প হইতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ সব দেশে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে।

ইহার কারণ কি? বড় আয়তনের কারখানায় যদি বহু সুবিধা পাওয়া যায় তবে ছোট কারখানাগুলি কি করিয়া টিঁকিয়া আছে? প্রথম কারণ বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার সীমা আছে। ইহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সুবিধা (Advantages of small-scale production): ইহা ছাড়াও ছোট কারবারীর নিজস্ব এমন কতকগুলি সুবিধা আছে যেজন্য ইহা টিঁকিয়া থাকে। মানুষ নিজের জন্য যে পরিশ্রম করে, পরের জন্য সেরূপ করে না। ছোট কারবারী নিজে সব বিভাগের দেখাশোনা করে বলিয়া সেখানে ফাঁকি দেওয়া কঠিন হয়। সাধারণত শ্রমিকদের সহিত তাহার পরিচয় এমনকি ঘনিষ্ঠতা থাকে এবং সে তাহাদের প্রিয়পাত্র হইতেও পারে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিবার সম্ভাবনা কম। ফলে তাহার পক্ষে দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব হয়। যেখানে ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুযায়ী জিনিস তৈয়ারি করিতে হয় এবং দ্রুত রুচি পরিবর্তিত হইতে পারে সেখানে কারবার ছোট থাকিলেও সুবিধা বেশি। ছোট কারবারীরা সুন্দর সৌখীন জিনিস যত্ন করিয়া তৈয়ারি করিতে পারে। এইসব ব্যবসায়ে ছোট কারবারীর স্থান চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

বিদ্যুতের ব্যবহারের ফলে ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অনেক সুবিধা বাড়িয়াছে। এ্যারোপ্লেন, মোটর, বাস ও লরি, জাহাজ ও রেলগাড়ির তুলনায় সাইজে ছোট। জেট ইঞ্জিন আবার পিস্টন (piston) ইঞ্জিন অপেক্ষা ছোট এবং সস্তা। একজন আমেরিকান লেখক বলিয়াছেন যে আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সুবিধা বাড়িতেছে। সুতরাং যন্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধে কারখানার যে সুবিধা এতদিন ছিল, ছোট কারখানারও ক্রমশ সে সুবিধা হইতেছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অনেক সময়েই কারবার বড় করিতে গেলে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। সেইজন্য কারখানার আয়তন

ছোটই থাকিয়া যায়। কারখানা বড় করিতে গেলে বেশি মূলধনের দরকার হয়। ইহা সংগ্রহ করা সব সময়ে ও সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। কারবার বড় হইলে পরিচালনা সমস্যাও বাড়িয়া যায়। আবার কারখানা বড় করা জিনিসটির বাজারের আয়তনের উপরেও অনেকটা নির্ভর করে। এই সমস্ত বাধার জন্য সব কারখানাই বড় আয়তনের হইয়া উঠে না। ইহা ছাড়া ছোট কারখানারও নিজস্ব কিছু কিছু সুবিধা আছে। মালিক নিজের ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে ও সব দিকে কড়া নজর রাখে। সে বাজারের অবস্থা বুঝিয়া ও খরিদ্দারের পছন্দ পরখ করিয়া জিনিস তৈয়ারি করিতে পারে। আজকাল ছোট কারখানায় ব্যবহারোপযোগী ছোট ও উন্নত ধরনের যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। ইহার ফলে কারিগরি বা টেক্‌নিক্যাল দিক দিয়াও ছোট কারখানার অসুবিধা কমিতেছে। পুরাতন আমলের চরখার বদলে উন্নত ধরনের অম্বর চরখা বাহির হইয়াছে। পদচালিত তাঁতের বদলে পাওয়ারলুম বা শক্তিচালিত তাঁতের ব্যবহার বাড়িতেছে। ইহার ফলে ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানেরও উৎপাদনব্যয় অনেকটা কমিতেছে ও বড় ছোটর ব্যবধান অন্তত কিছুটা দূর হইতেছে।

ইহা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে যে বড় ও ছোট কারখানার মধ্যে যে কেবল প্রতিযোগিতাই রহিয়াছে তাহা নহে। এই দুই শ্রেণীর শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতাও নিতান্ত কম নাই। অনেক সময়েই বড় কারখানা নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে ছোট ছোট অংশগুলি নিকটবর্তী ছোট কারখানা হইতে খরিদ করিয়া নেয়। নিজেরা তৈয়ারি করিতে হইলে যে হাঙ্গামা হয় বাহিরের ছোট কারখানা হইতে জিনিসগুলি কিনিলে ইহা অপেক্ষা কম অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। মোটরের কারখানা গাড়ির ইঞ্জিন প্রভৃতি বড় বড় অংশগুলি তৈয়ারি করে ও অনেক সময়েই ছোট ছোট অংশগুলি বাহিরের ছোট কারখানার নিকট হইতে কিনিয়া লয়। এইভাবে নানাদিক হইতে ছোট ও বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা গড়িয়া উঠিতেছে এবং উভয়েই নিজেদের স্থান বাছিয়া লইতেছে। বড় বড় জিনিসগুলি লইয়া মাথা ঘামায়,—ছোট জিনিসের ভার ছোট কারখানার উপর ছাড়িয়া দেয়। এইভাবে পরস্পরের সহযোগিতায় ছোট ও বড় দুই শ্রেণীর শিল্পপ্রতিষ্ঠানই প্রসার লাভ করিতে পারে।

আমাদের দেশে অনেক লেখকই ছোট কারখানা স্থাপনের পক্ষপাতী। তাঁহাদের মতে এদেশে মূলধনের পরিমাণ কম, কিন্তু শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মূলধন লাগে কম, কিন্তু তুলনায় বেশি লোককে কাজ দেওয়া যায়। কাজেই আমাদের পক্ষে ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানই উপযোগী। বড় কারখানার অর্থ বহু লোক কারখানার আশেপাশে বাস করে ও লাভের টাকা মাত্র কয়েকজন মালিকের মুষ্টিগত হয়। কিন্তু ছোট কারখানা দেশের নানা অঞ্চলে ছড়াইয়া থাকে। আর লাভের টাকা মাত্র কয়েকজন লোকের হাতে না গিয়া বহু মালিকের মধ্যে ছড়ান থাকে। ফলে ধন বণ্টনের অসাম্য কমে। ধনীর সংখ্যা কমে। কিন্তু দরিদ্রের সংখ্যাও বাড়ে না।

এই ভাবে ছোট ও বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। প্লানিং কমিসন অবশ্য ভোগ্যবস্তুর উৎপাদনব্যবস্থায়, ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রসার সমর্থন করিয়াছে। কিন্তু কমিসনের এই মতবাদ এদেশের অর্থশাস্ত্রীদের মধ্যে অনেকেই গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। তাঁহাদের মতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও কুটির শিল্পের উৎপাদনক্ষমতা বৃহদায়তন শিল্প হইতে কম! ইহাদের প্রসারের জন্য চেষ্টা করার অর্থ এই যে এরোপ্লেনের যুগে গরুর গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি করা। উন্নত ধরনের উৎপাদন প্রণালী অবলম্বন না করিলে বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতায় আমাদের ক্রমেই পিছাইয়া যাইতে হইবে। ছোট শিল্প বনাম বড় শিল্পের গুণাগুণ লইয়া বিতর্কের এখনও শেষ হয় নাই।

সর্বোত্তম আয়তনের ফার্ম (Optimum Firm): যখন নূতন ব্যবসায়ী কোন শিল্পের কারখানা খোলে তখন সে হয়ত ছোট কারখানা লইয়া জিনিস তৈয়ারি শুরু করে। প্রথম প্রথম হয়ত তাহার মূলধন কম ও অভিজ্ঞতাও কম। তাহার যদি ব্যবসায়ে দক্ষতা বেশি থাকে তবে সে ক্রমে বেশ লাভ করিবে, ও বাজারে সুনাম কিনিবে। আরো বেশি মূলধন সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায়কে বড় করিয়া তুলিবে। প্রথম দিক উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে তাহার উৎপাদনব্যয় কমিবে ও ফলে লাভের সম্ভাবনা বাড়িবে। এইভাবে কারবারের আয়তন বাড়াইতে বাড়াইতে সে এমন অবস্থায় পৌঁছিবে যে তাহার উৎপাদন ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম পড়িতেছে। কারবারের

আয়তন ইহা অপেক্ষা বড় হইলে উৎপাদনব্যয় না কমিয়া বাড়িতে থাকিবে। কারণ তখন বৃহদায়তন উৎপাদনের নানা অসুবিধা দেখা দিবে। তাহার নিজেরও পরিচালনক্ষমতার একটি সীমা আছে। ইহা অপেক্ষা বড় কারবার ঠিকমত চালান তাহার ক্ষমতায় কুলায় না। এই সব কারণে কারবার আরও বড় করিলে উৎপাদনব্যয় বাড়িতে থাকিবে। কারবার যে আয়তনের হইলে উৎপাদনব্যয় সর্বনিম্ন হয় ইহাকে সেই শিল্পের সর্বোত্তম আয়তনের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান (Optimum firm) বলে। এই পর্যন্ত আয়তনের কারবারে লাভও সর্বাপেক্ষা বেশি হয়। আয়তন ইহা অপেক্ষা বড় বা ছোট হইলে উৎপাদনব্যয়, পূর্বাপেক্ষা বেশি হইবে ও ফলে লাভ কম হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন শিল্পে ভিন্ন ভিন্ন আয়তনের কারবারকে সর্বোত্তম আয়তনের ফার্ম বলা হয়। ইহা নানা অবস্থার উপর নির্ভর করে,—যেমন যান্ত্রিক সুবিধা, মালিকের দক্ষতা, মূলধন সংগ্রহের সুবিধা অসুবিধা, বাজারের আয়তন ও প্রতিযোগিতার প্রকৃতি, ব্যবসায়ের ঝুঁকির পরিমাণ প্রভৃতি। যদি কোন শিল্পে দেখা যায় যে সর্বোত্তম আয়তনের কারবার ছোট আয়তনের, তবে বুঝিতে হইবে যে কারবার বেশি বড় করিয়া তোলার পথে নানা বাধা আছে। এই বাধাগুলি –যেমন মালিকের যোগ্যতার সীমা, মূলধন সংগ্রহের অসুবিধা, বাজারের আয়তনের ক্ষুদ্রতা, ঝুঁকি প্রভৃতি পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

Exercises

Q. 1. Indicate the advantages and disadvantages of large-scale production. (C. U. 1936, '31 ; C. U. B. Com. 1930).

Q. 2. Examine the factors that limit the growth of a business firm. "Division of labour is limited by the extent of the market." Discuss this statement and point out some other obstacles to the growth of a business unit. (C. U. 1958 ; B. Com. 1958 (c) ; Visw. 1955).

Q. 3. What are the conditions under which small-scale units of production are more economical than large-scale production ? (C. U. 1958 ; B. Com. 1954 ; Visw. 1953).

Q. 4. Why do small-scale producers still persist in many industries ? (C. U. 1940).

Q. 5. "If the optimum size of a firm is small, there are obstacles to the growth of the business units." Discuss this statement, and point out the nature of these obstacles. (Visw. 1957).

Q. 6. Explain and illustrate "external" and "internal" economies. Discuss in this connection the limits of largescale production. (C. U. 1919 ; B. Com. 1957 ; Viswa. 1954).

দশম অধ্যায়

একচেটিয়া ব্যবসায় ও যুক্ত ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান

(Monopoly and Combinations)

আজকাল অনেক শিল্পেই বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের গঠনের দিকে ব্যবসায়ীদের নজর গিয়াছে। অনেকে প্রথমে কিছু মূলধন লইয়া ছোটখাট ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে। ইহাদেব মধ্যে কোন ব্যবসায়ীর যদি যথেষ্ট যোগ্যতা থাকে ও বাজারের অবস্থা অনুকূল হয় তবে ক্রমে সে আরো মূলধন সংগ্রহ করিয়া নিজের ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানটি বৃহত্তর কবিবার চেষ্টা করে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে তাহার কারবার বড় হইয়া উঠে। আবার অনেক সময় দেখা যায় সুযোগ্য ব্যবসায়ী অন্যান্য ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ দিয়া ক্রমে নিজের প্রতিষ্ঠানটি বড় করিয়া তোলে। তাহার নিজের হয়ত সাবানের কারখানা রহিয়াছে। সে অন্য প্রতিযোগী সাবানের কারখানা কিনিয়া নিজেরটির সঙ্গে জুড়িয়া দিতে পারে। কিংবা অন্য কারখানার মালিকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া তাহাদের বুঝাইয়া সব কারখানা যুক্ত করিয়া একটি মিলিত এবং বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে। এই দুই ভাবে ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানের আয়তন ক্রমে বড় হইয়া উঠে। প্রথমে ছোট আকার হইতে সুপরিচালনার ফলে ধীরে ধীরে শশীকলার ন্যায় বাড়িয়া বিরাট আয়তন লাভ করে। কিংবা অন্য প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইবার ফলে বড় হইয়া উঠে। এই অধ্যায়ে দ্বিতীয় পন্থার কথা আলোচনা করা হইবে।

বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগঠনের মনোভাব (Motives of combination): কয়েকটি কারবার মিলিত হইয়া একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গঠন করিলে ইহাকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যুক্তকরণ বলা হয়। এই পদ্ধতিতে বৃহদায়তন কারবার গঠনের পশ্চাতে থাকে তিন প্রকারের মনোভাব। প্রথমত, বৃহদায়তন উৎপাদনের ফলে উৎপাদনব্যয় কমে ও ফলে ব্যবসায়ীর লাভ বেশি হইবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং বেশি লাভের আশায় ব্যবসায়ীরা যুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির আয়তন বড় হইলে ইহা জিনিসটির মোট যোগানের বেশি অংশ উৎপাদন

করিবে ও ফলে ইহার অন্তত কিছু পরিমাণ একচেটিয়া অধিকার জন্মায়। একচেটিয়া ব্যবসায়ী বাজারে অনেক সময়েই নিজের ইচ্ছামত দামে জিনিস বিক্রয় করিতে পারে ও সাধারণ প্রতিযোগী অপেক্ষা বেশি লাভ করিতে পারে। এই অধিক লাভের আকাঙ্ক্ষাই বৃহদায়তন ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেরণা যোগায়। অনেক সময়েই এই দুই শ্রেণীর মনোভাব একই সঙ্গে কাজ করে। অর্থাৎ ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানটির বৃহদায়তন লাভের প্রচেষ্টার পিছনে এই দুই রকমের মনোভাবই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু আবার বহু স্থানে শুধু কেবল দ্বিতীয় মনোভাবের প্রাবল্য দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে প্রথম মনোভাব-প্রসূত আয়তন-বৃদ্ধির চেষ্টা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক। কারণ ইহার ফলে উৎপাদনব্যয় কমে ও জিনিসের দামও কমিবার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় মনোভাব সব সময়ে সমাজের মঙ্গল সাধন করে না। একচেটিয়া ব্যবসায়ে জিনিসের দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনাই অধিক। যুক্তপ্রতিষ্ঠান গঠনের পিছনে আর একটি বিশেষ মনোভাব বর্তমান থাকিতে পারে। বড প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও প্রভাবপ্রতিপত্তি অনেক বেশি। এই ধরনের ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানকে সকলেই এক ডাকে চেনে। ইহা বহু লোককে কাজ দেয় ও বাজারে অনেক ক্রেডিট পায়। এইরূপ ক্ষমতা ও যশ অনেকেরই আকাঙ্ক্ষার বস্তু। ব্যবসায়ী যে শুধু কেবল লাভের আশায় বড় হইতে আরো বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে তাহা নহে। ধনাকাঙ্ক্ষা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু আবার যশাকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতাস্পৃহা দ্বারাও সে প্রভাবান্বিত হয়।

যুক্তব্যবসায়প্রতিষ্ঠান গঠনের পিছনে এই তিনটি মনোভাবই প্রধান। অবশ্য ইহাদের ছাডাও অন্য মনোভাবের বশবর্তী হইয়া শিল্পপতিরা যুক্ত-প্রতিষ্ঠান গঠন করে। যেমন, অনেক সময় শুধু কেবল আত্মরক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন কারবার নিজেদের মধ্যে মিলনের চেষ্টা করে। এই ধরনের মনোভাব বিশেষ করিয়া ব্যবসায় মন্দার সময় দেখা দেয়। বাজারের অবস্থা যখন খারাপ থাকে, তখন নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিলে হয়ত জিনিসটির দাম ক্রমেই কমিতে থাকিবে; তাহাতে লোকসান বাড়িবে। প্রতিযোগীরা মিলিত হইলে খারাপ বাজারেও ভাল দাম পাওয়া যাইতে পারে। এখানে সম্মেলনের আসল উদ্দেশ্য একচেটিয়া অধিকার লাভ নয়, নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা।

এই মনোভাবগুলির মধ্যে প্রথমটি সমাজের পক্ষে হিতকর। কারণ ইহার উদ্দেশ্য জিনিসের উৎপাদনপদ্ধতির উন্নতি করা যাহার ফলে উৎপাদনব্যয় কমিয়া যায়। উৎপাদনব্যয় কমিলে জিনিসটি বাজারে কম দামে বিক্রয় করা যাইবে ও তাহাতে সকলেরই লাভ। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, সাধারণভাবে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। একচেটিয়া কারবার গঠনের ফলে জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি, শ্রমিক শোষণ ইত্যাদি বহু অনর্থ উপস্থিত হয়। তৃতীয় মনোভাব সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। ইহার ফল ভালও হইতে পারে। আবার অনেক সময়ে মন্দও হয়। শুধু কেবল আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে যুক্ত হওয়াকে মন্দ বলা চলে না যদি ইহার মধ্যে একাধিকার ও ক্ষমতা লাভের ইচ্ছা লুকান না থাকে।

একচেটিয়া ব্যবসায় গঠনের শর্ত : কোন জিনিস বিক্রয় করার সম্পূর্ণ অধিকার যদি একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকে তবে ইহাকে একচেটিয়া ব্যবসায় বলে। কিন্তু এমন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা খুব কম দেখা যায়। প্রথমত, সেই জিনিসটির পরিবর্তে ব্যবহার করার মত অন্য কোন জিনিস পাওয়া যায় না এইরূপ খুব কমই হয়। সকল ব্যবসায়ীকেই কিছু না কিছু প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। Calcutta Electric Supply Corporationকে কলিকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিদ্যুতের পরিবর্তে গ্যাস অথবা কেরোসিন তেল অথবা কয়লা ব্যবহার করা যায়। সুতরাং কোম্পানীকে কিছুটা প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। প্রায় সব একচেটিয়া কারবারীর অবস্থা এই রকম। দামের উপর ইহাদের খানিকটা কর্তৃত্ব থাকিলেও সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব কাহারও নাই। তবে কোন কোন একচেটিয়া কারবারীর ক্ষমতা খুব বেশি। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার De Beers Company-র হীরক-বাজারের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে।

প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা অনেক এবং তাহারা প্রত্যেকে মোট উৎপাদনের অতি অল্প অংশ উৎপাদন করে। যে কোন লোক এই নূতন ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারে। যদি অন্য ব্যবসায়ের তুলনায় ঐ ব্যবসায়ে লাভের হার বাড়ে তবে বহু লোক এই ব্যবসায়ে ঢুকিবে। সুতরাং কোন বিক্রেতাই যোগান নিয়ন্ত্রণ করিয়া দাম

বাড়াইতে পারে না। কিন্তু একচেটিয়া ব্যবসায়ী যোগান কমাইয়া দাম বাড়াইতে পারে। যদি নূতন লোকের ঐ ব্যবসায় আরম্ভ করার নানা রকম বাধা থাকে তবে তাহার আরও সুবিধা হয়। সুতরাং সেই ব্যবসায়ে নূতন লোক কেন আসিতে পারে না ইহার আলোচনা করিতে হইবে। ইহার চারিটি কারণ থাকিতে পারে। প্রথমত, আইন করিয়া নূতন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করা বন্ধ থাকিতে পারে। সরকার মাত্র একটি ব্যবসায়ীকে এই জিনিস উৎপাদনের অনুমতি বা লাইসেন্স দিতে পারে। এইগুলিকে আইনসৃষ্ট একচেটিয়া কারবার বলা যায়। কলিকাতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিক্রয় করিবার অধিকার একমাত্র কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনকে দেওয়া আছে। অন্য কোন কোম্পানী কলিকাতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করিলে শাস্তি পাইবে। ঔষধের পেটেণ্ট, বইয়ের কপিরাইট ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

দ্বিতীয়ত, সরকার জনসাধারণের সুবিধার জন্য কতকগুলি ব্যবসায়ে ইচ্ছা করিয়া একচেটিয়া কারবার সৃষ্টি করে। যদি একই জায়গায় দুইটি টেলিফোন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে এক কোম্পানীর মক্কেল অন্য কোম্পানীর মক্কেলের সহিত কথা বলিতে পারিবে না। একই শহরে দুই বা ততোধিক গ্যাস বা বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান থাকিলে অযথা পোস্ট এবং লাইনের সংখ্যা বাড়িবে। সুতরাং সাধারণের সুবিধার জন্য এইসব ব্যবসায়ে একচেটিয়া কারবার অধিকার দেওয়া হয়।

তৃতীয়ত, অনেক সময় কাঁচামাল সরবরাহের উপর একচেটিয়া কারবারীর পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকায় হীরকের খনির উপর De Beers Compnny-র একচেটিয়া আধিপত্য আছে। অন্যত্র হীরকের খনি পাওয়া যায় না বলিয়া প্রতিযোগী কারবার গঠন করা সম্ভব নয়। চতুর্থত, অনেক মূলধন বিনিয়োগ করিয়া বৃহদায়তনে উৎপাদন না করিলে বহুক্ষেত্রে লাভ হয় না। সেইজন্য নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করার অসুবিধা হয়। এত টাকা বিনিয়োগের ঝুঁকি অনেকেই লইতে সাহস পায় না। অর্থশালী পুরাতন ব্যবসায়ীদের সহিত কঠিন প্রতিযোগিতার ভয়ও থাকে। লোহ ও ইস্পাত শিল্প অথবা Coats কোম্পানী পরিচালিত সূতার কারবারের এই অবস্থা। সুতরাং এক্ষেত্রে পুরাতন কোম্পানীগুলির

নূতন প্রতিযোগিতার ভয় কম থাকে। পুরাতন কোম্পানীগুলির সুনামের জন্য নূতন কোম্পানীর ব্যবসায় আরম্ভ করার অসুবিধা হয়। বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ফলে ক্রেতারা সেই জিনিসগুলি ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়, তখন তাহারা নূতন কোম্পানীর জিনিস কিনিতে নাও চাহিতে পারে। ক্রেতাদের এই ধারণা দূর করার জন্য প্রথম প্রথম বিজ্ঞাপন ও প্রচারের জন্য অনেক টাকা ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং নূতন লোক এই সমস্ত লাইনে ব্যবসায় শুরু করিতে ইতস্তত করে।

যুক্তব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ (Different types of combinations) : অন্যান্য কোম্পানীর সহিত সংযুক্ত হইয়া অথবা কারখানা বাড়াইয়া একটি কোম্পানীর আয়তন বৃদ্ধি হইতে পারে। অন্য কোম্পানীর সহিত সংযুক্ত হওয়ার নানাপ্রকার পদ্ধতি আছে। যথা,—মৌখিকচুক্তি, একত্রীকরণ (pool), কার্টেল (cartel), হোল্ডিং কোম্পানী (holding company), ট্রাস্ট (trust), মার্জার (merger) ইত্যাদি। ইহার প্রত্যেকটিকে আবার ভাগ করা যায়।

ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতা কমাইবার জন্য নিজেদের মধ্যে নানাপ্রকার চুক্তি করিতে পারে। প্রথমত, নিজেদের মধ্যে মৌখিক চুক্তি করিয়া সকল বিক্রেতাই এক দাম চাহিতে পারে, যেমন Burma Oil Co. এবং Standard Oil Co.র চুক্তি অনুসারে ভারতে পেট্রোলের দাম স্থির করা হয়। অনেক সময় আবার দাম স্থির করার জন্য সমিতি থাকে,—যেমন Shipping Conference ইংলণ্ডের মালবাহী জাহাজগুলির ভাড়া স্থির করে। অথবা উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করার জন্য চুক্তি করা হয়। ভারতীয় পাটকল সমিতি (Indian Jute Mills Association) এইরূপ একটি সমিতি। এই সমিতির নির্দেশ অনুসারে প্রয়োজনমত কিছু অংশ তাঁতের কাজ বন্ধ রাখিয়া উৎপাদন কমাইয়া মূল্যবৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়।

কেবল মূল্যনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধীয় চুক্তিতে (price-agreements) অনেক সময়েই সফল হয় না। কারণ বাজারের যাহা চাহিদা আছে ইহা অপেক্ষা বেশি জিনিস তৈয়ারি হইলে দাম কমিয়া যাইবে। এইজন্য আর একটু অগ্রসর হইয়া কেবল মূল্য নহে, উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাও করা হয়। ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানগুলি মিলিতভাবে একটি কেন্দ্রীয় সংঘ গঠন করে।

এই সংঘ চাহিদার অবস্থা বুঝিয়া মোট কত পরিমাণ জিনিস বিক্রয় করা সম্ভব হইবে ইহার হিসাব করে। পরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ইহাঁর কত অংশ বা quota উৎপাদন করিবে তাহা ঠিক করিয়া দেয়। যদি কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান নিজের নির্দিষ্ট অংশের বেশি উৎপাদন করে তবে ইহাকে জরিমানা স্বরূপ কিছু টাকা সংঘের নিকট জমা দিতে হয়। আবার অন্য প্রতিষ্ঠান যদি নির্দিষ্ট অংশের কম উৎপাদন করে তবে ইহাকে জরিমানা হইতে জমান টাকার এক অংশ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার নাম পুল (Pool)। কেন্দ্রীয় সংঘ বিভিন্ন কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করে না।

যখন কেন্দ্রীয় সংঘটি শুধু কেবল কোন কোম্পানী কত অংশ উৎপাদন করিবে ইহা ঠিক করে না, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের ভারও নেয় তখন সেই ধরনের যুক্ত প্রতিষ্ঠানকে কার্টেল বলা হয়। "পুল' এর চেয়ে ইহার বন্ধন আরো দৃঢ়। কার্টেল জিনিসের দাম ও বিভিন্ন কোম্পানী কত পরিমাণ উৎপাদন করিবে ইহা ঠিক করিয়া দেয়। উৎপাদনের পর জিনিসগুলি নির্দিষ্ট মূল্যে বাজারে বিক্রয়ের দায়িত্বও কার্টেলের। জার্মানিতে এই শ্রেণীর যুক্ত প্রতিষ্ঠান খুব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশে Cement Marketing Board, Indian Sugar Syndicate এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান। কার্টেল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে ও জিনিসটি বাজারে বিক্রয় করে। কিন্তু সাধারণত আর কোন ব্যাপারে কোম্পানীগুলির কার্যে বা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। যে কোম্পানীগুলি কার্টেলের সভ্য তাহারা অন্য বিষয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলে।

বিভিন্ন কোম্পানীর মধ্যে বন্ধন আরো দৃঢ় করিয়া গড়িয়া তোলার চেষ্টা হইয়াছে। ইহার ফলে ট্রাস্ট, হোল্ডিং কোম্পানী ও মার্জার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে মিলনোৎসুক বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ারের অধিকাংশ একটি ট্রাস্ট কোম্পানী কিনিয়া লয়। ফলে এই ট্রাস্ট অন্য কোম্পানীগুলি নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার পায় এবং ইহাদের একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালনা করে। কোম্পানীগুলি নামে পৃথক থাকিতে পারে। কিন্তু আসলে ইহারা যুক্ত প্রতিষ্ঠান। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানকে **"ট্রাস্ট"** নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহা আমেরিকান

শিল্পজগতে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। পরে আমেরিকান সরকার আইন করিয়া ট্রাস্ট গঠন বন্ধ করার চেষ্টা করিলে **হোল্ডিং কোম্পানী** নামে ভিন্ন ধরনের যুক্ত-প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যবস্থা হয়। ট্রাস্ট কোম্পানী গঠন না করিয়া, নূতন আর এক ধরনের কোম্পানী গঠন করা হয় এবং এই কোম্পানী অন্য কোম্পানীগুলির শেয়ারের অধিকাংশ কিনিয়া লয়। এই হোল্‌ডিং কোম্পানী অধস্তন কোম্পানীগুলির কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কোম্পানী একত্র করিয়া একটিমাত্র ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। ইহার ফলে অন্য কোম্পানীগুলি নামেও পৃথক থাকে না—ইহাদের পৃথক অস্তিত্ব লোপ পায়। ইহা পূর্ণ মিলনের অবস্থা এবং এরূপ ঘটিলে তাহাকে **মার্জার** নাম দেওয়া হয়।

ট্রাস্ট ও হোল্‌ডিং কোম্পানীতে অন্য কোম্পানীগুলি হয়ত নামে পৃথক থাকিতে পারে। কিন্তু আসলে ইহাদের কোন বিষয়েই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকে না। এইজন্য সাধারণভাবে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলিকে ট্রাস্ট বলা হয়।

আন্তর্জাতিক কার্টেল (International cartels) : আজকাল আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে ব্যবসায় সংঘ গঠন করা হয়। দেশে কত জিনিস বিক্রয় হইবে, বিদেশেই বা কত হইবে, এই সংঘ তাহা স্থির করিয়া দেয়। অনেক সময় এলাকা ভাগ করিয়া প্রতি এলাকায় কি দামে জিনিস বিক্রয় হইবে সে সম্পর্কে চুক্তি হয়। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত তাম্রের শতকরা ৯০ ভাগ একটি আন্তর্জাতিক সংঘ নিয়ন্ত্রণ করে। এই সংঘের নাম Copper Export Trading Company। ব্রাসল্‌সে ইহার কেন্দ্রীয় অফিস আছে। রেল লাইন, সিমেণ্ট ইত্যাদিও আন্তর্জাতিক সংঘ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

কার্টেল ও ট্রাস্টের তুলনা (Relative merits of cartels and trusts) : কার্টেলের চেয়ে ট্রাস্টের সংগঠন অধিকতর দৃঢ়। কার্টেলের সভ্য প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকেরই পৃথক অস্তিত্ব বজায় থাকে; কেবল বিক্রয়ের সুবিধার জন্য তাহারা সংঘবদ্ধ হয়। ইহারা কে কতটা উৎপাদন করিবে ও ইহা কি ভাবে বাজারে বিক্রয় করা হইবে ইহা কার্টেল নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু ট্রাস্ট গঠনের ফলে তাহাদের পৃথক অস্তিত্ব থাকিলেও তাহা নামমাত্র

থাকে। ট্রাস্ট একটি যুক্তপ্রতিষ্ঠান। কোন শিল্পে ট্রাস্ট, আবার কোথায় বা কার্টেল গঠন করা হয়, ইহার অনেক কারণ আছে। কারণগুলির কয়েকটি ব্যক্তিগত, কয়েকটি আইনগত এবং আর কয়েকটি অর্থনৈতিক। যে উদ্যোক্তারা সংঘ গঠন করে তাহাদের কাহারও হয়ত ট্রাস্ট, কাহারও বা কার্টেলের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকিতে পারে। আবার ট্রাস্ট অথবা কার্টেল গঠন করার আইনত সুবিধা-অসুবিধা থাকিতে পারে। তাহা ছাড়া এই দুইটি প্রথার মধ্যে কোনটি ভাল তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়।

যে সব শিল্পে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা পাওয়া সম্ভব সেখানে কার্টেলের চেয়ে ট্রাস্ট গঠনে লাভ হয়। কার্টেল প্রথায় কোন কারবারই বন্ধ করা হয় না, সবগুলিই উৎপাদন করে। সুতরাং বৃহদায়তন উৎপাদনের কোন সুবিধা পাওয়া যায় না। ট্রাস্ট প্রথায় অকেজো এবং ছোট কারখানাগুলি বন্ধ করিয়া কেবলমাত্র সুদক্ষ কারখানাগুলিকে চালু রাখা হয় এবং ইহাদের আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। ইহার ফলে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, কার্টেলের চেয়ে ট্রাস্ট বেশি দিন স্থায়ী হয়। বিশেষ অবস্থায় স্বার্থসিদ্ধি করার উদ্দেশ্যে বা হয়ত মন্দাবাজারে প্রতিযোগিতা এড়াইবার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কার্টেল বা বিক্রয়সংঘ গঠন করে। অবস্থা পরিবর্তিত হইলে অর্থাৎ বাজারের অবস্থা ভাল হইলে পরস্পরের স্বার্থে বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে। অনেক ব্যবসায়ী মনে করিতে পারে যে ঐ বাজারে আমি ইচ্ছামত বেশি জিনিস বিক্রয় করিতে পারিব। ইহার ফলে কার্টেল ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। কিন্তু একবার ট্রাস্ট গঠিত হইলে কারবারগুলির পৃথক সত্তা থাকে না। সুতরাং ইহা ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা কম। তৃতীয়ত, কার্টেল অপেক্ষা ট্রাস্ট সহজে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। ট্রাস্ট বৃহৎ প্রতিষ্ঠান; কার্টেল অপেক্ষা বাজারে ইহা সুপরিচিত। সুতরাং ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ধারের কারবারী ইহাকে কম সুদে টাকা ধার দেয়।

কিন্তু ট্রাস্টের এমন কতকগুলি অসুবিধা আছে, যেগুলি কার্টেলে দেখা যায় না। প্রথমত, একটি শিল্পের সাধারণত সব কয়টি প্রতিষ্ঠানই কার্টেলের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে; সুতরাং এখানে একচেটিয়া লাভের সুযোগ ট্রাস্ট অপেক্ষা কার্টেলের বেশি। কদাচিৎ সব প্রতিষ্ঠান ট্রাস্টের

অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বিতীয়ত, শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির পৃথক অস্তিত্ব থাকার ফলে অনেক সময় সংগঠন দৃঢ় হয়। সমস্ত সংগঠনগুলির স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকে এবং অবস্থা-অনুসারে পরিবর্তন করা যায়। সেই তুলনায় প্রয়োজন-মত ট্রাস্টের পরিবর্তন করা কঠিন। তৃতীয়ত, কার্টেল অপেক্ষা ট্রাস্ট ব্যয়বহুল। ট্রাস্ট গঠন করার সময় অত্যধিক দাম দিয়া প্রতিযোগীদের ব্যবসায় কিনিয়া লইতে হয়, অথবা পুরাতন অকেজো যন্ত্রপাতি কিনিতে হয়। এই সব অকর্মণ্য কারখানা বন্ধ করিয়া দিতে হয়, কিন্তু সেটি কেনার জন্য যে টাকা লাগিয়াছে তাহার জন্য সুদ দিতে হয়। কার্টেল গঠন করার খরচ অনেক কম। কেননা শুধু বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য অকেজো যন্ত্রপাতি কেনার প্রয়োজন কার্টেলে থাকে না। অধিকতর ক্ষমতা পাওয়ার লোভে ব্যবসায়ীরা ট্রাস্টের আকার বাড়ায়। কিন্তু কিছুদিন পরে অতিবৃহৎ ব্যবসায়ের অসুবিধাগুলি দেখা দেয়।

ট্রাস্ট ও কার্টেল উভয় প্রকারের প্রতিষ্ঠানের সুবিধাও আছে, আবার অসুবিধাও আছে। সবদিক বিবেচনা করিয়া ট্রাস্ট গঠন করা হইবে, কি কার্টেল গঠন করা হইবে ব্যবসায়ীরা তাহা স্থির করে।

একত্রীকরণের পদ্ধতি (Process of amalgamation) : কয়েকটি ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানে, মূল্য বা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ কথবা একচেটিয়া কারবারের সুবিধা লাভের জন্য যে ধরনের যুক্তপ্রতিষ্ঠান গঠন করে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাদের এই যুক্তপ্রচেষ্টা, মূল্য চুক্তি হইতে মার্জার পর্যন্ত বিভিন্ন রূপ লইতে পারে। যুক্তপ্রতিষ্ঠানের প্রকৃতিও যেমন ভিন্ন হয়, সংযুক্ত হইবার পদ্ধতিও সেইরূপ ভিন্ন হইতে পারে। কখনও কখনও দেখা যায় যে একই জিনিস তৈয়ারি কিংবা বিক্রয় করে এইরূপ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান যুক্তভাবে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে। আবার দেখা যায় যে জুতার কারখানার মালিক চামড়া তৈয়ারির কারখানার সঙ্গে যুক্ত হয় বা ইহা কিনিয়া লয়, কিংবা নিজেই জুতা বিক্রয়ের জন্য বহু দোকান খোলে। এইরূপ নানাভাবে যুক্তপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। সাধারণত vertical integration বা উর্ধ্বাধঃ একত্রীকরণ ও horizontal integration বা সমশ্রেণীয় একত্রীকরণ—এই দুই পদ্ধতি অনুযায়ী যুক্তপ্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়।

ভার্টিক্যাল সংঘ (Vertical combination) : সাধারণত কোন দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানেই উৎপন্ন হয়। জুতা তৈয়ারি করিতে চামড়া, সূতা, লোহা প্রভৃতি বহু জিনিসের দরকার হয়। সাধারণ অবস্থায় চামড়া সূতা ও লোহা—সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় তৈয়ারি হয়। যে জুতা তৈয়ারি করে সে চামড়ার কারবারীর নিকট হইতে চামড়া কেনে ও সূতার মিল হইতে সূতা লয়। একটি ফার্ম একটি ধরনের জিনিস তৈয়ারির কাজে লিপ্ত থাকে। কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় জুতার কারবারী নিজে শুধু জুতা তৈয়ারি করে না, চামড়ার কারখানা খোলে বা অন্য কারখানা কিনিয়া লয়। তাহা হইলে চামড়ার জন্য তাহাকে অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয় না। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানকে—অর্থাৎ জুতা তৈয়ারি ও চামড়া তৈয়ারির মিলিত প্রতিষ্ঠানকে —ভার্টিক্যাল বা উর্দ্ধাধঃ সংঘ বলা হয়। ধর, জুতা তৈয়ারির কাজে যেন তিনটি ধাপ আছে। চামড়া তৈয়ারি—ইহার প্রথম ধাপ ;—তারপর জুতা তৈয়ারি—দ্বিতীয় ধাপ ; ও পরে জুতা বিক্রয় ব্যবস্থা ও সেইজন্য দোকান খোলা,—ইহা তৃতীয় ধাপ। সাধারণত চামড়া—চামড়ার কলে তৈয়ারি হয়। ইহা একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান। জুতার কারবারী বাজার হইতে চামড়া কিনিয়া জুতা তৈয়ারি করিয়া, কোন জুতার পাইকারী ব্যবসায়ীকে সমস্ত জুতাই বিক্রয় করিয়া দেয়। আর এই ব্যবসায়ী জুতা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। কিন্তু কোন জুতার কলের মালিক যদি নিজেই চামড়ার কল স্থাপন করে, কিংবা কোন চামড়ার মিল কিনিয়া নিজে চালাইতে আরম্ভ করে এবং পাইকারী ব্যবসায়ীকে জুতা বিক্রয় না করিয়া নিজেই বাজারে দোকান খোলে তবে এই প্রতিষ্ঠানকে ভার্টিক্যাল সংঘ বলা হইবে। বিভিন্ন ধাপের কারখানার একত্রীকরণকে এই নাম দেওয়া হয়।

টাটা কোম্পানী এই প্রকার সংঘের উদাহরণ। ইস্পাত তৈয়ারি করিতে কাঁচা লোহা, কয়লা প্রভৃতি বহু জিনিসের প্রয়োজন হয়। এইজন্য টাটা কোম্পানী নিজেই লোহার খনি, কয়লার খনি, কাঁচা লোহার কারখানা এবং ইস্পাতের কারখানা সবই খুলিয়াছে। নিয়ন্ত্রণের সুবিধা এবং বিভিন্ন কারখানার লাভ কমাইবার উদ্দেশ্যে এই সংগঠন করা হয়। ইহাতে বিজ্ঞাপন ও বিক্রয়ের খরচ কমিয়া যায় ; নিয়মিত কাঁচামাল পাওয়া যায় ;

কোন স্তরে অতি-উপাদনের ভয় থাকে না। ইহাকে শিল্পের integration বা একীকরণও বলে।

হরাইজেণ্টাল সংঘ (Horizontal combination) : একই জিনিস বিক্রয় করে এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে মিলিত হইলে তাহাকে হরাইজেণ্টাল বা সমশ্রেণীর সংঘ বলে। ভার্টিক্যাল সংঘে কয়লার খনি, লোহার খনি, কাঁচা লোহা ও ইস্পাতের কারখানা একসঙ্গে মিলিত হয়। কিন্তু একাধিক কয়লার খনি অথবা একাধিক ইস্পাতের কাবখানা একসঙ্গে মিলিত হইলে ইহাকে হরাইজেণ্টাল সংঘ বলা হয়। পরিচালনার ব্যয় কমান এবং প্রতিযোগীর সংখ্যা কমাইয়া একচেটিয়া লাভ করার উদ্দেশ্যে এইরূপ সংঘ গঠন কবা হয়। এই ধরনের সংঘ আন্তর্জাতিক অর্থাৎ পৃথিবীব্যাপী হইতে পারে। Standard Oil Company ইহার উদাহরণ।

ভার্টিক্যাল সংঘের প্রথম সুবিধা এই যে, ইহাতে অতি প্রয়োজনীয় কাঁচামালেব অভাব হওয়ার সম্ভাবনা কোন সময়েই থাকে না। কোন সময়ে কয়লার অভাব হইলে ইস্পাতের কারখানার কাজ বন্ধ হইবে। তাই নিযমিত কয়লার সরবরাহ পাওয়ার জন্য এই সংঘ কয়লা খনি নিয়ন্ত্রিত করে। অথবা বাজারে নিজের জিনিস চালু করার জন্য বিক্রয়প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারে। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের কয়েকটি ধাপ একজন নিয়ন্ত্রণ করিলে ব্যয় হ্রাস পায়। যেমন, উৎপাদনের বিভিন্ন স্তর পাশাপাশি কারখানায় সম্পন্ন হইলে নানাভাবে খরচ বাঁচে। অনেক ক্ষেত্রে জ্বালানীর খরচও কম হয়। লোহ ও ইস্পাতের কারখানায় ইহা বিশেসভাবে প্রযোজ্য। ব্লাস্ট চুল্লী, ইস্পাত চুল্লী, রোলিং মিল একই জায়গায় অবস্থিত হইলে খরচ অনেক কম হয়।

হবাইজেণ্টাল সংঘের সুবিধা এই যে ইহার দ্বারা প্রতিযোগিতার হাত হইতে বাঁচা যায়। প্রতিযোগিতা না থাকিলে একচেটিয়া মুনাফা পাওয়া যায়।

ভার্টিক্যাল সংঘ অপেক্ষা হরাইজেণ্টাল সংঘের প্রচলন বেশি। ভার্টিক্যাল সংঘের নূতন ধরনের ব্যবসায়ে হাত দিতে হয়; কিন্তু হরাইজেণ্টাল সংঘে একই ধরনের ব্যবসায় করা যায়। সুতরাং ইহা সংগঠন করা সহজ।

একচেটিয়া কারবারের গুণাগুণ (Merits and Demerits or Social Implications of Monopoly) : একচেটিয়া কারবারের মালিকের

লাভ বেশি হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজের দিক হইতে কোন লাভ হয় কি? অর্থাৎ ব্যবসায়ীর স্বার্থের কথা ছাড়িয়া দিয়া দেখা যাক—একচেটিয়া কারবার গঠনের ফলে কি কি সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে। একচেটিয়া কারবারের সমর্থকেরা বলেন যে এই ধরনের কারবার গঠনের ফলে উৎপাদন-ব্যয় কম হয়। একচেটিয়া কারবার সাধারণত বড় আয়তনের হয় ও ফলে বৃহদায়তন ও উৎপাদনব্যবস্থার সকল সুবিধা লাভ করে। একচেটিয়া কারবারী পুরাতন জীর্ণ যন্ত্র বাতিল করিয়া নূতন ও উন্নত ধরনের যন্ত্র বসাইবে। তাহার আর্থিক সামর্থ্য বেশি ও বেশি মূলধন খাটাইয়া ভাল ভাল যন্ত্র কিনিবে, সর্বোত্তম উৎপাদনব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। কাজেই তাহার উৎপাদনব্যয় অনেক কম পড়িবে এবং জিনিসের দাম কিছু কমাইয়া দিলেও তাহার লাভ বেশি ছাড়া কম হইবে না। ধর, প্রতিযোগিতার বাজারে জিনিসটির উৎপাদনব্যয় পড়ে ২৲ টাকা। এই দামে বেচিলে কারবারীর লাভ থাকে জিনিস প্রতি ২৫ ন.প। অর্থাৎ লাভ ছাড়া উৎপাদনব্যয় পড়ে ১·৭৫ হিসাবে। এই ব্যবসায় যদি একচেটিয়া কারবারীর হাতে যায় তবে সে উন্নত ধরনের উৎপাদনব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। ফলে তাহার উৎপাদনব্যয় কমিয়া ১·৬৫ করিয়া পড়ে। সে যদি বাজারে জিনিসটি ১·৯৪ দামে বিক্রয় করে তবে তাহার নিজেরও যথেষ্ট লাভ থাকিবে। আবার ক্রেতারা জিনিসটি কিছু কম দামে পাইবে। ইহাতে সকলেরই লাভ।

ইহার উত্তরে অবশ্য বলা যায় যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলেই উৎপাদন-ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম হওয়ার সম্ভাবনা। প্রতিযোগিতা না থাকিলে খুব কম ব্যবসায়ীই উৎপাদনব্যয় কমাইবার দিকে কড়া নজর রাখে। সাধারণত একচেটিয়া কারবারে সহজেই লাভ করা যায় বলিয়া ব্যয়সংকোচের দিকে তত তৎপরতা থাকে না। আর একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই যে প্রতিযোগিতার বাজারের কারবারীরা ভাল যন্ত্র বা ভাল উৎপাদনপ্রণালীর কথা জানে না কিংবা নিজের ব্যবসায়ে ব্যবহার করিবে না। বরং প্রতি-যোগিতার চাপে প্রত্যেক ব্যবসায়ীই কোন যন্ত্র ব্যবহারে উৎপাদনব্যয় সর্বাপেক্ষা কম হইবে ইহার সন্ধান করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং একচেটিয়া কারবারের উৎপাদনব্যয় প্রতিযোগিতার কারবার হইতে কম হইবে একথা জোর করিয়া বলা যায় না।

ইহা সাধারণভাবে সত্য যে একচেটিয়া কারবার হইতে প্রতিযোগিতার কারবারেই উৎপাদনব্যয় কম হয়। তবে কোন ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কারণে একচেটিয়া কারবারীর উৎপাদনব্যয় কম হইতে পারে। প্রথমত, যে ব্যবসায়ে অনেক প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান থাকে সেখানে প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে বিজ্ঞাপনের জন্য বহু অর্থব্যয় করিতে হয়। কিন্তু প্রতিযোগীরা একটি প্রতিষ্ঠানে মিলিত হইলে পরস্পরবিরোধী বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয় না ও এইজন্য বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয় কম পড়ে। অন্য সকলের জিনিস হইতে আমার জিনিস ভাল ইহা প্রতিপন্ন করাইবার জন্য ব্যবসায়ীদের অনর্থক বহু টাকা বিজ্ঞাপনে ব্যয় করিতে হয়। একচেটিয়া কারবারে এই প্রয়োজন থাকে না। ফলে এই কারবারীর মোট উৎপাদনব্যয় কম হয়।

দ্বিতীয়ত, প্রতিযোগী বহু প্রতিষ্ঠান থাকিলে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে অনেক ঝুঁকি বাড়িয়া যাইতে পারে। একচেটিয়া কারবারীর প্রতিযোগী না থাকায় তাহার ঝুঁকি কম হয়। যে সমস্ত ঝুঁকি প্রতিযোগিতার ফলে সৃষ্ট হয় ইহা তাহাকে বহন করিতে হয় না। একচেটিয়া ব্যবসায়ীকে এই ধরনের নানা অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইতে হয় না। সুতরাং সে ব্যবসায়ের উন্নতির দিকেই সমস্ত মন দিতে পারে।

তৃতীয়ত, একচেটিয়া কারবারে জিনিস পাঠাইবার ব্যয় কম হইতে পারে। সাধারণত দেখা যায় যে কলিকাতার বাজারে বহু বোম্বাই মিলের কাপড় বিক্রয় হইতেছে। আবার বাংলা মিলের কাপড়ও বোম্বাইএ বিক্রয় হয়। ফলে মিলের মালিকদের কাপড় দূরের বাজারে পাঠাইতে হইতেছে ও সেই বাবদ ব্যয় বেশি হইতেছে। কিন্তু বোম্বাই ও বাংলা মিলের মালিকেরা যদি একচেটিয়া কারবার গঠন করে তবে বোম্বাইএর সমস্ত চাহিদা বোম্বাই মিল হইতে ও কলিকাতার চাহিদা বাংলার মিল হইতে মিটাইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহাতে কাপড় আনা-নেওয়ার খরচ বাঁচে ও দাম কমে।

চতুর্থত, প্রত্যেক ব্যবসায়ীর কিছু কিছু ট্রেড সিক্রেট বা ব্যবসায় সংক্রান্ত গুপ্ত তথ্য জানা থাকে। বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে অথবা বিশেষ গবেষণা করিয়া সে হয়ত জিনিসটি তৈয়ারির একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি জানে যাহা সে অন্য প্রতিযোগীকে জানাইবে না। কিন্তু একচেটিয়া কারবারে যুক্ত প্রতিষ্ঠান-

গুলির প্রত্যেকেরই গুপ্ত তথ্য অন্যেরাও জানিতে পারে। সকলের ব্যবসায় সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ও গুপ্ত তথ্য একত্র করার ফলে বহু সুবিধা পাওয়া যায় ও এইভাবে উৎপাদনব্যয় কমিতে পারে।

কোন কোন লেখকের মতে ট্রাস্ট বা একচেটিয়া কারবারে আর একটি সুবিধা আছে। যে শিল্পে এই ধরনের বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান থাকে সেখানে দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ ও মূল্য উভয়ই কম ওঠানামা করে। ট্রাস্ট অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান এবং নিজের স্বার্থে ইহা প্রতিবৎসর মোটামুটি একই পরিমাণে জিনিস উৎপাদনের চেষ্টা করে এবং যতটা সম্ভব একই দামে বিক্রয় করিতে চায়। ইহার আর্থিক সামর্থ্য বেশি বলিয়া দুর্বৎসরে অর্থাৎ যে বৎসর বাজারে জিনিসটির চাহিদা কম থাকে--উৎপাদন না কমাইয়া একই পরিমাণ জিনিস তৈয়ারি করে ও অবিক্রিত মাল মজুত করিয়া রাখে। যে বৎসর চাহিদা বাড়ে তখন মজুত মাল বিক্রয় করে। এইজন্য চাহিদার স্থায়ী কোন পরিবর্তন না হইলে ট্রাস্ট প্রতি বৎসর একই পরিমাণ জিনিস তৈয়ারি করে, একই সংখ্যক লোককে কাজে নিযুক্ত রাখে এবং যতদূর সম্ভব দামের বেশি পরিবর্তন করে না। এবৎসর চাহিদা একটু বেশি বলিয়া অনেক লোককে কাজে লাগাইয়া অনেক জিনিস তৈয়ারি করিলাম ও বাজারের অবস্থা বুঝিয়া খুব চড়া দামে বিক্রয় করিলাম। আবার পরের বৎসর লোক ছাঁটাই করিলাম। কম জিনিস তৈয়ারি হইল ও দামও বেশ নামাইয়া দিতে হইল—এইরূপ নীতি ট্রাস্ট বা একচেটিয়া কারবারের মালিকেরা পছন্দ করে না। সেইজন্য এই ধরনের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধি হইলে শিল্পবাণিজ্যে অনেকটা স্থিরতা আসিবে ও ব্যবসায়চক্রের ওঠানামার পরিমাণ কমিবে। অবশ্য এই যুক্তির মধ্যে কতটা সত্য আছে ইহা বলা শক্ত। কেম্বিজের অধ্যাপক রবিনসন বলিয়াছেন যে এই যুক্তির স্বপক্ষে সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ট্রাস্ট যদি তেজী ও ও মন্দা সব সময়েই উৎপাদনের পরিমাণ সমান রাখে তবে মূল্যের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আবার সকল বৎসরেই মূল্য স্থির রাখিলে উৎপাদনের পরিমাণ কম বেশি হইতে বাধ্য, একটিকে ঠিক রাখিতে গেলে অন্যটির পরিবর্তন বেশি পরিমাণে হইবে। উৎপাদনের পরিমাণ ও মূল্য—উভয়েই সর্বাবস্থায় ঠিক রাখা সম্ভব নহে।

অসুবিধা : একচেটিয়া কারবারের প্রধান অসুবিধা হইতেছে যে কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া প্রায় সর্বত্রই প্রতিযোগিতার বাজারের দাম অপেক্ষা ইহার দাম বেশি হয়। বাজারে একচেটিয়া অধিকার থাকিলে দাম বাড়াইয়া লাভ বেশি করিবার ইচ্ছা খুবই স্বাভাবিক। অধিকাংশ ব্যবসায়ীর লক্ষ্য কি করিয়া লাভের পরিমাণ বাড়ান যায়। প্রতিযোগিতার বাজারে কাহারও পক্ষে দাম বাড়ান সম্ভব নহে। সুতরাং উৎপাদনব্যয় কমাইয়া লাভ বেশি করার দিকেই তাহাদের নজর দিতে হয়। কিন্তু একচেটিয়া কারবারী দাম বাড়াইতে পারে বলিয়া উৎপাদনব্যয় কমাইবার দিকে তাহাকে ততটা সচেষ্ট থাকিতে হয় না। একচেটিয়া কারবারী সাধারণত বড় লোক; ক্রেতারা অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত গরিব লোক। বেশি দামে জিনিস বিক্রয় হওয়ার অর্থ গরিব ক্রেতাদের টাকা বড়লোকের পকেটে যাইতেছে। প্রতিযোগিতার বাজারে জিনিসটির দাম হযত ২ টাকা; এক-চেটিয়া কারবারের ফলে দাম বাড়িল ২·৫০ ন.প.। ফলে প্রত্যেক ক্রেতার পকেট হইতে জিনিস প্রতি পঞ্চাশ নয়া পয়সা বড়লোক কারবারীর ঘরে যাইতেছে। সুতরাং একচেটিয়া কারবার বৃদ্ধির অর্থ, অর্থনৈতিক বণ্টন-ব্যবস্থার অসাম্য বৃদ্ধি পাওয়া। ইহা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। শুধু তাই নয়, একচেটিয়া কারবারী শ্রমিকদের শোষণ করে। প্রতিযোগিতার বাজারে অনেক মালিক থাকায় তাহারা যে মজুরী পাইত, একচেটিয়া কারবারী নিজের অবস্থার সুযোগ লইয়া শ্রমিকদের কম বেতন দেয়। মালিকের সংখ্যা কম বলিয়া শ্রমিকেরাও কম বেতন লইতে বাধ্য হয়। সুতরাং একচেটিয়া কারবার বাড়িলে ধনীর উদর স্ফীত হয় ও গরিবের দেহ কৃশতর হয়।

একচেটিয়া কারবার উৎপাদনের উপাদানও তুলনায় কম হয়। প্রতি-যোগিতার বাজারে অতিরিক্ত জিনিস একই দামে বিক্রয় করা যায়। সুতরাং প্রত্যেক উৎপাদকই যতটা সম্ভব জিনিস উৎপাদন করে। কিন্তু একচেটিয়া কারবারে অতিরিক্ত জিনিস বেচিতে হইলে দাম কমাইতে হয়। সুতরাং একচেটিয়া কারবারীর স্বার্থ থাকে যে যতটা সম্ভব কম উৎপাদন করা যাহাতে বাজার দর বজায় থাকে। ফলে একচেটিয়া কারবারে উৎপাদনের পরিমাণ প্রতিযোগিতার বাজার অপেক্ষা কম হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক।

একচেটিয়া কারবারী স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজনীতিকেও কলুষিত করে। আইনসভার সভ্যদের মধ্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া আইনসভার দ্বারা সুবিধামত আইন পাশ করায় এবং বিচারকদেরও স্বপক্ষে রায় দিতে চেষ্টা তাহারা করে।

একচেটিয়া ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ (Control of Monopoly): আমরা দেখিয়াছি যে একচেটিয়া ব্যবসায়ের উৎপাদন প্রতিযোগিতা বাজারের উৎপাদন অপেক্ষা কম এবং একচেটিয়া দাম সাধারণত প্রতিযোগিতার বাজারের দাম হইতে বেশি হয়। সুতরাং রাষ্ট্র একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ করিলে সমাজের কল্যাণ হয়। নিয়ন্ত্রণের চারিটি পদ্ধতি আছে, যথা – (১) অসদুপায় অবলম্বন করিতে না দেওয়া, (২) বিভিন্ন শিল্পের উপর কর ধার্য করিয়া অথবা শিল্পকে সাহায্য করিয়া উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা, (৩) একচেটিয়া দাম নিয়ন্ত্রণ করা এবং (৪) একচেটিয়া কারবার বিরোধী আইন পাশ করা।

(১) অসদুপায় অবলম্বন বন্ধ করা: এই পদ্ধতির প্রধান লক্ষ্য প্রতিযোগীদের ব্যবসায়ক্ষেত্র হইতে তাড়াইবার জন্য একচেটিয়া কারবারী যে সব অসদুপায় অবলম্বন করে সেইগুলি বন্ধ করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সাময়িকভাবে দাম কমাইয়া একচেটিয়া কারবারী প্রতি-যোগীদের বাজার হইতে তাড়াইতে চেষ্টা করে। আমাদের দেশে বড় জাহাজ কোম্পানীগুলি ছোট কোম্পানীগুলিকে তাড়াইবার জন্য ভাড়া কমাইয়া দিত। প্রতিযোগী নূতন কোম্পানীগুলি বিতাড়িত হইলে আবার ভাড়া বাড়ান হইত। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র আইন করিতে পারে যে একবার ভাড়া কমাইলে আর ইহা বাড়ান যাইবে না। কিন্তু এই রকম আইন পাশ করার অসুবিধা এই যে ব্যবসায় বাড়াইবার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে দাম কমান যাইবে না। কোন উপায় সৎ কি অসৎ ইহাও অনেক সময়ে বলা শক্ত।

(২) কর ও সাহায্য: একচেটিয়া ব্যবসায়ের অসুবিধা দূর করার জন্য এই উপায় কার্যকরী। যে শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়িয়াছে, রাষ্ট্র ইহার উপর কর ধার্য করিয়া যাহা প্রয়োজনমত বাড়িতেছে না তাহাকে সাহায্য করিতে পারে। এই পদ্ধতি এমনভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যেন সব শিল্পের প্রান্তিক নীট উৎপাদন (marginal net product) সমান হয়। সব প্রতিষ্ঠানই যাহাতে কাম্য আয়তনের (optimum size) হয় ইহার জন্য

রাষ্ট্রকে চেষ্টা করিতে হইবে। যে প্রতিষ্ঠানগুলির আকার ইহা অপেক্ষা বেশি, সেগুলির উপর ট্যাক্স বসাইতে হইবে এবং যেগুলির আয়তন ছোট তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য দিতে হইবে। কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রধান অসুবিধা এই যে রাষ্ট্রের পক্ষে প্রান্তিক নীট উৎপাদন এবং আদর্শ-আকার স্থির করা সম্ভব নয়।

(৩) মূল্য নিয়ন্ত্রণ: প্রতিযোগিতা বাজারের দাম অপেক্ষা একচেটিয়া দাম যাহাতে বেশি না হয় রাষ্ট্র সে চেষ্টা করিতে পারে। দুইটি উপায়ে ইহা করা যায়—(১) সর্বোচ্চ লাভের হার বাঁধিয়া দিয়া রাষ্ট্র বলিতে পারে যে, প্রকৃত লাভের হার ইহা অপেক্ষা বেশি হইলে দাম কমাইতে হইবে। এই ব্যবস্থার অসুবিধা এই যে প্রতিযোগিতা বাজারের মূল্য অথবা ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করা খুব কষ্টকর। ইহার ফলে আবার দক্ষ পরিচালকদের উৎসাহ কমিয়া যাইতে পারে। (২) রাষ্ট্র উৎপন্ন দ্রব্যের এবং উৎপাদনের উপকরণের সর্বোচ্চ দাম বাঁধিয়া দিতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতির অনেকগুলি অসুবিধা আছে। গুণ অনুসারে দাম স্থির করা, উৎপাদনপদ্ধতি এবং চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সেই দাম পুনরায় স্থির করাই কষ্টকর।

(৪) একচেটিয়া কারবার গঠন বিরোধী আইন: উপরিলিখিত পদ্ধতিগুলির অসুবিধার জন্য কয়েকটি দেশে সরকার বাধ্য হইয়া একচেটিয়া কারবার গঠন বিরোধী আইন পাশ করিয়াছে। এইরূপ কারবার গঠন করা বে-আইনী ঘোষণা করা হইয়াছে। আমেরিকায় Sherman Anti-Trust Law এবং Clayton Act-এর দ্বারা একচেটিয়া কারবার গঠন করা বন্ধ করা হইয়াছে। এখানেও অসুবিধা আছে। আইনজীবিরা আইন ফাঁকি দেওয়ার উপায় বাহির করিয়াছেন। এক ধরনের সংঘ গঠন করা বে-আইনী ঘোষণা করিলে নূতন ধরনের সংঘ গঠন করা হয়। আমেরিকায় ঠিক এই ঘটনাই ঘটিয়াছে। ইহাছাড়া এই সমস্ত আইন, সংঘ গঠন করা বন্ধ করিলেও পূর্ণ প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। একচেটিয়া সংঘ গঠন করা বন্ধ করিলেই ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িবে অথবা প্রতিযোগিতার অপূর্ণতা ঘুচিয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই।

Exercises

Q. 1. Distinguish between competition and monopoly with their respective advantages and disadvantages. What steps are taken by modern governments to deal with the evils of monopoly ? (Viswa. 1956).

Q. 2. Discuss the various motives which impel different firms to combine. Are all such motives anti-social ? (C. U. B. Com. 1954, 1953).

Q. 3. Discuss the relative merits of cartels and trusts ? (C. U. B. Com. 1953 ; Viswa. 1955).

Q. 4. Distinguish between vertical and horizontal combinations and examine their advantages and disadvantages. (C. U. B. Com. 1953, 1952 ; Viswa. 1954).

Q. 5. Account for the growing tendency towards large industrial combinations and estimate its social implications. (C. U., 1958).

ক্রেতার আচরণ ও চাহিদা

একাদশ অধ্যায়

ক্রেতার আচরণ

(Consumer Behaviour)

আমরা জিনিসপত্র উৎপাদনের অর্থনৈতিক দিক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। ফার্ম বা উৎপাদনকারীর সংগঠন-প্রণালী কিরূপ, তাহাদের আয়তন কখন ও কেন বড় বা ছোট হয় ও তাহারা যে উৎপাদনপদ্ধতি অবলম্বন করে তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি,—এই বিষয়গুলি এ পর্যন্ত আলোচনা করা হইয়াছে। দ্রব্য উৎপাদন হয় বিক্রয় ও ভোগের জন্য এবং যাহারা দ্রব্য ক্রয় করে তাহাদের ক্রেতা বা ব্যবহারক বলা হয়। যেমন ফার্ম বলিতে অতি সামান্য বাদামভাজা বিক্রেতা হইতে অতি বিরাট ইস্পাত শিল্পের মালিককে বুঝায় সেইরূপ ক্রেতা বা ব্যবহারক বলিতে এক বা বহুব্যক্তি বিশিষ্ট পরিবার কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়। ক্রেতা ভোগ বা ব্যবহারের জন্য দ্রব্য ক্রয় করে। তাহারা যে দাম দিয়া জিনিসটি কিনিতেছে সেই দাম কেন দিতেছে? এবং যে পরিমাণ জিনিস কিনিতেছে তাহাই বা কেন কিনিতেছে? এই বিষয় দু'টির আলোচনা বর্তমান ও পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে করা হইবে।

এই প্রশ্নগুলির উত্তর আমরা কয়েকটি বিষয় ধরিয়া লইয়াই আলোচনা করিব। প্রথমত, ক্রেতা কত পরিমাণ জিনিস কিনিবে ইহা তাহার আয়ের উপর নির্ভর করে এবং প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট আয় আছে। ধরা যাক, একটি পরিবারের কর্তার মাসিক আয় তিনশ টাকা এবং তিনি প্রতি মাসে কাপড় কিনিতে ২০ টাকার বেশি ব্যয় করিতে পারেন না। কাপড়ের জন্য কোন পরিবার কত টাকা ব্যয় করে ইহা পরিবারের আয়ের উপর নির্ভর করে। অধিকাংশ ক্রেতার বেলাতেই একথা খাটে। তবে কোন ক্রেতার পূর্ব-সঞ্চিত অর্থ বা সম্পত্তি থাকিতে পারে। জরুরী প্রয়োজন মনে করিলে তিনি সেই সঞ্চিত অর্থ কিংবা সম্পত্তি বিক্রয় লব্ধ অর্থ ব্যয় করিয়া কোন জিনিস (যেমন রেডিও সেট বা রেফ্রিজারেটার বা সোফা সেট, কার্পেট ইত্যাদি) কিনিতে পারেন। সাধারণভাবে এইরূপ খুব বেশি ক্ষেত্রে হয়

না বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে ক্রেতাদের ব্যয়ের পরিমাণ তাহাদের আয়ের উপর নির্ভর করে। যেহেতু আয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে, সেই হেতু মোট ব্যয়ের পরিমাণ এবং কোন দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে।

দ্বিতীয়ত, ক্রেতা যখন বাজারে কোন জিনিস কিনিতে যায় তখন সে দেখে বাজারে জিনিসটি একটি নির্দিষ্ট দরে বিক্রয় হইতেছে। তাহাকে সেই দরে জিনিসটি কিনিতে হয় এবং সে কিনুক বা না কিনুক, কিংবা বেশি বা কম কিনুক জিনিসটির দরের কোন পরিবর্তন হয় না। অবশ্য বাজারে অনেক সময়ই দরাদরির সুযোগ থাকে ও বিক্রেতা প্রথমে যে দাম বলে ইহার চেয়ে কিছু কমে সে শেষে বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু যত দরাদরিই হউক না কেন, বিক্রেতারা একটি নির্দিষ্ট দামের নিচে কিছুতেই বেচিবে না এবং কোন একজন ক্রেতার কম বেশি কেনার উপরেও এই দাম নির্ভর করে না। সুতরাং আমরা ধরিয়া লই যে কোন একজন ক্রেতাকে নির্দিষ্ট দামেই জিনিস কিনিতে হয় এবং সে একটু কম বেশি কিনিলেও দামের কোন পরিবর্তন হয় না।

তৃতীয়ত, ক্রেতা জিনিস কিনিবার সময় নিজের প্রয়োজন, লাভ লোকসান, কম বেশি দাম প্রভৃতি সব বিষয় হিসাব করিয়া তবে জিনিস কেনে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই বিচার বিবেচনা করিয়া চলাফেরা করে। ইহা সব সময়ে সত্য নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত হাতে টাকা থাকে ততক্ষণ আমরা সাধারণত অভ্যস্ত জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিয়া যাই। ইহা যে সব সময়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া করি তাহা নহে। কোন কোন সময়ে আবার প্রতিবেশীরা কিনিতেছে বলিয়া তাহাদের দেখাদেখি জিনিস কিনি— আমাদের অবস্থায় কুলায় কিনা ইহার চুলচেরা বিচার করি না। অমুক প্রতিবেশী বা আত্মীয় বসিবার ঘর সাজাইবার জন্য এত দামের সোফা সেট কিনিয়াছে। সুতরাং পরিবারের মান বাঁচাইবার জন্য আমাদেরও এই রকম সেট কিনিতে হইবে। এইরূপ চিন্তাধারার বশবর্তী হইয়াও কেহ কেহ অবিবেচনার কাজ করিয়া থাকে। তবে সাধারণত অধিকাংশ লোকেরই আয় নির্দিষ্ট ও প্রয়োজনের তুলনায় বেশি নহে বলিয়া তাহাদিগকে কেনা-বেচার সময় হিসাব করিয়া চলাফেরা করিতে হয়। কোন

রকম হিসাব না করিয়া খেয়ালখুশিমত জিনিস কিনিবার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই আছে।

সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতেছি যে ক্রেতাদের আর নির্দিষ্ট ও কোন দ্রব্য ক্রয়ে তাহারা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। বাজারে জিনিসটির যে দাম ঠিক আছে ইহা তাহাদের একজনে ক্রয়ের পরিমাণের কম বেশির উপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ কেহ যদি কম বা বেশি জিনিস কেনা ঠিক করে, ইহার ফলে জিনিসটির দাম অপরিবর্তিত থাকে। প্রত্যেক ক্রেতাই জিনিস কিনিবার সময় একটু হিসাব করিয়া চলে। এই মাসে আর একজোড়া কাপড় কিনিব, না টাকাটা দিয়া দু-একদিন সিনেমা দেখিব,—এই চিন্তা বা হিসাব অনেককেই করিতে হয়। বাজারে মাছের যে দাম হইয়াছে—তাহাতে মাছ কিনিব না ডিম কিনিয়া খাইব অথবা কতটুকু মাছ ও কতগুলি ডিম কিনিব--অধিকাংশ গৃহস্থকেই এই হিসাব করিতে হয়। এই হিসাবের ভিত্তি কি ?—কেন একটি গৃহস্থ আজ কম মাছ ও বেশি ডিম কিনিতেছে—আর অন্যলোক বেশি মাংস কিনিতেছে ? এই বিষয় লইয়া দুইটি বিভিন্ন মতবাদ আছে। প্রথমটিকে উপযোগতত্ত্ব ও দ্বিতীয়টিকে পছন্দনীতি বলা হয়। অধ্যাপক মার্সাল প্রভৃতি কয়েকজন পুরাতনপন্থী লেখক প্রথমোক্ত তত্ত্বের সমর্থক। দ্বিতীয় তত্ত্বটি অধ্যাপক হিকস্, অ্যালেন প্রভৃতি বর্তমানকালের লেখকগণ আলোচনা করিয়াছেন। আমরা পর পর অধ্যায়ে এই দুইটি মতবাদের আলোচনা করিব। তবে ইহার পূর্বে অর্থশাস্ত্র মতে বাজার কাহাকে বলে ও বিভিন্ন ধরনের বাজারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

বাজারের সংজ্ঞা (Definition of a market) : সাধারণত বাজার বলিলে যে জায়গায় বেচা-কেনা হয় ইহাকে বোঝায়। গ্রামের যে জায়গাতে প্রতি সপ্তাহে বাজার বসে, যেখানে সকলে সমবেত হয়, বেচা-কেনা করে সেই জায়গাকে আমরা সাধারণত বাজার বলি। কিন্তু অর্থনীতিতে বাজার শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। বাজার বলিতে জিনিসের বাজারকে বোঝায়, কোন জায়গাকে নহে। যেমন, গমের বাজার বা শেয়ার বাজার বলিলে যেখানে গম অথবা শেয়ার বেচা-কেনা হয় তাহাকে বোঝায়।

বিস্তৃতি এবং কাল এই দুইটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া বাজারকে

দুই ভাগে ভাগ করা হয়। প্রতিযোগিতার প্রকৃতির উপর বাজারের বিস্তৃতি নির্ভর করে। যদি সমগ্র পৃথিবীব্যাপী জিনিসটির বেচা-কেনা চলে, তবে ইহার আন্তর্জাতিক বাজার আছে বলা হয়। কিন্তু শুধু দেশের ভিতর যদি ইহার বেচা-কেনা চলে, তবে ইহার জাতীয় বাজার আছে বলা হয়। আর শুধু যদি বিশেষ কোন স্থানে বেচা-কেনা চলে, তবে ইহার বাজার স্থানীয় বলে। সুতরাং বিস্তৃতির দিক হইতে অর্থনৈতিক বাজার আন্তর্জাতিক, জাতীয় অথবা স্থানীয় এই তিন প্রকারের হইতে পারে। সোনারূপার বাজার আন্তর্জাতিক, কিন্তু অপরদিকে দুধ, তরিতরকারীর মত যে সমস্ত জিনিস সহজে নষ্ট হইয়া যায় ইহাদের বাজার স্থানীয়।

দ্বিতীয়ত, সময়ের ভিত্তিতে বাজারের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। সময় অনুযায়ী অধ্যাপক মার্শাল চার শ্রেণীর বাজারের কথা বলিয়াছেন,—অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের বাজার, অল্প সময়ের বাজার, দীর্ঘ ও অতীদীর্ঘ সময়ের বাজার। যদি সময় খুব কম হয়, যেমন একদিন, তাহা হইলে বিক্রেতারা জিনিসের যোগান বাড়াইতে পারে না, তখন প্রধানত চাহিদা অনুসারে জিনিসের দাম স্থির হয়। কাজেই অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের বাজারে জিনিসের দাম চাহিদা অনুসারে ঠিক হয়। যদি কিছু বেশি সময় ধরা হয় তবে বাজারে জিনিসের আমদানি বাড়ান বা কমান চলে ও প্রয়োজনমত উৎপাদন বাড়ান যায়। এইরূপ অবস্থায় প্রধানত যোগান অনুসারে দাম স্থির হয়।

বিস্তৃত বাজারের শর্ত (Conditions for a wide market): বাজার বিস্তৃত হওয়ার ফলে শিল্প-বিপ্লব সম্ভব হইয়াছে। শিল্প-বিপ্লবের ফলে আবার এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়াছে যাহার ফলে বাজার আরও বিস্তৃত হইয়াছে ; যেমন রেলপথ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদি সমস্ত সভ্য জগৎকে একটি বাজারে পরিণত করিয়াছে। কি কি কারণ বর্তমান থাকিলে একটি জিনিসের বাজার বহু বিস্তৃত হয়, আবার আর একটির বাজার ছোট বা স্থানীয় হয় ? কারণগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইতেছে।

(১) প্রথম কারণ চাহিদার প্রকৃতি। চাহিদা যত বেশি ও বিস্তৃত হইবে জিনিসটির বাজারও তত বড় হইবে। সোনারূপার চাহিদাও সর্বত্র। কাজেই ইহার বাজারও পৃথিবীব্যাপী।

(২) জিনিসটি যদি এমন ধরনের হয় যে ইহাকে সহজে কম খরচে বহু দূরে লওয়া বা পাঠান যায়, তবে ইহার বাজার বড় হইতে পারে। সোনা ও রূপার মূল্য অনেক এবং দূর দেশে সহজেই পাঠান যায়। তাই ইহাদের বাজার বিস্তৃত। কিন্তু ইটের দাম কম, কিন্তু সেই তুলনায় পাঠাইবার ভাড়া অত্যন্ত বেশি, তাই স্থানীয় বাজারে বিক্রয় হয়। তাজা তরিতরকারী বেশিদিন থাকে না। সুতরাং ইহা খুব বেশি দূরে চালান দেওয়া যায় না। সুতরাং ইহাদের চাহিদা সর্বত্র থাকা সত্ত্বেও বাজার সংকীর্ণ।

(৩) নমুনা পাঠাইবার সুবিধা: দূরস্থিত ক্রেতাদের যদি ঠিক ঠিক নমুনা পাঠান যায়, তবে তাহারা নমুনা দেখিয়া নির্ভয়ে জিনিস কিনিতে পারে। এইরূপ সম্ভব হইলে বাজার বিস্তৃত হয়। নমুনা পাঠান সম্ভব না হইলে ক্রেতার উপস্থিতি প্রয়োজন হয়। তাহা হইলে সে জিনিসের বাজার সংকীর্ণ হয়।

(৪) শ্রেণীবিভাগের (Grading) সুবিধা: যদি নির্ভরযোগ্য কোন কর্তৃপক্ষ জিনিসগুলির শ্রেণীবিভাগ করিয়া দেয়, তাহা হইলে ক্রেতা নির্ভয়ে জিনিস বা ইহার নমুনা না দেখিয়াও কিনিতে পারে। সুতরাং বিস্তৃত এলাকায় এইরূপ জিনিসের বেচা-কেনা হইতে পারে। ভারতবর্ষে Coal Grading Board কয়লাকে প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করে। বিভিন্ন দেশের খরিদ্দার নমুনা দেখিয়াও প্রথম শ্রেণীর কয়লার অর্ডার দিতে পারে।

এই সমস্ত গুণগুলি থাকিলে বাজার বিস্তৃত হয়। স্বর্ণ, রৌপ্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কোম্পানীর শেয়ার ইত্যাদির বাজার পৃথিবী-ব্যাপী। কারণ সর্বত্রই ইহাদের চাহিদা আছে এবং সহজে নষ্ট হয় না, বহনযোগ্য ও সুপরিচিত। তুলা, গম, লোহা, তামা ইত্যাদির বাজারও আন্তর্জাতিক। কেননা এগুলি অতি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, ইহাদের শ্রেণীবিভাগ করা যায় এবং এগুলি নমুনা দ্বারা বিক্রয় করা যায়। যদিও পরিমাণের তুলনায় মূল্য কম, তবু এইগুলি বহনযোগ্য। সুতরাং সারা পৃথিবীতেই ইহাদের বেচা-কেনা হয়।

অপরপক্ষে তাজা তরিতরকারী, দুধ ইত্যাদির বাজার সংকীর্ণ। সর্বত্রই তাহাদের চাহিদা আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এইগুলি অত্যন্ত ভারী এবং

সহজে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং ইহাদের বহুদূর লইয়া যাওয়া সম্ভব নয়। নমুনা দেওয়া অথবা শ্রেণীবিভাগ করাও কষ্টকর। ফলে এই শ্রেণীর জিনিস স্থানীয় বাজারে বিক্রয় হয়।

বাজার এবং প্রতিযোগিতার প্রকৃতি (Markets and the nature of competition) : কি ধরনের প্রতিযোগিতা আছে সেই ভিত্তিতেও অনেক সময় বাজারের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। ক্লাসিক্যাল অর্থশাস্ত্রীরা মনে করিতেন যে বাজারে প্রায় সব সময়েই পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে। কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতার স্বরূপ কি, ইহা তাঁহারা বিশ্লেষণ করেন নাই। বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিতে হইলে সেখানে বহু ক্রেতা ও বহু বিক্রেতা থাকা চাই এবং কোন একটি ক্রেতা অথবা বিক্রেতা বাজারের দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অর্থাৎ সে যদি বাজারে বেচা-কেনা বন্ধ করে কিংবা কিছু বেশি বা কম বিক্রয় করে তবে ইহার ফলে জিনিসটির দামের কোন পরিবর্তন হইবে না। প্রত্যেক বিক্রেতা বাজারের দামেই জিনিস বিক্রয় করে, কিন্তু তাহার বিক্রয়ের ফলে দাম পড়ে না। মনে কর, কোন বাজারে ১০০০ এক হাজার বিক্রেতা আছে এবং প্রত্যেক ২০টি করিয়া জিনিস বিক্রয় করে। বাজারে মোট ২০,০০০ বিশ হাজার জিনিস বিক্রয় হয়। কোন একটি বিক্রেতা বিক্রয়ের পরিমাণ শতকরা পাঁচ ভাগ বাড়াইলেও মোট বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ মাত্র ১টি বাড়িবে। ২০,০০০ হাজারের স্থলে ২০,০০১ জিনিস বিক্রয় হইবে। যেমন কুড়ি হাজার জিনিস বিক্রয় হইতেছে সেখানে আর একটি জিনিস বিক্রয় করিতে গেলে দাম কমিবে না।

দ্বিতীয়ত, প্রতিযোগিতার বাজারে একই জিনিস বেচা-কেনা হওয়া চাই। ক্রেতারা যেন মনে করে যে একজন বিক্রেতা যে জিনিস বিক্রয় করিতেছে অপরেও ঠিক সেই একই জিনিস বিক্রয় করিতেছে। দুইটি বিক্রেতার জিনিসের মধ্যে কোন গুণগত প্রভেদ থাকিবে না। তবেই পূর্ণ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকে।

তৃতীয়ত, কে কি দামে বিক্রয় করিতেছে ও কিনিতেছে ইহা ক্রেতারা জানে এবং তাহারা সর্বাপেক্ষা কম দামে জিনিস কিনিতে চেষ্টা করে।

এই রকম বাজারে এক সময়ে একটি জিনিসের দুইটি দাম থাকিতে পারে

না। তর্কের খাতিরে ধর, একই জিনিস ভিন্ন ভিন্ন দামে বিক্রয় হইতেছে এবং ক্রেতারা সকলে ইহা জানে। সুতরাং যে বিক্রেতা সর্বাপেক্ষা কম দামে বিক্রয় করিতেছে সকলেই তাহার নিকট কিনিতে যাইবে। যদি তাহার গুদামে অনেক মাল থাকে, তবে অন্য বিক্রেতারাও দাম কমাইতে বাধ্য হইবে। অপরপক্ষে যদি তাহার মজুদ মাল কম থাকে, তবে ক্রেতাদের প্রতিযোগিতার ফলে দাম বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি জিনিসের এক দাম বহাল থাকিবে।

ক্ল্যাসিক্যাল লেখকেরা অনেকেই মনে করিতেন যে সব বাজারেই পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে। কিন্তু তাঁহাদের মত ঠিক নয়। বরং পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার খুব কম পাওয়া যায়। গম, তুলা এবং ধাতু প্রভৃতি দুই একটি জিনিসের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিতেও পারে। এই জিনিসগুলির নির্দিষ্ট গুণ আছে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতারা অভিজ্ঞ লোক। কিন্তু অধিকাংশ বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা নাই। সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাস্তব গুরুত্ব খুবই কম। কিন্তু তত্ত্বের দিক হইতে ইহার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। পূর্ণ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকিলে উৎপাদনের উপকরণগুলির সর্বাপেক্ষা লাভজনকভাবে সদ্ব্যবহার করা হয়। সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দাম কিভাবে স্থির হয় সেকথা আমরা প্রথমে আলোচনা করিব।

কেহ কেহ বলেন যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা (Perfect competition) ও শুদ্ধ প্রতিযোগিতার (Pure competition) মধ্যে প্রভেদ করার প্রয়োজন আছে। তাঁহাদের মতে যেখানে কোন বিক্রেতারই একটুও একচেটিয়া ক্ষমতা নাই এই অবস্থাকে শুদ্ধ প্রতিযোগিতা বলে। এরূপ বাজারে অনেক ক্রেতা ও বিক্রেতার সমাবেশ হয়। সুতরাং কোন বিশেষ ক্রেতা বা বিক্রেতা বাজার দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সব বিক্রেতাই একই জিনিস বিক্রয় করে। এই দুইটি শর্তের সহিত আরও দুইটি শর্ত যোগ করিলে পূর্ণ প্রতিযোগিতা হয়। প্রথমত, সেই শিল্পে নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করার পথে কোন বাধা নাই। অর্থাৎ লাভের আশা দেখিলে যে কোন নূতন লোক এই শিল্পের ব্যবসায় শুরু করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, সব উৎপাদকই উপকরণগুলি একই দামে কিনিতে পারে।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় বাজার (Markets and Imperfect competition): সাধারণত বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা খুব কম থাকে। জিনিসের গুণাগুণ সম্বন্ধে সাধারণ ক্রেতার বিশেষ জ্ঞান থাকে না। অন্যেরা কি দামে কেনা-বেচা করিতেছে এবিষয়ে সে, সব সময়ে ঠিক খবর রাখে না। এইরূপ প্রতিযোগিতাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা বলে।

কোথাও কি দামে জিনিস বিক্রয় হইতেছে তাহা যদি ক্রেতা না জানে, তবে তাহা অপূর্ণ-প্রতিযোগিতার বাজার* বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার নানাপ্রকার কারণ আছে যথা,—অজ্ঞতা ও অলসতা, যাতায়াতের খরচ ইত্যাদি। সত্য হউক অথবা মিথ্যা হউক যদি ক্রেতারা মনে করে ভিন্ন ভিন্ন বিক্রেতারা যে সব জিনিস বিক্রয় করিতেছে ইহাদের মধ্যে গুণের পার্থক্য আছে, তবে প্রতিযোগিতা অপূর্ণ হইবে। অথবা যদি অল্পসংখ্যক বিক্রেতা থাকে এবং তাহারা প্রত্যেক বিক্রীত দ্রব্যের মোট অংশ বিক্রয় করে, তাহা হইলে প্রতিযোগিতা অপূর্ণ হইবে। অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতাদের নিকট ভিন্ন ভিন্ন দামে বিক্রয় করিতে পারে

Exercises

Q. 1. Define the term market. What are the chief conditions which a commodity must satisfy to have a wide market ? (C. U. 1920 ; B. Com. 1923).

Q. 2. When does competition in the market become perfect ? When, and why does it become imperfect ? (C. U. B. Com. 1955).

* ইহার বিস্তৃত আলোচনার জন্য বিংশ অধ্যায় দেখ।

দ্বাদশ অধ্যায়

উপযোগতত্ত্ব

(The Utility Theory)

উপযোগ (Utility) ঃ পুরাপন্থী বা ক্ল্যাসিক্যাল লেখকদের মত ছিল যে জিনিসের উপযোগ আছে বলিয়াই ক্রেতারা ইহা কিনিতে চায়। কোন ক্রেতা একটি জিনিসের জন্য কত দাম দিতে রাজী আছে এবং কি পরিমাণ জিনিস সে কিনিবে ইহা জিনিসটির উপযোগ ও দামের উপর নির্ভর করে। উপযোগ বলিতে আমরা কি বুঝি? অভাব মিটাইবার ক্ষমতাকে উপযোগ বলা হয়।

একটি জিনিসের উপযোগ আছে এই কথা বলিলে আমরা বুঝি যে ইহার দ্বারা আমাদের অভাব মিটিতে পারে। সুতরাং ইহার চাহিদা আছে। উপযোগের সহিত প্রয়োজনীয়তার কোন সম্বন্ধ নাই। কারণ বহু অপ্রয়োজনীয় জিনিসেরও চাহিদা আছে। কোন জিনিসের চাহিদা থাকিলেই তাহার উপযোগ আছে বুঝিতে হইবে।

উপযোগ সোজাসুজি মাপা যায় না। খাদ্যে কত ক্যালরী আছে তাহা যেমন মাপা যায়, উপযোগ সেইভাবে মাপা যায় না। কিন্তু একটি জিনিসের উপযোগের সহিত অন্য একটি জিনিসের উপযোগ অথবা টাকার তুলনা করিতে পারি। যদি দেখি যে একটি লোক দুই আনা দিয়া সিগারেট খাইবে, কি চা খাইবে, কি বাস ভাড়া দিয়া বন্ধুর নিকট যাইবে এই কথা চিন্তা করিতেছে, তাহা হইলে সাধারণ রীতি অনুযায়ী আমরা বলিতে পারি যে ঐ সব জিনিস হইতে সে একই পরিমাণ উপযোগ পাইবে মনে করিতেছে।

অবশেষে মনে রাখা প্রয়োজন যে ক্ল্যাসিক্যাল লেখকেরা উপযোগ কথাটি নীতি-বাচক অর্থে ব্যবহার করিতেন না। পাওয়ার ইচ্ছা, ভাল কি মন্দ সে বিচারের দায়িত্ব অর্থশাস্ত্রীর নয়। পাওয়ার ইচ্ছা আছে কি না তাহাই তাঁহার একমাত্র বিচার্য বিষয়।

হ্রাসমান উপযোগের নিয়ম (Law of diminishing utility) : আকাঙ্ক্ষিত জিনিস একটিও না থাকিলে ইহার চাহিদা বেশি হয়। কিন্তু ইহা কিছু কিছু পরিমাণ বা সংখ্যায় পাইবার পর আরও পাইবার আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা কমিতে থাকে। এই সাধারণ ঘটনার উপরেই হ্রাসমান উপযোগের নিয়মটি গঠিত হইয়াছে। এই নিয়ম বলে যে জিনিসের উপযোগ সেই জিনিস আমাদের কতখানি আছে ইহার উপর নির্ভর করে, এবং যত বেশি জিনিস পাই ততই ইহার উপযোগ কমিতে থাকে।

কোন জিনিসের জন্য, লোকে যে দাম দিতে রাজী আছে তাহা হইতে পরোক্ষভাবে জিনিসটির উপযোগ মাপা যায়। ধর, একজন লোক এক জোড়া জুতার জন্য ১৬৲ টাকা দিতে রাজী আছে। অর্থাৎ জুতা জোড়াটি হইতে সে ১৬৲ টাকার পরিমাণ উপযোগ পাইবার আশা করে। দ্বিতীয় জোড়া হইতে কম উপযোগ পাইবে, সুতরাং সে কম টাকা দিবে। ধর, সে দ্বিতীয় জোড়ার জন্য ১৪৲ টাকা দিতে চাহিতেছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় জোড়া হইতে সে ১৪৲ টাকা পরিমাণ উপযোগ পাইবে। একই কারণে সে তৃতীয় জোড়ার জন্য ১০৲ টাকা দিবে। অর্থাৎ সে তৃতীয় জোড়া হইতে ১০৲ টাকা পরিমাণ উপযোগ পাইবে। এইভাবে লোকটি যত জুতা কিনিবে ক্রমশ ততই জুতার জন্য কম দাম দিতে চাহিবে। অবশেষে এমন এক সময় আসিবে যখন সে আর জুতা কিনিবে না। সে শেষ যে জুতা-জোড়াটি কিনিতেছে, ইহাকে প্রান্তিক সংখ্যা বলে এবং প্রান্তিক সংখ্যা হইতে যে উপযোগ পাওয়া যায়, ইহাকে প্রান্তিক উপযোগ (marginal utility) বলে। ধর, সে মাত্র তিন জোড়া জুতা কিনিল। তাহা হইলে জুতার প্রান্তিক উপযোগ ১০৲ টাকা। আমরা হ্রাসমান উপযোগের নিয়ম এই ভাবেও বলিতে পারে :—

কোন লোকের নিকট একটি জিনিসের পরিমাণ যত বাড়ে জিনিসটির প্রান্তিক উপযোগও ততই কমিয়া যায়।
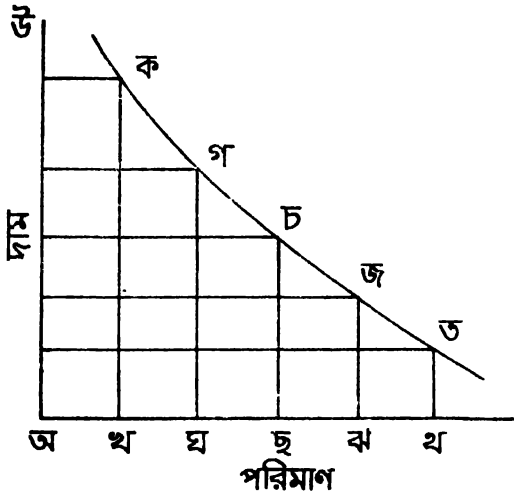
২নং চিত্র

এই রেখা-চিত্র দ্বারা নিয়মটি ব্যাখ্যা করা যায়। **অই** অক্ষরটিতে আমরা জিনিসের সংখ্যা মাপিতেছি এবং **অউ** অক্ষে লোকে যে দাম দিতে প্রস্তুত ইহা মাপিতেছি। **অঘ** জোড়ার জন্য ক্রেতা **কঘ** দাম দিবে এবং **খঘ** জোড়ার জন্য **গঘ** দাম দিবে কেন না **খঘ** জোড়ার উপযোগ **অঘ** জোড়ার উপযোগের চেয়ে কম। **ঘছ** জোড়ার জন্য লোকটি **চছ** এবং **ছঝ** জোড়ার জন্য **জঝ** দাম দিবে। যত বেশি জোড়া জুতা সে কিনিবে ততই সে কম দাম দিবে। **কগচজত** বিন্দুগুলি যোগ করিলে যে বক্ররেখা পাওয়া যাইবে ইহার দ্বারা হ্রাসমান উপযোগের নিয়মটি বোঝা যাইবে—এই রেখা দক্ষিণে নিম্নগামী।

নিয়মটির ব্যতিক্রম (Limitations of the law): এই নিয়মটি বলিবার সময় আমরা ধরিয়া লই যে, যে লোক সম্বন্ধে কথা হইতেছে ইতিমধ্যে তাহার স্বভাব অথবা রুচির কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। সুতরাং ভাল গান যত শোনা যায়, গান শোনার ইচ্ছা তত বাড়িতে পারে। যত মদ খাওয়া হয়, মদ্যপানের ইচ্ছা তত বাড়িতে পারে। এগুলি কি হ্রাসমান উপযোগের নিয়মের যথার্থ ব্যতিক্রম নয়? কারণ ইতিমধ্যে লোকটির স্বভাব ও রুচি পরিবর্তিত হইয়াছে। কোন সময়ে লোকের রুচি ও স্বভাব স্থির থাকিলে তবেই উপযোগ হ্রাসের নিয়ম বহাল থাকে।

দ্বিতীয় জিনিসটি উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার হওয়া চাই। পরিমাণ যদি অতি ক্ষুদ্র হয় তবে প্রথম প্রথম উপযোগ না কমিয়া বাড়িতে পারে। অল্পদিনের ছুটিতে কেহ হয়ত পূর্ণ বিশ্রাম পাইল না, সে যদি দ্বিগুণ ছুটি পায় তবে হয়ত দ্বিগুণের চেয়ে বেশি বিশ্রাম পাইতে পারে। ছোট গ্লাসে জল দিলে তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। সেখানে দ্বিতীয় গ্লাস জলের উপযোগ কম না হইয়া বেশি হইতে পারে। এইগুলি যথার্থ ব্যতিক্রম নহে। ঠিকমত পরিমাণে জিনিস লইলে সাধারণত উপযোগ কমে।

এমন কতকগুলি জিনিস আছে যাহাদেব প্রান্তিক উপযোগ সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে কমে না। দুর্লভ বস্তু অথবা স্ট্যাম্প সংগ্রাহক যত দুর্লভ বস্তু অথবা স্ট্যাম্প পাইবে ততই সে পাইতে চাহিবে। কিন্তু Vinerএর মতে সম্পূর্ণ সেটকে (set) একটি ইউনিট ধরিলে ইহা প্রকৃত ব্যতিক্রম নহে। যেমন, যদি একই ধরনের দুইটি মুক্তা থাকে তবে দুইটিকে এক ইউনিট ধরিতে হইবে। এই ইউনিটের সহিত অতিরিক্ত মুক্তা যোগ করিলে মুক্তার উপযোগ হ্রাস পাইবে।

সাধারণত কোন ব্যক্তির নিকট একটি জিনিসের প্রান্তিক উপযোগ তাহার নিকট সেই জিনিসটি কত পরিমাণ আছে ইহার উপব নির্ভর করে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য লোকের নিকট ইহা কতটা আছে ইহার উপরেও জিনিসটির প্রান্তিক উপযোগ নির্ভর করে। টেলিফোনের ব্যবহাব যত বাড়ে আমার নিকট টেলিফোনের উপযোগও তত বাড়ে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, জিনিসটির ব্যবহার বা প্রচার একই থাকিলে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার নিকট তাহার উপযোগ কমিয়া যাইবে। যেমন টেলিফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা স্থির থাকিলে আমি প্রথম টেলিফোন হইতে যে উপযোগ পাইব আর একটি টেলিফোন হইতে ইহার অনেক কম উপযোগ পাইব।

এই সমস্ত ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও নিয়মটিকে সর্বত্র প্রযোজ্য বলা যায়। চাহিদার ভিত্তি হিসাবে এই নিয়ম গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন চাহিদা-রেখা নিম্নগামী হয় তাহা ইহার দ্বারা বোঝা যায়।

মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ (Total utility and marginal utility): কোন জিনিসের সব কয়টি সংখ্যা বা পরিমাণ

হইতে যে উপযোগ পাওয়া যায় ইহাকে জিনিসটির মোট উপযোগ বলে। সবগুলি জিনিস হারাইলে যে মোট উপযোগ হারাই ইহাকে মোট উপযোগ বলে। সে আর একটি জিনিস যদি ক্রয় করে এবং তাহা হইতে যে উপযোগ পায় ইহাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে। জুতার কথাই ধরা যাক। একজন লোক দুইজোড়া জুতা কিনিল। জুতার মোট উপযোগ ১৬৲+১৪=৩০৲ টাকা। সে যদি আর একজোড়া জুতা কেনে তবে জুতার মোট উপযোগ ৪০৲ টাকা হয়। এক্ষেত্রে প্রান্তিক অথবা শেষ জুতা জোড়ার উপযোগ ১০৲ টাকা। জিনিসের দাম মোট উপযোগের সমান নয়, প্রান্তিক উপযোগের সমান। যতক্ষণ না প্রান্তিক উপযোগ দামের সমান হয় ততক্ষণ লোকে জিনিসটি কেনে। কোন জিনিসের, ধর, চায়ের মোট উপযোগ কত সেকথা কেহ জানিতে চায় না, সে হিসাব কেহ করেও না। কিন্তু প্রান্তিক উপযোগের ধারণা আমরা দৈনন্দিন সকল কার্যেই প্রয়োগ করি। ক্রেতা কিনিতে কিনিতে কোথায় থামিবে ইহাই তাহার সমস্যা। কোথাও না কোথাও তাহাকে কেনা শেষ করিতে হইবে। সেই শেষ রেখা টানিতে গেলেই একটি বেশি কিনিবে কি কম কিনিবে এ সমস্যার সমাধান তাহাকে করিতে হয়। শেষে সে এক জায়গায় আসিয়া থামে—ইহাই ক্রয়ের প্রান্তসীমা। মনে রাখিতে হইবে যে, প্রান্তিক উপযোগ শেষ ইউনিটের উপযোগ নয। একটি বেশি অথবা কম ইউনিটের উপযোগকেই প্রান্তিক উপযোগ বলে। কারণ ইউনিটগুলির আকারগত কোন প্রভেদ নাই।

প্রান্তিক উপযোগের গুরুত্ব (Importance of the margin): জিনিসের দাম ইহার প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়। ক্রেতা জিনিসটি যত কিনিতে থাকিবে, তাহার নিকট ইহার উপযোগ ততই কমিতে থাকে। যখন প্রান্তিক উপযোগ দামের সঙ্গে সমান হয়, সে তখন আর বেশি জিনিস কিনিবে না। সুতরাং মূল্যতত্ত্বে প্রান্তিক উপযোগের গুরুত্ব আছে।

প্রান্তিক উপযোগ মূল্য নির্ধারণ করে এ কথা অনেক সময়ে বলা হয়। কিন্তু ইহা সত্য নহে। প্রান্তিক উপযোগের দ্বারা মূল্য নির্ধারিত হয় না, বরঞ্চ প্রান্তিক উপযোগ ও মূল্য উভয়ই মোট চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। চাহিদা-রেখা যে বিন্দুতে যোগান-রেখা ছেদ করে সেখানে মূল্য ও প্রান্তিক উপযোগ দুইই স্থির হয়। "প্রান্তিক উপযোগ মূল্য স্থির

করে না, পরন্তু তাহাও মূল্য যোগান ও চাহিদার ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়।”

প্রান্তিক ইউনিটের দ্বারা দাম স্থির হয় না ইহা অবশ্য সত্য। কিন্তু প্রান্তিক ইউনিট কিংবা যে কোন ইউনিট না থাকিলে দাম অন্য রকম হইত। একথা অন্য যে কোন ইউনিট সম্বন্ধে খাটে, কেননা ইউনিটগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। প্রান্তিক ইউনিটের উপযোগ বা ব্যয় মূল্য স্থির করে না। মোট চাহিদা ও মোট যোগানের দ্বারা মূল্য স্থির হয়। বরঞ্চ প্রান্তিক ইউনিটের অবস্থান মোট চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। মনে কর, যে একটি নৌকা ৯জন লোক বহন করিতে পারে এবং তাহাতে ৯ জন যাত্রীই আছে। ধর, আর একজন লোক তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল এবং ফলে নৌকাটি ডুবিয়া গেল। একথা বলিলে ভুল হইবে যে কেবলমাত্র দশম ব্যক্তির ওজনের ফলেই নৌকাটি ডুবিয়া গেল। আসলে পূর্বের নয় জনের ওজনের সহিত দশম ব্যক্তির ওজন যোগ হওয়াতে নৌকাটি ডুবিয়াছে। তেমনি প্রান্তিক ইউনিটের উপযোগ দ্বারা দাম স্থির হয় না। পরন্তু অন্য ইউনিটগুলির উপযোগ এবং প্রান্তিক ইউনিটের উপযোগ দাম স্থির করে। মোট চাহিদা ও মোট যোগান প্রান্তিক ইউনিট ও মূল্য দুই-ই স্থির করে। অবশ্য এ কথার দ্বারা ইহা প্রমাণ হয় না যে, মূল্যের উপর প্রান্তিক ইউনিটের কিছুমাত্র প্রভাব নাই। অন্যান্য ইউনিটের মত প্রান্তিক ইউনিটও মোট যোগানের একাংশ। সুতরাং মূল্যের উপর ইহার কিছু প্রভাব নিশ্চয়ই আছে। প্রান্তিক ক্রেতা অথবা বিক্রেতা না থাকিলে মূল্য অন্য রকম হইত, কারণ সেক্ষেত্রে মোট চাহিদা অথবা যোগান ভিন্ন পরিমাণ হইত।

প্রান্তিক বিশ্লেষণের গুরুত্ব এই যে প্রান্তেই চাহিদা ও যোগান শক্তির পরিবর্তন ভালভাবে পরীক্ষা করা যায়। যে ঘটনা দ্বারা মূল্য পরিবর্তিত হয় ইহার ক্রিয়া প্রান্তেই ভাল বোঝা যায়। কৃষিজাত পণ্যের দাম কমিলে প্রান্তিক জমিতে, অর্থাৎ যে জমিতে দাম ও উৎপাদনব্যয় সমান, সেখানে প্রথমে চাষ বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং আমরা সব সময়ে প্রান্তিক ইউনিটের কথা আলোচনা করি।

ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্ব (The doctrine of consumer's surplus): হ্রাসমান উপযোগ তত্ত্ব হইতে ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্ব জানা যায়। কোন

জিনিসের যে দাম আমরা দিই তাহা উহার প্রান্তিক উপযোগের সমান—মোট উপযোগের নহে। কেবলমাত্র প্রান্তিক ইউনিটের উপযোগ দামের সমান হয়। কিন্তু যে ইউনিট সে কিনিয়াছে তাহা হইতে সে উদ্বৃত্ত উপযোগ পায়। কারণ ঐ ইউনিটগুলির জন্য সে আরও বেশি দাম দিতে প্রস্তুত ছিল। ক্রেতা যে মোট উপযোগ বা তৃপ্তি পায় এবং দাম দিতে গিয়া যে ক্ষতি স্বীকার করে ইহার পার্থক্যকে ভোগদ্বৃত্ত বলে। ইহা উদ্বৃত্ত তৃপ্তি। যে জিনিসগুলি পাওয়া যায় ইহাদের উপযোগ এবং বিনিময়ে যে জিনিসগুলি দিতে হয় ইহাদের উপযোগের পার্থক্য এই উদ্বৃত্তের সমান।

বিষয়টি ভাল করিয়া বোঝার জন্য পূর্বের জুতার উদাহরণটি দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম জুতা জোড়া হইতে লোকটি ১৮৲ টাকার সমান উপযোগ বোধ করে। দ্বিতীয়টি হইতে ১৬৲ টাকা উপযোগ পাইবে আশা করে। তৃতীয়টি হইতে ১০৲ টাকা অতিরিক্ত উপযোগ আশা করে। ধর, সে মাত্র তিন জোড়া জুতা কিনিল। প্রতিযোগিতার বাজারে একাধিক দাম থাকিতে পারে না। সুতরাং সব জোড়াগুলির জন্য সে প্রান্তিক জোড়ার যে দাম অর্থাৎ ১০৲ টাকা দিবে। সে তিন জোড়ার জন্য মোট (১০×৩) অর্থাৎ ৩০৲ টাকা দিবে। কিন্তু তিন জোড়া জুতা হইতে সে ২০+১৬+১০=৪৬৲ টাকার সমান উপযোগ পাইতেছে। সুতরাং সে ৪৬৲−৩০৲=১৬৲ টাকার সমান উদ্বৃত্ত তৃপ্তি পাইতেছে। অতএব ভোক্তার উদ্বৃত্ত=মোট উপযোগ (দাম×ক্রীত জিনিসের সংখ্যা)।

৩নং চিত্রে ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ দেখান হইয়াছে। এই চিত্রে OYর উপর দাম অথবা উপযোগ এবং OXএর উপর পরিমাণ বা সংখ্যা মাপা হইয়াছে। OA পরিমাণের জন্য একজন লোক AA′ মূল্য দিতে প্রস্তুত অর্থাৎ সে অন্তত OAA′P′ পরিমাণ তৃপ্তি পাওয়ার আশা করে। অন্যথা সে AA′ দাম দিবে না। ABর জন্য সে BB′ দাম দিবে। অর্থাৎ AB হইতে সে ABB′A′ পরিমাণ তৃপ্তি পাওয়ার আশা করে। BCর জন্য CC′ দাম দিতে প্রস্তুত, অর্থাৎ BCC′B′ পরিমাণ তৃপ্তি পাওয়ার আশা করে। ধর, সে OA, AB এবং BC, এই তিনটি জিনিস CC′ দামে কিনিল। এই তিনটির জন্য সে মোট (OCC′P অর্থাৎ OC′×CC′) পরিমাণ টাকা খরচ

করিল। সুতরাং সে OA, AB, এবং BC হইতে P'C'A'P' পরিমাণ উদ্বৃত্ত তৃপ্তি পাইল।
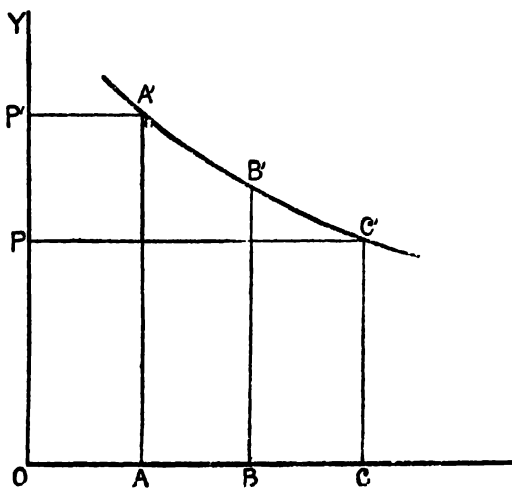
৩ নং চিত্র

Marshall-এর মতে উদ্বৃত্ত তৃপ্তির পরিমাণ আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। আধুনিক উন্নত সমাজে অনেক জিনিস সস্তায় তৈয়ারি হয় এবং কম দামে বিক্রয় হয়; কিন্তু সেইগুলি হইতে অনেক বেশি তৃপ্তি পাই, কিন্তু অনুন্নত সমাজে উদ্বৃত্ত তৃপ্তি খুব বেশি নাও হইতে পারে।

ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বের অসুবিধা (Difficulties of measuring consumer's surplus): একটি জিনিস হইতে কত ভোগোদ্বৃত্ত পাওয়া যাইতে পারে ইহা নির্ণয়ের কয়েকটি সুবিধা আছে। প্রথমত, খরচ বেশি অথবা কম হইলেও টাকার প্রান্তিক উপযোগ সমান থাকে, অথবা অতি অল্প পরিমাণ কমে এইরূপ একটি অনুমান আমাদের করিয়া নিতে হইবে। কোন জিনিস কেনার খরচ মোট আয়ের অতি সামান্য অংশ হইলে এই কথা বলা চলে। কিন্তু কোন জিনিসের জন্য আয়ের একটা মোটা অংশ ব্যয় করিতে হইলে টাকার প্রান্তিক উপযোগের পরিবর্তন হইবে এবং ফলে ভোগোদ্বৃত্তের হিসাবে ভুল হইবে।

সেইজন্য এই তত্ত্ব সর্বত্র প্রযোজ্য নহে। এই সমালোচনার উত্তরে অধ্যাপক Marshall বলিয়াছেন যে, অন্যান্য অর্থনৈতিক আলোচনাস্তে

এই অসুবিধা দেখা যায়। সুতরাং ইহা শুধু উদ্বৃত্ত তত্ত্বের বিশেষ ত্রুটি ইহা মনে করার কোন কারণ নাই।

J. R. Hicks এই অসুবিধা দূর করিবার একটি উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। জিনিসের দাম কমিলে লোকের সেই পরিমাণ আয় বাড়িয়াছে—এ কথা বলা যায়। Hicks-এর মতে উদ্বৃত্ত তৃপ্তি এই বর্ধিত আয়ের মত। ধর, একজন লোক ২৫ নয়া পয়সা জোড়া দরে ৪ জোড়া কমলা লেবু কিনিল। লেবুর দাম কমিয়া যদি ১৯ নয়া পয়সা হয়, তবে তাহার ২৪ নয়া পয়সা লাভ হয়, এই ২৪ নয়া পয়সা দিয়া সে অন্য জিনিস কিনিতে পারে। সম্ভবত কমলা লেবুর দাম কমার ফলে সে লেবুই বেশি কিনিবে এবং অন্য জিনিস কম কিনিবে। যাই হোক আমরা বলিতে পারি যে, লেবুর দাম কমার ফলে তাহার উদ্বৃত্ত তৃপ্তি ২৪ নয়া পয়সার কম হইবে না।

বাজার দর হইতে উদ্বৃত্ত তৃপ্তির পরিমাণ হিসাবের আর একটি অসুবিধা আছে। কারণ বাজারে ধনীদরিদ্র সব রকমের লোক আছে। ১৲ টাকা খরচ করিতে ধনীর যা কষ্ট হয়, দরিদ্রের তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট হয়। শুধু তাহাই নহে, আয় সমান হইলেও লোকদের রুচির ভেদ থাকিবে। একটি জিনিস একজনের কাছে খুব প্রিয়, সুতরাং সে ইহার জন্য অন্যের চেয়ে বেশি দাম দিতে রাজী আছে, অথবা অন্য লোকের সমান দাম দিয়াও সে ইহা হইতে বেশি তৃপ্তি পাইতে পারে। ইহার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বাজারে একই দাম দিয়া জিনিস কিনিতেছে বলিয়া যে তাহারা একই পরিমাণ তৃপ্তি লাভ করিতেছে ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং বাজারে কোন একটি জিনিস হইতে মোট কতটুকু উদ্বৃত্ত তৃপ্তি পাওয়া যাইতেছে ইহা নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু এই সব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও উদ্বৃত্ত তৃপ্তি মাপা যায়। কারণ, বাজারে ধনীদরিদ্র সকল শ্রেণীর বহু লোক থাকে, তাহাদের গড়পড়তা হিসাবে এইরূপ ব্যক্তিগত রুচি ও ধনের পার্থক্য চাপা পড়িয়া যায়।

আর একটি অসুবিধা এই যে চাহিদা-রেখার প্রথম অংশটি সম্পূর্ণ আনুমানিক। জিনিসটি একেবারে না পাওয়া গেলে কত দাম আমরা দিতে রাজী আছি ইহা বলা খুব শক্ত। কারণ এইরূপ অবস্থায় আমাদের খুব কম

সময়ে পড়িতে হয়। যদি বাজারে মাত্র একজোড়া জুতা থাকে, তবে ইহার জন্য একজন লোক কত দাম দিতে রাজী আছে তাহা কেবল অনুমান করা যায়, সঠিক বলা যায় না। প্রচলিত দামের কাছাকাছি না হইলে চাহিদা মূল্য সঠিক বলা শক্ত।• যেমন, কমলা লেবুর দাম ২৫ নয়া পয়সার স্থলে যদি ১৯ নয়া পয়সা হয় তবে আমরা কতটা বেশি লেবু কিনিব ইহা বলা শক্ত নয়। কিন্তু বাজারে মাত্র একজোড়া লেবু আছে এবং ইহার জন্য আমরা কত দাম দিতে রাজি আছি—ইহা সব সময়ে বলা যায় না। ইহা একটি বড় অসুবিধা সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধারণত প্রচলিত দামের চেয়ে দাম একটু বাড়িলে বা কমিলে মোট তৃপ্তি কি পরিমাণে কমে বা বাড়ে তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। দাম অল্প বাড়িলে বা কমিলে ভোগবৃত্তের উপর কি প্রতিক্রিয়া হয় আমরা ইহাই জানিতে চাই। চাহিদা-মূল্যের তালিকা যতই ভ্রমাত্মক হউক না কেন তাহা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট।

উদ্বৃত্ত তৃপ্তি তত্ত্বের কোন প্রয়োজন আছে কিনা সেবিষয়ে অধ্যাপক Nicholson সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। "১০০ পাউণ্ড বাৎসরিক আয়ের উপযোগ ১০০০ পাউণ্ডের সমান একথা বলিয়া লাভ কি?" তাঁহার মতে এই তত্ত্বটি অর্থহীন। একথা কিন্তু ঠিক নয়। অর্থনৈতিক অবস্থা হইতে কি পরিমাণে সুবিধা আমরা পাই তাহা এই তত্ত্বের দ্বারা সহজে বোঝা যায়। বর্তমান অবস্থার সহিত অতীতের অথবা এদেশের অবস্থার সহিত অন্য দেশের অবস্থা তুলনা করা যায়। Marshall বলিয়াছেন লণ্ডন ও মধ্যআফ্রিকার অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা এই তত্ত্বের দ্বারা সহজে বোঝা যায়। অনেক কিছু সুবিধা লণ্ডনে পাওয়া যায়, যাহা মধ্যআফ্রিকায় পাওয়া যায় না। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে একজন লোক ১০০ পাউণ্ডে যে সমস্ত জিনিসও সুবিধা দরে পাইবে ইহা মধ্য-আফ্রিকায় অন্তত এক হাজার পাউণ্ড খরচ করিলে হয়ত মিলিতে পারে। অর্থাৎ লণ্ডনে ১০০ পাউণ্ডের ভোগোদ্বৃত্ত মধ্য-আফ্রিকার হাজার পাউণ্ডের ভোগোদ্বৃত্তের সমান হইতে পারে। মনে রাখিতে হইবে যে সাধারণত আয়ের মোট উপযোগ আমরা জানিতে চাই না। অল্প পরিমাণ দাম পরিবর্তিত হইলে ইহা কি পরিমাণ পরিবর্তিত হয় তাহাই আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়। এইজন্য এই তত্ত্বের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

উদ্বৃত্ত তৃপ্তি সঠিক ভাবে মাপা না গেলেও তত্ত্বটি অমূলক নয়। ইহা অনুমানমূলকও নয়, অসত্যও নয়। যদিও জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি অথবা বিলাসদ্রব্য হইতে উদ্বৃত্ত তৃপ্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়, কিন্তু জীবনের সত্যকারের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি হইতে যে উদ্বৃত্ত তৃপ্তি পাওয়া যায় সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তত্ত্বটির প্রয়োজনীয়তা (Theoretical and practical utility of the doctrine): এই তত্ত্ব হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, দাম তৃপ্তি বা উপযোগের সূচনা করে না। লবণ ইত্যাদি সাধারণ ব্যবহার্য জিনিসগুলির ব্যবহারমূল্য ও বিনিময়-মূল্যের পার্থক্য আছে এবং এই তত্ত্বের সাহায্যে পার্থক্যের পরিমাণ মাপিতে পারি। দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্বের সাহায্যে এক দেশের আয় অর্থাৎ একজন লোক যে পরিমাণ উপযোগ পায় তাহা অন্য দেশের লোকের আয়ের সহিত তুলনা করা যায়। অথবা বর্তমান আয়ের সহিত অতীতের আয়ের তুলনা করা যায়। তৃতীয়ত, ইহা একচেটিয়া ব্যবসায়ীর কাজে লাগে। সে এমন উচ্চ দাম ধার্য করিতে পারে যে, ক্রেতারা কোন উদ্বৃত্ত তৃপ্তি পাইবে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রতিবাদ অথবা সরকারী হস্তক্ষেপের ভয় আছে। সুতরাং একচেটিয়া ব্যবসায় রক্ষার জন্য সে দাম কমাইয়া ক্রেতাদের উদ্বৃত্ত তৃপ্তি দেওয়া ভাল মনে করিতে পারে। জনসাধারণের সুবিধা অথবা ভবিষ্যৎ ব্যবসায়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সে দাম কমাইতে উদ্বুদ্ধ হইবে। দাম কমাইলে ক্রেতারা জিনিসটি বেশি পরিমাণে ব্যবহার করিবে এবং চাহিদা বাড়িবে। চতুর্থত, Marshall বলিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধাকে উদ্বৃত্ত ভোগ বলা যায়। পঞ্চমত, কর সম্পর্কিত আলোচনায় এই তত্ত্বটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। লবণ অথবা চিনির উপর মণ করা কয়েক আনা ট্যাক্স বসাইলে উদ্বৃত্ত তৃপ্তি কি পরিমাণ কমিবে তাহা এই তত্ত্বের সাহায্যে অর্থসচিব মহাশয় সহজে জানিতে পারেন। যদি জিনিসটি বর্তমান উৎপাদনের নিয়ম অনুসারে উৎপাদিত হয় তবে যত ট্যাক্স বাড়িয়াছে ইহার চেয়ে দাম বেশি বাড়িবে; আর যদি হ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম অনুসারে তৈয়ারি হয় তবে যত ট্যাক্স বাড়িয়াছে ইহার চেয়ে দাম কম বাড়িবে। সুতরাং প্রথম ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্ষেত্রের চেয়ে উদ্বৃত্ত তৃপ্তির ক্ষতি বেশি হইবে। আপাতদৃষ্টিতে অন্যান্য

বিষয় সমান হইলে দ্বিতীয় প্রকারের ট্যাক্স প্রথম প্রকার ট্যাক্সের চেয়ে ভাল। সরকারী সাহায্যের বেলায় ঠিক বিপরীত। সুতরাং অনেক জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার সহিত এই তত্ত্ব জড়িত এবং ইহার দ্বারা অনেক সত্য আবিষ্কার করা যায়।

Exercises

Q. 1. Why does a consumer buy only a definite amount of a commodity at a given market price and neither more nor less ? (C. U. 1950).

Q. 2. Explain what is meant by *consumer's surplus.* Show how it is related to individual demand price and to market price. (C. U. 1954, '51, '48 ; B. Com. 1953).

Indicate its importance in theory and practice. (C. U. 1958).

Examine critically the doctrine of consumer's surplus. Show that a consumer closes his purchases of a commodity as soon as his consumer's surplus reaches maximum. (C. U. 1945 ; B. Com. 1953).

Q. 3. Explain the relation between total utility and marginal utility.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নিরপেক্ষরেখা পদ্ধতি

(Indifference Curve Technique)

পূর্বের অধ্যায়ে মূল্যনির্ণয়নীতি সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে ইহা উপযোগতত্ত্বের ভিত্তিতে লেখা হইয়াছে। এই তত্ত্বে বলে যে কোন একটি জিনিসের বিভিন্ন ইউনিটের উপযোগ আমরা মাপিতে পারি। অধ্যাপক Hicks প্রমুখ অনেক লেখক মনে করেন যে কোন জিনিসের বিভিন্ন ইউনিটের উপযোগ আলাদা করিয়া মাপা যায় না। আমরা ক-এর বিভিন্ন ইউনিট হইতে কতটুকু উপযোগ পাই ইহা সব সময়ে ঠিব মত মাপা সম্ভব হয় না। বরং আমরা বলিতে পারি যে ক-এর এক ইউনিট খ-এর এক ইউনিটের মধ্যে কোনটিকে আমরা বেশি পছন্দ করি। এই পছন্দের কথা বলিতে গেলে ক ও খ-এর ইউনিটের উপযোগ আলাদা করিয়া মাপিবার প্রয়োজন হয় না। মা দুই ছেলের মধ্যে কোনটিকে বেশি ভালবাসে ইহা বলা খুব শক্ত নয়। কিন্তু কোনটিকে ঠিক কতটুকু ভালবাসে ইহা নির্ণয় করিবার কোন মাপকাঠি নাই। ইহা না মাপিয়াও বলা চলে যে মা যদু মধু দুই ভাইএর মধ্যে মধুকে একটু বেশি ভালবাসেন। এইজন্য অধ্যাপক হিক্‌স উপযোগ-তত্ত্ব সমর্থন করেন না। তিনি যে তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন তাহাকে নিরপেক্ষ-রেখাতত্ত্ব বলে। আমরা এই তত্ত্বের আলোচনা করিতেছি।

নিরপেক্ষ-রেখাতত্ত্ব (Indifference curve analysis): এই তত্ত্বের গোড়ার কথা হইতেছে যে আমরা সকলেই কোন একটি জিনিসের বিভিন্ন ইউনিটের উপযোগ পৃথকভাবে না মাপিতে পারিলেও ইহা বলিতে পারি যে আমরা বর্তমান অবস্থায় একজোড়া ধুতি ও একটি সার্টের মধ্যে কোনটি পাইলে বেশি খুশি হইব। এই ভাবে বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে তুলনামূলক পছন্দের তালিকা (Scale of preferences) তৈয়ারি করা খুব শক্ত নহে। এই পছন্দের তালিকা আরো বিশ্লেষণ করিলে বলা যায় যে বিভিন্ন পরিমাণের ধুতি ও সার্টের যুক্ত বাণ্ডিলের মধ্যে কোনটিকে আমরা বেশি পছন্দ করি; এবং কি পরিমাণ ধুতি ও সার্টের যুক্ত বাণ্ডিল আমরা

সমান পছন্দ করি, অর্থাৎ উহাদের জন্য আমাদের সমান স্পৃহা আছে। যেমন ধর, একটি বাণ্ডিলে ছয় জোড়া ধুতি ও দুইটি সার্ট আছে। অন্যটিতে পাঁচ জোড়া ধুতি ও চারটি সার্ট আছে। এই দুইটি বাণ্ডিল আমরা সমান পছন্দ করি। অর্থাৎ এই দুইটির প্রতিই আমাদের সমান স্পৃহা আছে। এইভাবে ধুতি ও সার্টের বাণ্ডিল আমরা এমন ভাবে তৈয়ারি করিতে পারি যাহা পাইবার বা কিনিবার স্পৃহা আমাদের নিকট সমান।

ধুতি ও সার্টের তালিকা

(ক) ছয় জোড়া ধুতি ও দুইটি সার্ট

(খ) পাঁচ জোড়া ধুতি ও চারটি সার্ট

(গ) চার জোড়া ধুতি ও সাতটি সার্ট

(ঘ) তিন জোড়া ধুতি ও এগারটি সার্ট।

এই তালিকার (ক), (খ), (গ), (ঘ), প্রত্যেকটি বাণ্ডিলই ক্রেতা পছন্দ করে এবং ইহার মধ্যে কোনটি সে কিনিবে এ বিষয়ে সে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

এই ধরনের তালিকা নিম্নলিখিত রেখাচিত্রে প্রকাশ করা যায়। এই রেখাচিত্রে ধুতির সংখ্যা OX অক্ষ ও সার্টের সংখ্যা OY অক্ষে মাপা হইতেছে।

৪নং রেখাচিত্র
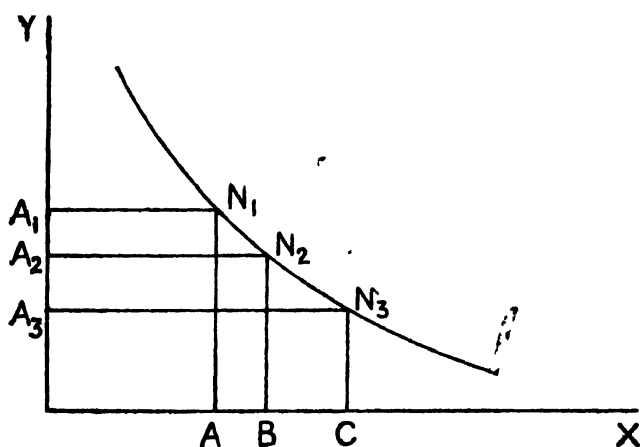
এই রেখাচিত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে রাম AN_1 সংখ্যক সার্ট ও A_1N_1 জোড়া ধুতি, BN_2 সংখ্যক সার্ট ও A_2N_2 জোড়া ধুতি, CN_3 সংখ্যক সার্ট ও A_3N_3 জোড়া ধুতিকে সমান পছন্দ করে। ইহার যে কোন একটিকে পাইলেই সে সন্তুষ্ট থাকিবে এবং এই ধরনের বিভিন্ন বাণ্ডিলের মধ্যে কোনটি তাহাকে দেওয়া হইবে বা কোনটি সে কিনিবে এ বিষয়ে সে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। কারণ ইহার প্রত্যেকটি বাণ্ডিলের প্রতি তাঁহার সমান স্পৃহা।

নিরপেক্ষরেখার প্রকৃতি (Properties of an Indifference curve): নিরপেক্ষরেখা মাত্রই দক্ষিণে নিম্নগামী নয়। কারণ বাণ্ডিলে যখন একটি জিনিসের পরিমাণ বাড়ান হয় তখন অন্যটি কমাইতে হইবে। তাহা না হইলে বাণ্ডিল দুইটি পাইবার বা কিনিবার আকাঙ্খা সমান থাকিবে না। রাম ৬ জোড়া ধুতি ও ২টি সার্টওয়ালা বাণ্ডিল এবং ৫ জোড়া ধুতি ও ৪টি সার্টওয়ালা বাণ্ডিল সমান পছন্দ করিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া ৬ জোড়া ধুতি ও ৪টি সার্টওয়ালা বাণ্ডিল এবং ৬ জোড়া ধুতি ও ২টি সার্টওয়ালা বাণ্ডিল সমান পছন্দ করিবে না। প্রথম বাণ্ডিল নিশ্চয়ই দ্বিতীয়টি অপেক্ষা বেশি পছন্দ করিবে। সমান পছন্দসই বাণ্ডিলগুলির মধ্যে যে বাণ্ডিলে ৬ জোড়ার স্থলে ৫ জোড়া ধুতি আছে, অর্থাৎ একটি ধুতি কম আছে,—সেখানে তাহাকে আরো দুইটি বেশি সার্ট দিতে হইবে। আবার বাণ্ডিলে ৫ জোড়ার বদলে ৪ জোড়া ধুতি দিলে অর্থাৎ একটি ধুতি কম হইলে হয়ত তাহাকে আরো দুইটি সার্ট দিলে চলিবে না—তিনটি সার্ট দিতে হইবে। ইহার পরও যদি বাণ্ডিলে আর এক জোড়া ধুতি কম রাখা হয় তবে ৩টি সার্ট দিলেও ক্ষতিপূরণ হইবে না, অন্তত ৪টি সার্ট রাখিতে হইবে।

কেন ধুতির পরিমাণ কমিলে ক্রমেই বেশি সংখ্যক সার্ট দিতে হইবে? ইহার কারণ ধুতির পরিমাণ যতই কমে ততই ধুতির জন্য স্পৃহা বাড়ে এবং ইহার বিনিময়ে ক্রমেই বেশি সার্ট দিতে হইবে। এদিকে আবার স্টকে সার্টের সংখ্যা যতই বাড়িতেছে ততই আরো সার্ট পাইবার বা কিনিবার স্পৃহা কমিতেছে। যে জিনিস বেশি পাওয়া যায় ইহা পাওয়ার আকাঙ্খা ততই কমে। আবার যে জিনিসের স্টক কমিতে থাকে তাহার মূল্যও তত বাড়ে। যখন আমাদের নিকট ৬ জোড়া ধুতি ও ২টি সার্ট আছে তখন যদি কেহ বলে যে এক জোড়া ধুতির বদলে আমি ২টি সার্ট দিতে রাজী আছি

তখন আমরা হয়ত এই বিনিময়ে সম্মত হইব। কারণ প্রয়োজনের তুলনায় ধুতির স্টক যতটা আছে সার্টের স্টক ততটা নাই। বিনিময়ের পর আমাদের নিকট রহিল ৫ জোড়া ধুতি ও ৪টি সার্ট। ধুতির স্টক কমিয়াছে, কিন্তু সার্টের স্টক বাড়িয়াছে। এরপর যদি কেহ আবার সেই পুরাতন হারে ধুতি ও সার্টের বিনিময় করিতে চায় আমরা হয়ত রাজী হইব না। কারণ এখন ৪টি সার্ট আছে, কিন্তু ধুতি আছে মাত্র ৫ জোড়া। তবে এ অবস্থাতেও কেহ যদি এক জোড়া ধুতির বদলে ৩টি সার্ট দিতে চাহে তবে আমরা হয়ত বিনিময়ে রাজী হইতে পারি। স্টকে মাত্র ৪ জোড়া ধুতি থাকিলে হয়ত একটু অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু আবার ৭টি সার্ট থাকার সুবিধাও কম নয়। এই সুবিধা অসুবিধার হিসাব করিয়া দেখা গেল যে বাণ্ডিলও আমরা কিছুমাত্র কম পছন্দ করি না। এক জোড়া ধুতির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কয়টি সার্ট দিতে হইবে, ইহাকে ধুতি ও সার্টের প্রান্তিক বিনিময়হার (marginal rate of substitution) বলে। স্টকে ধুতির পরিমা। কমিলে ও সার্টের সংখ্যা বাড়িলে ধুতি ও সার্টের প্রান্তিক বিনিময়হার ক্রমশই বাড়িয়া যাইবে। ইহাকে হ্রাসমান প্রান্তিক বিনিময় হারের নিয়ম (Law of diminishing marginal substituability) বলা হয়।

নিরপেক্ষরেখা চিত্রের দিকে লক্ষ্য করিলে আর একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ইহার আকার মূলবিন্দুর (origin) দিকে উত্তল (convex)। অর্থাৎ মূলবিন্দুতে দাঁড়াইলে মনে হইবে যে রেখাটি কূর্মপৃষ্ঠবৎ বৃত্তাকারে উপর হইতে নীচে নামিয়া গিয়াছে। এই বৃত্তাকারের কারণ কি? একটি বাণ্ডিলে দুইটি জিনিস আছে। ইহার মধ্যে একটি জিনিসের পরিমাণ যতই বাড়িবে, ইহার প্রতি ক্রেতার পছন্দ ততই কমিয়া যাইবে। ধর প্রথম বাণ্ডিলে ৮ জোড়া ধুতি ও ২টি মাত্র সার্ট আছে। এই বাণ্ডিলে ধুতি যথেষ্ট আছে। কিন্তু সার্টের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। এ অবস্থায় বাণ্ডিলের মালিক হয়ত আর একটি সার্টের বদলে একজোড়া ধুতি দিতে রাজী আছে। অর্থাৎ ধুতি একজোড়া কমিলে যে ক্ষতি হইবে তাহা একটি সার্ট দিয়া পূরণ করা যাইবে। সুতরাং ৭ জোড়া ধুতি ও তিনটি সার্ট ভর্তি বাণ্ডিলেও প্রথম বাণ্ডিলের মত সমান পছন্দসই হইবে। তৃতীয় বাণ্ডিলে ৬ জোড়া ধুতি ও ৫টি সার্ট আছে। এ বাণ্ডিলও সমান পছন্দ হইবে। কারণ এ অবস্থায়

এক জোড়া ধুতি কমার ক্ষতি আরো দুইটি সার্ট দিয়া পূরণ করা যাইবে। ধুতির স্টক কমিয়া সার্টের স্টক বাড়িলে এক জোড়া ধুতির বদলে বেশি সার্ট না দিলে বিনিময়ে কোন লাভ হয় না। আবার ৫ জোড়া ধুতি ও ৮টি সার্টের বাণ্ডিলও সমান পছন্দ হইবে।

তৃতীয়ত, কোন দুইটি নিরপেক্ষরেখা পরস্পর ছেদ করিতে পারে না। ইহা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়। ধর দুইটি নিরপেক্ষরেখা P_1 এবং P_2 পরস্পরকে a বিন্দুতে ছেদ করিল। ইহার অর্থ কি তাহা বিচার করিয়া দেখা দরকার। P_1 নিরপেক্ষরেখার উপর দুইটি বিন্দু নেওয়া থাকে। একটি a ও আর একটি b বিন্দু। দুইটি বিন্দু একটি নিরপেক্ষরেখায় আছে। ইহার অর্থ এই যে ক্রেতারা $om_1 + am_1$ দ্রব্যের বাণ্ডিল এবং $om_3 + bm_3$ এর বাণ্ডিল সমান পছন্দ করে। দ্বিতীয় নিরপেক্ষরেখা P_2তেও দুইটি বিন্দু, a এবং c নেওয়া যাক। এই নিরপেক্ষরেখা হইতে জানা যায় যে ক্রেতারা $om_1 + am_1$ বাণ্ডিল এবং $om_2 + cm_2$ এর বাণ্ডিল সমান পছন্দ করে। প্রথম রেখা হইতে

$$om_1 + am_1 = om_3 + bm_3$$

দ্বিতীয় রেখা হইতে

$$om_3 + bm_3 = om_2 + cm_2$$

সুতরাং $om_3 + bm_3 = om_2 + cm_2$। কারণ এই দুইটি বাণ্ডিলই $om_1 + am_1$ এর সমান বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু $om_3 + bm_3$ কখনও $om_2 + cm_2$ এর সমান হইতে পারে না। কারণ $om_3 + bm_3$ এর বাণ্ডিলে om_3 এবং bm_3 দুইটি দ্রব্যই $om_2 + cm_2$ এর বাণ্ডিলের দুইটি দ্রব্য হইতে বেশি। om_3 দ্রব্য om_2 দ্রব্য হইতে বেশি এবং bm_3 দ্রব্য cm_3 দ্রব্য হইতে বেশি। যে বাণ্ডিলে ৬ জোড়া ধুতি ও ৬ জোড়া সার্ট আছে তাহা অন্য আর একটি বাণ্ডিল—যাহাতে মাত্র ৫টি ধুতি ও ৫টি সার্ট আছে—এর সমান বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কোন ক্রেতাই এমন বোকা নয় যে সে ৬টি ধুতি ও ৬টি সার্টের বাণ্ডিল এবং ৫টি ধুতি ও ৫টি সার্টের বাণ্ডিল সমান পছন্দ করিবে। কিন্তু P_1 ও P_2 নিরপেক্ষরেখা যদি পরস্পরকে ছেদ করে তবে ইহা হইতে বাধ্য। যেহেতু তাহা সম্ভব নহে, সুতরাং দুইটি নিরপেক্ষরেখা কখনও পরস্পরকে ছেদ করে না।

নিরপেক্ষরেখার সহিত জিনিস দুইটির দামের কোন সম্বন্ধ নাই। ধুতি ও সার্টের দাম যাহাই হউক না কেন, সকল ক্রেতাই ৬ জোড়া ধুতি ও ৪টি সার্টের বাণ্ডিলকে ৬ জোড়া ধুতি ও ২টি সার্টের বাণ্ডিল অপেক্ষা বেশি পছন্দ করিবে। এই রেখা হইতে জানা যায় যে ক্রেতা কি কি পরিমাণ দ্রব্য সমষ্টির বাণ্ডিল সমান পছন্দ করে। যদি একই নিরপেক্ষরেখার দুইটি বাণ্ডিল নেওয়া হয়, তবে ক্রেতা দুইটিকেই সমান পছন্দ করে। আর একটি বাণ্ডিল নীচের রেখা হইতে এবং দ্বিতীয় বাণ্ডিলটি উঁচু রেখা হইতে নেওয়া হয় তবে বুঝিতে হইবে যে ক্রেতা দ্বিতীয় বাণ্ডিলটি অর্থাৎ উঁচু রেখার বাণ্ডিলটি—প্রথম বাণ্ডিল অপেক্ষা বেশি পছন্দ করে।

এইভাবে আমরা বিভিন্ন ধরনের নিরপেক্ষরেখার তালিকা প্রস্তুত করিতে পারি ও ইহার রেখাচিত্র আঁকিতে পারি।
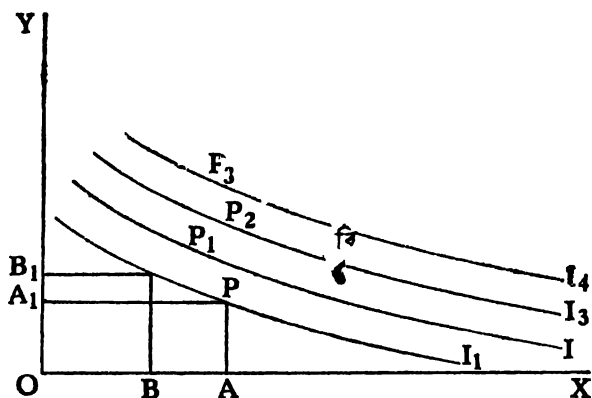
৫নং রেখাচিত্র

P এবং Q এই দুই বিন্দু একই নিরপেক্ষরেখা চিত্রে আছে। ইহার অর্থ OB জোড়া ধুতি + QB সংখ্যক সার্ট এবং OA জোড়া ধুতি + AP সংখ্যক সার্ট—এই দুই বাণ্ডিলের মধ্যে কোন পছন্দের তফাৎ নাই। দুইটির সম্বন্ধে ক্রেতা নিরপেক্ষ। কিন্তু সে I_2 রেখাচিত্রস্থিত যে কোন বাণ্ডিলের I_1 রেখাচিত্রস্থিত বাণ্ডিল অপেক্ষা বেশি পছন্দ করে। আবার I_3 রেখাচিত্রস্থিত যে কোন বাণ্ডিলের জন্য পছন্দ I_2 রেখাচিত্রস্থিত বাণ্ডিল অপেক্ষা বেশি। উঁচু রেখাচিত্রের বাণ্ডিলের প্রতি পছন্দ নীচু রেখাচিত্রের বাণ্ডিল হইতে

বরাবরই বেশি। সে ৬ জোড়া ধুতি ও ২টি সার্টের বাণ্ডিলকে ৫ জোড়া ধুতি ও ৩টি সার্টের বাণ্ডিলের সমান পছন্দ করিতে পারে। কিন্তু ৬ জোড়া ধুতি ও ৪টি সার্টের বাণ্ডিল, ৬ জোড়া ধুতি ও ২টি সার্টের বাণ্ডিল অপেক্ষা যে বেশি পছন্দ করিবে ইহাতে আর সন্দেহ কি? দ্বিতীয় বাণ্ডিল যদি I_1 রেখাচিত্রে পাওয়া যায় তবে প্রথমটির রেখাচিত্র হইবে I_2. কয়েকটি নিরপেক্ষরেখার সমষ্টি যুক্ত চিত্রকে **নিরপেক্ষরেখার মানচিত্র** (Indifference map) বলা হয়।

নিরপেক্ষরেখার মানচিত্র ও ক্রেতা (Consumer equilibrium with an indifference map): নিরপেক্ষরেখার সাহায্যে আমরা বলিতে পারি যে একজন ক্রেতা দ্রব্য দুইটি কত পরিমাণ কিনিবে। ইহা কি করিয়া জানা যায় তাহা নীচে ব্যাখ্যা করা হইতেছে। ধরা যাক যে রামের হাতে মাত্র ৫০৲ টাকা আছে এবং ইহা দিয়া সে ধুতি কিনিবে। ধুতির যা দাম তাহাতে সমস্ত টাকাটা ধুতি কেনায় খরচ করিলে সে ৫ জোড়া ধুতি পাইবে। সে ৫০৲ টাকা দিয়া কখন কত জোড়া ধুতি কিনিবে ও কত টাকা জমা রাখিবে ইহা তৃতীয় রেখাচিত্রে দেখান হইতেছে।

৩নং রেখাচিত্র
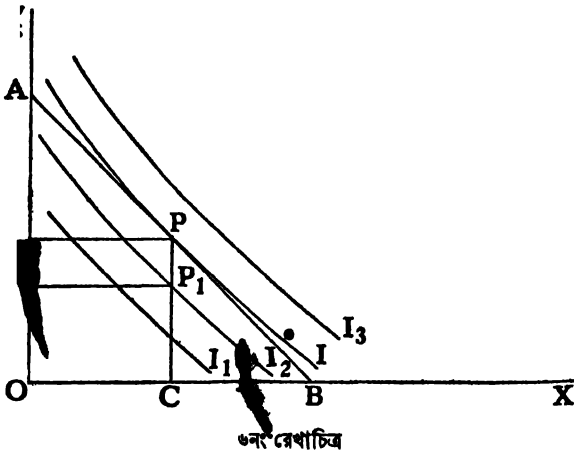
টাকার পরিমাণ OY অক্ষে ও ধুতির পরিমাণ OX অক্ষে মাপা হইতেছে। রাম যদি ধুতি না কিনিয়া সব টাকাই জমায়, তবে তাহার নিকট OY পরিমাণ টাকা থাকিলে, ধুতি কিনিবে না। সে যদি সব টাকা দিয়া ধুতি কেনে তবে

তাহার নিকট OB ধুতি থাকিবে কিন্তু টাকা থাকিবে না। কিংবা সে OC জোড়া ধুতি কিনিতে পারে ও PC পরিমাণ টাকা জমা দিতে পারে। A এবং Bকে যোগ দিলে যে রেখা পাওয়া যায় ইহাকে মূল্যরেখা (Price Line অথবা Consumption Possibility Line) বলে। এই রেখা কতটা ঢালু হইবে ইহা ধুতির দামের উপর নির্ভর করিবে। ধুতির দাম বেশি হইলে ৫০৲ টাকা দিয়া কম ধুতি পাওয়া যায়। তাহা হইলে AB রেখা কম ঢালু হইবে। আবার ধুতির দাম অনেক সস্তা হইলে রেখাটি আরো বেশি ঢালু হইবে।

এই মূল্যরেখা ও নিরপেক্ষরেখা একসঙ্গে করা যাক। এই সমাবেশ ৬নং রেখাচিত্রে সমান হইয়াছে। যে কয়টি নিরপেক্ষরেখা আঁকা গেল ইহার মধ্যে I রেখা মূল্যরেখাকে P বিন্দুতে স্পর্শ করিতেছে। I_2 মূল্যরেখাকে দুই স্থানে ছেদ করিয়াছে। I_3 মূল্যরেখার উর্ধ্বে ও I_1 মূল্যরেখার নীচে। I নিরপেক্ষরেখা AB মূল্যরেখাকে P বিন্দুতে স্পর্শ করিতেছে। যেহেতু নীচু নিরপেক্ষরেখার যে কোন বিন্দু অপেক্ষা উপরের নিরপেক্ষরেখার যে কোন বিন্দু বেশি পছন্দের, সুতরাং রাম O জোড়া ধুতি P পরিমাণ টাকা OC জোড়া ধুতি + P_1C পরিমাণ টাকা অপেক্ষা বেশি পছন্দ করিবে এবং একই কারণে I_1 নিরপেক্ষরেখাস্থিত যে কোন বিন্দু অপেক্ষা I নিরপেক্ষরেখাস্থিত ধুতি ও টাকার সমন্বয় কেনা রামের ক্ষমতার বাহিরে। কারণ তাহার হাতে অত টাকা নাই। সুতরাং P বিন্দুতে অর্থাৎ OC জোড়া ধুতি ও PC পরিমাণ টাকা হাতে রাখিলেই নিজের আর্থিক সামর্থ্য ও ধুতির দামের কথা চিন্তা করিয়া রাম সর্বাপেক্ষা ভাল অবস্থায় পৌঁছিবে। ইহা অপেক্ষা কম ধুতি ও বেশি টাকা অথবা বেশি ধুতি ও কম টাকা রাখিলে তাহার মোট তুষ্টি কমিয়া যাইবে। অন্য যে কোন অবস্থাতেই তাহার লাভ কম হইবে।

এইবার আর একটি অবস্থার কথা আলোচনা করা যাক। ধর, রামের হাতে মাত্র ৫০৲ টাকা রহিয়াছে। কিন্তু ধুতির দাম পূর্বাপেক্ষা কিছু কমিয়াছে। অর্থাৎ পূর্বে ৫০৲ টাকা দিয়া সে যদি OB জোড়া ধুতি কিনিতে পারিত এখন সে OB_1 জোড়া ধুতি কিনিতে পারে। (৭নং চিত্র দেখ)

এই অবস্থায় নূতন মূল্যরেখা AB_1 হইবে, পূর্বের মূল্যরেখা AB আর বহাল থাকিবে না। এই মূল্যরেখা আর একটি (এবং উঁচু) নিরপেক্ষ-রেখা I_1 কে P_1 বিন্দুতে স্পর্শ করিতেছে। অর্থাৎ দাম কমার ফলে OC_1 জোড়া ধুতি ও P_1C_1 পরিমাণ টাকা হাতে রাখিলেই সর্বাপেক্ষা বেশি তুষ্টি লাভ হইবে। আবার ধুতির দাম প্রথমবারের তুলনায় যদি
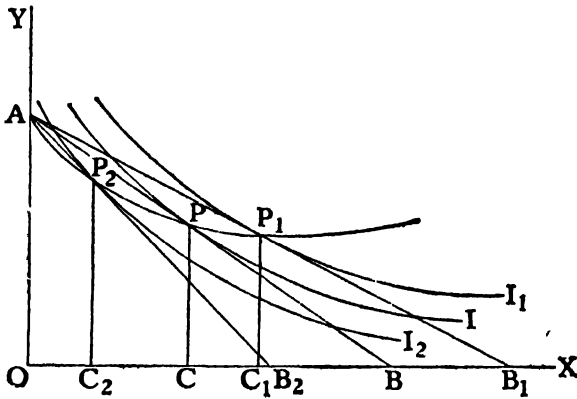
নং রেখাচিত্র

বাড়িয়া যায় তবে ৫০৲ টাকার বদলে মাত্র OC_2 জোড়া ধুতি কেনা যাইবে এই তৃতীয় মূল্যরেখার AB_2, আর একটি নিরপেক্ষরেখা I_2 কে P_2 বিন্দুতে স্পর্শ করিতেছে। এ অবস্থায় অর্থাৎ ধুতির দাম এত বেশি থাকিলে মাত্র OC_2 জোড়া ধুতি ও P_2C_2 পরিমাণ টাকা হাতে রাখাই সর্বাপেক্ষা ভাল। এই P_1, P এবং P_2 বিন্দু ও A বিন্দুকে যোগ দিলে যে রেখা পাওয়া যায় ইহাকে মূল্য-ভোগরেখা (price consumption curve) বলা হয়। কাহারও আয়ের পরিবর্তন না হইয়া শুধু কেবল জিনিসের দামের পরিবর্তন তবে সে জিনিসটি কোন দামে কতটুকু কিনিবে বা ভোগ করিতে চাহিবে ইহা এই মূল্য-ভোগরেখা হইতে বলা যায়।

এইবার লোকটির আয়ের পরিবর্তন হইলে কি হইতে পারে ইহা আলোচনার সময় আবার ৪নং রেখাচিত্রে ফিরিয়া যাওয়া যাক। রামের হাতে ৫০৲ টাকা আছে। ইহা দিয়া সে ধুতি ও সার্ট কিনিবে। যদি সমস্ত

টাকা দিয়া ধুতি কেনে তবে ধুতির বর্তমান দামে OB জোড়া ধুতি কিনিতে পারিবে। আর পঞ্চাশ টাকা দিয়া যদি কেবল সার্ট কেনে তবে OA সংখ্যক সার্ট কিনিতে পারে। AB-রেখা ধুতি ও সার্টের মূল্যরেখা। ইহা I নিরপেক্ষরেখাকে P বিন্দুতে স্পর্শ করিতেছে। (৮নং রেখাচিত্র দেখ)।
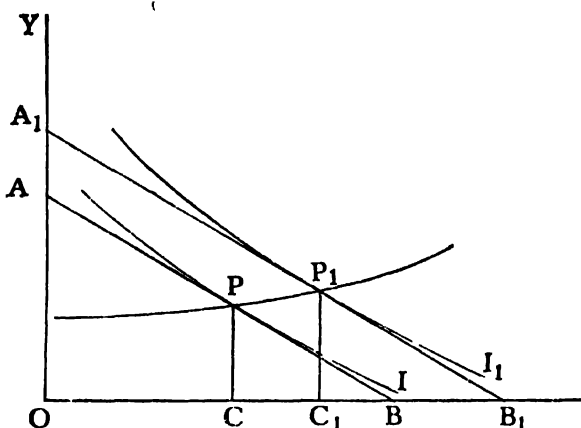
৮নং রেখাচিত্র

অর্থাৎ ধুতি ও সার্টের বর্তমান দামে ৬০৲ টাকা আয়েব লোক OC জোড়া ধুতি ও PC সংখ্যক সার্ট কিনিলে সর্বাপেক্ষা বেশি তুষ্টি লাভ করিবে। এখন ধরা যাক যে লোকটির আয় বাডিয়া ৭০৲ টাকা হইয়াছে। কিন্তু ধুতি ও সার্টের দাম একই আছে। তবে ৭০৲ টাকা দিয়া OB_1 জোড়া ধুতি কিংবা OA_1 সংখ্যক সার্ট কিনিতে পারা যাইবে। A_1B_1 রেখা ধুতি ও সার্টেব নূতন মূল্যরেখা। ইহা AB-এর ঊর্ধ্বে থাকিবে। কারণ দাম কমার ফলে ধুতি ও সার্ট দুইই পূর্বাপেক্ষা বেশি কেনা যাইতেছে। এই নূতন মূল্যরেখা I_1 নামক নিরপেক্ষরেখাকে P_1 বিন্দুতে স্পর্শ করিতেছে। এখন OC_1 জোড়া ধুতি ও P_1C_1 সংখ্যক সার্ট কিনিলেই সে সর্বাপেক্ষা ভাল অবস্থায় থাকিবে। আয় বৃদ্ধির ফলে ধুতি ও সার্ট সবই বেশি কেনা সম্ভব হইতেছে। আয়ের পরিমাণ যেরূপ বাড়িবে বা কমিবে লোকটিও তদনুরূপ বেশি বা কম ধুতি ও সার্ট কিনিবে। P_1P_2 এই বিন্দুগুলি যোগ দিয়া একটি রেখা টানা যায়। এই রেখাটিকে আয়-

ভোগরেখা (Income consumption curve) বলে। এই রেখা হইতে আমরা বলিতে পারি যে জিনিসের দাম একই থাকিয়া যদি কেবল আয় বাড়ে, কমে, তবে লোকে কত পরিমাণ জিনিস বেশি কিনিবে? ইহার দ্বারা আমরা চাহিদার উপর আয় পরিবর্তনের প্রভাব জানিতে পারি। সাধারণত এই রেখাটি দক্ষিণে উর্ধ্বমুখী হইবে। কারণ আয় বাড়িলে লোকে পূর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ জিনিস কেনে। ইহার ব্যতিক্রম যে ঘটে না তাহা নয়। কোন কোন জিনিস আছে যাহাকে লোকে নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া মনে করে এবং আয় কম বলিয়াই বাধ্য হইয়া ব্যবহার করে। কম আয়ের লোকই সাধারণত এই সব জিনিস ক্রয় করে। যেমন ইউরোপে গরিবেরা মাখন কিনিবার পয়সা না থাকায় "মার্গারীন" নামক ভেজিটেবল মাখন ব্যবহার করিত। কিন্তু আয় সে রকম বাড়িলে মার্গারীন না কিনিয়া মাখন কিনিত। ফলে আয় বৃদ্ধি হইলে এইসব নিকৃষ্ট শ্রেণীর জিনিসের চাহিদা কমিয়া যাইবে। এইসব জিনিসকে "নিকৃষ্ট জিনিস" বা inferior goods বলে।

আমরা নিরপেক্ষরেখা পদ্ধতি দ্বারা আয় ও মূল্য পরিবর্তনের প্রভাব কি হইবে ইহার আলোচনা করিয়াছি। আসলে কোন জিনিসের মূল্য পরিবর্তিত হইলে দুই রকমের প্রভাব দেখা দেয়। প্রথমত, মূল্য পরিবর্তনকে তাহার আয়ের পরিবর্তন হিসাবে দেখা দেয়। ধর, ধুতির দাম কমিয়াছে এবং পূর্বে লোকটি ৫ জোড়া ধুতি কিনিত। এখন দাম কমার ফলে ৫ জোড়া ধুতি কিনিয়াও তাহার হাতে কিছু টাকা রহিয়া গেল। অর্থাৎ তাহার আয় বৃদ্ধি হইয়াছে বলা যায়। আয় বৃদ্ধি হইলে লোকে সাধারণত পূর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণে জিনিস (এক্ষেত্রে ধুতি) কিনিবে। দ্বিতীয়ত, ধুতির দাম কমিয়াছে। কিন্তু সার্টের দাম পূর্ববৎ রহিয়াছে। ধুতি ও সার্টের মধ্যে ধুতি অপেক্ষাকৃত সস্তা হওয়ায় লোকে সার্টের বদলে বেশি করিয়া ধুতি কিনিবে। ইহাকে বিনিময়ের ফল বা substitution effect বলা হয়। সুতরাং মূল্য পরিবর্তনের ফল কি হইবে—ইহা আয় পরিবর্তনের ফল ও বিনিময়ের ফল, এই দুইটি বিষয় আলোচনা করিলে জানা যাইবে। নিকৃষ্ট শ্রেণীর জিনিস ও অন্য দুই একটি বিষয় ব্যতীত সাধারণভাবে এই দুইটি প্রভাব একই দিকে কাজ করে। অর্থাৎ

দাম কমিলে আয় বৃদ্ধির ও বিনিময়ের ফলে জিনিসটির বিক্রয় বাড়ে। আবার দাম বাড়িলে ইহাদের ফলে বিক্রয় কমে।

এই নিরপেক্ষরেখা হইতে ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা ও সমষ্টিগত বা বাজারের চাহিদা-রেখা টানা যায়। মূল্যভোগ-রেখা হইতে আমরা জানিতে পারি যে মূল্যপরিবর্তনের ফলে একজন লোক জিনিসটি কতটা বেশি বা কম কিনিবে। মূল্যভোগ-রেখা হইতে ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা সহজেই নির্ণয় করা যায়। বাজারের চাহিদা-রেখাও একই পদ্ধতিতে ঠিক করা যায়। যাঁহারা নিরপেক্ষরেখা তত্ত্বের সমর্থক তাঁহারা বলেন যে তাঁহাদের এই নূতন পদ্ধতি, পুরাতন পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক বেশি ফলদায়ক। যেমন প্রচলিত চাহিদা-রেখা হইতে আমরা কেবলমাত্র একটি সংবাদ পাই, —বিভিন্ন দামে কি পরিমাণ জিনিসের চাহিদা আছে। মূল্যভোগ-রেখা হইতে আমরা এই সংবাদ অতি সহজেই সংগ্রহ করিতে পারি। উপরন্তু আমরা জানিতে পারি যে দামের পরিবর্তনের সঙ্গে জিনিসটির জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ (Total outlay) কতটুকু পরিবর্তন করিতেছে।

বিনিময়ের প্রান্তিক হার (Marginal rate of substitution): উপরের উদাহরণে দেখিয়াছি যে, প্রথমে লোকটি ১০৲ টাকার A-র চেয়ে ১০৲ টাকার B পছন্দ করিয়াছে। কিন্তু এই বিনিময়ের পর তাহার পছন্দ পরিবর্তিত হইল। Bর সংখ্যা বাড়াইবার ফলে Bর প্রতি তাহার আকাঙ্ক্ষা বা পছন্দ কমিল এবং Aর সংখ্যা কমার ফলে Aর আকাঙ্ক্ষা বা পছন্দ বাড়িল। পছন্দের এই পরিবর্তন এমন হইল যে সে আর Aর বদলে B বিনিময় করিতে রাজী নহে। এই অবস্থায় প্রতি ইউনিট A এবং Bর প্রতি তাহার পছন্দ সমান বলিতে হইবে। দুইটি জিনিসের পছন্দ যখন সমান হয়, তখন এই দুইটি জিনিসের অনুপাতকে বিনিময়ের প্রান্তিক হার (MRS) বলে।

অতি অল্প পরিমাণ দুইটি জিনিস যখন সমান পছন্দ হয়, তখন তাহাদের অনুপাতকে বিনিময়ের প্রান্তিক হার বলে। Aর এক ইউনিট সে যতটুকু পছন্দ করে Bর যতগুলি ইউনিট তাহার সমান, ইহাকে Aর পরিবর্তে Bর বিনিময়ের প্রান্তিক হার বলে। উপরোক্ত উদাহরণে ১০ টাকার মূল্যে A ও Bএর পছন্দ সমান ধরা হইয়াছে। যদি এক ইউনিট Aর দাম ২৲

টাকা এবং প্রতি ইউনিট Bর দাম ৫৲ টাকা হয় তবে ঐ ব্যক্তির নিকট ৫টি A ২টি Bর সমান। Aর পরিবর্তে Bর

$$\text{বিনিময়ের প্রান্তিক হার} = \frac{৫A}{২B} \text{ অর্থাৎ } \frac{৫}{২}$$

B এবং Aর দামের অনুপাত $= \frac{৫}{২}$। Aর পরিবর্তে Bর বিনিময়ের প্রান্তিক হার তাহাদের দামের অনুপাতের সঙ্গে সমান অর্থাৎ $\frac{৫}{২}$। Aর পরিবর্তে Bর

$$\text{বিনিময়ের প্রান্তিক হার} = \frac{\text{এক A}}{\text{একটি Aর সহিত যতটি B সমান}} = \frac{\text{Bর দাম}}{\text{Aর দাম}}$$

বিনিময়ের প্রান্তিক হার (**Dimininishing marginal rate of substitution**) : উপযোগতত্ত্বে বলে যে লোকে একটি জিনিস যত পায়, সেই জিনিসটি আরও পাইবার আকাঙ্ক্ষা ততই কমিয়া যায়। এই তত্ত্বের পরিবর্তে বিনিময়ের হ্রাসমান প্রান্তিকহার তত্ত্ব বিবৃত করা হয়। একটি লোকের কাছে যত বেশি B এবং যত রকম A থাকে, ততই Aর তুলনায় অতিরিক্ত একটি Bর জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষা কম হইবে। অর্থাৎ একটি জিনিস অন্য জিনিসের পরিবর্তে যত পাওয়া যায়, সেই জিনিসটির বিনিময়ের প্রান্তিকহার তত কমিতে থাকে। Aর পরিবর্তে যত B পাওয়া যায়, ততই Aর পরিবর্তে Bর বিনিময়ের প্রান্তিকহার কম হয়। Aর পরিবর্তে Bর বিনিময়হার যখন $\frac{৫}{২}$ হয়, তখন ৫ এর পরিবর্তে ২ B দিবে কিনা সে বিষয়ে সে উদাসীন হয়। কিন্তু একবার ৫ Aর পরিবর্তে ২ B পাইলে, সে আর ২ Bর জন্য ৫ A দিতে চাহিবে না। কেননা তাহার নিকট Aর সংখ্যা কমার ফলে Aর প্রতি তাহার পছন্দ বাড়িয়াছে; এবং Bর সংখ্যা বাড়ার ফলে Bর প্রতি তাহার পছন্দ কমিয়াছে। ৫ A ত্যাগ করার যে ক্ষতি তাহা ২ B দ্বারা পূরণ হইবে না। কিন্তু সে হয়ত ৩ Aর পরিবর্তে আরও ২টি B পাইলে সন্তুষ্ট হইবে। এইক্ষেত্রে তাহার কাছে ৩ A আর ২ B সমান; Aর পরিবর্তে Bর বিনিময়ের প্রান্তিকহার $\frac{৩}{২}$। অর্থাৎ জিনিসের সংখ্যা যত বাড়ে, অন্য জিনিসের পরিবর্তে ঐ জিনিসটির বিনিময়ের প্রান্তিকহার তত কমে।

প্রান্তিক উপযোগ তত্ত্বের এই বিশ্লেষণ বাস্তববাদী। উপযোগ তত্ত্বের মত আমরা এই কথা বলি না যে একটি জিনিসের চাহিদা শুধু ঐ জিনিসটি

পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করে। পরন্তু এই তত্ত্ব খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে যে, শুধু ঐ জিনিসটি নহে অন্যান্য জিনিস পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার উপরেও ইহার চাহিদা নির্ভর করে।

Exercises

Q. 1. Discuss the properties of an Indifference Curve.

Q. 2. In what respects is the indifference curve analysis assumed to be superior to the utility analysis ?

Q. 3. Show with the aid of an indifference map how a consumer reaches equilibrium with regard to his purchases.

Q. 4. Write short notes on : (a) Indifference map, (b) Price consumption curve, (c) Income consumption curve.

চতুর্দশ অধ্যায়

চাহিদা ও যোগান

(Demand and Supply)

চাহিদা (Demand) : সাধারণ কথায় চাহিদা অর্থে কোন জিনিস পাইবার বা কিনিবার ইচ্ছা বুঝায়। কিন্তু কোন জিনিস পাওয়ার ইচ্ছাকে অর্থশাস্ত্রে চাহিদা বলে না। যখন কোন জিনিস পাওয়ার ইচ্ছার পশ্চাতে অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা এবং সামর্থ্য দুই-ই থাকে তখন ইহাকে অর্থনৈতিক চাহিদা বলে। অর্থাৎ যখন জিনিসটি পাওয়ার ইচ্ছা থাকে ও পাওয়ার জন্য প্রয়োজনমত অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত থাকে তবেই ইহাকে চাহিদা বলে।

চাহিদা বলিলে সব সময় দামের কথা বোঝা যায়। দাম না জানিলে কত জিনিস কিনিবে সে কথা কেহ বলিতে পারে না। একটি নির্দিষ্ট দামে যে পরিমাণ জিনিস লোকে কিনিতে চায় ইহাকে জিনিসটির চাহিদা বলে। একটি জিনিস যে দামে বাজারে বিক্রয় হইতে পারে ইহাকে চাহিদা-মূল্য বা demand price বলে।

বিভিন্ন দামে কি পরিমাণ জিনিস বিক্রয় হইবে ইহার একটি তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সেই তালিকাকে চাহিদার তালিকা (demand schedule) বলে। একটি লোক বিভিন্ন দামে কি পরিমাণ জিনিস কিনিবে ইহার তালিকাকে ব্যক্তিগত চাহিদার তালিকা বলে। সকলেই জানে যে, দাম বাড়িলে জিনিসের চাহিদা কমে এবং দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে। নিম্নলিখিত তালিকার সাহায্যে বিষয়টি বোঝা যাইবে।

চায়ের ব্যক্তিগত চাহিদার তালিকা

এক পাউণ্ডের দাম যখন ৮৲ টাকা, তখন সে ১ পাউণ্ড কিনিবে
" " " " ৬৲ " " ২ " "
" " " " ৪৲ " " ৪ " "
" " " " ৩৲ " " ৭ " "
" " " " ২৲ " " ১০ " "

অর্থাৎ বাজারে চায়ের দাম যখন পাউণ্ড প্রতি ৮৲ টাকা, তখন সে মাত্র ১ পাউণ্ড চা কিনিবে। কিন্তু দাম কমিয়া ৬৲ টাকা হইলে ২ পাউণ্ড পর্যন্ত কিনিবে। এইভাবে দাম নামিলে সে ক্রমেই বেশি চা কিনিতে রাজী আছে।

ব্যক্তিগত চাহিদার তালিকা জানা থাকিলে বাজারে অথবা শিল্পের চাহিদা-তালিকা নির্ণয় করা যায়। এই তালিকায় বিভিন্ন দামে বাজারে কি পরিমাণ জিনিস বিক্রয় হইবে তাহা দেখান হয়।

চা-শিল্পের চাহিদা-তালিকা

দাম	সমস্ত ক্রেতারা যে পরিমাণ চা কিনিবে
৮৲	১০০০ পাউণ্ড
৬৲	১৫০০ পাউণ্ড
৪৲	৫০০ পাউণ্ড
৩৲	৫৫০০ পাউণ্ড

একজন ক্রেতা যে পরিমাণ জিনিস কিনিবে ইহার সহিত মোট ক্রেতার সংখ্যা গুণ করিলেই কি বাজারের চাহিদার তালিকা পাওয়া যাবে? ব্যক্তিগত চাহিদার তালিকা একপ্রকারের হয় না। ধনীরা বেশি দামেও যথেষ্ট চা কিনিবে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই দরিদ্র; তাহারা ৮৲ পাউণ্ড দরে ১ পাউণ্ড চাও কিনিতে পারিবে না। ধনী হউক অথবা দরিদ্র হউক প্রত্যেকেরই রুচি ও প্রকৃতির প্রভেদ আছে। কেহ হয়ত চা এত ভালবাসে যে ৮৲ পাউণ্ড দাম হইলেও অপরের তুলনায় বেশি চা কিনিবে। সুতরাং একজনের চাহিদার তালিকা অন্য একজনের চাহিদার তালিকা হইতে এতই পৃথক যে কোন একটি তালিকাকে প্রতিনিধিস্থানীয় বলিয়া ধরা যায় না এবং ক্রেতার সংখ্যার দ্বারা গুণ করিয়া বাজারের

চাহিদার তালিকা বাহির করা যায় না। কিন্তু বাজার যদি খুব বিস্তৃত হয় তবে এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের কথা না ধরিলেও চলে। কারণ তখন একশ্রেণীর লোকের বেশি পছন্দ অন্য শ্রেণীর কম পছন্দদ্বারা কাটাকাটি হইয়া যাইবে। ইহার উপর ভরসা করিয়া আমরা বাজারের চাহিদার তালিকা প্রস্তুত করিতে পারি। "ব্যক্তিগত চাহিদা পরিবর্তনশীল হইলেও সমষ্টিগত চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থির—ঠিক যেমন পদার্থ বিজ্ঞানে দেখা যায় যে, এক একটি অনুর শক্তি পরিবর্তনশীল হইলেও সমষ্টিগত বায়বীয় চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৫ পাউণ্ড।"

চাহিদার তালিকাকে নিম্নলিখিত বক্ররেখা দ্বারা বোঝান যায়। ৯নং চিত্রে YO রেখায় ভিন্ন ভিন্ন দাম দেখান হইয়াছে এবং OX রেখার উপর ভিন্ন ভিন্ন দামে চাহিদার পরিমাণ কি হইবে ইহা দেখান হইয়াছে।
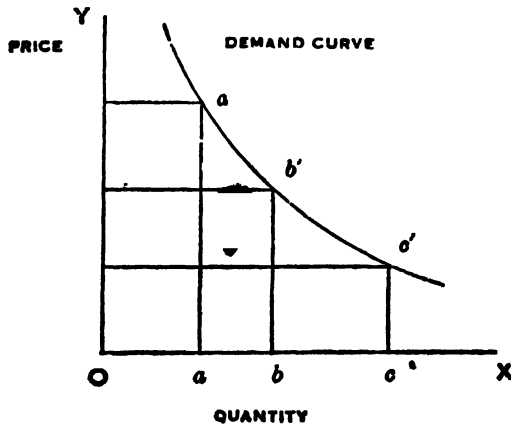
৯নং চিত্র

এই চিত্র হইতে বোঝা যায় যে, যখন চায়ের দাম aa' এর সমান তখন ক্রেতারা Oa পরিমাণ কিনিবে অর্থাৎ বেশি দামে চাহিদা কম হইবে। যখন চায়ের দাম কমিয়া bb' রেখার সমান হইবে, তখন চাএর চাহিদা বাড়িয়া Obএর সমান হইবে। আরো কমিয়া cc' এর সমান হইলে চাহিদা Ocর সমান হয়—অর্থাৎ যথেষ্ট বাড়ে।

চাহিদার নিয়ম (Law of Demand): চাহিদার তালিকার আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, যদি অন্য কোন বিষয়ে পরিবর্তন না ঘটে

তবে দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বাড়িবে এবং দাম বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কমিবে। যে দিকে দামের পরিবর্তন হয় চাহিদার পরিবর্তন ইহার বিপরীত দিকে হয়। ইহাকে চাহিদার নিয়ম বলে। সুতরাং বলা যায় যে বিক্রেতারা যদি বেশি জিনিস বিক্রয় করিতে চায় তবে তাহাদের দাম কমাইতে হইবে।

এই নিয়মে বলে যে দাম কমিলে বেশি জিনিস বিক্রয় হয়। কেন এই রকম হয়? দুইটি কারণে ইহা ঘটিতে পারে। প্রথমত, জিনিসটির দাম যখন কমে এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্য জিনিসের দাম না কমে তবে অন্য জনিসের পরিবর্তে লোকে ঐ জিনিসটি বেশি করিয়া কিনিবে। অতএব ঐ জিনিসটির চাহিদা বাড়িয়া যাইবে। ধর বাজারে চায়ের দাম ৪৲ টাকা পাউণ্ড ও কফি এবং কোকোর দামও ৪৲ টাকা পাউণ্ড। এই অবস্থায় কিছু লোক চা খায় ও অন্যান্য লোক কফি ও কোকো খাইতেছে। চায়ের দাম যদি কমে অর্থাৎ, তিন টাকা হয়, আর কফি অথবা কোকোর দাম যদি পূর্বের মত থাকে, তবে কিছু লোক বেশি চা এবং কম কফি অথবা কোকো কিনিবে। তাহারা ৪৲ টাকা পাউণ্ডের কফি অথবা কোকোর পরিবর্তে ৩৲ টাকা দামের চা কিনিবে। কফি ও কোকোর পরিবর্তে চাএর বিক্রয় বাড়িবে। Hicks ইহাকে প্রতিস্থাপনের ফল (Substitution effect) বলিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, এক পাউণ্ড চায়ের দাম ৪৲ হইতে ৩৲ টাকায় নামিয়া গেলে, ক্রেতা দেখে যে তিন পাউণ্ড চায়ের জন্য তাহার ১২৲ টাকার জায়গায় ৯৲ টাকা খরচ হইবে। সে মনে করিবে যে তাহার ৩৲ টাকা লাভ হইয়াছে—যেন তাহার আয় ৩৲ টাকা বাড়িয়াছে। সুতরাং সে বেশি চা কিনিতে চাহিবে। অতএব চায়ের চাহিদা বাড়িবে। Hicks ইহাকে আয় পরিবর্তনের ফল (income effect) বলিয়াছেন।

চাহিদার নিয়ম বলিবার সময় আমরা "অন্যান্য বিষয় যদি ঠিক থাকে" (other things being equal) এই কথা ব্যবহার করিয়াছি। এই কথার মধ্যে চাদিার নিয়মের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম লুক্কায়িত আছে। অন্যান্য বিষয় বলিলে ক্রেতার আয়, তাহার রুচি, অনুকল্প জিনিসের দাম ইত্যাদি বোঝায়। অর্থাৎ চায়ের দাম কমিলে চায়ের চাহিদা বাড়িবে, যদি ইতিমধ্যে কফি অথবা কোকোর দাম, ক্রেতাদের রুচি অথবা তাহাদের

ক্রয়ক্ষমতা প্রভৃতি অপরিবর্তিত থাকে। চায়ের দাম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কফি অথবা কোকোর দাম আরও পড়িয়া যায়, তবে চায়ের চাহিদা একদম না বাড়িতে পারে। অথবা চায়ের প্রতি কোন কারণে ক্রেতাদের যদি বিতৃষ্ণা জন্মে, অথবা ক্রেতাদের যদি আয় কমিয়া যায়, তাহা হইলে চায়ের দাম কমা সত্ত্বেও চায়ের চাহিদা না বাড়িতে পারে। দ্বিতীয়ত, ক্রেতা যদি বস্তুটিকে নিম্নস্তরের (inferior) মনে করে তবে আয় বাড়িলে সে আরও ভাল জিনিস কিনিতে চাহিতে পারে ; দাম কমিলেও ঐ জিনিস সে হয়ত আর কিনিবে না। এ ক্ষেত্রে নিম্নস্তরের জিনিসের দাম কমিলে ইহার চাহিদা বাড়িবে না।[১]

সাধারণত দাম বাড়িলে চাহিদা কমে। কিন্তু ইহার বিপরীত ঘটনাও ঘটিতে পারে। যেমন হীরকের যত দাম বাড়ে, ততই হীরকের চাহিদা বাড়িতে পারে। মূল্যবান বলিয়াই অনেকে ইহাকে আভিজাত্যের চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করে। সুতরাং দাম বাড়িলে এই সব জিনিসের চাহিদা কমে না, এমন কি বাড়িতেও পারে। দ্বিতীয়ত, মূল্য বৃদ্ধিকে যদি অধিকতর মূল্য বৃদ্ধির সূচনা বলিয়া লোকে মনে করে, তবে দাম বৃদ্ধি সত্ত্বেও লোকে বেশি জিনিস কিনিবে। বিশেষ করিয়া ফটকাবাজী লোকেরা এইরূপ করে। তৃতীয়ত, গরিব লোকে আয়ের অধিকাংশই আটা অথবা চাল কেনার জন্য খরচ করে এবং ইহার পর হাতে বিশেষ পয়সা থাকে না বলিয়া অন্যান্য জিনিসের জন্য অতি অল্প খরচ করে। আটা অথবা চালের দাম বাড়িলে ইহারা অন্যান্য সব জিনিস কেনা বন্ধ করিয়া উদরপূর্তির জন্য শুধু আটা অথবা চাল বেশি পরিমাণে কিনিতে পারে। সুতরাং আটা ও চালের দাম বাড়িলে ইহাদের চাহিদা বাড়িয়া যাইতে পারে।

যোগান (Supply) : মজুত মাল হইতে যে পরিমাণ জিনিস বিক্রেতারা বিভিন্ন দামে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ইহাকে জিনিসটির যোগান বলে। বাজারে যে পরিমাণ জিনিস বর্তমান আছে ইহাকে মজুত বলে। আর বিক্রেতারা বিভিন্ন দামে যে পরিমাণে জিনিস বিক্রয় করিতে রাজী

১। যেমন ভেজিটেবেল ঘিকে নিম্নস্তরের জিনিস মনে করা হয়। আয় বাড়িলে লোকে ভেজিটেবেল ঘি কম কিনিয়া ঘি বেশি পরিমাণে কিনিতে পারে। তখন দাম কমা সত্ত্বেও ভেজিটেবেল ঘি-এর চাহিদা কমিয়া যাইবে।

আছে ইহাকে যোগান বলে। যোগানের অর্থ দাম অনুসারে যোগান, ঠিক যেমন চাহিদার অর্থ দাম অনুসারে চাহিদা। ক্রেতারা কি দাম দিতে চায় ইহার উপর জিনিসের যোগান নির্ভর করে। বাজারে দাম বাড়িলে বিক্রেতারা বেশি জিনিস বিক্রয় করিতে রাজী হইবে। অর্থাৎ দাম বাড়িলে যোগান বাড়িবে, আবার দাম কমিলে যোগান কমিয়া যাইবে। ইহাকে যোগানের নিয়ম বা law of supply বলে। এই নিয়মে বলে যে দাম বাড়িলে যোগান বাড়ে এবং দাম কমিলে যোগান কমে। যোগানের নিয়ম চাহিদার নিয়মের বিপরীত।

১০নং চিত্রে এই নিয়ম বোঝান হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দামে কি পরিমাণ জিনিস যোগান দেওয়া হইবে তাহা OX অক্ষে মাপা হইয়াছে। OY অক্ষে দাম মাপা হইয়াছে।

১০নং চিত্র।
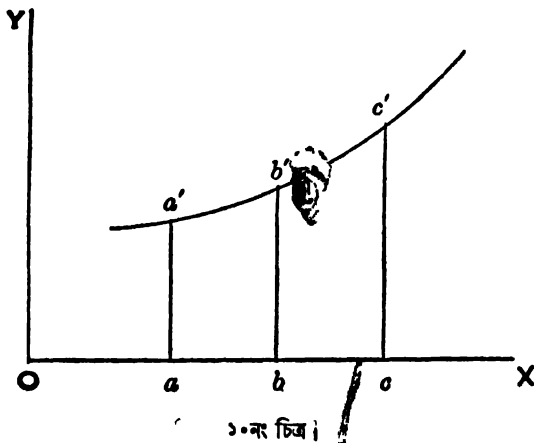
দাম aa′ হইলে বিক্রেতারা Oa′ পরিমাণ জিনিস বিক্রয় করিবে। দাম বাড়িয়া bb′ হইলে Ob বিক্রয় করিবে ইত্যাদি। যোগান-রেখা a′c′ উপরের দিকে উঠে।

অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। কোন কোন জিনিসের যোগান হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। যেমন অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত ছবির দাম যাহাই হউক না কেন তাহার সংখ্যা বাড়ান যাইবে না। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, দাম বাড়িলে বিক্রেতারা কম জিনিস বিক্রয় করে। যেখানে

শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নীচু এবং অভাব অতি সামান্য, সেখানে বেশি বেতন দিলে তাহারা মাসের ভিতর কম দিন কাজ করিয়া সেই সামান্য অভাব মিটাইতে পারে। সুতরাং বেতন বৃদ্ধি পাইলে শ্রমিকদের অনুপস্থিতি বাড়ে। অর্থাৎ বেতন বাড়িলে শ্রমিকদের যোগান কম হয়। ইহার অর্থ যোগান-রেখা উপরের দিকে না উঠিয়া নীচের দিকে নামে। কিন্তু এই সব অবস্থা কদাচিৎ ঘটে। সুতরাং যোগানের নিয়ম প্রায় সর্বত্রই প্রযোজ্য।

যোগান ও চাহিদার সাম্য (Equilibrium of demand and supply) : এখন আমরা যোগান ও চাহিদা রেখা যুক্তভাবে আলোচনা করিতে পারি। একই জায়গায় যোগান ও চাহিদার পরিমাণ দেখান যাক।

ক্রেতারা কিনিবে	দাম	বিক্রেতারা বিক্রয় করিবে
১০০০ পাঃ চা	৮৲ টাকা	৪০০০ পাঃ চা
১৫০০ পাঃ „	৬৲ টাকা	৩৫০০ পাঃ „
২৫০০ পাঃ „	৪৲ টাকা	২৫০০ „ „
৫৫০০ পাঃ „	৩৲ টাকা	১২০০ „ „

এখানে দেখা যায় যে, যখন এক পাউণ্ড চায়ের দাম ৪৲ টাকা তখন চায়ের যোগান ও চাহিদা সমান। ইহাই equilibrium price বা স্থির মূল্য। বাজারে এই দাম থাকিলে যাহারা ঐ দামে জিনিস ক্রয় করিতে প্রস্তুত তাহাদের চাহিদা ঠিকমত মিটিবে ; এবং যাহারা ঐ দামে যত জিনিস বিক্রয় করিতে প্রস্তুত তাহাদের সব মাল বিক্রয় হইবে। চায়ের দাম যদি বেশি, ধরা যাক ৬৲ টাকা পাউণ্ড হয়, তবে বিক্রেতারা ৩৫০০ পাঃ বিক্রয় করিতে চাহিবে, কিন্তু ক্রেতারা মাত্র ১৫০০ পাঃ কিনিতে রাজী হইবে। ১৫০০ পাঃ চা ৬৲ টাকা দামে বিক্রয় হইয়া যাইবার পর বিক্রেতারা আরও ১০০০ পাঃ বিক্রয় করিতে চায়। বিক্রেতার ব্যগ্রতা বা প্রতিযোগিতার ফলে চায়ের দাম পড়িয়া যাইবে। যদি চায়ের দাম ৩৲ টাকা পাউণ্ড হয়, তবে ক্রেতারা ৩৫৬০ পাউণ্ড কিনিতে চাহিবে, আর বিক্রেতারা মাত্র ১২০০ পাঃ বিক্রয় করিতে চাহিবে। ক্রেতাদের আগ্রহ বিক্রেতাদের আগ্রহ অপেক্ষা বেশি বলিয়া চায়ের দাম বাড়িয়া যাইবে।

১১নং চিত্রে DD′ বক্ররেখায় চায়ের চাহিদা এবং SS′ বক্ররেখায় চায়ের যোগান পরিমাপ করা হইয়াছে।
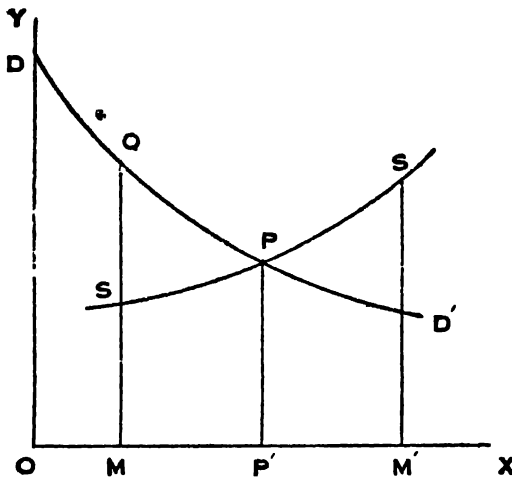
১১নং চিত্র

এই দুইটি রেখা P বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করিতেছে। PP′ মূল্যে ক্রেতারা OP′ পরিমাণ চা কিনিবে এবং বিক্রেতারাও OP′ পরিমাণ চা বিক্রয় করিবে। যদি দাম OM হয়, তবে চাহিদা-রেখা অনুসারে ক্রেতারা OM পরিমাণ চা কিনিতে চাহিবে, অথচ বিক্রেতারা OM′ পরিমাণ চা বিক্রয় করিতে চাহিবে। বিক্রেতার অধিক বিক্রয়ের ইচ্ছার ফলে দাম PP′তে নামিয়া আসিবে এবং ইহাই স্থির-মূল্য।

চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন (Changes in demand and supply): এখন আমরা চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের ফল কি ইহা আলোচনা করিব।

জিনিসের চাহিদা বাড়িতে বা কমিতে পারে। এই বাড়া অথবা কমার অর্থ ভালভাবে বুঝিতে হইবে। যোগানের পরিবর্তনের ফলে যদি দাম বাড়ে অথবা কমে, ইহার ফলে চাহিদা কমিতে অথবা বাড়িতে পারে। দাম পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হয় ইহাকে আমরা চাহিদার হ্রাস ও বৃদ্ধি বলি না। এইক্ষেত্রে চাহিদার তালিকার কোন পরিবর্তন হয় না, কেবলমাত্র মূল্য পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে বা কমে।

চাহিদার পরিবর্তনের অর্থ এই যে, পূর্বে যে দাম ছিল সেই একই দামে লোকে এখন বেশি বা কম জিনিস কিনিতে চায়।

নানা কারণে চাহিদার পরিবর্তন হইতে পারে। প্রথমত, লোকসংখ্যা বাড়িলে কোন জিনিসের দাম পরিবর্তিত না হইয়াও চাহিদা বাড়িতে পারে। যে দেশে লোকসংখ্যা বাড়িতেছে সেখানে ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাহিদা বাড়ে। দ্বিতীয়ত, ক্রেতাদের রুচির পরিবর্তনের ফলেও চাহিদা পরিবর্তিত হয়। রুচির পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে বিড়ি অপেক্ষা সিগারেটের চাহিদা বাড়িয়াছে। তৃতীয়ত, ক্রেতাদের আয় বাড়া-কমার ফলে চাহিদা বাড়িতে বা কমিতে পারে। আয় বাড়িলে কোন কোন জিনিসের চাহিদা বাড়ে, কিন্তু "নিম্নস্তরের" জিনিসের চাহিদা কমে। চতুর্থত, অন্যান্য জিনিসের দাম পরিবর্তনের ফলেও সেই জিনিসটির চাহিদা পরিবর্তিত হইতে পারে। যেমন কফির দাম বাড়িবে, চায়ের দাম পূর্বের মত থাকিলেও হয়ত চায়ের চাহিদা বাড়িবে। এই সব কারণে দামের পরিবর্তন না হইলেও জিনিসের চাহিদার পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে পুরাতন চাহিদা-রেখার পরিবর্তন হইবে; উহা হয় উপরে উঠিবে, নয় নীচে নামিবে। নীচের ১২নং চিত্রে বিষয়টি বোঝান হইয়াছে।

১২নং চিত্র
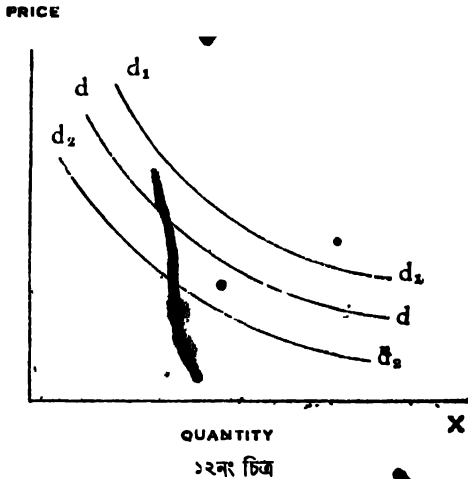
dd বক্ররেখা প্রথম চাহিদা-রেখা। চাহিদা বাড়িলে রেখাটি উপরের দিকে উঠিয়া d_1d_1 আকার ধারণ করে। আর চাহিদা কমিলে রেখাটি

নীচের দিকে নামিয়া d_2d_2 আকার ধারণ করে। চাহিদা পরিবর্তিত হইলে সব দামেই ক্রেতারা বেশি অথবা কম কিনিবে।

যোগানের পরিবর্তন (Changes in supply) : চাহিদার মতই যোগানের পরিবর্তন বলিলে সমস্ত SS যোগান রেখাটির স্থান পরিবর্তন বোঝায়।
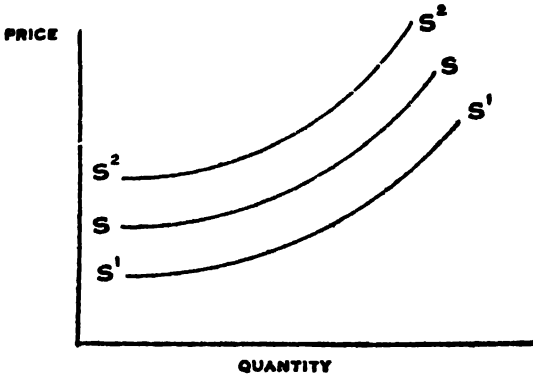
১৩নং চিত্র

এই চিত্রে SS প্রথম যোগান-রেখা। যোগান বাড়িলে উহা S^1S^1 আকার ধারণ করিবে। ইহার অর্থ এই যে, যে কোন দামেই বেশি জিনিস পাওয়া যাইবে অথবা একই পরিমাণ জিনিস কম দামে পাওয়া যাইবে যোগান কমিলে রেখাটি S^2S^2 আকার ধারণ করিবে।
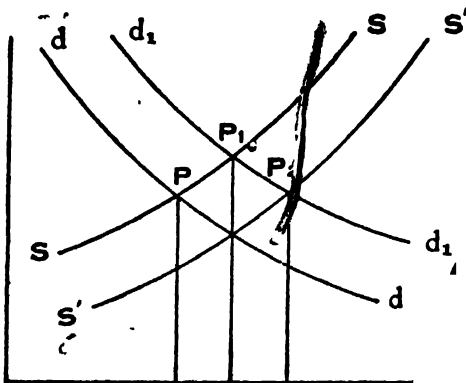
১৪নং চিত্র

চাহিদা ও যোগানের সাম্য (Equilibrium with demand and supply) : ধর, চাহিদা বাড়িয়াছে এবং ইহার ফলে চাহিদা-রেখা d_1d_1 আকার ধারণ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে যোগান নাও বাড়িতে পারে। নূতন চাহিদা-রেখা পুরাতন যোগান-রেখা SS-কে P বিন্দুর স্থলে P^1 বিন্দুতে ছেদ করিবে।

অর্থাৎ জিনিসটির দাম বাড়িবে। যোগানও যদি বাড়ে তাহা হইলে নূতন যোগান-রেখা S′S′ রূপ ধারণ করিবে এবং নূতন চাহিদা-রেখাকে P_2 বিন্দুতে ছেদ করিবে। এই দাম পূর্বের P বিন্দুর দাম হইতে কম হইতে পারে অথবা বেশি হইতে পারে। চাহিদা-রেখার অপেক্ষা যোগান-রেখার পরিবর্তন বেশি হইলে নূতন দাম পূর্বের দাম অপেক্ষা কম হইবে ; আর চাহিদা-রেখার পরিবর্তন বেশি হইলে নূতন দাম পূর্বের দাম হইতে বেশি হইবে।

Exercises

Q. 1. State the law of demand. Discuss the relationship between the law of diminishing utility and the law of demand. (C. U. 1934)

Q. 2. Consider the effects of increased demand upon the price of wheat and cotton-goods. (C. U. 1934).

Q. 3. What is competition ? Can more than one-price prevail in a market when there is unlimited competition ? (C. U. '55. '49).

Q. 4. Illustrate the law of demand by a suitable scheme of demand and prices. (C. U. 1953).

পঞ্চদশ অধ্যায়

চাহিদা-রেখার বৈশিষ্ট্য

(Characteristics of the Demand Curve)

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of demand) : দামের পরিবর্তন হইলে চাহিদাও পরিবর্তিত হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে চাহিদা বেশি মাত্রায় পরিবর্তিত হয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অল্প মাত্রায় পরিবর্তিত হয়। দাম পরিবর্তনের ফলে যে হারে চাহিদা পরিবর্তিত হয় ইহাকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে[১]। ইহার দ্বারা চাহিদার উপর দামের প্রতিক্রিয়া বোঝা যায়। যদি e স্থিতিস্থাপকতা হয় তবে

$$e = \frac{\text{চাহিদা পরিবর্তনের হার}}{\text{দাম পরিবর্তনের হার}}$$

যদি দাম ও চাহিদার পরিবর্তন শতকরা এক হয় তবে $e = ১$। ইহা একক-স্থিতিস্থাপকতার উদাহরণ। কিন্তু দাম শতকরা ১ ভাগ পরিবর্তিত হইলে যদি চাহিদা শতকরা ২ ভাগ পরিবর্তিত হয় তবে $e = ২$। এক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা এককের অধিক। আবার দাম শতকরা ১ ভাগ পরিবর্তিত হওয়ার ফলে যদি চাহিদা শতকরা ½ ভাগ পরিবর্তিত হয় তবে $e = ½$, অর্থাৎ স্থিতিস্থাপকতা একক হইতে কম। e এককের বেশি হইলে চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক (elastic) বলে, আর e এককের কম হইলে চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক (inelastic) বলে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কি উপায়ে নির্ণয় করা যায়? Marshall একটি পদ্ধতির কথা বলিয়াছেন। দামের সামান্য পরিবর্তন হইলে ক্রেতারা বেশি বা কম অথবা পূর্বের মতই জিনিস কিনিবে। কেনার ফলে তাহারা

১। দামের পরিবর্তন খুব অল্প ধরিতে হইবে। না হইলে কতকগুলি অসুবিধা দেখা দেয়। ধর, প্রতি পাউণ্ড চায়ের দাম ৬৲ হইতে ৫৲ টাকায় নামিয়া গেল। উচ্চ মূল্য (অর্থাৎ ৬৲) অনুসারে দাম শতকরা ১৬৬ ভাগ কমিয়াছে। কিন্তু নূতন দাম ৫৲ অনুসারে দাম পূর্বে শতকরা ২০ ভাগ বেশি ছিল বলা চলে। কোনটি ধরিব? যখন দামের পরিবর্তন খুব কম ধরা হয় তখন এই অসুবিধা দেখা দেয় না। মোট আয় অনুসারে স্থিতিস্থাপকতা মাপার এই অসুবিধা দূরীকরণের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

কিনিতে মোট যা অর্থব্যয় করিত, ইহার পরিমাণ সমান থাকিতে পারে অথবা কম বা বেশি হইতে পারে। দাম এবং মোট বিক্রয়ের পরিমাণ গুণ করিলে ক্রেতারা জিনিসটির জন্য কত অর্থব্যয় করিয়াছে ইহার হিসাব পাওয়া যাইবে। ইহা মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা টোটাল রেভিনিউ। দাম শতকরা একভাগ কমার ফলে যদি চাহিদা শতকরা ১ ভাগের বেশি বাড়ে তবে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ বাড়িবে। অর্থাৎ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যদি একের বেশি হয় তবে দাম কমিলে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ বাড়িবে এবং দাম বাড়িলে ইহা কমিবে। স্থিতিস্থাপকতা যদি একের কম হয় তবে, দাম বাড়িলে বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ বাড়িবে এবং দাম কমিলে ইহা কমিবে। স্থিতিস্থাপকতা একের সমান হইলে, দাম যাহাই হউক না কেন, মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ সমান থাকিবে। নিম্নে উদাহরণগুলির দ্বারা বিষয়টি বোঝান যাইতে পারে।

১নং তালিকা

প্রতি পাউণ্ড চায়ের দাম ও বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণের সম্পর্ক

দাম	বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ	মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ
৬৲ টাকা পাউণ্ড	১০০০ পাউণ্ড	৬০০০৲ টাকা
৫৲ " "	১২০০ "	৬০০০৲ "
৪৲ " "	১৫০০ "	৬০০০৲ "

এক্ষেত্রে দাম পরিবর্তনের হার যাহাই হইক না কেন বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ এমনভাবে বাড়ে বা কমে যে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ সমান থাকে। ইহা একক স্থিতিস্থাপকতার নিদর্শন।

অন্য বাজারে ভিন্ন প্রকারের সম্বন্ধ থাকিতে পারে। দ্বিতীয় তালিকায় ইহাই দেখান হইয়াছে :

২নং তালিকা

দাম	বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ	মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ
৬৲ টাকা পাউণ্ড	১০০০ পাউণ্ড	৬০০০৲ টাকা
৫৲ " "	১৩০০ "	৬৫০০৲ "
৪৲ " "	১৮০০ "	৭২০০৲ "

এখানে বিক্রীত দ্রব্য এমন হারে বাড়িতেছে যে দাম কমিলেও মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ বাড়িতেছে। এখানে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একের বেশি। ইহাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদার নিদর্শন বলা হয়।

৩নং তালিকায় আর একটি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে :

৩নং তালিকা

দাম	বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ	মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ
৬৲ টাকা পাউণ্ড	১০০০ পাউণ্ড	৬০০০৲ টাকা
৫৲ " "	১১০০ "	৫৫০০৲ "
৪৲ " "	১২৫০ "	৫০০০৲ "

দাম পড়ার ফলে মোট বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িতেছে স— নাই। কিন্তু ইহা খুব কম মাত্রায় বাড়ে বলিয়া মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ না বাড়িয়া কমিতে থাকে। এখানে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একের কম বলা হয় অর্থাৎ চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। এইভাবে মোট বিক্রয়ের পরিমাণের বাড়া-কমার হিসাব করিয়া চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা স্থির করা হয়।

এই তিনটি উদাহরণ রেখাচিত্রের দ্বারাও বোঝান যায় :
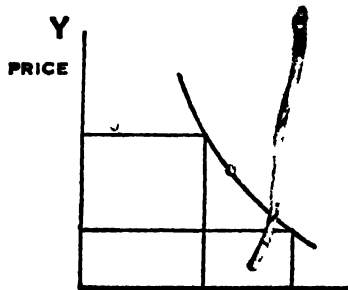
UNIT-ELASTICITY

একক স্থিতিস্থাপকতা

১০নং চিত্র
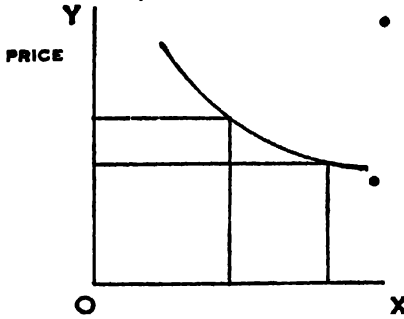
ELASTICITY GREATER THAN UNITY (ELASTIC)

স্থিতিস্থাপকতা একের বেশি

১৬নং চিত্র
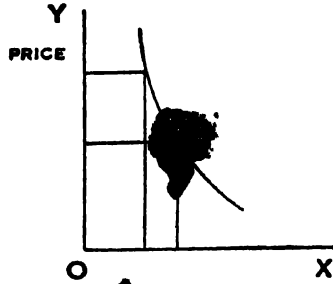
ELASTICITY LESS THAN UNITY (INELASTIC)

স্থিতিস্থাপকতা একের কম

১৭নং চিত্র

[illegible]স্থাপকতার কা[illegible] (Factors determining elasticity of demand)ঃ জিনিসের চাহিদা[illegible] স্থিতিস্থাপকতা কেন বেশি বা কম হয়? চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

জিনিসটির বদলে অনুরূপ অন্য জিনিস পাওয়া যায় কি না ইহার উপরেই ইহাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে। অনুরূপ জিনিস পাওয়া গেলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশি হইবে। যদি চায়ের দাম বাড়ে অথচ কফির দাম না বাড়ে, তবে অনেকে চা ছাড়িয়া কফি ধরিবে। তাহারা

বেশি কফি এবং কম চা পান করিবে। সুতরাং চায়ের দাম অল্প বাড়িলে চাহিদা বেশি পরিমাণ কমিয়া যাইবে। পক্ষান্তরে অনুকল্প জিনিস না থাকিলে, যেমন লবণের বেলায়, ক্রেতারা অন্য জিনিসের দ্বারা চাহিদা মিটাইতে পারে না। সুতরাং দাম বাড়িলেও চাহিদা তেমন কমিবে না।

এইজন্য বিলাস দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক, নিত্যব্যবহার্য বস্তুর চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। লবণ, আটা, চাল ইত্যাদি জিনিস নিত্য প্রয়োজনীয় এবং ইহাদের অনুকল্প জিনিস সহজে মেলে না। সুতরাং এই সব জিনিসের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় না। দাম বাড়িলেও সকলে সাধ্যমত নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করিবে। কিন্তু সাধারণত একটি বিলাসদ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্য ব্যবহার করা যায়। যেমন কলমালেবুর দাম বাড়িলে লোকে কলা কিনিতে পারে। মাংসের দাম বাড়িলে লোকে বেশি মাছ অথবা ডিম কিনিতে পারে। এইজন্য বিলাসদ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশি হয়।

একটি জিনিসের পরিবর্তে অন্য জিনিস ব্যবহার করা যায় কিনা ইহা অনেক সময়ে জিনিসটির দাম এবং ক্রেতাদের আয়ের উপর নির্ভর করে। খুব সস্তা জিনিসের চাহিদা সাধারণত [illegible]াক নয়। ইহাদের দা[illegible] এত কম যে একটু বাড়িলেও লোকে অন্য জিনিসের সন্ধান করে না। লবণের দাম এত কম যে ইহার দাম কিছু বাড়িলেও লোকে ইহা কিনিবে। তেমনি বস্তুটি যদি এমন একশ্রেণীর লোক কেনে যাহারা দামের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না, তবে ইহাদের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইবে। গরিব লোকের চাহিদার অপেক্ষা সাধারণভাবে ধনীর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম। যে জিনিসের দাম ৪৲ টাকা ৫৲ টাকা, তাহার দাম যদি শতকরা ১০৲ টাকা বাড়ে তবে ধনীদের তাহাতে কিছু হইবে না। তাহারা অনুকল্প জিনিসের খোঁজ করিবে না এবং খোঁজ করার কোন প্রয়োজনীয়তাও বোধ করিবে না।

জিনিসটির জন্য যদি আয়ের সামান্য অংশ খরচ হয়, তবে অনুকল্প জিনিস খোঁজার ইচ্ছা কম হইবে। কারণ অল্প দাম বাড়ার জন্য খরচ এত কম বাড়িবে যে কেহ তাহার জন্য মাথা ঘামাইবে না। ফলে জিনিসটির দাম সামান্য বাড়িলেও চাহিদা বিশেষ কমিবে না।

একটি জিনিস নানাভাবে ব্যবহার করার সম্ভাবনা থাকিলে অনুকল্প

জিনিস ব্যবহার করার সম্ভাবনা বাড়ে। বিদ্যুৎ নানা কাজে ব্যবহার করা যায়,—যেমন আলো জ্বালা, রান্না করা ইত্যাদি। প্রত্যেক ক্ষেত্রে ইহার অনুকল্প বস্তু আছে—আলোর জন্য কেরোসিন, রান্না অথবা উত্তাপ সৃষ্টি করার জন্য কয়লা এবং গ্যাস ব্যবহার করা যায়। ধর, এক ইউনিট বিদ্যুতের বর্ত্তমান দামে তাহা শুধু আলোর জন্য ব্যবহার করা হয়। রান্না অথবা উত্তাপের জন্য কয়লা অথবা গ্যাসের তুলনায় ইহার দাম বেশি। কিন্তু বিদ্যুতের দাম কমিলে ইহার রান্নার জন্য ব্যবহার করা যায়। সুতরাং কয়লা অথবা গ্যাসের পরিবর্তে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হইবে এবং বিদ্যুতের চাহিদা বেশ বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং যে সমস্ত জিনিসের বহু প্রকার ব্যবহার আছে ইহাদের চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

বিভিন্ন প্রকার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Different types of elasticity of demand): এ পর্যন্ত আমরা মূল্য পরিবর্তনের হারের সহিত চাহিদা পরিবর্তনের হারের তুলনা করিয়াছি। ইহাকে চাহিদার মূল্যগত স্থিতিস্থাপকতা (price-elasticity of demand) বলে। চাহিদা পরিবর্তনের হার এবং মূল্য পরিবর্তনের হারের অনুপাতকে মূল্যগত স্থিতিস্থাপকতা বলে।

$$\text{মূল্যগত স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদা পরিবর্তনের হার}}{\text{মূল্য পরিবর্তনের হার}}$$

লক্ষ্য করিতে হইবে যে এই স্থিতিস্থাপকতা চাহিদা রেখার একটি বিন্দু অনুসারে হিসাব করা হয়। চাহিদা-রেখার একটি বিন্দুর নিকটে দামের অতি সামান্য পরিবর্তন হইলে চাহিদার কত পরিবর্তন হইবে ইহা হিসাব করা হয়। সেই চাহিদা-রেখার অন্য বিন্দুর নিকটে স্থিতিস্থাপকতা পৃথক হইতে পারে। অতি উচ্চ মূল্যে অথবা অতি অল্প মূল্যে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইতে পারে। কিন্তু মাঝামাঝি দামে হয়ত স্থিতিস্থাপক হয় (সর্বত্র একই চাহিদা-রেখা অনুসারে দাম ধরা হইয়াছে)। মাঝামাঝি দামের বেলায়ও চাহিদা-রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন স্থিতিস্থাপকতা হইতে পারে।

চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা (Income-elasticity of demand): ক্রেতার আয় পরিবর্তনের ফলেও চাহিদা পরিবর্তিত হয়। কাহারও যদি আয় বাড়ে অথচ জিনিসের দাম যদি সমান থাকে, তবে সে

হয়ত পূর্বাপেক্ষা বেশি জিনিস কিনিতে পারে। আমাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত হইলে আমরা মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদির জন্য বেশি খরচ করি, আর সাধারণ খাদ্যের জন্য আয়ের কম অংশ খরচ করি। অর্থাৎ আয় পরিবর্তিত হইলে কোন কোন জিনিসের চাহিদা পরিবর্তিত হয়। ইহাকে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা বলে। চাহিদা পরিবর্তনের হার এবং আয় পরিবর্তনের হারের অনুপাতকে আয়গত স্থিতিস্থাপকতা বলে।

$$\text{আয়গত-স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদা পরিবর্তনের হার}}{\text{আয়-পরিবর্তনের হার}}$$

আয়গত স্থিতিস্থাপকতা হিসাব করার সময় আমরা সেই জিনিস এবং অন্যান্য সব জিনিসের দাম সমান ধরিয়া লই। সাধারণত আয়গত স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক, অর্থাৎ ক্রেতার আয় বাড়িলে সে বেশি পরিমাণে জিনিস কেনে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আয়গত স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক হয়। অর্থাৎ আয় বাড়িলে ক্রেতা কম জিনিস কেনে। "নিম্নস্তরের" বেলায় একথা খাটে। অপরপক্ষে আয় বৃদ্ধির ক্রেতারা যদি আয়ের পূর্বাপেক্ষা বেশি অংশ ব্যয় করে, তবে আয়গত স্থিপিস্থাপকতা এককের অধিক। সাধারণত বিলাস দ্রব্যের বেলায় একথা খাটে।

চাহিদার ক্রস্ স্থিতিস্থাপকতা (Cross-elasticity of demand): দুইটি জিনিসের চাহিদার এমন যোগাযোগ থাকিতে পারে যে একটির দাম পরিবর্তিত হইলে অপরটির দাম সমান থাকিলেও তাহার চাহিদা পরিবর্তিত হয়। অন্য জিনিসের দাম পরিবর্তনের ফলে একটি জিনিসের চাহিদার পরিবর্তনকে ক্রস্ স্থিতিস্থাপকতা বা (cross-elasticity) বলে। X-এর চাহিদা পরিবর্তনের হার ও Y-এর দাম পরিবর্তনের হারের অনুপাতকে cross-elasticity বলে।

$$\text{ক্রস্ স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{X-এর চাহিদা পরিবর্তনের হার}}{\text{Y-এর দাম পরিবর্তনের হার}}$$

দুইটি জিনিস সম্যক অনুকল্প হইলে একটির দাম বাড়িলে অপরটির চাহিদা বাড়ে। যেমন, কফির দাম বাড়িলে, চায়ের দামও বাড়ে। পক্ষান্তরে দুইটি জিনিস যদি সহ-ভোগ্য (joint demand) হয়, যেমন রুটি ও মাখন, তবে রুটির দাম কমিলে মাখনের দাম বাড়িতে পারে। রুটির

দাম কমিলে রুটির বিক্রয় বাড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাখনের দামও বাড়িবে। আবার রুটির দাম বাড়িলে [illegible] কমিবে এবং তাহার ফলে মাখনের চাহিদা কমিবে। [illegible] জিনিসের ক্রস্ স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক, সহ-ভোগ্য জিনিসের [illegible]স্থাপকতা ঋণাত্মক।

চাহিদার স্থি[illegible]কতা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বক্তব্য (Further notes on the elasticity of demand): আমরা চাহিদার তিন প্রকার স্থিতিস্থাপকতার কথা বলিয়াছি, যথা—এক স্থিতিস্থাপকতা, অপেক্ষাকৃত বেশি স্থিতিস্থাপকতা এবং অপেক্ষাকৃত কম স্থিতিস্থাপকতা। আরও দুই প্রকার স্থিতিস্থাপকতার কথা বলা প্রয়োজন—পূর্ণ স্থিতিস্থাপকতা এবং পূর্ণ অস্থিতিস্থাপকতা। দামের সামান্য পরিবর্তনের ফলে যদি চাহিদার অসীম পরিবর্তন হয় তবে তাহাকে পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। পরন্তু দামের যাহাই পরিবর্তন হউক না কেন চাহিদা যদি সমান থাকে তবে তাহাকে পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। একটি রেখা ১৮নং চিত্রের দ্বারা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বোঝান যায়। ১৯নং চিত্রের রেখা পূর্ণ অস্থিতিস্থাপকতাহীন চাহিদা [illegible]তেছে।

১৮নং চিত্র

PERFECTLY INELASTIC DEMAND
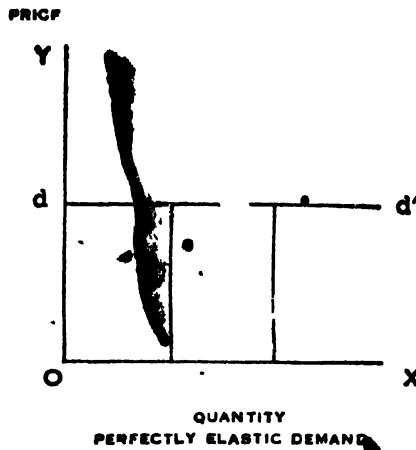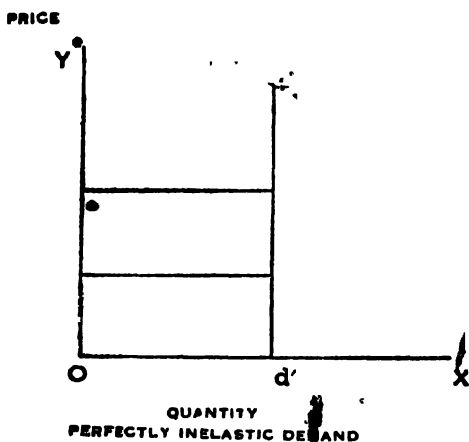
১৯নং চিত্র

এ যাবৎ আমরা ব্যক্তিগত চাহিদার তালিকা এবং শিল্পের মোট চাহিদার তালিকা আলোচনা করিয়াছি। এরূপ চাহিদার তালিকা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হইতে পারে না। যেহেতু আমাদের আয় সীমাবদ্ধ, আমরা কোন জিনিস অপরিমিত [illegible] কিনিতে পারি না। কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি বি[illegible] চাহিদা-রেখা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। শিল্পের প্রকৃতি এবং চাহিদা-রেখার সম্পর্কের কথা এবার আমরা আলোচনা করিব।

বিক্রেতার চাহিদা-রেখা (Individual sellers demand curve) : শিল্পের চাহিদা-রেখা অথবা মোট চাহিদা-রেখার দ্বারা বিভিন্ন [illegible]মে কি পরিমাণ জিনিস হইবে ইহা বোঝা যায়। ইহা মোট উৎপাদনের এবং মোট চাহিদার পরিমাণ সূচনা করে। সমস্ত বিক্রেতা সমবেত ভাবে কত জিনিস বিক্রয় করিতে পারিবে তাহাই মোট চাহিদা-রেখা হইতে বোঝা যায়। কিন্তু একজন বিক্রেতা কত জিনিস বিক্রয় করিতে পারিবে তাহা ইহার দ্বারা বোঝা যাইবে না। অবশ্য মোট বিক্রয়ের পরিমাণ যদি বেশি হয় তবে একজন বিক্রেতা হয়ত বেশি বিক্রয় করিতে পারিবে। কিন্তু মোট বিক্রয়ের কত অংশ একজন বিক্রয় করিবে তাহা বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখার উপর নির্ভর করে। একজন বিক্রেতা মোট উৎপাদনের কত

অংশ বিক্রয় করিবে তাহা এই রেখা [illegible] তে বুঝিতে পারা যায়। ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা অংশত শিল্পের [illegible] এবং প্রতিযোগিতার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। [illegible] হিদা-রেখা দেওয়া থাকিলে, ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখার শিল্পের [illegible] তিযোগিতার উপর নির্ভর করে।

প্রতিযোগিতা [illegible] য়েকটি অবস্থার কথা কল্পনা করা যায়। একদিকে অনেক বিক্রেতা একই জিনিস বিক্রয় করিতে পারে। ইহাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বলে। অথবা অনেক বিক্রেতা কিন্তু প্রত্যেক ভিন্ন ধরনের (differentiated) জিনিস বিক্রয় করিতে পারে। ইহাকে একাধিকারিক প্রতিযোগিতা (monopolistic competition) বলে। অথবা একজন বিক্রেতা থাকিতে পারে। ইহাকে একাধিকার বা একচেটিয়া কারবার বলে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে অনেক বিক্রেতা আছে এবং তাহারা সকলে একই জিনিস বিক্রয় করে। প্রত্যেক বিক্রেতা মোট উৎপাদনের সামান্য অংশ বিক্রয় করে। সুতরাং দাম না কমাইয়াও সে তাহার উৎপাদিত সমস্ত পণ্য বাজারে চলিত দামে বিক্রয় করিতে পারে। যদি সে বাজারের দাম অপেক্ষা বেশি [illegible] তবে সে কিছুই বিক্রয় করিতে পারিবে না। কেন না ক্রেতারা [illegible] বিক্রেতাদের নিকট হইতে কম দামে জিনিস কিনিবে। যদি সে বাজারের চেয়ে কম দামে বিক্রয় করে তবে সব ক্রেতা তাহার নিকট আসিবে এবং সে যাহা উৎপাদন করিয়াছে সবই বিক্রয় হইবে। সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা পূর্ণ আস্থিতিস্থাপক। কিন্তু শিল্পের মোট চাহিদা-রেখা আস্থিতিস্থাপক হইতে পারে। যেমন গমের মোট চাহিদা-রেখা অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু গম বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক।

পূর্ণ একাধিকারের ক্ষেত্রে বিক্রেতা মাত্র একজন এবং সে এমন জিনিস বিক্রয় করে যাহার অনুকল্প নাই। ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা ও শিল্পের চাহিদা-রেখা এক্ষেত্রে সমান এবং এই রেখা অস্থিতিস্থাপকতা হওয়াই সম্ভব, কেন না অনুকল্প বস্তু পাওয়া কষ্টকর।

একাধিকারিক প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা অনেক, কিন্তু ভিন্ন ধরনের জিনিস বিক্রয় করে এবং জিনিসগুলি পরস্পরের সমান না হইলেও প্রায়

অনুকল্প। সুতরাং প্রত্যেক বিক্রে[illegible] কিছু কিছু একচেটিয়া ক্ষমতা আছে। সে একটু দাম বাড়িলেও সব [illegible] যায় না। এখানে ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক নহে [illegible] অর্থাৎ [illegible] সাধারণত দক্ষিণে নীচের দিকে নামিবে। ক্রেতাদের যদি এ[illegible] জিনিসের প্রতি বিশেষ মোহ থাকে, তবে ব্যক্তিগত চাহিদা-রে[illegible]কতা কম হইবে।

বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা কম হইলে প্রত্যেকেই মোট যোগানের একটি বড় অংশ বিক্রয় করিতেছে। অপরের উপর তাহার কার্যের প্রভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রত্যেক বিক্রেতা জানে যে তাহাকে বেশি বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হইবে। আবার যদি সে একটু বেশি দাম লইবার চেষ্টা করে তবে প্রতিযোগীরা খরিদ্দার ভাঙ্গাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে পারে—বিশেষত যদি তাহারা দাম না বাড়ায় কিন্তু যদি সে অনেক বিজ্ঞাপন দিয়া তাহার তৈয়ারি জিনিস বাজারের সেরা এই বিশ্বাস ক্রেতাদের মনে জন্মাইতে পারে তবে দাম সামান্য বাড়াইলেও ক্রেতারা সেই জিনিস হয়ত আগের মতই কিনিবে। এইরূপ হইলে দাম পরিবর্তনের ফলে চাহিদা খুব বেশি পরিবর্তিত [illegible] এবং ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখার স্থিতিস্থাপকতা কম হইবে।

Exercises

Q. 1. What do you mean by ela[illegible]ty of demand ? How can it be measured ? What are the f[illegible]ors on which elasticity depends ? Name two articles which a[illegible] elastic in dem[illegible] and two others which are inelastic in supply. (C. U 1946, [illegible]3, '42, '38, '37, '25, '21, '19, '16 ; C. U. B.Com. 1924 ; Agra 19[illegible], '39 ; Dacca 1943, '39 ; Delhi 1933 ; Nag[illegible] 1944, '40 ; Pat[illegible] 1945 Punj. 1942 ; '40, '38).

Q. 2 Would the demand for a commodity be elastic or inelastic, (a) if it is one of the necessaries of life, (b) if there are many possible uses for it, (c) if it has many substitutes, (d) if its use constitutes a habit ? (C. U. 1938, '25).

Q. 3. Explain the meaning of 'Elasticity of supply' and 'Elasticity of demand' and point out the importance of this concept in the theory of value. (C. U. 1957).

অধ্যায়

...সের ... অবস্থা এবং উৎপাদনব্যয়

(Con... Supply and Cost of Production)

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of supply) : চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ... যোগানের স্থিতিস্থাপকতা আলোচনা করিতে হইবে। কোন জিনিসের ... অতি সামান্য বাড়িলে বা কমিলে যোগান যে পরিমাণে পরিবর্তিত হয় ইহাকে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলে। দাম পরিবর্তনের ফলে সব জিনিসের যোগান একই হারে পরিবর্তিত হয় না। কোন কোন জিনিসের যোগান বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হয়। এইক্ষেত্রে জিনিসটির যোগান স্থিতিস্থাপক বলা হয়। আবার দাম সামান্য বাড়া-কমার ফলে যদি যোগান খুব সামান্যই পরিবর্তিত হয়, তবে তাহাকে অস্থিতিস্থাপক যোগান বলে।

কি কি জিনিসের উপর ... স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে? জিনিসটির প্রকৃতি অর্থাৎ বস্তুটি স্থা... ...স্থায়ী ইত্যাদির উপর যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কিছুটা নির্ভর করে। দুধ, মাছ, তাজা তরিতরকারী প্রভৃতির মত যে সব জিনিস ... নষ্ট হইয়া যায় ইহাদের যোগান অস্থিতিস্থাপক। কেননা পচিয়া যাওয়ার পূর্বেই ঐগুলি বিক্রয় করিতে হয়। এই অর্থে শ্রমের যোগানও অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু যে জিনিস স্থায়ী, ইহার বর্তমান দাম কম ...নে হইলে বিক্রেতা ইহা বেশি করিয়া মজুত রাখিতে পারে। সুতরাং ইহাদের যোগান স্থিতিস্থাপক হয়। দ্বিতীয়ত, যে জিনিস বেশি পরিমাণে উৎপাদন করিতে গেলে উৎপাদনব্যয় বেশি হয়, ইহার যোগান অস্থিতিস্থাপক হইবার সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে দাম একটু বাড়িলেও বর্ধিত উৎপাদনব্যয় হইতে হয়ত কম থাকিবে। সুতরাং যোগান বাড়িবে না। সাধারণত, ইহা কৃষি এবং খনিজ পদার্থ—যেখানে হ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম খাটে—সেইক্ষেত্রে এই বিষয় প্রযোজ্য। এই সব জিনিসের যোগান সাধারণত অস্থিতিস্থাপক হয়। তৃতীয়ত, বর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম

(law of increasing returns) ... জিনিসটি উৎপাদন করা সম্ভব হইলে ইহার যোগান স্থিতিস্থাপক নহে ... বাড়ার ফলে যদি দাম বাড়ে, তবে উৎপাদকদের প্রচুর লাভ হইবে ... উৎপাদনের ফলে উৎপাদনব্যয় কমিবে। মনে রাখিতে ... যদি বর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম খাটে তবে দাম কমিলে প্রত্যেকেই স্থিতিস্থাপক হইবে। কেননা উৎপাদকেরা পূর্বের মত উৎপাদন ক... উপর ... উৎপাদনব্যয় বাড়িয়া যাইবে। অবশেষে উৎপাদনপদ্ধতির ... কিছুটা নির্ভর করে। উৎপাদনের পদ্ধতি যদি সহজ হয় ... যন্ত্রের যদি প্রয়োজন না হয়, তাহা হইলে সহজে চাহিদা ও যোগানের সামঞ্জস্য করা যায়। কিন্তু জটিল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন ... চাহিদা ও যোগানের সামঞ্জস্য করা হয়ত সম্ভব নাও হইতে পারে ... যোগান অস্থিতিস্থাপক হইবার সম্ভাবনা বেশি।

উৎপাদনব্যয় (Cost of production) : উৎপাদন বাড়াইলে উৎপাদনব্যয় কমে কি বাড়ে ইহার উপর যোগানের স্থিতিস্থাপকতা অনেকটা নির্ভর করে। একটি ফার্ম কত ... করিবে তাহা উৎপাদনব্যয় এবং জিনিসটির দামের উপর নির্ভর ...

উৎপাদন ব্যয় বলিলে আমরা কি বুঝি ? একটি জিনিস তৈয়ারি করিতে গেলে ইহার জন্য কিছু ব্যয় করিতে হয়। ... যন্ত্রপাতি বসান, কাঁচা মাল কেনা, মজুরী দেওয়া ইত্যাদির বাবদ ব্যয় ... ভিন্ন উপকরণকে উৎপাদনের কাজে লাগাইতে যে টাকা খরচ হয় তাহাই উৎপাদনব্যয়। ইহার মধ্যে (১) কাঁচা মালের দাম, (২) মজুরী ও বেতন, (৩) নিয়োজিত মূলধনের সুদ, (৪) বাড়িঘরের খাজনা, (৫) বাড়িঘর, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ক্ষয়-ক্ষতিপূরণ বাবদ ব্যয়, (৬) পরিচালকদের লাভ, (৭) অন্যান্য ব্যবসায় সংক্রান্ত খরচ (যেমন বিক্রয়ের খরচ, বিজ্ঞাপনের খরচ ইত্যাদি) এবং (৮) কর ইত্যাদি ধরা হয়। যে সমস্ত উপকরণ কোম্পানী কেনে এবং দাম দেয় কেবল সেইগুলিই যে ব্যয়ের অন্তর্গত তাহা নয়। যে সমস্ত উপকরণের জন্য দাম দিতে হয় না, অথচ ব্যবহার করা হয় সেগুলির আরোপিত (imputed) মূল্যও মোট ব্যয়ের অন্তর্গত। পরিচালক যদি নিজেই মালিক হয়, তবে তাহার আরোপিত বেতন মালিকের জমির

আরোপিত খাজনা এবং তাহার [illegible] অর্জিত মূলধনের সুদ এই হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে। [illegible]

প্রাথমি[illegible] (Prime or variable) এবং **অনুপূরক বা অপরিব[illegible]** ([illegible]plementary or fixed) **ব্যয়:** যে যে বিষয়ের জন্য উৎ[illegible] ইহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে কতকগুলি ব্যয়ের পরিমাণ উৎপাদন বাড়া-কমার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে ও কমে। আবার কতকগুলি বিষয়ের ব্যয় উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। উৎপাদন কম হউক কি বেশি হউক এই ধরনের ব্যয়ের পরিমাণ একই থাকে। উৎপাদনের পরিম[illegible]ড়া-কমার সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যয় বাড়ে ও কমে ইহাকে প্রাথমিক বা পরি[illegible]বলা হয়। উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে স[illegible]বর্তন হয়। উৎপাদন বাড়াইতে গেলে বেশি পরিমাণে কাঁচ[illegible]আনিতে হইবে, আরো বেশি সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োগ করিতে হইবে[illegible]ং এই বাবদ যে ব্যয় করা হয় ইহা উৎপাদনের পরিমাণের [illegible]। কোন কারণে সাময়িকভাবে যদি উৎপাদন বন্ধ রাখিতে [illegible]বদ ব্যয়ও থাকে না।

[illegible]উৎপাদন কম হউক ব[illegible]ক যে ব্যয়ের পরিমাণ একই থাকে তাহাকে অপরিবর্তনীয় ব্যয় ব[illegible]। উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধ করিলেও এই ব্যয় টানিয়া যাই[illegible]। ব্যবসায়ীরা ইহাকে (overhead costs) বলেন। সাধারণত খাজ[illegible]র্ঘমেয়াদী কর্জের সুদ, ক্ষয়ক্ষতির বাবদ ধার্য ব্যয়, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদে[illegible] বেতন ইত্যাদিকে অপরিবর্তনীয় ব্যয় এবং অতিরিক্ত শ্রমিকদের মজুরি, কাঁচামালের দাম, আলো ও শক্তি ইত্যাদির জন্য ব্যয়ের অধিকাংশকে পরিবর্তনীয় বলে।

এই দুই প্রকার ব্যয়ের মধ্যে অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই কোন পার্থক্য করা যায় না। আবার এই দুই-এর পার্থক্য অনেক সময়েই কোম্পানীর নীতির উপর নির্ভর করে। যদি শ্রমিকদের সহিত কোম্পানীর পাঁচ বৎসরের জন্য নিয়োগের চুক্তি থাকে, তবে উৎপাদন না করিলেও তাহাদের বেতন দিতে হইবে। তখন শ্রমিকের মজুরী বাবদ ব্যয়কে অপরিবর্তনীয় ব্যয় বলিতে হইবে।

এমন কথা উঠিতে পারে যে মোট ব্যয়কে এই ভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ

কোম্পানীও বিভিন্ন জিনিসের জন্য পৃথক ভাড়া লয়। তামা অপেক্ষা কয়লার ভাড়া কম বলিয়া কেহ তামার পরিবর্তে কয়লা ব্যবহার করে না।

দ্বিতীয়ত, জিনিসটির চাহিদা, কম দামের বাজার হইতে বেশি দামে বাজারে চালান দেওয়া সম্ভব না হইলে মূল্যভেদ করা যায়। আর্থিক অবস্থার তারতম্যের উপর যদি মূল্যভেদ নীতি প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহা হইলে ইহা সম্ভব হয়। ডাক্তার গরিব লোকের কাছে কম ফি নেয় বলিয়া ধনী গরিব হইতে চাহিবে না। এদেশের লোকের নিকট কম দামে ও অন্য দেশে বেশি দামে বিক্রয় করা হইলে বেশি দামের দেশের লোক প্রথম দেশে যাইবে না। অনেক ক্ষেত্রে পুনরায় বিক্রয় করার সম্ভাবনা থাকিলে একচেটিয়া ব্যবসায়ী ক্রেতার সহিত এমন চুক্তি করিতে পারে যে তাহারা বেশি মূল্যের বাজারে জিনিসগুলি পুনরায় বিক্রয় করিতে (Re-exports) পারিবে না। ইহা করা সম্ভব হইলে বিভিন্ন ক্রেতার নিকট বিভিন্ন দামে বিক্রয় করা যায়।

মূল্যভেদ ব্যক্তিগত, স্থানীয় অথবা ব্যবসায়গত হইতে পারে। যখন ক্রেতার চাহিদা অথবা সঙ্গতি অনুসারে দামের তারতম্য করা হয় তখন তাহাকে ব্যক্তিগত মূল্যভেদ বলা হয়। যাহাদের কিনিবার ইচ্ছা প্রবল অথবা যাহাদের আয় বেশি তাহাদের নিকট বেশি দাম চাওয়া হয়। অনেক সময় আভিজাত অঞ্চলের বাসিন্দাদের নিকট বেশি দাম চাওয়া হয়। সব সময় এই ধরনের মূল্যভেদ সম্ভব হয় না। কেননা ক্রেতারা জানিতে পারিলে তাহাদের মধ্যে অসন্তোষ উপস্থিত হইতে পারে। তাহাতে ব্যবসায়ীর ক্ষতি হয়।

এক জায়গায় কম দাম অন্য জায়গায় বেশি দাম চাওয়াকে স্থানীয় মূল্যভেদ বলা হয়। ডাম্পিং (dumping) স্থানীয় মূল্যভেদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দেশের মধ্যে যে দামে জিনিস বিক্রয় করা হয় বিদেশে ইহা অপেক্ষা কম দামে বিক্রয় করা হইলে ডাম্পিং বলে।

এক ব্যবসায়ের লোকের নিকট কম দাম ও অন্য ব্যবসায়ের লোকের নিকট বেশি দাম চাওয়াকে ব্যবসায়গত মূল্যভেদ বলে। সাধারণত বাড়িতে আলো-জ্বালার জন্য ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বেশি দামে এবং কারখানার ব্যবহৃত বিদ্যুৎ কম দামে বিক্রয় করা হয়। ইহাকে ব্যবসায়গত মূল্যভেদ বলে।

এইরূপ মূল্যভেদ সম্ভব হইলে, বিভিন্ন বাজারে একই জিনিস ভিন্ন ভিন্ন দামে বিক্রয় হইতে পারে। সব বাজারেই জিনিসটির দাম একচেটিয়া দামের নীতি অনুসারে স্থিরীকৃত হয়। প্রতি বাজারে এমন দাম স্থির করা হয় যাহাতে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় সমান হয়। বাজারের সংখ্যা যাহাই হউক না কেন একচেটিয়া ব্যবসায়ীর প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় একই। সুতরাং প্রতি বাজারের প্রান্তিক আয়ও সমান হয়। কিন্তু এক এক বাজারে এক এক রকম দাম থাকে। ইহার কারণ আবার অনেক সময়ে ব্যবহারগত মূল্যভেদও করা হয়। যেমন কলিকাতার বাড়িতে আলো জ্বালা ও পাখা চালাইবার কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বেশি দামে ও রান্নার জন্য ব্যবহৃত বিদ্যুৎ কম দামে বিক্রয় করা হয়। একই বাড়ির মালিক দুই রকম দামে বিদ্যুৎ কেনে। প্রত্যেকটি বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ভিন্ন। প্রত্যেক বাজারের প্রান্তিক আয় সেই বাজারের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে। চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয়, তবে সেই বাজারে দাম কম হইবে। কিন্তু চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয় তবে দাম বেশি হইবে। যেমন কলিকাতায় আলো জ্বালাইবার ও পাখা চালাইবার জন্য বিদ্যুতের বেশি চাহিদা আছে। অর্থাৎ এই কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুতের চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম স্থিতিস্থাপক। কাজেই দাম একটু বেশি রাখিলেও বিদ্যুতের চাহিদা বিশেষ কমিবে না। কিন্তু রান্নায় ব্যবহৃত বিদ্যুতের দাম কম না রাখিলে লোকেরা এই কাজে কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করিবে। তাহারা কয়লার উনুনেই সব কাজ চালাইবার চেষ্টা করিবে। সুতরাং রান্নায় ব্যবহৃত বিদ্যুতের দাম কম রাখিতে হইবে। এইখানে বিদ্যুতের চাহিদা বেশি স্থিতিস্থাপক। দুইটি বাজারের মধ্যে যেটিতে চাহিদা বেশি স্থিতিস্থাপক সেখানে দাম কম এবং যেটিতে চাহিদা কম স্থিতিস্থাপক সেখানে দাম বেশি হইবে।

একজনের নিকট কম দামে ও অন্যের নিকট বেশি দামে বিক্রয় করাটা সাধারণভাবে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এইরূপ মূল্যভেদের ফলে বিক্রেতার উপকার হয়; এমন কি অনেক সময়ে সমাজেরও উপকার হয়। কোন কোন ক্রেতা বেশি দামে কিনিতে কোন আপত্তি নাও করিতে পারে। আবার দাম বেশি হইলে অনেকে কিনিবে না। ধর, জিনিসটি একই দামে

বিক্রয় করিতে হইবে। সেই দাম বেশি হইতে পারে, আবার কমও হইতে পারে। বেশি দাম হইলে কেবল অবস্থাপন্ন লোকেরাই তাহা কিনিবে। সে ক্ষেত্রে বিক্রয়ের পরিমাণ ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ কম হইবে এবং উৎপাদনব্যয় হয়ত উঠিবে না। অবশ্য দাম কমাইয়া দিলে বহু গরিব ক্রেতারাও জিনিসটি কিনিবে এবং বিক্রয়ের পরিমাণও বাড়িবে। কিন্তু বিক্রয়লব্ধ অর্থ হয়ত এত বেশি হইবে না যে বিক্রেতার ঠিকমত লাভ হইবে। এ অবস্থায় মূল্যভেদ করা সম্ভব হইলে তাহার ফল ভাল হইতে পারে। ধনী বেশি দাম দিতে রাজী আছে। সুতরাং তাহাদের নিকট বেশি দাম এবং গরিবদের নিকট কম দাম চাহিলে বিক্রয়ের পরিমাণ বেশি হইবে। ফলে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ মোট ব্যয়ের সমান হইবে। যদি উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে গড়পড়তা ব্যয় কমে, তাহা হইলে আরও ভাল হয়। সমাজ ও ক্রেতারা উভয়েই উপকৃত হইবে।

মূল্যভেদ নীতি অনুসৃত হইলে একদল ক্রেতাকে বেশি দাম দিতে হইবে, আর একদল ক্রেতা কম দাম দিবে। যাহারা বেশি দাম দিবে তাহাদের এবং যাহারা কম দাম দিবে তাহাদের লাভ। যাহারা বেশি দাম দেয় তাহারা যদি ধনী হয়, আর যাহারা কম দাম দেয় তাহারা যদি দরিদ্র হয়, তবে ধনিকশ্রেণীর যে ক্ষতি হইতে পারে ইহা অপেক্ষা দরিদ্র শ্রেণীর লাভ বেশি হইতে পারে। এক্ষেত্রেও মূল্যভেদের ফলে ক্ষতি অপেক্ষা লাভের পরিমাণ বেশি হয়।

ডাম্পিং নীতি (dumping)**:** বিভিন্ন দেশের মধ্যে মূল্যভেদকে ডাম্পিং বলা হয়। যদি একচেটিয়া ব্যবসায়ী বিদেশে দেশের অপেক্ষা কম দামে জিনিস বিক্রয় করে তবে ডাম্পিং করা হইতেছে বলা হয়। বিদেশী বাজারের দাম, উৎপাদনব্যয় হইতে বেশি হইতেও পারে অথবা কমও হইতে পারে। দেশে একচেটিয়া ব্যবসায় থাকার ফলে সেখানকার বাজারের দাম, উৎপাদনব্যয়ের অনেক বেশি হইতে পারে। সে অবস্থায় বিদেশী বাজারের দাম, দেশের বাজারের দামের অপেক্ষা কম হইলেও গড়পড়তা উৎপাদনব্যয় হইতে বেশি থাকিতে পারে।

নানা কারণে একচেটিয়া ব্যবসায়ী ডাম্পিং করে। চাহিদার ভুল হিসাবের জন্য অনেক সময় যত মাল তৈয়ারি হয়, তাহা সমস্তই বিক্রয় করা

সম্ভব নাও হইতে পারে। ফলে গুদামে বহু মাল অবিক্রিত জমা থাকে ও ব্যবসায়ীর লোকসান হয়। গুদামে যে মাল জমা হইয়া যায় তাহা অন্যত্র কিছু কম দামে বিক্রয় করিতে পারিলেও লোকসান কম হয়। ইহাও ডাম্পিং-এর একটি উদ্দেশ্য হইতে পারে। অথবা নূতন বাজার দখল করার জন্য অথবা ক্রেতাদের শুভেচ্ছা লাভের জন্য অথবা প্রতিযোগিদের বিদেশের বাজার হইতে তাড়াইবার জন্য সে ডাম্পিং করে। অর্থাৎ বিদেশে বেশ কম দামে মাল বিক্রয় করে। অথবা অধিক উৎপাদন করিয়া বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা লাভ করাও একটি উদ্দেশ্য হইতে পারে। কারখানার আয়তন বাড়াইলে হয়ত উৎপাদনব্যয় বেশ কমিয়া যাইবে। কিন্তু সব জিনিস দেশের বাজারে ছাড়িলে দাম হয়ত খুব বেশি নামিয়া যাইবে। সুতরাং দেশে একটু বেশি দামেও বিদেশে কিছু কম দামে বিক্রয় করিয়া লাভ হইতে পারে।

ডাম্পিং এর ফলে বিদেশী উৎপাদকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তাহারাও জিনিসটি কম দামে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। তাই অনেক দেশে ইহা বন্ধ করা হইয়াছে। ডাম্পিং বিরোধী আইন পাস করিয়া এইসব জিনিসের উপর উচ্চহারে আমদানি শুল্ক বসান হয়। ১৯৩৩ সালে জাপানী জিনিসের ডাম্পিং বন্ধ করার জন্য ভারতবর্ষে অনুরূপ আইন পাস করা হইয়াছিল।

Exercises

Q. 1. On what principles does the monopolist fix the price of his products ? Can he charge any price he likes ? (C. U. B.Com. 1956, 1958, 1959).

Q. 2. "There are potent restrictions on the price-fixing powers of the monopolist." Elucidate the statement. (C.U. 1941).

Q. 3. Analyse the effects of an increase in demand for the product of a monopolist on his price and on his output. (C.U. B.Com. 1951).

Q. 4. Indicate the methods and objects of price discrimination under monopoly. (Pun. 1945).

Q. 5. How does monopoly price differ from price determined under competition ? Is monopoly price always higher than competitive price ? (C. U. B.Com. 1959).

একবিংশ অধ্যায়

অপূর্ণ প্রতিযোগিতা ও মূল্য

(Value and Imperfect Competition)

পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবার,—এই দুই শ্রেণীর বাজার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব জগতে সম্পূর্ণ একচেটিয়া অধিকার কমই দেখা যায়। আবার পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব বলিলেও চলে। মানুষের জীবনে যেমন অবিমিশ্র হাসিকান্না থাকে না, বাস্তবের বাজারেও এইরূপ শুধু প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া অধিকার দেখা যায় না। পূর্ণ একচেটিয়া অধিকার থাকার অর্থ জিনিসটির আর দ্বিতীয় কোন উৎপাদক বা বিক্রেতা নাই। এইরূপ অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে হইতে পারে। যেমন কলিকাতায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের অধিকার একমাত্র কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানীকে দেওয়া আছে। আর কোন প্রতিযোগী কোম্পানী কলিকাতা অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিক্রয় করিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া এই কোম্পানীরও পূর্ণ একচেটিয়া অধিকার আছে একথা বলা ঠিক হইবে না। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যুতের পরিবর্তে অন্য জিনিস ব্যবহার করা চলে ততক্ষণ কোম্পানীর পূর্ণ একচেটিয়া অধিকার আছে বলা যায় না। লোকেরা দরকার হইলে বিদ্যুতের পরিবর্তে গ্যাসের আলো বা কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বালাইতে পারে। রান্নার জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার না করিয়া কয়লা, গ্যাস ও অন্য জিনিস ব্যবহার করিতে পারে। পাটের চাষে পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার একচেটিয়া অধিকার আছে বলা হয়। কিন্তু প্রয়োজন হইলে পাটের থলির বদলে কাপড়ের থলি ব্যবহার করা চলে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে পূর্ণ একচেটিয়া অধিকার খুব কম ক্ষেত্রেই বর্তমান থাকে। সাধারণত একচেটিয়া অধিকারের সঙ্গে অন্তত কিছুটা প্রতিযোগিতার খাদ মেশানো থাকেই। যতক্ষণ পর্যন্ত একচেটিয়া কারবারীর উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য ব্যবহারের আশংকা বা সম্ভাবনা আছে—ততক্ষণ অবিমিশ্র একচেটিয়া অধিকার আছে বলা যায় না। একচেটিয়া কারবারীকেও অধিকাংশ সময়ে কিছু কিছু প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়।

সেইরূপ পূর্ণপ্রতিযোগিতা প্রায় বিরল বলিলেও চলে। পূর্ণপ্রতিযোগিতার নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করিলেই সত্যিকার বাজারে ইহা বর্তমান থাকা যে কতখানি অসম্ভব তাহা বুঝা যাইবে। পূর্ণপ্রতিযোগিতার অর্থ—বাজারে বহু ক্রেতা ও বিক্রেতা আছে। ইহারা প্রত্যেকে মোট যোগানের খুব সামান্য অংশ কেনাবেচা করে। সুতরাং একজনে কিছু বেশি বেচিতে বা কিনিতে চাহিলে বাজারদর একটুও পরিবর্তিত হইবে না। প্রত্যেক বিক্রেতা বাজার দর জানে এবং যে সর্বাপেক্ষা কম দামে বেচিতেছে তাহার নিকট হইতে জিনিস কেনে। বিভিন্ন বিক্রেতার জিনিসের মধ্যে সে কোন পার্থক্য করে না। অর্থাৎ লর্ডস্ মাখন কি পলসন মাখন, লিপটন বা ব্রুকবণ্ডের বা টসের চা, পিয়ার্সের বা হিমানীর গ্লিসারিন সাবান—ইহাদের কোন কিছুর মধ্যে কোন ক্রেতা একটুও পার্থক্য করে না। ইহাদের একই জিনিস বলিয়া মনে করে। কোন বাস্তব বাজারে এই সব কয়টি লক্ষণ মেলে কিনা সন্দেহ। বিশেষ করিয়া ক্রেতারা খুব কমক্ষেত্রেই মনে করে যে বিভিন্ন বিক্রেতার জিনিসের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই বা বিভিন্ন ব্রাণ্ডের জিনিস আসলে একই পদেই কিংবা আমরা যদি বন্ধু, আত্মীয় বা বিশেষ পরিচিত লোকের দোকানে গিয়া দাম সম্বন্ধে অনুসন্ধান না করিয়া জিনিস কিনিয়া যাই তবে প্রতিযোগিতা পূর্ণ আছে বলা চলে না। দোকানদার বন্ধুত্ব বা পরিচয়ের সুযোগ নিয়া আমাদের নিকট একটু বেশি দামে জিনিস বিক্রয় করিতে পারে। আমরা দাম সম্বন্ধে কোন খোঁজ করি না বলিয়া ইহা জানিব না। কিংবা কোনক্রমে জানিলেও হয়ত চক্ষুলজ্জার বশে কেনা বন্ধ করিব না। অথবা যদি আলস্যবশত একটু দূরে যাওয়ার হাঙ্গামা বাঁচাইবার জন্য নিকটের দোকানে একটু বেশি দাম দিয়া জিনিস কিনি, তবে পূর্ণপ্রতিযোগিতার খুঁত ধরিবে। পরিচালক মাত্রেই সবসময়ে বিজ্ঞাপন দিয়া ক্রেতাদের মন এমন ভাবে প্রভাবান্বিত করিতে চেষ্টা করে যাহাতে বাজারে তাহার অন্তত কিছুটা একচেটিয়া অধিকার জন্মায়। অর্থাৎ ক্রমাগত বিজ্ঞাপন দেখার ফলে ক্রেতাদের মনে যদি ধারণা হয় যে তাহার জিনিসটি অন্য উৎপাদকের জিনিস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তবে তাহার উদ্দেশ্য সফল হইল। সে জিনিসটির দাম কিছু বেশি করিলেও ক্রেতারা ইহা কিনিয়া যাইবে। কারণ তাহারা বিশ্বাস করে যে, ইহা অন্য জিনিস হইতে বেশি ভাল। অর্থাৎ সেই পরিচালকের তৈয়ারি

জিনিসের বাজারে প্রতিযোগিতা পূর্ণ থাকিবে না—তাহার কিছুটা একাধিকার ক্ষমতা জন্মাইবে। সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারেও একচেটিয়া কারবারের কিছু কিছু লক্ষণ প্রায় দেখা যায়। এই মাধ্যমিক অবস্থা যেখানে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বা পূর্ণ একচেটিয়া অধিকার নাই—ইহাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা বা Imperfect Competition বলে।

এইজন্য বলা হয় যে অধিকাংশ বাজারেই পূর্ণপ্রতিযোগিতা বা পূর্ণ একচেটিয়া অধিকার, ইহার কোনটাই থাকে না। হয়ত প্রতিযোগিতার লক্ষণই বেশি দেখা যায়। কিন্তু কিছু না কিছু একচেটিয়া খাদও মিশান থাকে। আবার সম্পূর্ণভাবে প্রতিযোগিতাহীন একচেটিয়া অধিকারও আছে কিনা সন্দেহ।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতা কখন হয়? (Conditions of imperfect competition): কি অবস্থায় প্রতিযোগিতা অপূর্ণ হয়? তিনটি শর্ত বর্তমান থাকিলে প্রতিযোগিতা পূর্ণ বলা হয়। যথা, (১) বাজারে বহু বিক্রেতা ও ক্রেতা আছে এবং ইহাদের প্রত্যেকে মোট যোগানের তুলনায় খুব কম পরিমাণ জিনিস কেনা-বেচা করে। সুতরাং কেহ যদি একটু বেশি বা কম কেনা-বেচা করে ইহাতে বাজারদর বাড়িবে না বা কমিবে না। (২) বাজারে কোথায় কি দামে জিনিস বিক্রয় হইতেছে তাহা ক্রেতারা জানে এবং তাহারা সর্বাপেক্ষা কম দামে জিনিস কিনিতে চায়। (৩) সকল বিক্রেতা একই জিনিস বিক্রয় করে। এইগুলির যে কোন একটি শর্ত পূর্ণ না হইলে প্রতিযোগিতা অপূর্ণ হয়।

বিক্রেতা অথবা ক্রেতার সংখ্যা যদি কম হয় এবং ইহার ফলে যদি প্রত্যেক বিক্রেতা মোট উৎপাদনের এক বৃহৎ অংশ বিক্রয় করে, অথবা প্রত্যেক ক্রেতা যদি মোট উৎপাদনের এক বৃহৎ অংশ ক্রয় করে তাহা হইলে প্রতিযোগিতা অপূর্ণ হয়। ধর, চারজন বিক্রেতা আছে এবং তাহারা প্রত্যেকে ৫০০০ হাজার করিয়া জিনিস বিক্রয় করে। তাহাদের একজন যদি শতকরা ৫ ভাগ উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে চায়, তবে সে ৫২৫০টি জিনিস উৎপাদন করিবে। অর্থাৎ মোট উৎপাদন ২০,০০০ হাজার না হইয়া ২০২৫০ হইবে। ইহার ফলে বিক্রেতা দাম কমাইতে বাধ্য হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেক বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা নিম্নমুখী। দ্বিতীয়ত, ক্রেতারা

যদি বাজারের দাম সম্পর্কে অবহিত না হয় তবে প্রতিযোগিতা অপূর্ণ হয়। অজ্ঞতার জন্য অথবা যানবাহনের অসুবিধার জন্য যেখানে সর্বাপেক্ষা কম দামে বিক্রয় হইতেছে ক্রেতা সেখানে না কিনিতে পারে। এক্ষেত্রে বিক্রেতার সংখ্যা বেশি হইলেও প্রতিযোগিতা অপূর্ণ রহিয়াছে বলা হয়। আবার বিক্রেতারা যদি একই জিনিস বিক্রয় না করে তবে প্রতিযোগিতা অপূর্ণ হয়। বিভিন্ন বিক্রেতা যে যে জিনিস বিক্রয় করে ইহার মধ্যে গুণের পার্থক্য থাকিতে পারে। এমনও হইতে পারে যে জিনিস দুইটির মধ্যে হয়ত আসলে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু ক্রেতারা মনে করে যে ইহাদের গুণের পার্থক্য আছে। যেমন ধর, একদল ক্রেতা পল্‌সন মাখন পছন্দ করে, আর একদল লর্ডস্-এর মাখন পছন্দ করে। সুতরাং প্রত্যেক ফার্মের বিশেষ ক্রেতাগোষ্ঠী থাকে এবং ফার্মটির কিছু একচেটিয়া ক্ষমতা থাকে। একটু দাম বাড়াইলেও এইসব ক্রেতা তাহাকে হয়ত ছাড়িয়া যায় না। জিনিসের গুণের এই পার্থক্যকে উৎপন্ন দ্রব্যের তারতম্য বা product defferentiation বলে। দ্রব্যের গুণের এই তারতম্যের ফলে বিক্রেতার সংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও প্রতিযোগিতা অপূর্ণ হয়।

যদি অল্পসংখ্যক ক্রেতা এবং বিক্রেতা থাকে এবং তাহারা যদি মোট উৎপাদনের বৃহদংশ কেনে বা বিক্রয় করে তবে প্রতিযোগিতা অপূর্ণ হইবে। ইহা ছাড়া যদি অল্পসংখ্যক বিক্রেতার মধ্যে একজন যাহা করে অন্যেরাও তাহার প্রতিকারকল্পে ব্যবস্থা অবলম্বন করে তবে ইহাকে oligopoly বা অল্পসংখ্যক বিক্রেতার বাজার বলে। বিক্রেতার সংখ্যা অধিক হইলেও প্রতিযোগিতা অপূর্ণ হয় যদি ক্রেতারা অজ্ঞাত বা অন্য কোন কারণে সর্বাপেক্ষা সস্তা দামে জিনিস না কেনে; অথবা মনে করে যে বিভিন্ন বিক্রেতা যে জিনিস বিক্রয় করে তাহার মধ্যে তারতম্য আছে। শেষের এই অবস্থাকে অনেক সময় একাধিকারিক প্রতিযোগিতা বা Monopolistic Competition বলে।

বাজারে যদি অল্পসংখ্যক বিক্রেতা থাকে তবে প্রত্যেকেই দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। নানা কারণে বিক্রেতার সংখ্যা কম হয়। যেমন, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ (যেমন রেলপথ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি); অথবা কাঁচামালের উৎসের সীমাবদ্ধতা (যেমন পেট্রোল) অথবা বহু মূলধনের

প্রয়োজনীয়তা। বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা যেসব শিল্পে বেশি সেখানে, উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে খরচ কমে এবং দাম কমাইয়া প্রতিযোগিতা হটান যায়। ইহার ফলে শেষে অতি অল্পসংখ্যক বিক্রেতা অবশিষ্ট থাকিবে। ইহাদের প্রত্যেকেরই যোগানের উপর প্রভূত ক্ষমতা থাকিবে এবং উৎপাদনব্যয় অপেক্ষা বেশি দামে বিক্রয় করিবে। ইহা ছাড়া কম খরচে উৎপাদন করার জন্য তাহারা অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিবে। ফলে মোট উৎপাদন বাড়িবে এবং দাম এত কমিয়া যাইবে যে উৎপাদনব্যয় নাও উঠিতে পারে।[১]

বিক্রেতারা বাজারমূল্য সম্পর্কে অজ্ঞ হইলে বিক্রেতার সংখ্যা বেশি হইলেও প্রতিযোগিতা অপূর্ণ হয় অথবা যানবাহনের খরচ ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য কোন বিক্রেতা বেশি দাম হইতেছে বুঝিয়াও ক্রেতারা তাহার নিকট জিনিস কিনিতে বাধ্য হয়। যাতায়াতের খরচ যদি বেশি হয় তবে দোকানদারের নিকটবর্তী অঞ্চলে একটি অপ্রতিযোগী বাজার গড়িয়া উঠে। খুচরা বিক্রেতাদের ক্ষেত্রে ইহাই ঘটে। তাহারা একটু বেশি দামে বিক্রয় করিতে পারে। কেননা ক্রেতারা দূরে গিয়া সস্তায় জিনিস কেনা অপেক্ষা একটু বেশি দামে নিকটের দোকানে কেনাই ভাল মনে করে। পাড়ার দোকানদার যদি কোন জিনিসে এক পয়সা দাম বেশি নেয় সেজন্য ট্রাম-বাসের পয়সা খরচ করিয়া দূরের দোকানে যাওয়া সব সময় পোষায় না। তেমনি কোন বিক্রেতা বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইতে চাহিলে তাহাকে দাম কমাইতে হইবে। দাম কমাইয়া নূতন খরিদ্দার ধরিতে হয় এবং পুরান খরিদ্দারকে বেশি জিনিস কিনিতে প্রলুব্ধ করিতে হয়।

জিনিসের সত্য অথবা কল্পিত পার্থক্যের জন্যও প্রতিযোগিতা অপূর্ণ হয়। বিজ্ঞাপন, বিশেষ চিহ্ন (brand) ইত্যাদির দ্বারা প্রত্যেক বিক্রেতা তাহার জিনিস অন্য লোকের জিনিস অপেক্ষা ভাল এই বিশ্বাস সকলের মনে জন্মাইতে চেষ্টা করে। সত্য হউক অথবা মিথ্যা হউক, ইহা ক্রেতারা যদি বিশ্বাস করে তবে প্রত্যেক বিক্রেতা একটি অপ্রতিযোগী বাজার সৃষ্টি করে। সুতরাং একটু বেশি দাম সে চাহিতে পারে। আর যদি বিক্রয় বাড়াইতে চায় তবে

১। অনেক সময় মাত্র দুইজন বিক্রেতা এবং অনেক ক্রেতা থাকে। এ অবস্থাকে দ্ব্যধিকার বা duopoly বলে।

দাম কমাইতে হইবে। দাম কমাইলে নূতন খরিদ্দার আসিবে এবং পুরান খরিদ্দারের ক্রয়ের পরিমাণ বাড়িবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় মূল্য নির্ধারণ বিষয়ে বিক্রেতাদের কিছু স্বাধীনতা আছে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় তাহাকে বাজার দামে বিক্রয় করিতে হয়। বাজার দাম অপেক্ষা কম দাম চাহিলে সকল ক্রেতা তাহার কাছে যাইবে। কিন্তু অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা প্রতিযোগিদের অপেক্ষা কিছু বেশি দাম চাহিতে পারে। এজন্য তাহার খরিদ্দারেরা তাহাকে ত্যাগ করিবে না, কেননা তাহারা হয়ত অন্যান্য বিক্রেতাদের দাম জানে না অথবা যানবাহনের খরচ বেশি অথবা ঐ বিক্রেতার জিনিসের প্রতি তাহার বিশেষ আকর্ষণ আছে। অবশ্য দাম বাড়ার জন্য ক্রেতারা কম পরিমাণে জিনিস কিনিতে পারে। তেমনি দাম কমাইলে তাহার বিক্রয় বেশি না বাড়িতে পারে। পুরাতন খরিদ্দারেরা হয়ত কিছু বেশি কিনিবে, কিন্তু বহুল পরিমাণে বিক্রয় বাড়াইতে হইলে দাম অনেক কমাইতে হইবে। তবেই প্রতিযোগী বিক্রেতার আকর্ষণ কাটাইয়া নূতন খরিদ্দার আসিবে। অতএব দাম বেশি করিয়া না কমাইলে বিক্রেতা অধিক পরিমাণে বিক্রয় করিতে পারে না। এইরূপ বিক্রেতা বা উৎপাদকের ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা অস্থিতিস্থাপক বা কম স্থিতিস্থাপক।

প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় যেখানে সমান হয় অপূর্ণ প্রতিযোগিতার দামও সেখানেই স্থির হয়। যতক্ষণ প্রান্তিক আয় উৎপাদনব্যয় অপেক্ষা বেশি ততক্ষণ উদ্যোক্তা উৎপাদন করিবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রান্তিক আয় ও দাম সমান। কিন্তু অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রান্তিক আয় দাম অপেক্ষা কম। কারণ বেশি বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হয়। দাম কমাইলে সবগুলির দাম কমাইতে হয়, শুধু অতিরিক্ত ইউনিটের নহে। সুতরাং দাম হইতে পুরাতন ইউনিটগুলি কম দামে বিক্রয় করার লোকসান বাদ দিলে অতিরিক্ত আয়ের হিসাব পাওয়া যাইবে। ধর, একজন বিক্রেতা ২৲ টাকা দামে ১০টি জিনিস বিক্রয় করিতে পারে। যদি সে শতকরা ১০ ভাগ উৎপাদন বাড়ায় এবং ১১টি জিনিস বিক্রয় করিতে চায় তবে দাম ১'৯৫ ন.প. হইবে। আমরা দেখি যে,

মোট উৎপাদন	দাম	মোট আয়
১০	২৲ টাকা	২০৲
১১	১'৯৫ ন.প.	২১'৪৫ ন.প

অর্থাৎ অতিরিক্ত একটি জিনিস বিক্রয় করার ফলে তাহার মোট আয় ১'৪৫ ন.প. বাড়ে। সুতরাং তাহার প্রান্তিক আয় (marginal revenue) ১'৪৫ ন.প.। অথচ দাম ১'৯৫, ন.প. অতএব প্রান্তিক আয় দাম হইতে কম। যতক্ষণ প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় প্রান্তিক আয় হইতে কম, উদ্যোক্তা উৎপাদন করিবে এবং বিক্রয় করিবে। কারণ ইহাতে তাহার লাভ বাড়িবে। প্রান্তিক আয় ও উৎপাদনব্যয় সমান হইলে সে থামিবে। কিন্তু প্রান্তিক আয় দাম হইতে কম। সুতরাং দাম প্রান্তিক উৎপাদনব্যয়ের সমান হওয়ার পূর্বেই সে উৎপাদন বন্ধ করিবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রান্তিক উৎপাদনব্যয়, দাম এবং প্রান্তিক আয় সমান (কেননা দাম ও প্রান্তিক আয় সমান)। কিন্তু অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় প্রান্তিক আয়ের সঙ্গে সমান, কিন্তু দামের সঙ্গে নহে। প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় দামের সমান হওয়ার পূর্বেই উৎপাদন বন্ধ হইবে। অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক উদ্যোক্তা পূর্ণ প্রতিযোগিতায় যত উৎপাদন হইত তাহা হইতে কম উৎপাদন করিবে এবং প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় অপেক্ষা দাম বেশি হইবে।

আমরা দেখিয়াছি যে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের সংখ্যা এমন হয় যে, প্রত্যেক ফার্ম সর্বোত্তম আকারের (optimum size) হয় অর্থাৎ সকলেই সর্বনিম্ন গড়পড়তা ব্যয়ে উৎপাদন করে। অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় তাহা হয় না। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় যে ফার্মের আকার সর্বোত্তম আকার হইতে কম, তাহার আয়তন বাড়ে। আয়তন বাড়াইলে তাহার অতিরিক্ত উৎপাদনের ব্যয় কমে, কিন্তু দাম সমান থাকে। অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় এইরূপ ফার্ম বাড়ে না। অবশ্য একথা ঠিক যে উৎপাদন বাড়িলে তাহার গড়পড়তা ব্যয় কমিবে। কিন্তু অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য তাহাকে দাম কমাইতে হইবে। সুতরাং কম বিক্রয় করার ক্ষতি, খরচ কমার ফলে যে লাভ, ইহা হইতে বেশি অথবা সমান হইতে পারে। এই অবস্থায় ফার্মটির উৎপাদন বৃদ্ধি করার কোন আকর্ষণ থাকে না। অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় সুদক্ষ ফার্ম সাধারণ ফার্মকে তাড়াইতে পারে না। সাধারণ ফার্মের খরিদ্দারের বিশেষ

আকর্ষণ নষ্ট করার জন্য যদি সুদক্ষ ফার্মকে দাম অনেক কমাইতে হয় তবে সে এরূপ প্রতিযোগিতা করে না। কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দাম না কমাইয়াও সুদক্ষ ফার্ম বিক্রয় বাড়াইতে পারে। উৎপাদন বাড়াইলে সরবরাহ বাড়িবে এবং দাম পড়িবে। তখন সাধারণ ফার্মগুলি খরচ তুলিতে পারিবে না। অতএব অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের সংখ্যা পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের সংখ্যা অপেক্ষা বেশি হইতেও পারে। প্রত্যেক ফার্ম সর্বোত্তম উৎপাদন (optimum output) হইতে কম উৎপাদন করিবে এবং হয়ত অন্যান্য ব্যবসায়ের অপেক্ষা বেশি লাভ করিতে পারিবে একথাও বলা যায় না। যেমন শহরে অনেক ছোট ছোট মনোহারী দোকান অথবা ময়রার দোকান আছে, তাহাদের প্রত্যেকের আকার সর্বোত্তম আকার হইতে কম। অনুরূপ ব্যবসায়ে যাহা লাভ হয় তাহা অপেক্ষা বেশি লাভ তাহাদের হয়ত হয় না। কিন্তু তবু যানবাহনের অসুবিধার জন্য অথবা ক্রেতাদের অজ্ঞতার অথবা শুভেচ্ছার জন্য প্রত্যেক বিক্রেতার কিছু পরিমাণ একচেটিয়া ক্ষমতা থাকে। এ অবস্থায় ফার্মের সংখ্যা কমিলে সমাজের লাভ।[১] এই কথাটি প্রথম দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হইতে পারে। কেননা ইহার অর্থ এই যে অপূর্ণ প্রতিযোগিতার স্থলে অধিকতর অপূর্ণ করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ফার্মের সংখ্যা কমাইলে প্রত্যেক ফার্মের কার্যক্ষমতা বাড়িবে, উৎপাদনের গড়পড়তা ব্যয় কমিবে এবং প্রত্যেকটি ইউনিট সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে উৎপাদিত হইবে।

Exercises

Q. 1. Discuss the conditions which result in the existence of imperfect competition in the market for a commodity.

Q. 2. How is value determined under imperfect competition ? (Viswa. 1959).

Q. 3. "The fact is that we never find monopoly undiluted by competition and very rarely find competition undiluted by

১। অবশ্য সব সময় ইহা সত্য হয় না। যদি বিক্রেতার জিনিসের মধ্যে সত্যই গুণগত কোন পার্থক্য থাকে তবে ফার্মের সংখ্যা কমাইলে সমাজের ক্ষতি হইবে।

monopoly." Discuss this statement. (C. U. B.Com. 1955, '58 ; Viswa. 1957).

"While perfect competition is seldom found, pure monopoly is rare." Discuss (C. U. 1958).

Q. 4. When does competition in the market for a commodity become perfect ? When, and why, does it become imperfect ? (C. U. B.Com. 1955).

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

মূল্য নির্ধারণ-তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার

(The summary of the principles of value)

সংক্ষেপে মূল্য নির্ধারণতত্ত্ব আলোচনা করা যাক। জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করিতে হইলে প্রথমে প্রতিযোগিতার স্বরূপ বুঝিতে হইবে। জিনিসটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে, বহু বিক্রেতা বিক্রয় করিতে পারে, অথবা একজন বিক্রয় করিতে পারে; অথবা বহু বিক্রেতা অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রয় করিতে পারে। তাহার পর কত সময়ের কথা ধরা হইবে তাহাও জানা দরকার। সময়ের দিক হইতে তিনটি বিভাগ করা যায়—অতি অল্পকাল, অল্পকাল এবং দীর্ঘকাল।

মূল্য এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতা (Value and perfect competition): তিনটি শর্ত পূর্ণ হইলে প্রতিযোগিতা পূর্ণ হয়। প্রথমত, ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা অনেক এবং প্রত্যেকে মোট উৎপাদনের অতি সামান্য অংশ উৎপাদন বা ক্রয় করে। তাহার ফলে ক্রয়-বিক্রয় বাড়াইয়া অথবা কমাইয়া কেহ দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, সকলেই একই জিনিস বিক্রয় করে। কোন বিশেষ বিক্রেতার জিনিসের জন্য ক্রেতাদের আকর্ষণ নাই।

তৃতীয়ত, কোন্ দোকানে কি-দামে জিনিস বিক্রয় হইতেছে ক্রেতারা তাহা জানে এবং যেখানে দাম সর্বাপেক্ষা কম, সেখানেই কেনে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক বিক্রেতা দাম না কমাইয়াও বিক্রয় বাড়াইতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যেক বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক।

অতি অল্পকালীন বাজারে যোগান স্থির থাকে। এই অবস্থায় বাজার মূল্য প্রধানত চাহিদার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পূর্বেই উৎপাদনের কার্য শেষ হইয়াছে, অতএব বাজার মূল্যের উপর উৎপাদনব্যয়ের বিশেষ কোন প্রভাব থাকে না। যদি সহজে বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তবে বিক্রেতারা

ভবিষ্যতে দাম বৃদ্ধির আশায় জিনিসটি গুদামজাত করিতে পারে। তাহার ফলে বাজারে যোগান কমে এবং দাম বাড়ে। অতএব অল্পকালীন স্বাভাবিক মূল্যের সহিত বাজার মূল্যের সম্পর্ক আছে।

যদি এমন সময় পাওয়া যায় যে কারখানার বর্তমান যন্ত্রপাতির সাহায্যে যতটুকু উৎপাদন করা যায়, ততদূর পর্যন্ত উৎপাদন বাড়ান যায় অথবা প্রয়োজন হইলে উৎপাদন কমান যায়, তবে তাহাকে অল্পকালের বাজার বলে এবং সেখানে যে দাম স্থির হয় তাহাকে অল্পকালীন স্বাভাবিক মূল্য বলে। অতিরিক্ত উৎপাদন করিলে যদি মোট লাভ হয় তবে উৎপাদকেরা উৎপাদন করিবে। অতিরিক্ত উৎপাদন করিলে কাঁচামাল শ্রমিক ইত্যাদি বাবদ অতিরিক্ত ব্যয় বাড়িবে। এই অতিরিক্ত ব্যয়কে প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় বলে। তেমনি বিক্রয় বাড়িলে দাম অনুসারে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ বাড়িবে। অতিরিক্ত একটি ইউনিট বিক্রয় করিয়া যে আয় হয় তাহাকে প্রান্তিক আয় বলে। যতক্ষণ প্রান্তিক আয় উৎপাদনব্যয় হইতে বেশি, ততক্ষণ উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া বিক্রেতার লাভ। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় বাড়িবে এবং অবশেষে প্রান্তিক আয়ের সমান হইবে। এইখানে বিক্রেতার সর্বোচ্চ লাভ হইবে এবং সে উৎপাদন বন্ধ করিবে। যদি সে আরও বেশি উৎপাদন করে, তবে তাহার প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় প্রান্তিক আয় হইতে বেশি হইবে এবং বিক্রেতার ক্ষতি হইবে। অতএব যে পরিমাণ উৎপাদন করিলে প্রান্তিক আয় ও উৎপাদন সমান হয়, উৎপাদক সেই পরিমাণ জিনিস উৎপাদন করিবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দাম না কমাইয়াও বিক্রয় বাড়ান যায়। সুতরাং প্রান্তিক আয় ও দাম সমান। অতএব প্রত্যেক বিক্রেতা সেই পরিমাণ জিনিস উৎপাদন করিবে যাহাতে প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় ও দাম সমান হয়।

ক্রেতার দিক হইতে বলা যায় যে, যতক্ষণ প্রান্তিক উপযোগিতা দাম অপেক্ষা বেশি ততক্ষণ সে কিনিবে। কিন্তু ক্রেতা যতই কিনতে থাকিবে ততই তাহার প্রান্তিক উপযোগিতা কমিবে এবং অবশেষে দামের সমান হইবে। সুতরাং প্রত্যেক ক্রেতা সেই পরিমাণ জিনিস কিনিবে যাহার প্রান্তিক উপযোগিতা ও দাম সমান হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দাম একদিকে প্রান্তিক উপযোগিতা অন্যদিকে

প্রান্তিক উৎপাদনব্যয়ের সমান হয়। প্রত্যেক বিক্রেতার প্রান্তিক ব্যয়-রেখার ভিত্তিতে মোট উৎপাদনের ব্যয়-রেখা এবং ব্যক্তিগত চাহিদা-তালিকার ভিত্তিতে মোট চাহিদা-রেখা নির্ণয় করা যায়। যে বিন্দুতে সরবরাহ-রেখা ও চাহিদা-রেখা পরস্পরকে ভেদ করে সেই বিন্দুতে দাম স্থির হয়।

যদি দীর্ঘ সময় লওয়া হয় তবে অনেক নূতন ফার্ম ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারে, অথবা পুরাতন ফার্ম ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতে পারে, অথবা প্রত্যেক ফার্ম কারবারের আয়তন বাড়াইতে পারে বা কমাইতে পারে। এই অবস্থায় যে দাম স্থির হয় তাহাকে দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্য বলে। দীর্ঘ সময়ে যদি চাহিদা খুব বেশি হয়, তবে ব্যবসায়ীদের লাভ হইবে এবং তাহারা উৎপাদন বাড়াইবার জন্য নূতন যন্ত্রপাতি বসাইবে, অথবা নূতন ব্যবসায়ী ব্যবসায় আরম্ভ করিবে। যদি চাহিদা কম হয় তবে ব্যবসায়ীর ক্ষতি হইবে। সুতরাং কেহ কেহ ব্যবসায় একেবারে বন্ধ করিয়া দিবে। কেহ কেহ কারখানা আংশিকভাবে বন্ধ করিয়া দিবে।

দীর্ঘকালে কিভাবে দাম স্থির হয়? এখানে আমাদের শিল্পের চাহিদা-রেখা এবং বিভিন্ন ফার্মের দীর্ঘকালীন প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় ও গড়পড়তা ব্য[illegible] হিসাব লইতে হইবে। অল্পকালীন বাজারের প্রত্যেক বিক্রেতা প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় ও দাম সমান না হওয়া পর্যন্ত উৎপাদন করিবে। এই দাম গডপডতা মোট ব্যয়ের সমান হইতে পারে, নাও হইতে পারে। যদি দাম প্রান্তিক উৎপাদনব্যয়ের সমান, অথচ গডপডতা মোট ব্যয় হইতে বেশি হয় তবে বিক্রেতাদের মোট লাভ বেশি হইবে, কেননা গড়পড়তা মোট ব্যয়ের মধ্যে তাহাদের ন্যায্য লাভ ধরা আছে। অতিলাভের দ্বারা প্রলুব্ধ হইযা অনেক নূতন নূতন ব্যবসায়ী ব্যবসায় আরম্ভ করিবে অথবা পুরাতন ব্যবসায়ীর ব্যবসায় বাড়াইবে। ইহার ফলে সরবরাহ বাড়িবে এবং দাম কমিয়া যদি গডপডতা মোট উৎপাদনব্যয় অপেক্ষা কম হয়, তবে ব্যবসায়ীদের ন্যায্য লাভ হইবে না। ইহার ফলে অনেক ব্যবসায়ী উৎপাদন কমাইয়া দিবে এবং দুর্বল ফার্মগুলি ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিবে। সুতরাং সরবরাহ কমিয়া যাইবে এবং দাম বাড়িয়া গডপডতা মোট ব্যয়ের সমান হইবে। অতএব দীর্ঘকালে দাম প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় ও গড়পড়তা মোট ব্যয় দুইটির সমান হয়। প্রান্তিক ব্যয়-রেখা গডপড়তা মোট ব্যয়-রেখা সর্বনিম্ন

বিন্দুতে ভেদ করে। সুতরাং প্রত্যেক ফার্ম সর্বাপেক্ষা কম খরচে উৎপাদন করিবে এবং সর্বোত্তম আকারের হইবে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার অভাব ও দাম (Value in the absence of perfect competition) : একটি জিনিস একজন বিক্রেতা বিক্রয় করিতে পারে এবং তাহার কোন অনুকল্প না থকিতে পরে। এই অবস্থাকে একচেটিয়া ব্যবসায় বলে। যেহেতু কোন অনুকল্প নাই, ইহার চাহিদা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হইতে পারে না। অর্থাৎ একচেটিয়া ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা দক্ষিণদিকে নিম্নগামী হয়।

প্রতিযোগিতা বাজারের উৎপাদকের মত একচেটিয়া ব্যবসায়ীও সর্বাধিক লাভ করিতে চায় এবং প্রান্তিক আয় ও উৎপাদনব্যয় সমান হইলেই তাহা সম্ভব হয়। প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া ব্যবসায়ের নীতি মূলত এক। কিন্তু পার্থক্য আছে। প্রতিযোগিতার দাম ও প্রান্তিক আয় সমান। কিন্তু যেহেতু একচেটিয়া ব্যবসায়ী একমাত্র বিক্রেতা, সে দাম না কমাইয়া বিক্রয় বাড়াইতে পারে না। বিক্রয় বাড়াইবার জন্য দাম কমাইলে তাহার প্রান্তিক আয় দাম হইতে কম। সুতরাং একচেটিয়া কারবারের দাম প্রান্তিক আয়ের সমান কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদনব্যয়ের বেশি এবং প্রতিযোগিতা হইতে একচেটিয়া ব্যবসায়ে উৎপাদন কম হয়।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতায়ও দাম না কমাইয়া বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ান যায় না। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও প্রান্তিক আয় দাম অপেক্ষা কম। প্রান্তিক উৎপাদন ও প্রান্তিক আয় সমান না হওয়া পর্যন্ত উৎপাদকেরা উৎপাদন করিবে এবং দাম প্রান্তিক আয় হইতে বেশি হওয়ায় প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় অপেক্ষাও বেশি হইবে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ফটকা কারবার

(Speculation)

ফটকা কারবার কি? বাজারের ভবিষ্যৎ অবস্থা বুঝিয়া আবার ভবিষ্যতেই ক্রয়-বিক্রয় করিয়া লাভের আশায় কোন জিনিস কেনা-বেচাকে ফটকা কারবার বলে। যদি ভবিষ্যতে দাম বাড়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে ফটকা কারবার লাভে বিক্রয় করার জন্য এখনই জিনিসটি কিনিবে। আর যদি ভবিষ্যতে দাম কমার সম্ভাবনা থাকে তবে সে তখন সে কম দামে কিনিবার আশায় বর্তমানে ইহা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। এই ভাবে অদূর ভবিষ্যতের দাম পরিবর্তন অনুমান করিয়া ফটকা কারবারী লাভ করার চেষ্টা করে। সে বরাবরের জন্য জিনিস মজুত করে না অথবা জিনিস তৈয়ারি করে না। সে হয়ত কখনও জিনিসটি স্পর্শও করে না। সে আসলে জিনিসের কারবারী নয়, ঝুঁকির কারবারী। সব কারবারেই দাম উঠা-নামার ঝুঁকি আছে। দাম বেশি নামিলে উৎপাদকদের লোকসান হইবে। এই দাম উঠা-নামার ঝুঁকির সুযোগ লইয়া ফটকা কারবারী লাভ করিবার চেষ্টা করে। এইজন্য তাহাকে ঝুঁকির কারবারী বলা হয়।

আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় বহু ঝুঁকি আছে। আদিম সমাজে সকলেই নিজেদের প্রয়োজনমত বস্তু উৎপাদন করিত এবং ভোগ করিত। তখন ঝুঁকিও কম ছিল। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের ঝুঁকি বাড়িয়াছে। এখন কয়েক মাস কি কয়েক বৎসর পরে চাহিদা কি হইবে ইহা অনুমান করিয়া উৎপাদন শুরু করিতে হয়। উৎপাদন শেষ হওয়ার পূর্বেই হয়ত চাহিদা কমিয়া যাইতে পারে। তখন লাভের পরিবর্তে লোকসান হইবে। উৎপাদনের এই সমস্ত ঝুঁকির বহু অংশ ফটকা বাজারের কারবারীরা বহন করে। যাহারা এই কাজে সুদক্ষ তাহারা ঝুঁকির কারবারেও যথেষ্ট লাভ করে। আর ফটকা কারবারীর ঘাড়ে কিছু ঝুঁকি সরাইয়া দেওয়া যায় বলিয়া উৎপাদকেরাও অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে উৎপাদনের কাজে মন দিতে পারে।

ফট্‌কার কারবার এবং জুয়া খেলার মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। যাহারা জুয়া খেলে তাহারা অনিশ্চিত ঘটনায় ঝুঁকি নেয়। ফটকার কারবারীও তাহাই করে সন্দেহ নাই। কিন্তু জুয়া-খেলোয়াড় যে ঝুঁকি নেয় তাহা অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি এবং অনেক সময় তাহারা নিজেরাই এই ঝুঁকি সৃষ্টি করে। যেমন টেস্ট্ খেলায় ইংলণ্ড কি অস্ট্রেলিয়া জয়লাভ করিবে তাহা অনিশ্চিত। কিন্তু অনিশ্চয়তা কেহ বহন না করিলেও উৎপাদনপদ্ধতি বা সমাজের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু টেস্ট্ খেলার ফলাফল সম্পর্কে বাজী হয়। আজ এক ইঞ্চি কি দুই ইঞ্চি বৃষ্টি হইবে সে সম্পর্কে বাজী ধরা হয়। এখানে বাস্তবিক কোন ঝুঁকি নাই। যাহারা বাজী ধরে তাহারা এইরূপ অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি বহন করে। কিন্তু ফটকা কারবারী প্রয়োজনীয় ঝুঁকি বহন করে। যেমন ধর, ছয়মাস পরে পাটের দাম বাড়িতে পারে বা কমিতে পারে। এই দাম কমা-বাড়ার ঝুঁকি বহন না করিলে উৎপাদনে অনেক অসুবিধা উপস্থিত হয়। যাহারা জুয়া খেলে তাহারা উৎপাদনের কোন সাহায্য করে না। ফটকা কারবার উৎপাদনের জন্য অনেক সময়েই প্রয়োজনীয়।

ফটকা কারবারীরা জিনিস অথবা শেয়ার লইয়া কেনা-বেচা করে। যে সব জিনিসের ভবিষ্যৎ দাম অনিশ্চিত, ইহাদের লইয়া ফটকা কারবার হয় অবশ্য সমস্ত জিনিসেরই ভবিষ্যৎ দাম অনিশ্চিত। কিন্তু তাই বলিয়া সব জিনিস লইয়া ফটকা কারবার চলে না। কেবল কয়েকটি বিশেষ অবস্থা থাকিলেই ফটকা কারবার চলে। প্রথমত, জিনিসটির চাহিদা প্রচুর এবং স্থায়ী হইবে। দ্বিতীয়ত, জিনিসটির গুণ অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব হয়। তৃতীয়ত, জিনিসটি যেন সহজে চেনা এবং মাপা যায়। অনেক জিনিসেরই এইসব গুণ আছে। এইগুলি বিশেষভাবে শেয়ারের আছে এবং সেইজন্য শেয়ারের বাজার প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। অন্য কতকগুলি কারণেও ফটকা বাজার বাড়ে। চতুর্থত, জিনিসটির সরবরাহ যদি অনিশ্চিত হয় এবং বৎসরের একটি বিশেষ ঋতুতে উৎপন্ন হয় তবে জিনিসটির দাম বেশি উঠা-নামা করে, বিশেষত যদি জিনিসটির চাহিদা বৎসরের সকল মাসেই প্রায় সমান থাকে। অতি প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল, যেমন তুলা, পশম ইত্যাদি অথবা ধান, গম ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য এই পর্যায়ে পড়ে। এই সব কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন

বর্ষার জলের উপর নির্ভর করে। শুধু তাই নয়, ফসল উঠার পরই এইগুলি বাজারে আমদানি হয়, কিন্তু চাহিদা সারা বছর ধরিয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের দাম খুব বেশি উঠা-নামা করে। এক বৎসর গমের উৎপাদন কম হইলে দাম খুব বাড়িয়া যায়, আর এক বৎসর উৎপাদন বেশি হইলে দাম কমিয়া যায়। দাম উঠা-নামার ঝুঁকি কমাইবার জন্য এই সমস্ত জিনিসের ফটকা বাজার (produce exchange) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ফটকা বাজারের সংগঠন (Organisation of speculative markets) : শেয়ার বাজারে যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজ বেচাকেনা হয়। ফটকা বাজারের জন্য যে গুণগুলি থাকা দরকার ইহার সবই শেয়ারে আছে। সব শেয়ার একই ধরনের, চেনার কোন অসুবিধা হয় না।

ফটকাবাজ যদি মনে করে যে, জিনিসের বর্তমান দাম বেশি এবং ভবিষ্যতে দাম পড়িয়া যাইবে তাহা হইলে সে "sell short" করিবে অর্থাৎ সে বিক্রয় করার চুক্তি করিবে। হয়ত মাল তাহার হাতে নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে সরবরাহ করার চুক্তি করিবে। দুইভাবে তাহার লাভ হইতে পারে। যদি তাহার ধারণামত পরে দাম কমে তখন সে কম দামে কিনিয়া সরবরাহ করিতে পারে। অথবা এখুনি সে একটি covering বা hedging চুক্তি করিতে পারে, অর্থাৎ যে দামে বিক্রয় করিবে বলিয়াছে ইহা অপেক্ষা কম দামে সম্ভব হইলে অন্য বিক্রেতার সহিত জিনিস বা শেয়ার কেনার চুক্তি করিবে। যদি সে মনে করে যে বর্তমান দাম কম আছে এবং ভবিষ্যতে দাম বাড়িবে তবে সে "buy long" করিবে, অর্থাৎ এখন প্রচুর পরিমাণে কিনিবার চুক্তি করিবে এবং দাম বাড়িলে সেইগুলি বিক্রয় করিবে। যে ফটকাবাজার "sell short" করার চুক্তি করে তাহাকে "bear" বলে, কারণ তাহার কারবারের ফলে দাম কমে। যাহারা "buy long" চুক্তি করে তাহাদিগকে "bull" বলে, কারণ তাহাদের কারবারের ফলে দাম বাড়ে। যাহারা পরে দাম কমিবে আশংকা করিয়া এখনই বিক্রয় শুরু করে তাহাদের bear বা মন্দী কারবারী বলা হয়। আর যাহারা দাম চড়িবে আশা করিয়া এখনই জিনিসটি কিনিতে শুরু করে তাহাদের bull বা তেজী কারবারী নাম দেওয়া হয়।

ভাবী ফটকার বাজার (Futures market) : সাধারণত বাজারে জিনিস বিক্রয়ের পরে বিক্রেতা জিনিসটি তখনই কিংবা হয়ত কিছুদিন পরে ক্রেতাকে ডেলিভারী দেয়। সাধারণ ফটকা বাজারেও তাই করা হয়। যেমন শেয়ার বাজারের কারবারী শেয়ারের ক্রেতাকে তখনই কিংবা ৮।১০ দিন পরে শেয়ার ডেলিভারী দেয়। আর এক ধরনের ফটকা কারবার আছে যেখানে জিনিস লইয়া কেনা-বেচা হইলেও তিন মাস কি আরো দীর্ঘ সময় অন্তর ডেলিভারী দেওয়ার চুক্তি থাকে; কিংবা হয়ত কোন সময়েই ডেলিভারী দেওয়া হয় না। বিক্রেতা তিন মাস পরে এক দামে বিক্রয় করিবে বলিয়া চুক্তি করিয়াছে। যেদিন ইহার দেওয়ার কথা সেদিন বাজারে যে দাম বহাল আছে শুধু এই দুই দামের তফাৎ লইয়া দেনাপাওনার হিসাব করা হয়। ধর, কারবারী তিনমাস পরে ১০৲ টাকা মন দামে ১০০ মণ গম বেচিবে চুক্তি করিল। তিন মাস পরে সেদিন গমের বাজারদর হইল মণ প্রতি ৯.৭৫। কারবারী ইচ্ছা করিলে তখন ৯৭৫ মণে ১০০ মণ গম কিনিয়া ক্রেতাকে ডেলিভারী দিতে পারে ও তাহার নিকট হইতে চুক্তিমত ১০৲ মণ হিসাবে দাম আদায় করিবে। ফলে তাহার মণ প্রতি ২৫ ন.প লাভ থাকিবে। এই ধরনের ফটকা কারবারে জিনিসের ডেলিভারী দেওয়া-নেওয়া হয় না। গমের ক্রেতা দুইটি দামের পার্থক্য অর্থাৎ চার মণ হিসাবে ২৫৲ টাকা বিক্রেতাকে দিয়া দেয়। আবার গমের দাম সেদিন যদি ১০.৫০ মণ হয় তবে বিক্রেতা ক্রেতাকে ৫০৲ টাকা দিয়া দেয়। এই ধরনের ফটকা কারবারকে ভাবী ফটকা কারবার (Futures market) বলে। পণ্যদ্রব্যের ফটকা কারবার সাধারণত এই ধরনের।

ফটকা কারবারের উপকারিতা (Utility of speculation) : ঠিকমত ফটকা কারবার চলিলে ইহার দ্বারা বহু উপকার হয়। প্রথমত, ইহার ফলে উৎপাদকদের অনেক সুবিধা হয়। ভবিষ্যৎ চাহিদা কিরূপ হইবে উৎপাদকের তাহা অনুমান করিয়া উৎপাদন করিতে হয়। বর্তমান যুগের উৎপাদন-পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ। কাপড়ের চাহিদা আজ বেশি থাকিতে পারে। তাহা দেখিয়া কোন উৎপাদক হয়ত নূতন কাপড়ের কল বসাইতে শুরু করিল। যন্ত্রপাতি কিনিয়া বসান, কারখানার ঘর-বাড়ি তৈয়ারি করান ইত্যাদিতে অনেক সময় যাইবে। তারপর তুলা কিনিয়া কাপড়

বুনিতে বুনিতে সব মিলিয়া হয়ত দেড় বৎসর দুই বৎসর চলিয়া যাইবে। ইতিমধ্যে কাপড়ের চাহিদা আর পূর্বের মত চড়া না থাকিতে পারে, কিংবা তুলার দাম অনেক নামিয়া যাইতে পারে। ফলে কাপড়ের দাম কমিয়া যাইবে ও উৎপাদকের লাভ না হইয়া ক্ষতি হইবে। উৎপাদন করিতে গেলেই এইরূপ অনেক ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার বোঝা উৎপাদককে বহন করিতে হয়। কিন্তু উৎপাদক যখন তুলা কেনে সেই সময় ভাবী ফটকার বাজারে তিন মাস পরে সমপরিমাণ তুলা বিক্রয়ের চুক্তি করিতে পারে। ইতিমধ্যে তুলার দাম কমিলে কাপড় বিক্রয় করিয়া তাহার লোকসান বা কম লাভ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাবী ফটকার বাজারে তুলা বিক্রয়ের চুক্তি হইতে তাহার লাভ হইবে। জিনিসের দাম উঠা-নামার ঝুঁকির খানিকটা ফটকা কারবারী বহন করে বলিয়া উৎপাদকের সুবিধা হয় ও সে উৎপাদনের কাজে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারে।

একজন আটার কলের মালিকের নিকট তিনমাস পরে এক হাজার মণ আটার অর্ডার আসিল এবং তখন কি দামে সে আটা বেচিবে ইহাও তাহাকে এখন ঠিক করিয়া দিতে হইবে। আড়াই মাস বা তিন মাস পরে গমের [illegible]কৃত থাকিবে ইহা না জানিতে পারিলে তাহার পক্ষে আটার দাম ঠিক করা শক্ত। মিলের মালিক ভাবী ফটকার বাজারে গিয়া কোন কারবারীর সহিত তিন মাস পরে প্রয়োজন মত গম কিনিবার চুক্তি করিল ও কারবারী যে দাম দিতে রাজী আছে সেই দামের উপর হিসাব করিয়া অন্যান্য খরচ ধরিয়া সে তিন মাস পরে কি দামে আটা দিবে তাহা বলিয়া দিতে পারে। সেই সময়ে গমের দাম যাহাই হোক না কেন; তাহার কোন লোকসান হইবে না। ফটকার বাজার থাকাতে উৎপাদকের এইরূপ নানা প্রকার সুবিধা হয়।

এখন কথা উঠিতে পারে যে উৎপাদকের লাভ হয় তাহাতো বুঝিলাম, কিন্তু এই ধরনের ফটকা খেলায় কারবারীর উপকার কি? সে কি শুধু ঝুঁকি বহিয়াই যায়, না লাভ করে? কি ভাবে লাভ করে? পরোপকারের জন্য কেহই ব্যবসায়ে নামে না। ফটকা কারবারে যথেষ্ট লাভ হয়. এবং এই লাভ নিম্নলিখিত উপায়ে কারবারীর পকেটস্থ হয়। ফটকা কারবারী তিন মাস পরে আটার মিল মালিককে এক হাজার মণ গম ১০৲ টাকা মণ

হিসাবে বিক্রয় করার চুক্তি করিল। তিন মাস পরে গমের দাম বেশি হইলে তাহার লোকসান যাইবে। কিন্তু বাজারে যেমন গমের ক্রেতারা আসে বিক্রেতারাও আসে। একজন চাষীর গুদামে হয়ত এক হাজার মণ গম আছে। সে তিন মাস পরে ইহা বিক্রয় করিতে চায়। কারণ সে সময় তাহার কিছু মোটা টাকার দরকার। সে ফটকা কারবারীর নিকট গিয়া তিন মাস পরে সব গম বিক্রয় করার চুক্তি করিল ও কারবারী তাহাকে ৯৭৫ দাম দিল। এই চুক্তির পর ফটকা-কারবারীর ঘাড়ে কোন ঝুঁকি রহিল না। তিন মাস পরে সে চাষীর গুদাম হইতে হাজার মণ গম লইয়া মিলমালিককে ডেলিভারী দিবে ও ২৫০৲ টাকা লাভ বাবদ পাইবে। কিংবা গমের দাম এখন অপেক্ষাকৃত কম থাকিলে, অর্থাৎ ধর ৯৫০ মণ থাকিলে কারবারী হয়ত এখনই গম কিনিয়া গুদামজাত করিতে পারে। ফটকা বাজারের কারবারীরা যে জিনিস লইয়া কারবার করে ইহার ভবিষ্যৎ চাহিদা ও যোগান সম্বন্ধে তাহারা বিশেষভাবে অনুশীলন করে এবং সেই হিসাবে ভবিষ্যৎ দাম অনুমান করে। তাহারা যে যত দক্ষ ততই তাহার অনুমান ঠিক হইবার সম্ভাবনা। সেই অনুমান অনুসারে কেনা-বেচা করিলে তাহার লাভ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

ফটকা কারবার থাকিলে শুধু যে উৎপাদকের সুবিধা হয় তাহা নহে; সমাজেরও যথেষ্ট উপকার হয়। প্রথমত, ঠিকমত ফটকা কারবারের ফলে জিনিসের হ্রাসবৃদ্ধির প্রবণতা কমে। অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ের মধ্যে দামের সমতা হয়। ধরা যাক্, কোন জিনিসের যোগান ভবিষ্যতে কম হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। কিন্তু এখন বাজারে ইহার যোগান যথেষ্ট আছে, সুতরাং দামও আছে। চার পাঁচ মাস পরে যখন যোগান কম হওয়ার কথা প্রকাশ হইবে তখন হয়ত ইহার দাম অনেক চড়িয়া যাইবে। ফটকার কারবারীরা ইহা আগে হইতে লক্ষ্য করিয়া এখন দাম কম থাকিতে থাকিতে জিনিসটি কিনিয়া গুদামজাত করার চেষ্টা করিবে। তাহাদের এই কাজের ফলে জিনিসটির দাম এখন হইতে আস্তে আস্তে বাড়িতে থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় কমিতে থাকিবে। অর্থাৎ বর্তমানের যোগানের কিছু অংশ বিক্রয় না হইয়া গুদামজাত হইবে। চার পাঁচ মাস পরে যোগান তত কম হইবে না, কারণ নূতন যোগান যাহা আসিবার

আসিবে। ইহা ছাড়া কারবারীরা ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরা যে মাল গুদামজাত রাখিয়াছে তাহাও বাজারে বিক্রয় হইবে। যোগান তত কম না হইলে দামও সে রকম বাড়িবে না, কিছুটা বাড়িবে মাত্র। সুতরাং ফটকা কারবারের ফলে জিনিসটির দাম কম পরিবর্তিত হইবে। দামের উঠা-নামার পরিমাণ কমিলে ক্রেতাদের ও সমাজের মঙ্গল হয়। ফটকা কারবার যত ব্যাপক ও ঠিকমত চলিবে ততই জিনিসের দাম বিভিন্ন সময়ে সমান থাকার সম্ভাবনা বাড়িবে। ইহাদের কাজের ফলে জিনিসের দাম সাময়িক কারণে হঠাৎ উঠা-নামা করে না। চাহিদা ও যোগানের মধ্যে যথার্থ সমতা দেখা দেয় ও বাজার দর শীঘ্র শীঘ্র স্বাভাবিক মূল্যের সমান হয়।

দ্বিতীয়ত ধর ফটকা কারবারী দূরের সব লক্ষণ হিসাব করিয়া দেখিল যে, এ দেশের যে রকম আর্থিক উন্নতি হইতেছে তাহার ফলে কাপড়ের চাহিদা খুব বেশি রকম বাড়িবে ও ফলে কাপড়ের কলগুলির লাভ অনেক বাড়িবে। লাভ বাড়িলে কাপড়ের কলের শেয়ারের দাম চড়িয়া যাইবে। সুতরাং সে এখনই শেয়ার বাজারে কিছু বেশি দাম দিয়াও এই শেয়ার কিনিতে আরম্ভ করিবে। কাপড়ের কলের শেয়ারের দাম চড়িবে। শেয়ারের এই চড়া দাম দেখিয়া উদ্যোক্তারা বুঝিতে পারে যে, দেশে আরও কাপড়ের কল বসান দরকার। তাহারা নূতন নূতন কোম্পানী গঠন করিয়া কাপড়ের কল খুলিবে। ফটকা কারবারীর কাজের ফলে ইনভেস্টরেরা অর্থাৎ মূলধন বিনিয়োগকারীরা কোন ব্যবসায়ে মূলধন নিয়োগ করা লাভজনক হইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারে। কাপড়ের কলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার অর্থ কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি। কাপড়ের উৎপাদন-বাড়িলে দাম বেশি বাড়িবে না ও তাহাতে সকলেরই উপকার হইবে।

বে-আইনী ফটকা কারবার (Illegitimate speculation): ফটকা বাজারের কারবারীরা যদি দূরদর্শী ও সাধুলোক হয় তবেই ফটকা কারবার হইতে উপরোক্ত সুবিধাগুলি পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক অজ্ঞ ও অসাধু লোকও ফটকা কারবারে নামে। লাভের লোভে সাধারণ লোক ফটকা কারবার করে। তাহাদের ব্যবসায় জ্ঞানবুদ্ধি কম। সুতরাং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয় অনুমান ঠিক না হইয়া বেঠিক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

তাহাদের এই ভুল অনুমান অনুযায়ী কাজের ফলে জিনিসের দাম বেশি রকম উঠা-নামা করিতে পারে। আবার আর এক শ্রেণীর ফটকা কারবারী আছে যাহারা অসাধু তাহারা চাহিদা ও যোগান সম্পর্কে মিথ্যা গুজব রটনা করে। ধরা যাক, তাহাদের দলের লোক কোন জিনিসের দাম পড়িয়া যাইবে বলিয়া রটনা করিতে লাগিল। লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্য বাজারে কিছু জিনিস হয়ত বিক্রয়ও করিল, কিন্তু যেই দাম পড়িতে লাগিল গোপনে অন্যের নামে হয়ত প্রচুর পরিমাণে মাল কিনিতে লাগিল। এইভাবে যখন বাজারে অধিকাংশ মাল তাহার হাতে আসিবে তখন সে দাম বাড়াইয়া দিবে। ইহাকে "Corner" করা বলে।

অজ্ঞ ও অসাধু লোকেরা ফটকা কারবার করিলে দামের উঠা-নামা বাড়ে, কমে না। তাহারা গুজবে বিশ্বাস করিয়া ভয় পায় এবং একসঙ্গে সব মাল বা শেয়ার বিক্রয় করে। ইহার ফলে দাম অত্যন্ত কমিয়া যায়। আবার দাম বাড়িবে এই কথা শুনিয়াই এত কিনিতে আরম্ভ করে যে, দাম প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়া যায়। এইরূপ ফটকা কারবার সমাজের বহু অপকার করে সন্দেহ নাই।

ফটকা বাজারের নিয়ন্ত্রণ (Regulation of speculation): ফটকা কারবারীরা সব সময়ে সাধু হয় না বলিয়া এই বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন উঠিয়াছে। নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অধিকাংশ লেখকই একমত। কিন্তু প্রস্তাবিত পন্থাগুলি লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। আইন করিয়া ফটকা বাজার একদম বন্ধ করা যায়। কিন্তু আইনের ফাঁক থাকিবেই এবং আইন-জীবিদের সাহায্যে ফটকাবাজার আইন ফাঁকী দিবেই। অনেক দেশেই নামমাত্র বেচা-কেনা আইনগত অসিদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে। "Future" বা ভাবী ফটকা বাজার বন্ধ করিয়া দিলে এই প্রকারের ফটকা বন্ধ হয় বটে, কিন্তু ইহার ফলে এই ধরণের কারবারের সুবিধা একেবারে নষ্ট করা হয়। ইহা সমীচীন নহে।

শেয়ার বাজারের বেচা কেনার নিয়মকানুন যথাযথভাবে প্রয়োগ করিলেই অসাধু ফটকা কারবার অনেক কমিবে। অজ্ঞ ফটকাবাজারের জনমত গঠন করা প্রয়োজন। অবশ্য এইগুলি পরোক্ষ উপায় এবং সময়সাপেক্ষ।

Exercises

Q. 1. Discuss the functions of stock exchanges, indicating, in particular, how they promote the investment of capital. (C. U. 1956).

Q. 2. Discuss the nature and necessity of speculation in a modern community. (C. U. B. Com. 1953, '58 ; Viswa. 1952).

Q. 3. Explain carefully the possible beneficial and harmful effects of speculation. (Viswa. 1955, '54 ; C. U. B. Com. 1951).

Q. 4. Do you think that the modern productive organisation would suffer a great loss if all Stock and Produce Exchanges are closed down ? (C. U. B. Com. 1955).

প্রা

১৬'

চতুর্বিংশ অধ্যায়

উৎপাদনের উপকরণগুলির মূল্য নির্ধারণ

(Pricing of the Factors of Production)

বিভিন্ন প্রকার বাজার দ্রব্যের মূল্য কিভাবে স্থির হয় তাহা আমরা আলোচনা করিলাম। এখন আমরা উৎপাদনের উপকরণের মূল্য কিভাবে স্থির হয় তাহা আলোচনা করিব। ইহাকে বণ্টনতত্ত্ব বলে। জাতীয় আয় কিভাবে উপকরণগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয় তাহাঁই এই তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। চার প্রকারের উপকরণ আছে, সুতরাং জাতীয় আয় চারভাগে বিভক্ত হয়। জমির আয়কে খাজনা, শ্রমিকের আয়কে মজুরী, মূলধনের আয়কে সুদ এবং পরিচালকের আয়কে লাভ বলে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বণ্টনতত্ত্বে ব্যক্তিগত আয়ের কথা আলোচিত হয় না, কর্মগত (functional) আয়ই ইহার আলোচ্য বিষয়।

দ্রব্যমূল্যের মত উপকরণের মূল্যও চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ণীত হয়। উপকরণের চাহিদা এবং যোগান কিভাবে স্থির হয় তাহাই বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। প্রথমে আমরা চাহিদার কথা আলোচনা করিব।

একটি ফার্মের চাহিদা : প্রান্তিক উৎপাদন (The demand of a firm : Marginal productivity) : কোন কারবারী একটি উপকর কি পরিমাণ ব্যবহার করিবে? কতটুকু মূলধন বা কয়জন শ্রমিক নিয়োগ করিবে? সাধারণ জিনিসের বেলায় আমরা দেখিয়াছি যে, ইহার প্রান্তিব উপযোগ ও দাম সমান না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতা ইহা ক্রয় করে। তেমনি উপকরণটির প্রান্তিক উৎপাদন ও দাম সমান না হওয়া পর্যন্ত ইহার চাহিদা থাকিবে।

প্রচলিত দামে উপকরণের যে ইউনিট ব্যবহার করিলে লাভও নাই, ক্ষতিও নাই—ইহাকে প্রান্তিক ইউনিট এবং ইহার দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে। অন্যান্য উপকরণের পরিমাণ সমান রাখিয়া নির্দিষ্ট

উপকরণের একটি ইউনিট বাড়াইলে যে পরিমাণ উৎপাদন বাড়ে ইহার মূল্যকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে। ক্ষুদ্র একটি ইউনিট বাড়াইলে বা কমাইলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণ বাড়ে বা কমে ইহাকে প্রান্তিক নীট উৎপাদন বলে। এইভাবে একটি ইউনিট বাড়াইয়া বা কমাইয়া আমরা উপকরণটির প্রান্তিক উৎপাদন স্থির করিতে পারি। তত্ত্বের দিক দিয়া সব ইউনিটই সমান। সুতরাং সকলের দামই প্রান্তিক উৎপাদনের সমান।

হ্রাসমান উপযোগের নিয়ম হইতে যেমন প্রান্তিক উপযোগের কথা বলা যায়, তেমনি উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম হইতে প্রান্তিক উৎপাদনের হিসাব করা যায়। অন্যান্য উপকরণ সমান রাখিয়া একটি উপকরণ বাড়াইলে প্রথম অবস্থায় উৎপাদন হয়ত বেশি বাড়িবে। কিন্তু এইভাবে কিছু উৎপাদনের পরে বেশি উপকরণ ব্যবহার করিলে উৎপাদনের হার কমিয়া যাইবে। কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াইতে থাকিলে, অতিরিক্ত উৎপাদন হয়ত প্রথম বাড়ে, কিন্তু পরে উৎপাদন কমিতে থাকে। ব্যবসায়ী যত বেশি উপকরণ ব্যবহার করে, প্রান্তিক উৎপাদন তত কমে এবং অবশেষে দাম ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান হয়। ইহাকেই প্রান্তিক ইউনিট বলে এবং এই ইউনিটের উৎপাদনের মূল্য, সব ইউনিটের মূল্য স্থির করে। ইহার পর সে আর উৎপাদন বাড়াইবে না, কেননা উৎপাদন অপেক্ষা দেয় পারিশ্রমিক বেশি হইবে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোন কারবারই দ্রব্যের বাজারমূল্য অথবা উপকরণের বাজারমূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। সেই উপকরণটি অন্যত্র নিয়োজিত হইলে যে পারিশ্রমিক পাইতে পারে তাহাকেও সেই মূল্য বা মজুরী দিতে হয়। এইভাবে উপকরণগুলির বাজারমূল্য নির্দিষ্ট হইলে, পরিচালক এমনভাবে উপকরণগুলি নিয়োগ করিবেন যাহাতে তাঁহার উৎপাদনব্যয় সর্বনিম্ন হয়। সেই উপকরণগুলি এমনভাবে ব্যবহার করিবে যাহাতে ইহাদের পারিশ্রমিক ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান হয়। যদি সে মনে করে যে, শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াইলে তাহাদের পারিশ্রমিক হইতে প্রান্তিক উৎপাদন বেশি হইবে, তখন সে অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করিবে। সুদের যে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন বেশি হইলে সে কর্জ নিয়াও মূলধন বাড়াইবে। এইভাবে সে বেশি জমি এবং কম শ্রমিক ও

মূলধন অথবা বেশি শ্রমিক এবং কম জমি ও মূলধন অথবা বেশি মূলধন এবং কম জমি ও শ্রমিক নিয়োগ করে। জমি, শ্রমিক ও মূলধনের ব্যবহার এমনভাবে অদল বদল করিবে যে ইহাদের সকলের পারিশ্রমিক ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান হইবে। পারিশ্রমিকের চেয়ে প্রান্তিক উৎপাদন কম হইলে সেই উপকরণ অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইবে, আর বেশি হইলে উপকরণ ব্যবহার কমান হইবে। ইহার ফলে প্রান্তিক উৎপাদন ও পারিশ্রমিক সমান হইবে।

সংক্ষেপে ইহাই প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্ব। এই তত্ত্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। প্রথমত, সব ইউনিট সমান এবং যে কোন ইউনিট অন্যের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের জন্য সবগুলি উপকরণ প্রয়োজন হইলেও প্রান্তভাগে বেশি মূলধন অথবা বেশি শ্রমিক এবং কম জমি ও মূলধন ব্যবহার কবিতে পারি। অতএব তৃতীয়ত, এই তত্ত্বে ধরিয়া লয় যে, ক্রমাগত উপকরণগুলির পরিমাণ পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। চতুর্থত, ইহা উৎপাদন হ্রাসের নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই তত্ত্বের দ্বারা খাজনা, সুদ, মজুরী ও লাভ ব্যাখ্যা করা যায়। বেশি শ্রমিক ও মূলধনের সাহায্যে একখণ্ড জমি ক্রমাগত আবাদ করিলে প্রান্তিক উৎপাদন কমিতে থাকিবে। জমির খাজনা এই প্রান্তিক উৎপাদনের সমান। অন্যান্য উপকরণ সমান রাখিয়া মূলধনের এক ইউনিট বাড়াইলে বা কমাইলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণে বাড়ে বা কমে ইহাকে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন বলে। সুদ এই প্রান্তিক উৎপাদনের সমান। মজুরীও শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান। পরিচালক না থাকিলে যাহা উৎপাদন হয় ইহার চেয়ে পরিচালকের সাহায্যে উৎপাদন যতটা বেশি হয় তাহাই পরিচালকের প্রান্তিক উৎপাদন। লাভ এই প্রান্তিক উৎপাদনের সমান।

এই তত্ত্বের বহু সমালোচনা করা হইয়াছে। Taussig, Davenport প্রমুখ কয়েকজন লেখক বলিয়াছেন যে, সব উৎপাদনই জমি, শ্রমিক, মূলধন ও পরিচালকের মিলিত পরিশ্রমের ফল। উৎপাদনে ইহাদের কাহার কত অংশ আছে তাহা আলাদা ভাগ করা যায় না। প্রত্যেক উপকরণের নিজস্ব উৎপাদন কতটুকু ইহা স্থির করা সম্ভব নয়। উৎপাদনের জন্য সবগুলি উপকরণই সমানভাবে দায়ী। কিন্তু এই সমালোচকেরা প্রান্তিক উৎপাদন

তত্ত্বের অপপ্রয়োগ করিয়াছেন। যখন আমরা বলি যে ইহা শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন, তখন আমরা একথা ভাবি যে শ্রমিক ছাড়া আর কেহই কিছু উৎপাদন করে না। আমরা শুধু ঐ পরিমাণ উৎপাদন অতিরিক্ত শ্রমিককে আরোপ করি। এ ছাড়া যুক্তভাবে ব্যবহৃত উপকরণগুলির পৃথক উৎপাদন মাপার জন্য কোন উপায় নাই; রুটি ও মাখনের পৃথক উপযোগ বাহির করিতে যতটুকু অসুবিধা হয় জমি, শ্রমিক ও মূলধনের পৃথক উৎপাদন বাহির করিতে ইহার চেয়ে বেশি অসুবিধা হয় না।

দ্বিতীয়ত, Wieser Hobson আর একটি সমালোচনা করিয়াছেন। প্রান্তিক উৎপাদনের দ্বারা একটি উৎকরণের উৎপাদন মাপা যায় না। কারণ সেই উপকরণটির এক ইউনিট কমাইয়া দিলে উৎপাদনব্যবস্থায় এমন সব অসুবিধা দেখা দিবে যে অন্য উপকরণগুলির উৎপাদন কমিয়া যাইবে। সুতরাং এক ইউনিট কমাইয়া দিলে মোট উৎপাদন যত কমিবে তাহা সেই ইউনিটের উৎপাদন অপেক্ষা অনেক বেশি। এইভাবে প্রত্যেক উপকরণের প্রান্তিক উৎপাদন পৃথকভাবে হিসাব করিয়া ইহা যোগ দিলে যোগফল মোট উৎপাদন হইতে বেশি হওয়া অসম্ভব। এই সমালোচকেরা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির ছোট এবং উপকরণগুলির ইউনিট বড় করিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু সাধারণত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনায় উপকরণের ইউনিটগুলি এত ছোট যে একটিকে সরাইয়া দিলে অন্যান্য উপকরণের উৎপাদনক্ষমতা কিছুমাত্র কমে না। ইউনিটগুলি খুব ছোট হওয়া চাই। কিন্তু ইহার জন্য যে ত্রুটি তাহাকে Marshall "second order of the small" বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন।

তৃতীয়ত, এই তত্ত্ব উপকরণগুলির যোগান স্থির থাকে ধরিয়া চাহিদা লইয়া আলোচনা করে। কিন্তু শুধু চাহিদার দ্বারা কোন জিনিস বা উপকরণের মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। উপকরণের যোগান স্থির থাকে না, ইহা পারিশ্রমিক অনুসারে বাড়ে বা কমে। তাই Marshall স্বীকার করিয়াছেন যে এই তত্ত্ব উপকরণগুলির মূল্য নির্ণয়ের শুধু একটি দিকে আলোক সম্পাত করে।

Exercises

Q. 1. Examine the validity of the marginal productivity theory of distribution.

Q. 2. In what respects, if any, does the determination of the values of the factors of production differ from that of the values of commodities ?

Q. 3. How far is it true to say that the theory of wages is an application of the general theory of value ? (C. U. 1931 ; Agra 1939 ; Punj. 1935).

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

খাজনা

(Rent)

খাজনার সংজ্ঞা (The meaning of rent) : সাধারণত পিয়ানো, বাড়ি, জমি ইত্যাদি ব্যবহার করার জন্য যে নিয়মিত ভাড়া দেওয়া হয় ইহাকে খাজনা বলে। কোন বসতবাড়ি বা চাষের জমি ব্যবহার করার জন্য মালিককে যে টাকা দেওয়া হয় ইহাই খাজনা। কিন্তু ইহাতে জমির আয় এবং জমিতে নিয়োজিত মূলধনের আয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। শুধু প্রথমটিকেই অর্থশাস্ত্রে খাজনা বলে। দ্বিতীয়টি সুদ। কেবল জমি ব্যবহারের জন্য যে অর্থ দিতে হয় ইহাকে খাজনা বলে।

প্রজা জমির মালিককে যে খাজনা দেয় ইহাকে মোট খাজনা বা gross rent বলে। ইহার মধ্যে তিন শ্রেণীর জিনিস আছে—আসল খাজনা, মূলধনের সুদ এবং মালিকের ঝুঁকি বহন ও পরিশ্রমের পুরস্কার। (১) শুধু জমি ব্যবহার করার জন্য যে অর্থ দেওয়া হয় ইহাই অর্থনৈতিক খাজনা, (২) ঘরবাড়ি ইত্যাদি বাবদ আয় অর্থাৎ সুদ এবং (৩) মালিকের পরিচালনার পারিশ্রমিক অর্থাৎ মজুরী ইহার অন্তর্গত। জমিটির উন্নতি করিতে যাইয়া মালিক যে ঝুঁকি লইয়াছে তাহার পারিশ্রমিক ইহার ভিতর ধরা যাইতে পারে।

রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব (Ricardian theory of rent) : ক্ল্যাসিক্যাল খাজনাতত্ত্ব Ricardoর নামের সহিত জড়িত, যদিও তাঁহার পূর্বে অন্য লেখকেরা ইহার উল্লেখ করিয়াছিলেন। Ricardoর মতে "জমির নিজস্ব এবং স্থায়ী ক্ষমতা বা উর্বরতা আছে এবং ইহার জন্য মালিককে উৎপন্ন শস্যের যে অংশ দিতে হয় তাহাকে খাজনা বলে।" সব জমির উৎপাদিকা শক্তি সমান নহে। কোন জমির উৎপাদিকা শক্তি বেশি, কোনটির কম। অনুর্বর জমির চেয়ে উর্বর জমির উৎপাদিকা শক্তি বেশি বলিয়া দ্বিতীয় জমির চাষীকে খাজনা দিতে হয়। রিকার্ডো এইভাবে তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ধরা যাক একদল লোক নূতন দেশে অর্থাৎ যেখানে কোন লোক

বাস করে না সেখানে বসতি স্থাপন করিয়া আবাদ শুরু করিয়াছে। প্রথমে তাহারা সর্বাপেক্ষা ভাল জমিগুলি চাষ করিবে। যতদিন এই জমি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইবে ততদিন খাজনা দিবার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। এইসব জমিতে যে ফসল হয় ইহাতে তাহাদের চাহিদা মেটে। তাহারা কোন খাজনা দিবে না, কারণ যে জিনিস অপর্যাপ্ত পাওয়া যায় কেহ ইহার জন্য দাম দেয় না। তারপর আর একদল লোক সেই দেশে আসিল। তাহারা বাকী ভাল জমি সবই চাষ করিল। কিন্তু ইহাতে যে মোট ফসল পাওয়া যায় ইহা দিয়া সকলের খাদ্যের চাহিদা মিটিতেছে না। এ অবস্থায় নূতন দলের অনেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ কম উর্বর জমি চাষ করিতে আরম্ভ করিবে। প্রথম শ্রেণীর জমির চেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি কম উর্বর। সুতরাং ইহাতে কম ফসল হয়। প্রথম শ্রেণীর জমি চাষ করিয়া প্রতি বিঘাতে যদি ১০ মণ ধান পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে বিঘা প্রতি ৮ মণ ধান মিলিবে। উভয় জমি একই পরিশ্রমে একই ভাবে চাষ করিলেও এইরূপ হইবে। ধানের দাম এমন হইবে যে ৮ মণ ধান বিক্রয় করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির উৎপাদনব্যয় পোষাইবে। তাহা না হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি কেহ চাষ করিবে না। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে চাষের ব্যয় একই পড়ে। এই জমিরই ফসলের বাজার দর এক। প্রথম শ্রেণীর জমিতে ব্যয় মিটাইয়াও দুই মণ ধান বেশি থাকিবে। ইহাই প্রথম শ্রেণীর জমির খাজনা। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সমস্ত জমি চাষ করিয়াও যদি খাদ্যের চাহিদা না মেটে তবে তৃতীয় শ্রেণীর জমির আবাদ করা হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে দ্বিতীয় শ্রেণী অপেক্ষাও কম ধান হয়। কিন্তু চাষের ব্যয় একই। সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীর জমি চাষ হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে উদ্বৃত্ত অর্থাৎ খাজনা দেখা দিবে এবং প্রথম শ্রেণীর জমির খাজনা আরও বাড়িয়া যাইবে।

ধরা যাক, জমিতে চাষের খরচ মোট ১০০৲ টাকা করিয়া পড়ে। ইহার মধ্যে চাষীর লাভও ধরা আছে। ধানের দাম যদি মণ প্রতি ১০৲ টাকা হয়, তবে প্রথম শ্রেণীতে উৎপন্ন ধান বেচিয়া ১০০৲ টাকা পাওয়া যায় মাত্র। এই অবস্থায় কোন চাষী দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিবে না। কারণ তাহা হইতে ৮ মণ ধান পাওয়া যায় এবং ইহার দাম ৮০৲ টাকা। কিন্তু চাষের

ব্যয় পড়ে ১০০৲ টাকা। সব জমিতেই চাষের ব্যয় এক পড়ে, কারণ সব জমি একই ভাবে চাষ করা হয়। লোকসংখ্যা বাড়ার ফলে যদি ধানের চাহিদা বাড়ে এবং দাম মণ প্রতি ১২'৫০ হয় তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করা লাভজনক হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির প্রতি বিঘায় ৮ মণ ধান পাওয়া যায়, তাহা মণ প্রতি ১২'৫০ বিক্রয় করিলে ১০০৲ টাকা পাওয়া যাইবে। ইহা চাষের ব্যয় ও লাভের সমান। বাজারে একটি জিনিসের একই দাম থাকে। সুতরাং প্রথম শ্রেণীর জমির ধানও ১২'৫০ অর্থাৎ মোট ১২৫ টাকায় বিক্রয় হইবে। চাষের ব্যয় বাবদ ১০০৲ টাকা বাদ দিলে এই জমিতে ২৫৲ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। ইহাই প্রথম শ্রেণীর জমির খাজনা।

ধানের চাহিদা বাড়িলে প্রথম শ্রেণীর জমি আরো বেশি পরিশ্রম করিয়া বেশি সার দিয়া চাষ করা (intensively) যাইতে পারে কিন্তু একই জমিতে শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিলে উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম দেখা দিবে। প্রথমবার চাষের ফলে যদি ১০ মণ ধান হয়, দ্বিতীয়বার চাষে মাত্র ৮ মণ ধান পাওয়া যায়। অতএব প্রথম শ্রেণীর জমি আরো বেশি করিয়া চাষ করিলে সেখানেও খাজনা দেখা দিবে।

খাজনা নির্ণয়ের ব্যাপারে ভূমির অবস্থানেরও (situation) গুরুত্ব আছে। ধর, সব জমির উৎপাদনশক্তি সমান। কিন্তু কতকগুলি জমি বাজারের নিকটে, আর কতকগুলি দূরে অবস্থিত। সব জমিতে বিঘা প্রতি ১০ মণ ধান হয় ও চাষের ব্যয় ১০০৲ পড়ে। ধানের দাম যদি ১০৲ টাকা হয়, তবে দূরের জমিগুলি কেহ চাষ করিবে না। কেননা দূরের জমিতে চাষের ব্যয় ছাড়াও যানবাহনের খরচ আছে। ধর, ধান, গরুর গাড়িতে বাজারে আনিতে খরচ পড়ে মণ প্রতি ২৫ নয়া পয়সা। অর্থাৎ দশ মণে ২'৫০ টাকা। সুতরাং দূরের জমিগুলিতে যানবাহনের খরচ ধরিয়া মোট উৎপাদন-ব্যয় বেশি। দূরের জমি আবাদ না হইলে শস্যের যোগান কমিবে এবং ধানের দাম অন্তত ১০'২৫ না হইলে দূরের জমিতে যানবাহনের খরচ পোষাইবে না। নিকটের জমির ধান ১০'২৫ মণ হিসাবে বিক্রয় করার ফলে উদ্বৃত্ত দেখা দিবে। ইহাই খাজনা। সুতরাং জমির অবস্থানের পার্থক্যের জন্যও খাজনা দেখা দেয়।

খাজনাতত্ত্ব হইতে Ricardo এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে খাজনা দামের

অংশ নয়। শস্যের দাম প্রান্তিক জমির উৎপাদনব্যয়ের সমান হয়। দাম যদি প্রান্তিক জমির উৎপাদনব্যয়ের কম হয় তবে তাহা চাষ হইবে না। ইহার ফলে শস্যের যোগান কমিয়া যাইবে এবং ইহার দাম বাড়িবে। তখন প্রান্তিক জমি আবাদ করা আবার লাভজনক হইবে। সুতরাং দাম ও প্রান্তিক জমির উৎপাদনব্যয় সমান হইবে। কিন্তু প্রান্তিক জমিতে কোন উদ্বৃত্ত বা খাজনা নাই। সুতরাং খাজনা উৎপাদনব্যয় অথবা দামের অন্তর্গত নহে। অতএব Ricardoর মতে দাম বেশি হইলেই খাজনা বেশি হয়। খাজনা বেশির জন্য শস্যের দাম বেশি হয় না।

খাজনাতত্ত্বের সমালোচনা: Ricardoর খাজনাতত্ত্বের বহু সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, জমির কোন নিজস্ব এবং অবিনাশী শক্তি নাই। কয়েক বৎসর পর পর চাষ করিলে সব জমিরই উর্বরতা কমিয়া যায়। ইহা অবশ্য সত্য। কিন্তু তাহা হইলেও জমির এমন কতকগুলি গুণ আছে যেমন জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি ইত্যাদি যেগুলি বার বার চাষ করা সত্ত্বেও কখনও নষ্ট হয় না।

Ricardo চাষের যে নিয়মের কথা বলিয়াছেন তাহা আমেরিকান লেখক Carey এবং Rosher সমালোচনা করিয়াছেন। এই লেখকেরা বলেন যে নূতন দেশে সব সময়ে যে সর্বাপেক্ষা উর্বর জমিগুলিই প্রথমে চাষ করা হয় তাহা নয়। অধিকাংশ সময়ে ভাল হউক বা মন্দ হউক লোকালয়ের নিকটস্থ জমিগুলিই প্রথমে চাষ করা হয়। এই জমি খুব উর্বর নাও হইতে পারে। সুতরাং Ricardo চাষের যে নিয়মের কথা বলিয়াছেন তাহা ভুল। ইহার উত্তরে Walker বলিয়াছেন যে উর্বরতা ও অবস্থানের কথা ধরিয়া লইয়াই Ricardo সর্বোৎকৃষ্ট জমির কথা বলিয়াছেন—অর্থাৎ কোন্ জমি প্রথম শ্রেণীর, কোন্‌টি দ্বিতীয় শ্রেণীর—ইহা জমির উর্বরতা ও অবস্থান উভয়ের কথা বিবেচনা করিয়াই ধরা হয়।

রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বের মূল কথা হইতেছে যে খাজনা উৎপাদনব্যয় ও মূল্যের অন্তর্গত নহে। অনেক লেখক ইহার সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অনেক সময়েই খাজনা উৎপাদনব্যয়ের অন্তর্গত এবং ইহা ফসলের মূল্যকে প্রভাবান্বিত করে। সমস্ত জমির কথা ধরিলে অবশ্য খাজনা মূল্যের অন্তর্গত হইবে না। কিন্তু যে কোন এক খণ্ড জমি নানা

জিনিসের চাষে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং এই জমির খাজনা বর্তমানে যে ফসল চাষ হইতেছে ইহার উৎপাদনব্যয় ও মূল্যের অন্তর্গত।

আধুনিক খাজনাতত্ত্ব (The modern theory of rent) : অন্যান্য উপকরণের সহিত জমির পার্থক্য এই যে, জমির সরবরাহ ইহাদের তুলনায় বেশি অস্থিতিস্থাপক। জমির এই বৈশিষ্ট্যই Ricardoর খাজনাতত্ত্বের ভিত্তি। সেইজন্য Ricardo বলিয়াছেন যে জমির খাজনা নির্ধারণের নীতি অন্যান্য উপকরণের মূল্য নির্ধারণ নীতি হইতে পৃথক। কিন্তু অল্প সময়ের কথা ধরিলেই সব উপকরণেরই যোগান অস্থিতিস্থাপক। আবার দীর্ঘ সময় ধরিলে জমির সরবরাহও যতটা অস্থিতিস্থাপক মনে করা হয় ততটা নয়। যদিও জমির পরিমাণ বাড়ান যায় না, তবু জলসেচের সুব্যবস্থা, সার ইত্যাদি ব্যবহার করার ফলে জমির উৎপাদন বাড়ান যায়।

সুতরাং আধুনিক লেখকদের মধ্যে অনেকেই অন্যান্য উপকরণের ন্যায় জমির খাজনা ও প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্ব (marginal productivity) দ্বারা ব্যাখ্যা করেন। শ্রমিকের মত জমিও বিভিন্ন ধরনের। অতএব শ্রমিকের মজুরী যে নীতি দ্বারা স্থির হয় খাজনাও সেই নীতি দ্বারা স্থির হয়। খাজনা প্রান্তিক জমির উৎপাদনের সমান। ধর উর্বরতা এবং অবস্থানের কোন পার্থক্য নাই। অর্থাৎ সব জমির উর্বরতা সমান এবং সবগুলিই বাজার হইতে সমান দূরে অবস্থিত; একজন কৃষক ৫০ বিঘা জমি চাষ করিতেছে। সে কিছু ফসল পায়। সে আর এক বিঘা জমি চাষের জন্য লইল। এখন সে পূর্বের মত পরিশ্রম করিয়া ও শ্রমিকের সংখ্যা না বাড়াইয়া ৫১ বিঘা জমি চাষ করিল। সে অতিরিক্ত ফসল পাইবে ইহা ৫১তম বিঘা জমির উৎপাদন। জমির খাজনা এই প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হইবে।

উর্বরতার পার্থক্যের ফলে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হইবে না। প্রথম খণ্ড জমি যদি দ্বিতীয় খণ্ড জমির চেয়ে বেশি উর্বর হয় তবে প্রথম খণ্ড জমির উৎপাদন দ্বিতীয় খণ্ডের চেয়ে বেশি হইবে। সুতরাং প্রথমটির খাজনা দ্বিতীয়টি হইতে বেশি হইবে। যেমন দক্ষ শ্রমিক কম দক্ষ শ্রমিক হইতে বেশি মজুরী পায়।

খাজনা নির্ণয়ের বিষয় : জমির খাজনা তাহা হইলে কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? প্রথমত, জমির উর্বরতার উপর ইহার খাজনা

অনেকখানি নির্ভর করে। এ বিষয়ের কোন সন্দেহ নাই। যে জমি অপেক্ষাকৃত বেশি উর্বরা ইহার খাজনাও বেশি হয়। দ্বিতীয়ত, জমির অবস্থানের উপরেও ইহার খাজনার পরিমাণ নির্ভর করে। বাজারের নিকটে জমির খাজনা বেশি হইবার সম্ভাবনা, দূরের জমির খাজনা কম হইবে। বড়লোকদের পাড়ার বসতবাড়ির জমির খাজনা গরিব পাড়ার খাজনা হইতে অনেক বেশি হইবে।

যদি সব জমি সমান উর্বর হয় এবং বাজার হইতে সমান দূরে অবস্থিত হয় তবে কি ইহাদের মালিক কোন খাজনা পাইবে না? উর্বরতা ও অবস্থানজনিত কোন পার্থক্য না থাকিলেও জমিতে খাজনা থাকিবে। ইহার কারণ খুঁজিতে বেশি দূর যাইতে হয় না। ধর সব জমিই প্রথমবারে বেশ ভাল করিয়া চাষ করা হইল। ইহাতে যে মোট ফসল পাওয়া গেল তাহা চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হইল না। ফসল বাড়াইবার উদ্দেশ্যে সব জমিই দ্বিতীয়বার চাষ করা হইল।

প্রথমবার চাষের ফলে জমিতে যে পরিমাণ ফসল পাওয়া গিয়াছিল, দ্বিতীয়বার চাষে ইহার চেয়ে কম ফসল পাওয়া যাইবে। প্রথমবারে যদি বিঘাপ্রতি ১০ মণ ফসল পাওয়া গিয়া থাকে, দ্বিতীয়বার চাষে হয়ত ৮ মণ ফসল উঠিবে। ফসলের দাম এমন হওয়া যাই যে ৮ মণ ধান বেচিতে দ্বিতীয়বারের উৎপাদনব্যয় মিটান যায়। ফলে প্রত্যেক জমিতেই ২ মণ করিয়া ফসল উদ্বৃত্ত হইতেছে ও ইহাই জমির খাজনা। সব জমিই সমান উর্বর ও সমান দূরে অবস্থিত বলিয়া ইহার খাজনাও সমান হইবে। কিন্তু উর্বরতা ও অবস্থানজনিত পার্থক্য না থাকিলেও জমিতে খাজনা হইতে পারে। একই জমিতে নানা রকমের ফসল জন্মাইতে পারে। ধর সে জমিতে পাট এবং ধান দুই-ই চাষ করা যায়। বর্তমানে সে জমিতে পাট লাগান হইতেছে ও সে জমিতে কোন খাজনা নাই। কিন্তু ধানের চাহিদা বাড়িয়াছে ও সেইজন্য বেশি জমিতে ধান চাষের প্রয়োজন হইয়াছে। পূর্বেকার জমির মালিককে হয়ত কিছু দিতে পারিলে সে জমিতে ধান চাষের অনুমতি দিতে পারে। এই জমি পাট হইতে ধান চাষে সরাইয়া আনিতে হইলে জমির মালিককে এখন কিছু অর্থ দিতে হইবে। এই অর্থ ধান চাষের খাজনা। সব জমি সমান উর্বর হইলেও এই অর্থ দিবার

প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ তাহা না হইলে পাট চাষের জমিতে ধান চাষের অনুমতি মিলিবে না।

খাজনা ও দামের সম্বন্ধ (Rent and Price): সাধারণ চাষী মোট উৎপাদনব্যয়ের হিসাব করিবার সময় জমির জন্য তাহাকে কত টাকা খাজনা দিতে হয় ইহাও হিসাবের মধ্যে ধরে। খাজনার হার বেশি হইলে মোট উৎপাদনব্যয়ও বেশি হইবে বলিয়া ধরা হয়। আবার কলিকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলের দোকানে অনেক সময়েই দেখা যায় যে জিনিস-পত্রের দাম অন্য দোকান অপেক্ষা একটু বেশি থাকে। ইহার সমর্থনে সেই অঞ্চলের দোকানদারেরা বলে যে তাহাদের দোকানভাড়া অনেক বেশি। সুতরাং একটু বেশি দাম না নিলে তাহাদের খরচ উঠিবে না। এই জন্য সাধারণভাবে মনে হয় যে খাজনা বেশি হইলে ফসলের বা জিনিসের দাম বেশি হইবে। অর্থাৎ খাজনার হার দ্বারা জিনিসের মূল্য নির্ধারিত হয়।

রিকার্ডো এই মতের বিরুদ্ধবাদী। তাঁহার মতে খাজনার হার বাড়িলে জিনিসের দাম বাড়ে না। বরঞ্চ জিনিসের দাম বাড়ার ফলেই খাজনা বাড়ে। কোন কারণে ফসলের মূল্যবৃদ্ধি হইলে চাষীরা পূর্বের চেয়ে বেশি খাজনা দিতে পারে ও তাহাদের প্রতিযোগিতার ফলে খাজনার হার বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন জমির উর্বরাশক্তি বিভিন্ন এবং সেই ভিত্তিতে জমির শ্রেণী বিভাগ করা যায়। যেমন প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী প্রভৃতি জমি। প্রথম শ্রেণীর জমির উর্বরাশক্তি দ্বিতীয় শ্রেণী অপেক্ষা বেশি বলিয়া উহা হইতে বেশি ফসল পাওয়া যায়। ধরা যাক যে ১০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া প্রথম শ্রেণী হইতে বিঘা প্রতি ১০ মণ ধান ও দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে ৮ মণ ধান পাওয়া যায়। এই একশত টাকার মধ্যে সমস্ত উৎপাদনব্যয় ও চাষীর লাভও ধরা হয়। কিন্তু খাজনা ধরা হয় না। ধানের দর ১০৲ মণের কম হইলে কোন জমিই চাষ হইবে না। অর্থাৎ ফসল উঠিবে না। ১০৲ টাকা দাম থাকিলে কেবল প্রথম শ্রেণীর জমি চাষ হইবে। কারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে চাষের খরচ পড়ে মণ প্রতি ১২.৫০ টাকা।

সুতরাং ইহার কম দাম হইলে এই জমির চাষী খরচ তুলিতে পারিবে না। যদি কোন সময়ে ধানের চাহিদা বাড়িয়া দাম ১২.৫০ মণ হয় তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ হইবে। এই জমিতে যে ফসল পাওয়া যায় ইহা

বিক্রয় করিয়া কেবল চাষের খরচ উঠে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর চাষীরা বিঘা প্রতি ২৫৲ টাকা বেশি লাভ করে। কারণ তাহাদের উৎপাদনব্যয় পড়ে ১০৲ টাকা মণ ও তাহারা বাজারে ১২.৫০ টাকা মণে বিক্রয় করিতেছে। নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে প্রথম শ্রেণীর চাষী বিঘা প্রতি উদ্বৃত্ত লাভ ২৫৲ টাকা জমির মালিককে খাজনা বাবদ দিতে বাধ্য হইবে। ক্রমে ক্রমে প্রথম শ্রেণীর জমির খাজনা ২৫৲ টাকা হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে উৎপাদনব্যয় (খাজনা বাদ দিয়া) পড়ে ১২.৫০ ও ধানের দামও ১২.৫০ টাকা। এই জমির চাষী কোনও খাজনা দেয় না। কারণ চাষের খরচ ও নিজের লাভের উপর তাহার কোন উদ্বৃত্ত থাকে না। রিকার্ডোর মতে নিজের লাভ সহ উৎপাদনব্যয়ের অতিরিক্ত যাহা থাকে অর্থাৎ দামও উৎপাদনব্যয়ের মধ্যে যাহা উদ্বৃত্ত তাহাই খাজনা। অতএব খাজনা উৎপাদনব্যয়ের অন্তর্গত নয় এবং যেহেতু ফসলের দাম ইহার উৎপাদনব্যয়ের সমান হয়, দাম খাজনার উপর নির্ভর করে না। বরঞ্চ ধানের দাম ১০৲ টাকা হইতে ১২.৫০ টাকা হওয়ার ফলেই প্রথম শ্রেণীর জমিতে ২৫৲ টাকা করিয়া খাজনা পাওয়া গেল। খাজনা বাড়িলে দাম বাড়ে ইহা বলা ঠিক নয়। দাম বাড়িলেই খাজনা বাড়ে। চৌরঙ্গীর দোকানদার জানে যে সেখানকার দোকানে অপেক্ষাকৃত ধনী কিংবা যাহারা সৌখিন বা অভিজাত পল্লীতে ঘোরা-ফেরা পছন্দ করে তাহারা জিনিস কিনিতে আসে। এই শ্রেণীর খরিদ্দারের নিকট কিছু বেশি দাম চাহিলে তাহারা ভ্রূক্ষেপও করে না। সুতরাং দোকানদার বেশি ভাড়া দিয়াও সেই অঞ্চলে দোকান নিতে রাজী হইবে। অর্থাৎ দাম বেশি নেওয়া যায় বলিয়াই দোকান ভাড়া বেশি হয়।

এই তত্ত্বে কতখানি সত্য নিহিত আছে? বহু লেখক ইহা স্বীকার করিতে রাজী নহেন। তাঁহাদের মতে রিকার্ডো মনে করিয়াছিলেন যে মজুরী না দিলে শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়া যাইবে; সুদ না দিলে মূলধনের পরিমাণ কমিবে ও লাভ না দিলে কেহই ব্যবসায় নামিবে না। সুতরাং মজুরী, সুদ ও লাভ না দিলে এইসব উপকরণের যোগান কমিয়া যাইবে। ঠিকমত মজুরী, সুদ ও লাভ দিলে তবেই উৎপাদনের কার্যে ইহাদের পাওয়া যাইবে। সুতরাং মজুরী, সুদ ও লাভ উৎপাদনব্যয়ের প্রয়োজনীয় অংশ।

কিন্তু খাজনা না দিলেও জমির সরবরাহ কমিবে না। জমি প্রকৃতিদত্ত সম্পদ। সুতরাং খাজনা দিলেও জমির সরবরাহ ঠিকই থাকিবে। অর্থাৎ রিকার্ডোর মতে সমস্ত জমির সরবরাহ অস্থিতিস্থাপক। জমি চাষ না করিলে শুধু পড়িয়া থাকিবে এবং হয়ত বনজঙ্গল গজাইবে। অর্থাৎ জমিকে অন্য কোন কার্যে ব্যবহার করা যায় না (Land has no alternative use)।

কিন্তু সমস্ত জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক হইলেও বিশেষ কোন শস্য উৎপাদনের কথা ধরিলে জমির যোগান স্থিতিস্থাপক। ধান চাষের জমির যোগান বাড়ান বা কমান যায়। এখন যে জমিতে পাট চাষ হইতেছে দরকার হইলে ইহাতে ধান চাষ করা যায়। বেশি ধান উৎপাদন করিতে হইলে বেশি জমিতে ধান চাষ করিতে হইবে। এখন যে জমিতে পাট চাষ হইতেছে সেখানে পাট না লাগাইয়া ধান লাগাইতে হইবে। পাটের জমিতে যে খাজনা ঠিক করা ছিল অন্তত সেই খাজনা অথবা ইহার চেয়ে সামান্য কিছু বেশি খাজনা দিতে স্বীকার না করিলে এই জমির মালিক ধান চাষের জন্য জমি দিবে না। সুতরাং পাটের জমির খাজনা ধান চাষের উৎপাদনব্যয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে। ইহা না দিলে সেই জমিতে ধান চাষ করা যাইবে না। এই খাজনাকে পবিবর্তনব্যয় (transfer cost) বলে এবং ইহা ধানের দামের অন্তর্গত। অন্তত এই খাজনা দিলে ধানের জন্য জমি পাওয়া যাইবে না। সুতরাং বিশেষ ধরনের কৃষির জন্য জমির সরবরাহ স্থিতিস্থাপক এবং ইহার জন্য যে খাজনা দিতে হয় তাহা শস্যের দামের অন্তর্গত।

শহরের জমির খাজনা (Urban site rent) : যে নীতিতে চাষের জমির খাজনা নির্ণীত হয় সেই নীতিতেই শহরের জমির খাজনাও নির্ণীত হয়। কিন্তু শহরে জমির বেলায় উর্বরতার পার্থক্যের কোন গুরুত্ব নাই। বিভিন্ন জমির প্লটের সুবিধা অসুবিধার উপরেই এই সমস্ত জমির খাজনা নির্ভর করে।

বসতবাটির খাজনা জমির অবস্থানের—যেমন চওড়া রাস্তা, পার্কের নৈকট্য ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। অন্য কতকগুলি কারণের উপরেও বাড়ির খাজনা নির্ভর করে। নিজেদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব যে অঞ্চলে

বাস করে লোকে অনেক সময়ে তাহার নিকটেই থাকিতে চায়। ধনীরা অভিজাত অঞ্চল পছন্দ করে।

অবস্থানের সুবিধা ছাড়াও ঘরের তলা বাড়াইতে যে মূলধন নিয়োগ করিতে হয় তাহার জন্যও খাজনা বাড়ে বা কমে। উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম কৃষিক্ষেত্রের মত শহরের জমিতেও খাটে। কয়েকটি তলা বাড়াইবার পর প্রান্তিক তলার খরচ ও খাজনা সমান হয়। অনেক কারণে নীচের তলার ভাড়া বেশি হয়, বিশেষত বাড়িটি যদি ব্যবসায়ের কাজে লাগে। প্রান্তিক তলা ও নীচের তলার ভাড়ার পার্থক্যই খাজনা।

গৃহনির্মাণযোগ্য সব জমিতেই অনুপার্জিত মূল্য বৃদ্ধির (unearned increment) সমস্যা দেখা দেয়। শহরতলীতে প্রথমে কম ভাডা থাকে। শহর বাড়িলে ক্রমেই বাড়ির ভাড়া বাড়ে। তেমনি নূতন রাস্তা তৈয়ারি করিলে অথবা নিকটে পার্ক তৈয়ারি করিলে ঐ অঞ্চলের ভাডা বাডে যদিও ইহার জন্য মালিককে কিছুই করিতে হয় না। চাষের জমিতেও বিনা পরিশ্রমে মূল্যবৃদ্ধি হয়, যেমন নূতন শহর বসিলে নিকটস্থ চাষের জমির মূল্য বাডে। শহরের জমির মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার কথা সকলেই জানে। সমাজতন্ত্র-বাদীদের মতে অনুপার্জিত মূল্যবৃদ্ধি সরকারের প্রাপ্য; সরকারও এই আয়ের উপর উচ্চহারে কর ধার্য করে।

খনি, মৎস্য চাষের বিল ইত্যাদির খাজনা (The rent of mines, quarries and fisheries): চাষের জমি ও খনির মধ্যে পার্থক্য আছে। চাষের জমি হইতে চিরকাল আয় পাওয়া যায়, কিন্তু খনি কালক্রমে নিঃশেষ হইয়া যায়। খনির ইজারাদারেরা যে টাকা দেয় তাহার দুইটি অংশ—প্রথমত, খনি নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে বলিয়া একটি রাজস্ব (Royalty), দ্বিতীয়ত, অন্যান্য খনির চেয়ে অধিক সুবিধার জন্য খাজনা, তৃতীয়ত, ঐটিই প্রকৃত খাজনা এবং প্রান্তিক তত্ত্বের ভিত্তিতে ইহা হিসাব করা হয়।

ইজারাদারেরা দুই প্রকারে টাকা দেয়—একটি বাৎসরিক নির্দিষ্ট হারে; ইহাকে dead rent বলে। আর একটি খনিজ দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে ইহাকে রাজস্ব বলে। প্রশ্ন এই যে রাজস্ব কি প্রকৃত খাজনা? Marshall-এর মতে খনি নিঃশেষ করার জন্যই রাজস্ব দিতে হয়; ইহা

প্রকৃত খাজনা নহে। Taussig অন্যমত পোষণ করেন। রাজস্ব হউক অথবা যাহাই হউক অপকৃষ্ট জমির মালিক কিছু পাইবে কিনা সে বিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সব খনি প্রান্তসীমায় অবস্থিত এবং প্রান্তিক খনিতে ব্যয়ের অতিরিক্ত কোন আয় হয় না। তাঁহার মতে ভাল খনিতে যে রাজস্ব দেওয়া হয় তাহা খাজনা ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ নিকৃষ্টতম খনি dead rent হউক বা রাজস্ব হউক কিছুই দিতে পারে না।

অর্থনৈতিক উন্নতি ও খাজনা (Economic progress and rent): অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে জমির খাজনা বাড়ে বা কমে? না একই থাকিয়া যায়? অর্থনৈতিক উন্নতি বলিতে সাধারণত যান্ত্রিক উন্নতি ও যানবাহনের উন্নতি বুঝায় এবং ইহার ফলে লোকের আয় ও জীবনধারণের মান উন্নত হয়। এইগুলি জমির খাজনা কিভাবে প্রভাবান্বিত করে? ধরা যাক, যন্ত্রপাতির উন্নতির ফলে অথবা নূতন ধরনের সার ব্যবহার করার ফলে জমির ফসল বাড়িতেছে। চাহিদা যদি পূর্বের মত থাকে তবে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে শস্যের মূল্য কমিয়া যাইবে। ফলে প্রান্তিক জমির (যে জমিতে চাষের ব্যয় ও উৎপন্ন শস্যের মূল্য সমান) চাষ হইবে না। কৃষির উন্নতির ফলে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বাড়িবে। যদি ফসলের চাহিদা না বাড়ে তবে ইহার মূল্য কমিবে। ফলে, মোট খাজনা কমিয়া যাইবে। অবশ্য উন্নতির ফলে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের জমির খাজনা বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত হইতে পারে। ধরা যাক, উন্নতির ফলে উৎকৃষ্ট জমির উৎপাদন অপকৃষ্ট জমির উৎপাদনের চেয়ে বেশি হইবে। এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট জমির উৎপাদন ও খাজনা বাড়িবে। উন্নতির ফলে আবার কেবলমাত্র নিকৃষ্ট জমিগুলির যদি উন্নতি হয়, তবে তাহাদের উৎপাদন বাড়িবে ও ফলে উৎকৃষ্ট জমির খাজনা কমিতে পারে।

এবার যাতায়াতের উন্নতির কথা আলোচনা করা যাক। যদি রাস্তাঘাট, যানবাহনের উন্নতির ফলে যাতায়াতের ব্যয় কমে, তবে অবস্থানজনিত খাজনার হার কমিয়া যাইবে। যানবাহনের উন্নতির জন্য দূর অঞ্চল হইতে বাজারে মাল আনা সম্ভব হইলে জিনিসের দাম কমিয়া যাইবে। ফলে বাজারে নিকটবর্তী জমিগুলির খাজনা কমিয়া যাইবে এবং দূর অঞ্চলের

জমিগুলির খাজনা বাড়িবে। পূর্বে যাতায়াতের ভাল পথ বা ব্যবস্থা ছিল না বলিয়া গ্রামের চাল গ্রামেই বিক্রয় হইত ও ফলে দামও কম ছিল। ধর গ্রামে ১২৲ টাকা মণ চাল বিক্রয় হইতেছিল ও শহরে চালের দাম ছিল ২০৲ টাকা। কিছুদিন পর রাস্তাঘাটের ভাল ব্যবস্থা হইল ও গ্রাম হইতে চাল শহরে চালান দেওয়া সম্ভব হইল। ফলে গ্রামে চালের দাম বাড়িবে ও সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার জমির খাজনা বাড়িবে। কারণ দাম বাড়িলে খাজনা বাড়ে। আবার গ্রাম হইতে চাল সরবরাহ হইতেছে বলিয়া বাজারে চালের দাম কমিয়া যাইবে। ফলে শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলের জমির খাজনা কমিয়া যাইবে। যখন ২০৲ টাকা দাম ছিল তখন জমির যে খাজনা ছিল এখন গ্রাম হইতে চাল আমদানির জন্য দাম ১৮৲ টাকা হওয়াতে সেই জমির খাজনা কমিতে বাধ্য। পুরাতন দেশে যদি নূতন উর্বর দেশ হইতে মাল চালান যায়, তবে একই অবস্থা হয়। নূতন দেশের জমির খাজনা বাড়ে, আর পুরাতন দেশে খাজনা কমে।

আয় এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলে খাজনা কি ভাবে প্রভাবান্বিত হইবে? সাধারণ লোকে আয় বাড়িলে খাদ্যদ্রব্যের জন্য আয়ের কম অংশ ব্যয় করে। আয় দ্বিগুণ হইলে অন্যান্য জিনিসের চাহিদা দ্বিগুণ হইতেও পারে, কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা দ্বিগুণ হয় না। আয় বাড়িলে খাদ্যদ্রব্যের জন্য আয়ের কম অংশই ব্যয় হয়। অতএব জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলে শিল্পজাত দ্রব্যের তুলনায় কৃষিজাত পণ্যের চাহিদা কমে। যদি ফসলের পরিমাণ একই থাকে তবে ইহার দাম কম হারে বাড়িবে। ফলে অন্যান্য শ্রেণীর আয়ের তুলনায় খাজনার হার কম বাড়িবে।

খাজনা ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধিঃ দেশে যদি লোকসংখ্যা বাড়ে তবে খাজনার পরিমাণ কি পরিবর্তিত হইবে? লোকসংখ্যা বাড়িলে খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়ে। চাহিদা বাড়িলে ইহার মূল্য বৃদ্ধি হইবে। এই চাহিদা মিটাইবার জন্য ক্রমেই উর্বর জমি চাষ করিবার প্রয়োজন হয়। ইহার ফলে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ কমে ও খাজনা বাড়ে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যদি উন্নততর উৎপাদনব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তবে জাতীয় আয় বাড়িবে। আয় বাড়িলে সাধারণভাবে সব জিনিসেরই চাহিদা বাড়িবে এবং কৃষিজাত পণ্যের চাহিদাও বাড়িবে। অবশ্য অন্য

জিনিসের চাহিদা যে হারে বাড়িবে কৃষিজাত পণ্যের চাহিদা সে হারে বাড়িবে না। ইহা সত্ত্বেও চাহিদা বৃদ্ধির ফলে খাজনার হার বাড়িয়া যাইবে।

আধাখাজনা বা খাজনাকল্প আয় (Quasi-rent) : জমি হইতে যে আয় হয় ইহাকে খাজনা বলে। জমির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার যোগান অস্থিতিস্থাপক। ইহা প্রকৃতিদত্ত এবং প্রয়োজনমত ইহার যোগান বাড়ান যায় না। সুতরাং একথা বলা চলে যে উৎপাদনের উপকরণের যোগান অস্থিতিস্থাপক, ইহার আয়ের নাম খাজনা। কিন্তু জমি ছাড়াও অন্য কতকগুলি উৎপাদনের উপকরণ আছে, যাহাদের যোগান চিরকালের জন্য অস্থিতিস্থাপক না হইলেও কিছু কালের জন্য ইহা বাড়ান বা কমান যায় না। কারখানায় বড় বড় জটিল যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিতে ও বসাইতে সময় লাগে অনেক। কাজেই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই উৎপাদন বাড়াইবার প্রয়োজন হইলে নূতন কারখানা খোলা যায় না। কারণ ইহা সময়সাপেক্ষ। আবার যন্ত্রপাতি একবার বসাইবার পর ইহার ব্যবহার না করিলে লোকসান হয়। সুতরাং এই সমস্ত যন্ত্রপাতি হইতে যে আয় হয় ইহার সহিত জমির আয়, অর্থাৎ খাজনার অনেক সাদৃশ্য আছে। জমির মতই ইহাদের যোগান অন্তত কিছুদিনের মত অস্থিতিস্থাপক। যে সব জিনিস তৈয়ারি করিতে এই যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় চাহিদা বাড়িলেও উৎপাদন বাড়ান যায় না। কারণ নূতন যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিয়া ঠিকমত বসাইতে সময় লাগে। কাজেই এই জিনিসগুলির চাহিদা বাড়িলে ইহাদের যোগান বাড়ান সম্ভব হয় না। ফলে ইহাদের দাম চড়ে ও এই সব যন্ত্রের মালিকদের আয় বাড়িয়া যায়। শস্যেরও চাহিদা বাড়িলে জমির খাজনা বাড়ে। এই পর্যন্ত এই ধরনের যন্ত্রপাতির আয়ের সঙ্গে খাজনার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে পার্থক্যও অনেক আছে। দীর্ঘ সময়ের কথা ধরিলেও জমির যোগান একই থাকে ও শস্যের চাহিদা বেশি থাকিলে খাজনাও বেশি থাকে। কিন্তু যন্ত্রপাতি মনুষ্যকৃত জিনিস, প্রকৃতিদত্ত নহে। সময় পাইলে ইহাদের যোগান বাড়ান কমান যায়। প্রয়োজনমত নূতন যন্ত্র তৈয়ারি করা যায়, কিংবা দাম না পোষাইলে পুরাতন যন্ত্র খারাপ হইয়া গেলেও নূতন যন্ত্র বসান বন্ধ করা যায়। সুতরাং চাহিদা বেশি থাকিলে যন্ত্রপাতির যোগান তখন বাড়ান যায় ও ফলে ইহাদের আয় কমিয়া আবার স্বাভাবিক বা ন্যায্য মত হইবে।

কাজেই দীর্ঘ সময়ে যন্ত্রপাতির আয় ও খাজনার প্রকৃতি ভিন্ন। এই অল্প-কালীন সাদৃশ্য ও দীর্ঘকালীন পার্থক্য থাকার জন্য কেম্ব্রিজের অধ্যাপক মার্শাল এই সব যন্ত্রপাতির আয়কে আধাখাজনা বা খাজনাকল্প আয় নাম দিয়াছেন। অল্প সময়ের কথা ধরিলে এই সব যন্ত্রপাতি হইতে যে আয় হয় ইহা চাহিদার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ চাহিদা বেশি কম হইলে ইহা হইতে আয়ও বেশি কম হইবে। জিনিসগুলির উৎপাদনব্যয়ের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ খুব বেশি নাই। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের বাজারে ইহাদের আয় চাহিদা ও যোগান উভয়ের উপরই নির্ভর করে। তখন এই শ্রেণীর আয় জিনিসের উৎপাদনব্যয়ের সমান হইবে। অর্থাৎ খাজনাকল্প আয় উৎপাদনব্যয়ের অংশ। এইখানে খাজনার সহিত ইহাদের পার্থক্য। কারণ খাজনা কোন সময়েই উৎপাদনব্যয়ের অংশে নহে।

মজুরী, সুদ ও লাভে খাজনার অংশ (Rent element in wages, interest and profits) : জমির আয়কে খাজনা বলা হয়। জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক,—ইহা বাড়ান কমান যায় না। সুতরাং জমির আয়, বা খাজনা ফসলের চাহিদার উপর নির্ভর করে। চাহিদা বেশি হইলে ফসলের মূল্য বৃদ্ধি হইবে। ইহার ফলে জমির খাজনা বাড়িবে। খাজনার পরিমাণ প্রধানত ফসলের মূল্য উঠানামার উপর নির্ভর করে। উর্বরতা ও অবস্থানের পার্থক্য গৌণ প্রভাবের মধ্যে পড়ে। ভাল উর্বর জমি কিংবা শহরের নিকটস্থ জমির পরিমাণ চাহিদার তুলনায় কম। ইহাদের যোগান অস্থিতিস্থাপক বলিয়াই এই সব জমিতে বেশি খাজনা পাওয়া যায়।

ইহাই রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বের মূল কথা। রিকার্ডোর মতে এই তত্ত্ব জমিতে প্রযোজ্য। কিন্তু দেখা যায় যে শুধু জমি নয়, অন্য অনেক উপকরণের আয়ের মধ্যেও খাজনার ন্যায় উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়। খাজনা হইতেছে উদ্বৃত্ত—ফসল বেচিয়া চাষের ব্যয় মিটাইয়া যে উদ্বৃত্ত পাওয়া যায় ইহাই খাজনা। এই উদ্বৃত্ত হওয়ার কারণ যোগানের স্থিতিস্থাপকতার অভাব ও চাহিদা বৃদ্ধি। উপকরণটির যোগান যদি অস্থিতিস্থাপক হয় ও ইহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায় তবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ও খাজনা বাড়ে।

কোন কোন শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরীতেও এইরূপ উদ্বৃত্ত অংশ থাকিতে পারে। এদেশে নদ্যো ধরনের কাজের জন্য বহু ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন। কিন্তু

চাহিদার তুলনায় ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা বাড়াইতে হইলে আরো নূতন নূতন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করিতে হইবে ও নূতন নূতন ছাত্র তৈয়ারি করিতে হইবে। ইহা করিতে সময় লাগে। ফলে আপাতত কয়েক বৎসরের জন্য ইঞ্জিনিয়ারের সরবরাহ সীমাবদ্ধ বা অস্থিতিস্থাপক। অথচ ইহাদের চাহিদা বাড়িতেছে। ফলে ইঞ্জিনিয়ারদের বেতন বাড়িয়া যাইবে। ইহাদের শিক্ষা বাবদ পাঁচ ছয় বৎসরে যে টাকা ব্যয় হইয়াছে ইহার ন্যায্য পুরস্কার হিসাবে যে বেতন পাওয়া উচিত আসল বেতন তাহার অনেক বেশি হইতে পারে। অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারদের বেতনের মধ্যে উদ্বৃত্ত অংশ দেখা যায় এবং ইহার সহিত খাজনার অনেক সাদৃশ্য আছে। বিখ্যাত সিনেমা স্টারের বেতনের মধ্যেও এই ধরনের বহু উদ্বৃত্ত আছে এবং ইহার সহিতও খাজনার অনেক সাদৃশ্য আছে।

লাভের মধ্যেও অনেক সময়ে খাজনার সাদৃশ্য আয়ের অংশ দেখা যায়। এমন কি আমেরিকান লেখক ওয়াকারের লাভতত্ত্ব খাজনাতত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত। তাঁহার মতে দক্ষ ব্যবসায়ীর সংখ্যা বেশি নহে। ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করিতে হইলে যে গুণ দরকার ইহা সকল লোকের বা ব্যবসায়ীর মধ্যে পাওয়া যায় না। যাহাদের মধ্যে এইগুণগুলি আছে—তাহাদের সংখ্যা অল্প এবং ইহা সহজে বাড়ান যায় না। কারণ ভাল জমির উর্বরতার ন্যায় এই গুণগুলিও প্রকৃতিদত্ত। কিন্তু ইহাদের যথেষ্ট চাহিদা আছে। পরিচালক দক্ষ হইলে উৎপাদনের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দক্ষ পরিচালকেরা যথেষ্ট আয় করে এবং এই আয়ের সহিত খাজনার অনেক সাদৃশ্য আছে। যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা ও চাহিদা বৃদ্ধি যদি খাজনার কারণ হয়, তবে সুদক্ষ পরিচালকের উপার্জিত লাভকেও খাজনা বলিতে হয়। কারণ তাহাদের যোগান সীমাবদ্ধ এবং তাহাদের যথেষ্ট চাহিদা আছে।

যন্ত্রপাতি হইতে লব্ধ আয়ের মধ্যে যে অল্প সময়ে খাজনার অংশ আছে—ইহাও অধ্যাপক মার্শাল তাঁহার খাজনাকল্প আয়তত্ত্বে দেখাইয়াছেন। যে সমস্ত যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয় ইহাদের বর্তমান যোগান অন্তত সাময়িকভাবে অস্থিতিস্থাপক। ইহাদের চাহিদা বাড়িয়া গেলে এই সব যন্ত্র হইতে সাধারণ অবস্থা হইতে বেশি আয় করা যায়। এই সাময়িক আয় বৃদ্ধির মধ্যে কিছু উদ্বৃত্ত অংশ আছে এবং ইহাই খাজনা।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে উৎপাদনের প্রায় সমস্ত উপকরণের আয়ের মধ্যেই খাজনা সদৃশ অংশ পাওয়া যাইতে পারে। এই কথা মনে করিয়া অধ্যাপক মার্শাল বলিয়াছেন যে খাজনাতত্ত্ব যে কেবলমাত্র জমির বেলাতে প্রযোজ্য তাহা নহে। অন্য অনেক উপকরণের আয়ের কিছু অংশ অন্তত সাময়িকভাবেও এই তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। জমির খাজনা বহু গোষ্ঠীর মধ্যে একটি উপজাতি মাত্র।

Exercises

Q. 1. "Rent is paid for the original and indestructible powers of the soil." Explain. (C. U. 1945, 1935 ; B.Com. 1944, 1941).

Q. 2. Discuss the relation between agricultural rent and agricultural prices. (C. U. 1936 ; B.Com. 1939, 1936).

Q. 3. Examine the validity of the statement that the rent of land does not enter into price but it itself governed by price. (C. U. B.Com. 1953 ; Viswa. 1957, 1956).

Q. 4. Examine the factors that cause the rent of land to increase. Will there be rent if all lands were equally fertile ? (Viswa. 1956 ; C. U. B.Com. 1953, 1951).

Q. 5. Explain the relation between rent, the fertility of agricultural land and the price of crops. (Viswa. 1954).

Q. 6. Explain the effect on rent of (i) an improvement in transport, (ii) an increase in population, (iii) improvement in methods of cultivation and (iv) economic progress in general. (C. U. 1957, B.Com. 1943).

Explain the relation between rent and economic progress. (C. U. 1955).

Q. 7. Distinguish between rent and quasi-rent. (C. U. 1937 ; B.Com. 1932).

Q. 8. State the theory of Rent and discuss whether there is any rent element is Wages, Interest and Profits. (C. U. B.Com. 1957, 1953, 1938).

Q. 9. "The rent of land is the leading species of a large genus". Explain this statement. (C. U. B.Com. 1958, 1955, 1942).

ষড়বিংশ অধ্যায়

সুদ

(Interest)

কোন ঝুঁকি বা অসুবিধা না থাকিলে এবং অতিরিক্ত কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন না হইলে ধার দিয়া মহাজন যে টাকা পায় ইহাকে সুদ বলে। ইহাই শুদ্ধ বা নীট pure or net or economic সুদ। কিন্তু খাতক মহাজনকে সুদ বাবদ যে টাকা দেয় ইহার মধ্যে ঝুঁকি, অসুবিধা এবং ঋণ আদায় সংক্রান্ত পরিশ্রমের জন্য পারিশ্রমিক থাকে। অতএব মোট (gross) সুদের মধ্যে নিম্নলিখিত অংশ আছে—(১) শুদ্ধ সুদ, (২) ঝুঁকি বহনের পারিশ্রমিক, (৩) ঋণ আদায় সংক্রান্ত কাজের পারিশ্রমিক ইত্যাদি। টাকা লেনদেনের কারবারে কিছু না কিছু ঝুঁকি থাকে। যেমন খাতক অসাধু হইলে টাকাটা শোধ না দেওয়ার চেষ্টা করিবে। নানারকমে পরখ করিলেও লোকের অসাধু উদ্দেশ্য সব সময়ে বোঝা যায় না। এমনও হইতে পারে যে সাধু খাতকের ব্যবসার হয়ত ফেল পড়িয়াছে ও ফলে সে নির্দিষ্ট দিনে দেনা শোধ করিতে অপারগ হইয়াছে। মহাজনকে এইরূপ নানা ঝুঁকি বহন করিতে হয় এবং যেখানে ঝুঁকি বেশি, সেখানে ঝুঁকির পুরস্কার স্বরূপ বেশি সুদ চাওয়া তাহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। ইহা ছাড়া টাকা ধার দিয়া আদায় করার সময়ে মহাজনকে হয়ত পরিশ্রম করিতে হয়। খাতকের বাড়ি রোজ রোজ যাইয়া তাগিদ দিতে হয়। এই রকমের অপ্রিয় কাজ তাহাকে যত বেশি করিতে হয় সে ততই বেশি সুদ চাহিবে। মোট সুদের মধ্যে এই বাবদ কিছু পারিশ্রমিকও ধরা হয়। টাকাকড়ি আদানপ্রদানের হিসাবপত্র রাখার জন্য কিছু পরিশ্রম করিতে হয়। এই অতিরিক্ত শ্রমের জন্য মহাজন কিছু পারিশ্রমিক প্রত্যাশা করে। এইসব কারণে মোট সুদের হার বেশি হইতে পারে।

অনেক সময় মোট সুদ বেশি হইলে নীট সুদ কম হইতে পারে। ইহা ছাড়া প্রতিযোগিতার ফলে নীট সুদের হার সর্বত্র সমান হয়। কিন্তু মোট সুদের হার সমান নাও হইতে পারে।

সুদ নির্ণয়ের ক্লাসিক্যাল নীতি (The classical theory of the determination of interest) : সুদ কি ভাবে নির্ণয় করা হয় এবিষয়ে নানা তত্ত্ব আছে। ক্লাসিক্যাল বা পুরাতন কালের লেখকদের মধ্যে অনেকের মত ছিল যে সুদ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন দ্বারা নির্ধারিত হয়। মূলধন বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে। মূলধন ছাড়া শ্রমিক যাহা উৎপাদন করে মূলধনের সহযোগে সে ইহার চেয়ে অনেক বেশি উৎপাদন করে। সেই জন্য ব্যবসায়ীরা কারবারে মূলধন খাটায়। এই কারণে মূলধনের চাহিদা আছে ও যে মূলধন ধার দেয় তাহাকে কিছু অতিরিক্ত মূল্য দিতে ব্যবসায়ীরা রাজী থাকে। উদ্যোক্তা ব্যবসায়ে কত মূলধন খাটাইবে ইহা মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন ও সুদের হারের উপর নির্ভর করে। উৎপাদনের জন্য ক্রমাগত বেশি মূলধন বিনিয়োগ করিলে উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম দেখা যায়। অর্থাৎ অন্য উপকরণের ব্যবহার একই রাখিয়া কেবলমাত্র মূলধনের পরিমাণ বাড়াইলে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার ক্রমেই কমিতে থাকে। মূলধন বিনিয়োগের জন্য যে অতিরিক্ত উৎপাদন হয় ইহা যতক্ষণ পর্যন্ত সুদের পরিমাণ হইতে বেশি থাকে ততক্ষণ ব্যবসায়ে মূলধন খাটান লাভ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই অতিরিক্ত উৎপাদনের পরিমাণ সুদের সমান হইবে। ইহার পরে ব্যবসায়ে আরো বেশি মূলধন খাটান লোকসান। এইভাবে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন (marginal product) সুদের হারের সমান হয়। ইহাকে **মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন তত্ত্ব** বলা হয়।

এই তত্ত্বের অনেক সমালোচনা আছে। মূলধন ব্যবহারে উৎপাদন বাড়ে—এই কথার দুইটি অর্থ হইতে পারে। যথা, মূলধনের ব্যবহারে অধিক জিনিস বা অধিক মূল্য উৎপাদিত হয়। অধিক জিনিস যে উৎপাদিত হয় একথা ঠিক। কিন্তু তাই বলিয়া অধিক মূল্য উৎপাদিত হয় একথা বলা চলে না। জিনিসটির চাহিদা যদি খুব বেশি স্থিতিস্থাপক হয় তবে বেশি জিনিস বিক্রয় করিতে গেলে দাম এত কমিয়া যাইতে পারে যে, মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ বেশি না হইয়া কম হইতে পারে। ফলে বেশি মূলধন দিয়া বেশি জিনিস তৈয়ারি করিয়া লোকসান হইবে। কত মূলধন খাটাইলে অধিক কত জিনিস উৎপন্ন হইল ইহাও সহজে নির্ণয়

করা যায় না। কারণ যন্ত্রপাতি (বা মূলধন) ও উৎপন্ন ভোগ্যদ্রব্য এক প্রকৃতির জিনিস নয়। সুতরাং এই তত্ত্ব দ্বারা সুদের হার নির্ধারণ করা যায় না।

অধ্যাপক মার্শাল প্রভৃতি কয়েকজন লেখকের মতে সুদের হার ভোগনিবৃত্তির (abstinence) বা অপেক্ষার (waiting) পরিমাণের দ্বারা নির্ণীত হয়। মূলধনের পরিমাণ নির্ভর করে সঞ্চয়ের উপর এবং সঞ্চয় নির্ভর করে, লোকে কতখানি ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইতে রাজী আছে ইহার উপর। আমরা যে আয় করি ইহা সমস্ত এখনই নিজেদের ভোগের জন্য ব্যয় করিতে পারি, ফলে কিছুই সঞ্চয় হয় না। কিন্তু তাহা না করিয়া অর্থাৎ কিছুটা ভোগের পরিমাণ যদি কমাইয়া দেওয়া হয় তবেই সঞ্চয় সম্ভব হয়। সুতরাং সঞ্চয়ের পিছনে থাকে ভোগ হইতে নিবৃত্তি। বর্তমানে আয় সম্পূর্ণ ভোগ করি না বলিয়া ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা যায়। আবার অন্য দিক দিয়া দেখিলে বলা যায় যে, সঞ্চয়ের মূলে আছে অপেক্ষা। আমরা সঞ্চয় করি সঞ্চিত অর্থ হইতে ভবিষ্যতে নানা প্রকারের সুবিধা পাইব এই মনোভাব লইয়া। আজ সব টাকা খরচ না করিয়া ভবিষ্যতে পুত্রকন্যার শিক্ষা ও বিবাহে ব্যয় করিব হয়ত এই আকাঙ্ক্ষায় সঞ্চয় করি। অর্থাৎ আজিকার প্রয়োজন না মিটাইয়া ভবিষ্যতের প্রয়োজনে ব্যয় করিব এইজন্য আজ অপেক্ষা করি ও টাকা নানাভাবে সরাইয়া রাখি। লোকেদের মধ্যে সাধারণভাবে ভোগাকাঙ্ক্ষা এত বেশি যে, তাহারা ভোগ হইতে নিবৃত্ত বা ভবিষ্যতে অভাব মিটাইবার জন্য আজ অপেক্ষা করা পছন্দ করে না। এই অপেক্ষা করার অপছন্দতা দূর করিবার জন্য সুদ দিতে হয়। সুদ না দিলে লোকে কম অপেক্ষা করিবে ও ফলে সঞ্চয় কম হইবে। সাধারণত দেখা যায় যে সুদের হার যত বাড়ে সঞ্চয়ও (বা ভোগনিবৃত্তি কিংবা অপেক্ষার পরিমাণ) তত বাড়ে। সুদের হার এমন হওয়া চাই যাহার ফলে প্রয়োজনমত অর্থ সঞ্চিত হয়। ইহাকে ভোগনিবৃত্তি তত্ত্ব (abstinence theory) বা অপেক্ষা তত্ত্ব (waiting theory) বলে।

আবার অধ্যাপক ফিসার (Fisher) প্রমুখ কয়েকজন লেখক বলিয়াছেন যে সুদের হার নির্ভর করে লোকে ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমানকে কতখানি বেশি করিয়া দেখে ইহার উপর। দূরের জিনিস সবই যেন ছোট দেখায়।

ভবিষ্যতের প্রয়োজন-সুখদুঃখ সমস্তই বর্তমানের তুলনায় অনেক কম বলিয়া মনে হয়। এইজন্য লোকে সাধারণভাবে ভবিষ্যতের প্রয়োজনের তুলনায় বর্তমানের প্রয়োজনকে বেশি মূল্য দেয়, যদিও হয়ত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের প্রয়োজন দুইই আসলে সমান। কোন লোককে যদি বলা যায় যে তুমি আজকে একশ টাকা চাও, না এক বৎসর পরে একশ টাকা চাও, তবে সে (এক বৎসর পরে একশ টাকা পাওয়ার মধ্যে কোনরকম অনিশ্চয়তা না থাকিলেও) আজকেই টাকা লওয়া বেশি পছন্দ করিবে। কিন্তু যদি তাহাকে বলা হয় যে তুমি আজ একশ টাকা লইবে, না এক বৎসর পরে ১১০৲ টাকা লইবে তবে সে হয়ত এক বৎসর পরে লওয়াই ঠিক করিতে পারে। অর্থাৎ সে আজকের ১০০৲ টাকাকে একবৎসর পরের ১১০৲ টাকার সমান মূল্য দেয়। অধ্যাপক ফিসার বলেন, এই ক্ষেত্রে লোকটির rate of time-perference, অর্থাৎ ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমানকে বেশি পছন্দের হার, শতকরা ১০৲ টাকা। লোকে সাধারণভাবে বর্তমানকে বেশি পছন্দ করে এবং বর্তমানের জন্যই সমস্ত অর্থ ব্যয় করিতে চাহিবে। এই মনোভাব জয় করিবার জন্য তাহাদিগকে কিছু বেশি অর্থ দিলে তাহারা বর্তমানকে ছাড়িয়া ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিতে রাজী হইতে পারে। অর্থাৎ তাহারা বর্তমানের ব্যয় কমাইয়া ভবিষ্যতের জন্যই সঞ্চয় করিতে রাজী হইবে। এই অধিক মূল্যই সুদ।

এই দুইটি তত্ত্বের সঞ্চয় ও মূলধনের সরবরাহ কেন বেশি হয় না ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু শুধু সরবরাহ দিয়া কোন জিনিস বা উপকরণের মূল্য নির্ণয় হয় না। উহাদের চাহিদার কথাও ভাবিতে হয়। এই দুইটি তত্ত্বে চাহিদার বিষয় কিছু বলা হয় নাই।

সুদ নির্ণয়ের বর্তমান নীতি (The existing theories of determination of interest): বর্তমান লেখকদের মধ্যে যাঁহারা সুদনির্ণয়পদ্ধতি সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একদলের মত এই যে loanable funds অর্থাৎ ঋণ-তহবিলের যোগান ও চাহিদার দ্বারা সুদের হার নির্ধারিত হয়। এই মতবাদকে নিয়ো-ক্ল্যাসিক্যাল বা আধুনিক-পুরাপন্থী মত বলে। দ্বিতীয় দলের প্রবর্তক ইংলণ্ডের বিখ্যাত অধ্যাপক লর্ড কেন্‌স্ (Keynes)। তাঁহার মতে সুদের

হার টাকার চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। আমরা পর পর এই দুইটি তত্ত্বের আলোচনা করিব।

নয়া-ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদ (Neo-classical or Loanable funds theory): এই শ্রেণীর লেখকদের মতে সুদের হার ঋণ-তহবিলের যোগান ও চাহিদার উপর নির্ভর করে। এই তহবিলের পরিমাণ সঞ্চয় ও ব্যাঙ্কগুলির কর্মপদ্ধতির দ্বারা নির্ণীত হয়। যদি সঞ্চয়ের পরিমাণ কোন কারণে বাড়ে তবে এই তহবিল বাড়িয়া যাইবে। অর্থাৎ লোকের হাতে বেশি টাকা জমিলে তাহারা বেশি টাকা লগ্নী বা ধার দিতে চাহিবে। আবার ব্যাঙ্কগুলি যদি বেশি পরিমাণে আমানত সৃষ্টি করে, অর্থাৎ বেশি অর্থ ধার দেয় তবেও এই তহবিল বাড়িবে। ঋণপ্রার্থী থাকে তিন শ্রেণীর লোক,—দেশের সরকার, ব্যবসায়ীবৃন্দ ও সাধারণ লোক। সরকার ঋণ চায় যুদ্ধবিগ্রহ কিংবা দেশের মধ্যে নানা ধরনের উন্নতিমূলক কার্যপদ্ধতি ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য। ইহা ছাড়া বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্যও সরকার দেশের লোকের নিকট ঋণ চায়। ব্যবসায়ীরা ঋণ চায় কারবারে মূলধন বিনিয়োগ করিবার জন্য। মূলধন বিনিয়োগের ফলে উৎপাদন বাড়ে। সেইজন্য ব্যবসায়ীরা ঋণ চায়। তাহাদের চাহিদা সুদের হারের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ সুদের হার বেশি হইলে ব্যবসায়ীরা কম ঋণ চাহিবে। সাধারণ লোকের ছেলেমেয়েদের বিবাহ, বাপ-মার শ্রাদ্ধ, এমন কি সংসারের নানা ব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণ করিতে চায়। তবে এই শ্রেণীর ঋণের চাহিদার পরিমাণ মোট চাহিদার তুলনায় অনেক কম।

ঋণের মোট যোগান ও চাহিদার রেখাদ্বয় যে বিন্দুতে ছেদ করে, সুদের হার সেখানেই নির্ধারিত হয়। সুদ নির্ধারণের উপর সঞ্চয়প্রবৃত্তি ও মূলধনের উৎপাদন শক্তির যথেষ্ট প্রভাব আছে, একথা এই মতবাদে স্বীকার করে।

কেন্‌সের সুদ-নির্ধারণ নীতি (The Keynesian theory of determination of interest): কেন্‌সের মতে সঞ্চয়ের পরিমাণ বা মূলধনের উৎপাদনশক্তি দ্বারা সুদ নির্ণীত হয় না। কারণ সুদের হারের উপর সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে না। বরঞ্চ সুদের হার বাড়িলে সঞ্চয় কমিবে। সুদ বেশি হইলে ব্যবসায়ীরা কম ঋণ লইবে ও কম মূলধন

বিনিয়োগ হইলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ কমিবে। জাতীয় আয় কমিলে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণও কম হইবে। সুদকে সঞ্চয়ের পুরস্কার বলা চলে না। কারণ কোন লোক সঞ্চিত অর্থ যদি মাটির নীচে কলসীতে পুতিয়া রাখে, তবে সে কোন সুদ পায় না।

সুতরাং সুদকে সঞ্চয়ের পুরস্কার বলিলে ভুল করা হইবে। টাকা কর্জ নিলে সুদ দিতে হয়। অতএব সুদকে টাকা কর্জ দেওয়ার পুরস্কার বলা উচিত। লোকে কত টাকা কর্জ দিতে চায় এবং কত টাকা কর্জ নিতে চায় ইহার দ্বারা সুদের হার নির্ণীত হয়। টাকা কর্জ দেওয়ার অর্থ টাকার উপর সাময়িকভাবে কর্তৃত্ব হারান। যাহার হাতে নগদ টাকা থাকে, সে নানা সুবিধা ভোগ করিতে পারে। কিন্তু সে যদি টাকাগুলি কাহাকেও কর্জ দেয় তবে খাতক যতদিন টাকা শোধ না দিতেছে ততদিন এই টাকার উপর তাহার সকল কর্তৃত্ব চলিয়া গেল। এই সময়টুকুর জন্য হাজার প্রয়োজন হইলেও সে টাকাগুলি ফেরত পাইবে না। সুতরাং যে টাকা সে কর্জ দিতেছে খাতক ইহার চেয়ে কিছু বেশি টাকা ফেরত দিতে স্বীকার না করিলে সে কর্জ দিতে রাজী হইবে না। এই বেশি টাকাই সুদ। যাহাদের হাতে নগদ টাকা আছে আসল অপেক্ষা কিছু বেশি টাকা সুদ হিসাবে না দিলে তাহারা টাকা লগ্নী করিতে রাজী হইবে না।

এখন কথা হইতে পারে যে টাকা লগ্নী করিলে যদি সুদ পাওয়া যায় তবে লোকে নগদ টাকা হাতে রাখে কেন? নগদ টাকা হাতে রাখার অর্থ লোকসান দেওয়া, সুদ হারান। কারণ টাকাটা লগ্নী করিলে সুদ পাওয়া যাইত। সুদের লোভ ছাড়িয়া নগদ টাকা হাতে রাখার তিনটি কারণ আছে। প্রথম, প্রত্যেক লোককেই দৈনন্দিন ব্যয়নির্বাহের জন্য হাতে কিছু নগদ টাকা রাখিতে হয়। ইহার পরিমাণ প্রধানত তাহার আয়ের উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়ত, আকস্মিক বিপদ-আপদের জন্যও কিছু নগদ টাকা হাতে রাখিতে হয়। এই দুইটি কারণে যত নগদ টাকা রাখা হয় ইহা সাধারণত সুদের উপর নির্ভর করে না। ইহা লোকের আয় ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। এই বাবদে যে নগদ টাকা রাখা হয় ইহাকে সক্রিয় তহবিল (active balances) বলে। আর একটি কারণে লোকে নগদ টাকা হাতে রাখিতে চায়। লোকে যদি মনে করে

যে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সুদের হার বাড়িবে, তবে তাহারা আজ কর্জ না দিয়া নগদ টাকা হাতে রাখিতে পারে। পরে যখন সুদের হার বাড়িবে, তখন বেশি সুদে কর্জ দিবে এই আশায় টাকা এখন হাতে রাখিয়া দেয়। কিংবা যাহারা আশংকা করে যে শীঘ্রই সুদের হার কমিতে পারে তাহারা আজই সব টাকা লগ্নী করিতে ব্যস্ত হইবে। অর্থাৎ তাহারা হাতে নগদ টাকা যত কম সম্ভব রাখিতে চেষ্টা করিবে। এই উদ্দেশ্যে যত টাকা হাতে রাখা হয়, ইহাকে নিষ্ক্রিয় তহবিল (Idle balances) বলে। ইহার পরিমাণ সুদের হারের উপর নির্ভর করে। সুদের হার বেশি হইলে লোকে কম টাকা হাতে রাখিবে,—কমিলে বেশি টাকা হাতে রাখিবে।

সক্রিয় তহবিল অর্থাৎ দৈনন্দিন প্রয়োজন এবং আকস্মিক বিপদ-আপদের জন্য যে টাকা হাতে রাখা হয় তাহা সুদ-নিরপেক্ষ। অর্থাৎ সুদের হার কম বেশিতে ইহার পরিমাণ বিশেষ বাড়ে-কমে না। কিন্তু নিষ্ক্রিয় তহবিল অর্থাৎ ভবিষ্যতে সুদের হার পরিবর্তিত হইবে মনে করিয়া যে টাকা রাখা হয় ইহা সুদের উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন সুদের হারে লোকে কত টাকা হাতে রাখিবে ইহার একটি তালিকা প্রস্তুত করা যায়। এই তালিকাকে নগদ টাকা রাখিবার ইচ্ছা-তালিকা (Schedule of liquidity-preference) বলে। ইহাতে বলে যে, ধর সুদের হার যদি আট পারসেণ্ট হয় তবে লোকে এত টাকা হাতে মজুত রাখিবে; ছয় পারসেণ্টে আরো বেশি টাকা রাখিবে; চার পারসেণ্টে হইলে ইহার চেয়েও বেশি রাখিবে ইত্যাদি। এই তালিকা এবং টাকার পরিমাণের উপর সুদের হার নির্ভর করে। যেখানে মোট নগদ টাকার পরিমাণ, লোকে যত টাকা হাতে রাখিতে চায়, ইহার সমান হয় সেখানেই সুদের হার নির্ণীত হয়। ধর, সরকার দেশে মোট ১০০০ কোটি টাকা চালু করিয়াছে। নগদ টাকা রাখিবার ইচ্ছা-তালিকা হইতে আমরা জানিতে পারি যে সুদের হার যখন ছয় পারসেণ্ট তখন লোকে মোট ৭০০ কোটি টাকা হাতে রাখিতে চাহিবে; যখন চার পারসেণ্ট তখন ১০০০ কোটি টাকা রাখিবে; যখন তিন পারসেণ্ট তখন ১৩০০ কোটি টাকা রাখিতে রাজী আছে। মোট টাকার পরিমাণ যখন ১০০০ কোটি টাকা, তখন এই তালিকা হইতে বলিতে পারি যে সুদের হার চার পারসেণ্ট হইবে। কারণ তাহা হইলেই সরকার বাজারে যত টাকা ছাড়িয়াছে লোকে ঠিক তত টাকাই

হাতে রাখিতে রাজী আছে। এইভাবে নগদ টাকা হাতে রাখিবার ইচ্ছা ও মোট টাকার পরিমাণ—ইহাদের দ্বারা সুদের হার নির্ণীত হয়।

প্রথম দৃষ্টিতে নয়া-ক্ল্যাসিক্যাল ও কেন্‌সের সুদ তত্ত্ব যতটা বিরোধী মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। মুদ্রাস্ফীতি হইলে অর্থাৎ সরকার বাজারে বেশি টাকা চালু করিলে নগদ টাকা রাখিবার ইচ্ছা-তালিকা যদি একই থাকে তবে সুদের হার কমিবে। এইরূপ ঘটিলে ঋণ-তহবিলের পরিমাণও বাড়িবে ও ফলে সুদের হার কমিবে। নগদ টাকা রাখিবার ইচ্ছা তালিকার পরিবর্তন হইলে বাজারে ঋণ-তহবিলের পরিমাণও বাড়িবে-কমিবে ও সুদের হারের পরিবর্তন হইবে।

সুদ ও উদ্ভাবনী শক্তি (Interest and inventions): সুদের হার নির্ধারণের উপর উদ্ভাবনী শক্তির কোন প্রভাব আছে কি? ধরা যাক্, ঋণ-তহবিলের সরবরাহ ও চাহিদার উপর সুদ নির্ভর করে। সুতরাং উদ্ভাবনের ফলে ঋণ-তহবিলের চাহিদা বাড়িবে না সরবরাহ বাড়িবে ইহার উপর ভবিষ্যৎ সুদের হার নির্ভর করিবে।

সভ্যতার অগ্রগতির ফলে মানুষের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি বাড়িবে। আদিম অসভ্য সমাজের লোক ভবিষ্যতের চিন্তা করিত না। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ভবিষ্যৎ বিপদ-আপদের জন্য সঞ্চয় করিতে শিখিয়াছে। Keynes-এর ভাষায় সভ্যতার ফলে নগদ টাকা রাখিবার ইচ্ছা কমে। ইহা ছাড়া শিল্পোন্নতির ফলে আয় বাড়ে এবং আয় বাড়িলে সঞ্চয় বাড়ে। সঞ্চয় বাড়িলে ঋণতহবিলও বাড়িবে।

কিন্তু সুদ কমিবে কিনা ইহা প্রধানত চাহিদার উপর নির্ভর করে। চাহিদা আবার উদ্ভাবনী শক্তির উন্নতির উপর অনেকটা নির্ভর করে। উদ্ভাবনী শক্তির উন্নতির ফলে ঋণের চাহিদা বাড়িতে পারে। নূতন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন হইলে ইহা তৈয়ারি করিতে হইবে। এই কাজে বহু মূলধনের প্রয়োজন হয় ও ফলে মূলধনের চাহিদা বাড়ে। কিন্তু ইহা যে সব সময়েই হইবে একথা বলা ঠিক হইবে না। পূর্বে জিনিস প্রস্তুত করিতে জটিল যন্ত্রাদি লাগিত। এখনও হয়ত এমন একটি ছোট যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল যাহা দিয়া জিনিসটি সহজে তৈয়ারি করা যায়। ফলে পূর্বাপেক্ষা কম মূলধন লাগে ও মূলধনের চাহিদা কমে।

মোটের উপর ভবিষ্যতের সুদ কমার সম্ভাবনাই বেশি। সুদ কমার আরও দুইটি কারণ আছে। প্রথমত, পাশ্চাত্য দেশগুলিতে লোকসংখ্যা হয় স্থির আছে, না হয় কমিতেছে। ইহার ফলে ঋণ-তহবিলের চাহিদা কমিয়া যাইবে। দ্বিতীয়ত, সাধারণত গরিব লোকে আয়ের সব বা বেশি অংশ ব্যয় করিতে বাধ্য হয়, কম অংশ সঞ্চয় করে। আবার ধনীরা আয়ের বেশি অংশ সঞ্চয় করে। সুতরাং দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িবে এবং সুদের হার কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা বেশি।

সুদের হার কি কখনও শূন্যে নামিতে পারে? (Can the rate of interest ever fall to zero?): চাহিদার দিক হইতে শূন্য সুদের হারের অর্থ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের হার শূন্য। প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য হইলে মূলধনের পরিমাণ বাড়াইয়া উৎপাদন বাড়ান যায় না। অর্থাৎ আমরা মূলধনের উৎপাদনক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছি - ইহার অর্থ আমাদের সব চাহিদা মিটিয়া গিয়াছে। কিন্তু মানুষের কোন অভাব নাই, কোন চাহিদাও নাই এ অবস্থা কল্পনার অতীত। অভাব ও চাহিদা যতদিন থাকিবে ততদিন মূলধন নিয়োগের সুযোগ থাকিবে। সুতরাং সুদ কখনও শূন্য হইতে পারে না।

তেমনি সরবরাহের দিক হইতে সুদের হার শূন্য হইবার অর্থ কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা না রাখিয়াই লোকে ধার দেয়। এই অবস্থা কোনদিন হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ তাহা হইলে লোকে টাকা ধার না দিয়া নিজের হাতে জমা রাখিবে। সুতরাং সুদের হার কোনদিন শূন্যে নামিয়া যাইবার সম্ভাবনা খুবই কম।

সুদের তারতম্য (Different rates of interest): এখন পর্যন্ত আমরা অর্থনৈতিক বা খাঁটি সুদের কথা আলোচনা করিয়াছি। প্রতিযোগিতা থাকিলে অর্থনৈতিক সুদ সর্বত্র সমান হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন দেশে সুদের হার বিভিন্ন। আবার দেশের মধ্যেও বিভিন্ন এলাকায় বা বিভিন্ন কাজের জন্য সুদের হার পৃথক হয়। কি কারণে এই পার্থক্য দেখা যায়?

সব খাতক ভাল জামিন দিতে পারে না বলিয়া সুদের হার পৃথক হয়।

মহাজন যদি খাতকের সাধুতা এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সন্দেহহীন হয় এবং সে জানে যে ঋণ পরিশোধের কোন দুর্ভাবনা নাই, তবে সে কম সুদে ধার দিতে পারে। কিন্তু ইহা না হইলে সে বেশি সুদ দাবি করিবে। স্বভাবতই যে ভাল জামিন রাখিতে পারিবে কিংবা যাহার নিকট হইতে টাকা শোধ না হইবার আশংকা কম, তাহাকে মহাজন কম সুদে টাকা ধার দিতে রাজী হইবে। কাজেই সুদের হারের তারতম্যের একটি বড় কারণ হইতেছে ধারের কারবারের ঝুঁকি। যেখানে ঝুঁকি কম সেখানে মহাজন কম সুদে ধার দিবে। সরকারকে এইজন্য লোকে কম সুদেও ধার দেয়। কারণ এখানে টাকা ফেরত না পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আবার যেখানে ঝুঁকি বেশি সেখানে সুদের হারও বেশি হইবে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সময়ের জন্য ঋণ করা হয় বলিয়া সুদের হার পৃথক হয়। দীর্ঘদিনের জন্য ধার করিলে মহাজন দীর্ঘকাল টাকার উপর কর্তৃত্ব হারায়। অতএব সে বেশি সুদ চাহিবে। এইজন্য সাধারণভাবে দীর্ঘ সময়ের ধারের কারবারে সুদের হার বেশি হয়। অল্প মেয়াদী ধারে সুদ কম হয়।

তৃতীয়ত, ঋণের বাজারে পূর্ণপ্রতিযোগিতা নাই। বিভিন্ন প্রকার ঋণের জন্য বিশেষ বিশেষ বাজার আছে। ব্যাঙ্কগুলি একধরনের লোককে টাকা ধার দেয়, আর সাহুকার বা অন্য মহাজনেরা আর একশ্রেণীর লোককে টাকা ধার দেয়। ব্যাঙ্কের সহিত গ্রাম্য মহাজনদের কোন প্রতিযোগিতা নাই বলিলেই চলে। সর্বত্র সমান প্রতিযোগিতা থাকে না বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন বাজারে ভিন্ন ভিন্ন সুদের হার বর্তমান থাকে।

প্রতিযোগিতার অপূর্ণতার জন্যই বিভিন্ন দেশে সুদের হারের পার্থক্য হয়। বিদেশীরা যে জামিন দেয় তাহা হয়ত পছন্দ হয় না, অথবা অন্য দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অজ্ঞাত থাকে না বলিয়া একদেশের সুদের হার বেশি হইলেও অন্য দেশে ধার দিতে চায় না।

সুদের প্রয়োজনীয়তা (Necessity and justification of interest) : অতি অল্পদিন হইল সুদ দেওয়া সম্মানজনক হইয়াছে। প্রাচীনকালে সুদ গ্রহণ লোকে অসম্মানজনক মনে করিত। তখন লোকে মূলধনের উৎপাদিকাশক্তি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। তাই Aristotle সুদের নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া অন্যান্য লেখকেরা বলিয়াছেন যে,

যাহার বেশি টাকা আছে সেই ধার দেয়। সুতরাং ধার দেওয়ার জন্য মহাজনকে কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না। অতএব সুদ গ্রহণ অর্থের অপব্যবহার মাত্র। প্রাচীনকালে সাধারণত গরিব লোকেরা অভাবের তাড়নায় ধনীদের নিকট ধার করিত। এই কারণে সুদ গ্রহণ নিন্দনীয় ছিল।

আধুনিককালে Karl Marx প্রভৃতির সমালোচনার ফলে সুদ নেওয়া উচিত কিনা প্রশ্ন উঠিয়াছে। মার্কসের মতে শ্রমের পরিমাণ অনুসারে মূল্য স্থির হয়। অতএব মূল্য সম্পূর্ণ শ্রমিকের প্রাপ্য। কিন্তু শুধুমাত্র বাঁচিবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু শ্রমিককে দিয়া মালিকেরা সবই আত্মসাৎ করিতেছে। অতএব মার্কসের মতে সুদ চৌর্যের নামান্তর মাত্র। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুদ থাকিবে না।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভাল কি মন্দ সে আলোচনার ক্ষেত্র ইহা নহে। যতদিন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিবে ততদিন লোককে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সুদ দিতে হইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি যদি নাও থাকে তবুও সুদের অন্য প্রয়োজনীয়তা আছে। দুইটি কারণে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্তত হিসাবের সুবিধার জন্য সুদ রাখিতে হইবে। সরকারের হাতে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন আছে ইহা বিভিন্ন শিল্পে বিনিয়োগ করিতে হইবে। সব শিল্পে সমান হারে উৎপাদন হয় না। কোন কোন শিল্পে শতকরা ১০৲ টাকা অন্যগুলিতে শতকরা ৩৲ টাকা আয় হয়। সমাজতান্ত্রিক সরকারও মূলধন হইতে সর্বোচ্চ আয় পাইতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং সরকারকে অন্তত হিসাব রাখিবার জন্য সুদের হার ধরিতে হইবে। যে শিল্পে ইহার চেয়ে কম উৎপাদন হয় সেখানে সরকার মূলধন বিনিয়োগ করিবে না।

দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক সরকার যদি জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে চায় তাহা হইলেও সুদের হিসাব বাবদ কিছু ধরিতে হইবে। ধর শ্রমিকেরা শুধু ভোগদ্রব্য প্রস্তুত করে এবং ইহা সমানভাবে তাহাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। যদি ভোগের মান উন্নত করিতে হয় তবে কিছু শ্রমিককে যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করার কাজে লাগাইতে হইবে। ভবিষ্যতে এই যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে। কিন্তু যে শ্রমিকেরা যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিতেছে তাহাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুতরাং

যাহারা ভোগ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে তাহাদের কিছু ভোগ্যদ্রব্য ত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ তাহারা প্রত্যেকে যত ভোগ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে তাহার কিছু অংশ যন্ত্রপাতি নির্মাণে নিযুক্ত শ্রমিকদের দিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রমিকদিগকে ভবিষ্যৎ আয়বৃদ্ধির আশায় সাময়িকভাবে অল্প আয়ে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এই সাময়িক আয় হ্রাস যে হারে করা হইবে তাহাই সুদ।

Exercises

Q. 1. Discuss the Keynesian Theory of interest. (C. U. 1956, 1950 ; Viswa. 1956).

Q. 2. Discuss the nature of interest and explain the necessity of paying it. (C. U. 1951 ; B.Com. 1952 ; Viswa. 1954).

Q. 3. Discuss the statement that the rate of interest is determined by the demand for, and supply of loanable funds. (Viswa. 1955).

Q. 4. "Interest is paid for the same reason as all other payments are made, because a loan confers a service." Elucidate this statement. (C. U. B.Com. 1947).

সপ্তবিংশ অধ্যায়

মজুরী

(Wages)

মজুরীর প্রকৃতি (Nature of wages): শ্রমিকের পারিশ্রমিককে মজুরী বলে। খাজনা এবং সুদের সহিত মজুরীর পার্থক্য আছে। শুদ্ধ সুদের (pure interest) হার সর্বত্র সমান। কিন্তু শুদ্ধ মজুরী (pure wages) বলিয়া কিছু নাই। স্থান অনুসারে এবং লোক অনুসারে মজুরীর হারের পার্থক্য হয়। খাজনার সহিত মজুরীর পার্থক্য আছে। খাজনার পরিমাণ খুব কম হয়, আবার খুব বেশিও হয়। মজুরীর এত পার্থক্য হয় না। জীবনধারণ ও কার্যক্ষম থাকার জন্য যে টাকা দরকার মজুরী ইহার কম হইতে পারে না। খাজনা ও মজুরীর আর একটি পার্থক্য আছে। খাজনার স্তর কথার কোন অর্থ নাই, কিন্তু মজুরীর স্তর কথার অর্থ আছে। কারণ সাধারণ শ্রমিকের সর্বনিম্ন মজুরী ও সুদক্ষ শ্রমিকের মজুরীর মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি নহে। যে অর্থে মূল্যস্তরের কথা আমরা বলি সেই অর্থে মজুরীরস্তরের কথাও বলিতে পারা যায়। মূল্যস্তর উচ্চ অথবা নিম্ন বলিলে বোঝায় যে অধিকাংশ দ্রব্যের মূল্য উচ্চ অথবা নিম্ন হইয়াছে। তেমনি মজুরীর স্তর অথবা নিম্ন বলিলে বোঝায় যে অধিকাংশ শ্রমিকের মজুরী বেশি অথবা কম। অতএব খাজনা ও সুদ উভয়ের সহিত মজুরীর পার্থক্য আছে।

প্রকৃত মজুরী এবং আর্থিক মজুরী (Real wages and nominal or money wages): প্রত্যেক শ্রমিক মাসে অথবা সপ্তাহে মজুরী হিসাবে কিছু টাকা পায়। এই টাকাকে আর্থিক মজুরী বলে। কিন্তু শুধু টাকা খাইয়া কেহ বাঁচে না। আমাদের জীবনের ভালমন্দ নির্ভর করে টাকার বদলে যে জিনিস পাই ইহার উপর। সুতরাং আর্থিক মজুরী (অর্থাৎ শ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ) এবং প্রকৃত মজুরীর (অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে যে পরিমাণ দ্রব্যাদি বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়) পার্থক্য বোঝা দরকার। শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিক যে পরিমাণ দ্রব্য পায় ইহার উপর তাহার প্রকৃত মজুরী নির্ভর করে।

প্রকৃত মজুরী কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ? (Factors determining real wages) ঃ বেতন ছাড়া অনেক বিষয়ের উপর প্রকৃত মজুরী নির্ভর করে।

(১) টাকার বদলে কি পরিমাণ জিনিস পাওয়া যায় ইহার উপর প্রকৃত মজুরী নির্ভর করে। প্রত্যেকে টাকা ও নয়া পয়সায় মজুরী পায়। মজুরীর টাকার বিনিময়ে যে ভোগ্যদ্রব্য পাওয়া যায় ইহাই তাহার প্রকৃত পারিশ্রমিক। আর্থিক মজুরী বেশি হইতে পারে, কিন্তু মূল্যস্তর উচ্চ হইলে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী বেশি নাও হইতে পারে। সূচক-সংখ্যার (index number) দ্বারা মূল্যস্তর মাপা যায়।

(২) কিভাবে মজুরী দেওয়া হয় ইহার উপরও প্রকৃত মজুরীর হার নির্ভর করে। মজুরীর টাকা ছাড়াও অনেক সময় শ্রমিককে অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হয়। জেলে বিনাপয়সায় মাছ পায়। সরকারী কর্মচারী বিনা ভাড়ায় বা কম ভাড়ায় বাড়ি পায়। অনেক কাজে অবসর ভাতা বা পেনসন দেওয়া হয়। প্রকৃত মজুরী হিসাবের সময় এই সমস্ত সুবিধার মূল্য ধরিতে হইবে।

(৩) কাজের সময়ও হিসাব করিতে হয়। সপ্তাহে এবং বৎসরে কতদিন কাজ পাওয়া যায় ইহার হিসাব করা উচিত। দুইজন শ্রমিক হয়ত একই বেতন পায়। কিন্তু একজনকে বৎসরের মধ্যে অনেকদিন বেকার থাকিতে হয়। অতএব এই শ্রমিকের প্রকৃত মজুরীর হার অনেক কম।

(৪) কাজের প্রকৃতি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাজ যদি এমন হয় যে শ্রমিকের জীবনীশক্তি কমিয়া যায়, যেমন রেলগাড়ির ড্রাইভার, অথবা ব্লাস্ট চুল্লির শ্রমিক, তাহা হইলে আর্থিক বেতন বেশি হইলেও প্রকৃত মজুরী কম। অল্প বেতনেও লোকে আরামপ্রদ ও মর্যাদাসম্পন্ন কাজ করে। প্রকৃত বেতনের-হিসাব করার সময় এইগুলি ধরিতে হইবে।

(৫) অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ আছে কিনা তাহাও দেখিতে হইবে। কাজের সময় যদি কম হয় তবে অন্য কাজ করিয়া কিছু আয় করার সুযোগ থাকে—যেমন পত্রিকাদিতে লিখিয়া শিক্ষকেরাও কিছু আয় করিতে পারে,—তাহা হইলে আর্থিক বেতন কম হইলেও প্রকৃত মজুরী কম নয় বলিতে হইবে।

(৬) নিয়মিত কাজের সুযোগ আছে কিনা তাহাও দ্রষ্টব্য। বৎসরের কিছু সময়ের জন্য বেশি বেতনের কাজের চেয়ে কম বেতনের সারা বৎসরের কাজ ভাল।

সাফল্যের সুযোগ, উন্নতির আশা, মালিকের ভাল ব্যবহার ইত্যাদি লোককে কম বেতনে কাজ করিতে উদ্বুদ্ধ করে। আর্থিক ও প্রকৃত মজুরীর, পার্থক্য বিভিন্ন সময়ের ও স্থানের মজুরীর তুলনা করিতে সাহায্য করে। প্রকৃত মজুরী বেশি হইলেই শ্রমিকের অবস্থা ভাল বলিতে হইবে।

মজুরী নির্ধারণ নীতি সম্বন্ধে প্রাচীন মতামত (Old views about the determination of wages) : মজুরী কি ভাবে নির্ণীত হয়— এই সম্বন্ধে সেকালের লেখকেরা নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তত্ত্বগুলি একে একে আলোচনা করিব।

অনেক লেখকের মতে মজুরীর হার শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহের ব্যয়ের সমান হইবে। শ্রমিকেরা অধিকাংশই অতি দরিদ্র। তাহাদের বসিয়া থাকিবার মত সামর্থ্য নাই। সুতরাং মালিক যে মজুরী দেয় ইহাতেই তাহাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। কিন্তু মজুরীর হার শ্রমিকের জীবনধারণের জন্য যাহা প্রয়োজন ইহার চেয়ে কম হইতে পারে না। ন্যূনতম যে পরিমাণ অর্থ না থাকিলে পরিবার প্রতিপালন করা সম্ভব নহে, মজুরীর হার যদি ইহারও কম হয় তবে শ্রমিকেরা বিবাহ ও পরিবার প্রতিপালন করিতে পারিবে না। ফলে জন্মের হার কমিবে ও দুইচার বৎসর পরে শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়া যাইবে। চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যা কম হইলে মজুরীর হার বাড়িবে। আবার মজুরীর হার যদি যথেষ্ট বেশি হয়, তবে শ্রমিকদের মধ্যে অবস্থার স্বচ্ছলতার জন্য জন্মের হার বৃদ্ধি পাইবে। ফলে কিছুকালের মধ্যেই শ্রমিকের সরবরাহ বাড়িবে ও চাহিদা একই থাকিলে মজুরীর হার কমিবে। সুতরাং পরিবার পালনের জন্য ন্যূনতম যে অর্থের প্রয়োজন মজুরীর হার ইহার সমান হইবে।

এই তত্ত্বের মূলে আছে ম্যাল্‌থাসের জনসংখ্যাতত্ত্ব। ম্যাল্‌থাসের মতে কোন বাধা না থাকিলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রবণতা বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে ম্যাল্‌থাসের জনসংখ্যাতত্ত্ব সব সময়ে ঠিক হয় না। আর মজুরীর হার বাড়িলেই যে জন্মের হার বাড়িবে—একথা নিশ্চয় করিয়া

বলা যায় না। বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিক বিভিন্ন হারে বেতন পায়। এই তত্ত্ব দ্বারা বেতনের হারের এই পার্থক্যের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং এ কালের লেখকেরা এই মত আর গ্রহণ করে না।

জীবনযাত্রার মান এবং মজুরী (The standard of living and wages)ঃ মজুরীর হারের সহিত মজুরের জীবনযাত্রার মানের সম্বন্ধ কি? সাধারণভাবে মনে হয় যে মজুরীর হার শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিতে যত টাকা প্রয়োজন ইহার সমান হওয়াই উচিত। জীবনযাত্রার মান দ্বারাই মজুরীর হার স্থির হয়। কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্য যাহা প্রয়োজন হয় তাহা নয়, জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য যাহা প্রয়োজন সেই মজুরী শ্রমিককে দিতে হয়। জীবিকা নির্বাহের ব্যয়ের চেয়ে জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য বেশি টাকার দরকার হয়। যে শ্রেণীর শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উচ্চ, তাহাদের বেশি বেতন না দিলে তাহারা কাজ করিতে রাজী হইবে না।

এক অর্থে এই তত্ত্ব সত্য। জীবনযাত্রার মান যে মজুরীর উপর প্রভাব বিস্তার করে তাহা আংশিকভাবে সত্য। সাধারণত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার জন্য শ্রমিকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করিবে ও মজুরীর হার ইহার কম হইলে তাহারা কাজ লইতে অস্বীকার করিবে। সুতরাং মজুরীর হার জীবনযাত্রার মান রক্ষার প্রয়োজনীয় অর্থের কম হইবে না। দ্বিতীয়ত, জীবনযাত্রার মানের সহিত কর্মদক্ষতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। জীবনযাত্রার মান উচ্চ হইলে অর্থাৎ উত্তম খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ ইত্যাদি পাইলে শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ে। দক্ষ শ্রমিকের মজুরী বেশি হয়। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, জীবনযাত্রার মান উচ্চ হইলে মজুরীর হারও বেশি হয়। তৃতীয়ত, জীবনযাত্রার মান লোকসংখ্যার উপরও প্রভাব বিস্তার করে। মজুরীর হার যদি জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন ইহার চেয়ে কম হয়, তবে শ্রমিকেরা বিবাহ করিবে না এবং তাঁহাদের সন্তানসন্ততি কম হইলে শ্রমিকের সরবরাহ কমিয়া যাইবে। ইহার ফলে মজুরী বাড়িবে।

কিন্তু এ তত্ত্বের সমর্থকেরা যদি একথা বলেন যে, মজুরীর উপর জীবনযাত্রার মানের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে তাহা হইলে সে কথা সমর্থন করা যায় না। প্রথমত, জীবনযাত্রার মান উচ্চ হইলেই যে বেশি মজুরী পাওয়া

যাইবে এই কথা জোর করিয়া বলা চলে না। প্রান্তিক উৎপাদন, উন্নত ধরনের উৎপাদনকৌশল, বেশি মূলধনের ব্যবহার ইত্যাদিও মজুরীর হার বেশি হওয়ার কারণ। জীবনযাত্রার মান যতই উচ্চ হউক না কেন শ্রমিকের উৎপাদন যদি বেশি না হয় তবে কোন মালিকই তাহাকে বেশি বেতন দিতে চাহিবে না। দ্বিতীয়ত, জীবনযাত্রার মান উচ্চ ও মজুরীর হার পরস্পর নির্ভরশীল। জীবনযাত্রার মান উচ্চ হইলে যেমন মজুরী বাড়ে, তেমনি মজুরী বাড়িলেও জীবনযাত্রার মান উচ্চ হয়। কোন্‌টি কাহার কারণ ইহা বলা শক্ত। তৃতীয়ত, ইংরাজ লেখক Cannan বলিয়াছেন যে, সভ্যতার অগ্রগতির ফলে মজুরীর হার ধীরে ধীরে বাড়িয়াছে। এই তত্ত্ব দ্বারা মজুরীর হারের উচ্চগতি ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ জীবনযাত্রার মান কথার অর্থ শ্রমিক যে সমস্ত জিনিস বা আরামে অভ্যস্ত হইয়াছে ইহার সমষ্টি যাহা একবার অভ্যাস হইয়াছে ইহা সহজে বদলায় না। সুতরাং জীবনযাত্রার মানও সাধারণত স্থির থাকিবার সম্ভাবনাই বেশি। জীবনযাত্রার মান স্থির থাকিলে মজুরীর হারও স্থির থাকা উচিত। সুতরাং এই তত্ত্ব দ্বারা মজুরীর হার বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না।

সুতরাং মজুরীর হারের উপর জীবনযাত্রার মানের প্রভাব সাধারণত পরোক্ষ। উচ্চ জীবনযাত্রার ফলে কর্মদক্ষতা বাড়ে এবং প্রান্তিক উৎপাদন যদি বেশি হয় তবেই মজুরীর হার বেশি হইবে।

শেষ দাবিদার তত্ত্ব (Residual claimant theory) : আমেরিকান লেখক Walker-এর মতে মোট উৎপাদন হইতে খাজনা, সুদ এবং লাভ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে ইহাই মজুরী। খাজনা, সুদ ও লাভ নির্ণয়ের তত্ত্ব আছে। মজুরী নির্ণয়ের কোন তত্ত্ব নাই, সুতরাং খাজনা, সুদ ও লাভ বাদ দিয়া যাহা থাকে তাহা শ্রমিক পায়। শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়িলে উৎপাদন বাড়িবে এবং সেই সঙ্গে মজুরীও বাড়িবে। এই তত্ত্ব বলে শ্রমিকেরা যাহা উৎপাদন করে তাহার অংশ পায় এবং যত বেশি উৎপাদন করিবে মজুরী ততই বাড়িবে।

কিন্তু এই তত্ত্বের কতকগুলি দোষ আছে। (১) শ্রমিকসংঘের মাধ্যমে কেন মজুরী বাড়ে, তাহা এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে না। (২) এই তত্ত্ব শ্রমিক সরবরাহের কথা আলোচনা করে না। (৩) যদি খাজনা, সুদ

এবং লাভ সরবরাহ ও চাহিদার দ্বারা নির্ণীত হয়, তবে মজুরীও সেইভাবে নির্ণীত হইতে পারে।

মজুরী তহবিল তত্ত্ব (Wages fund theory) : Adam Smith-এর আলোচনার উপর ভিত্তি করিয়া Mill মজুরী-তহবিল তত্ত্বের বর্ণনা করিয়াছেন।

Mill-এর মতে শ্রমিকের যোগান ও চাহিদা অর্থাৎ লোকসংখ্যা ও মূলধনের অনুপাতের উপর মজুরী নির্ভর করে। লোকসংখ্যা বলিতে শ্রমিকের সংখ্যা বোঝায় এবং মূলধন বলিতে চলমান (circulating) মূলধন বোঝায়। আবার চলমান মূলধনের সম্পূর্ণ অংশকে বোঝায় না, যে অংশ শ্রমিকের মজুরী দেওয়ার জন্য ব্যয় হয় কেবলমাত্র তাহাকে বোঝায়। মজুরী তহবিল অর্থাৎ যে টাকা শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার জন্য ব্যয় হয় তাহা নির্দিষ্ট। কেননা ইহা অতীত সঞ্চয়ের ফল। এই তহবিল হইতে শ্রমিকদের চাহিদা আসে। এই তহবিলকে শ্রমিকদের সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে মজুরীর হার পাওয়া যাইবে। অতএব মজুরীর বাড়াইতে হইলে হয় এই তহবিল বাড়াইতে হইবে অথবা শ্রমিকদের সংখ্যা কমাইতে হইবে। কোন বিশেষ এক শ্রেণীর শ্রমিকের বেতন বাড়াইলে অন্য শ্রমিকের বেতন কমিতে বাধ্য।

Mill-এর মতে চলমান মূলধন হইতে শ্রমিকদের চাহিদা আসে। সুতরাং জিনিসের চাহিদা ও শ্রমের চাহিদা এক নয়। অর্থাৎ লোকে যখন কোন জিনিস কেনে তাহাদের ব্যয় বাড়ে ও সঞ্চয় কমে। কিন্তু সঞ্চয় বাড়িলে তবেই শ্রমিকদের চাহিদা বাড়ে। এই উক্তি সন্তোষজনক নয়। শ্রমিকের চাহিদা পরোক্ষভাবে জিনিসের চাহিদা হইতে আসে। জিনিসের চাহিদা বাড়িলে ব্যবসায়ীরা বেশি উৎপাদন করে। ব্যবসায় মন্দা হইলে বিপরীত ঘটে। ইহা ছাড়া লোকেরা আয়ের সবটাই খরচ করে, তবে শ্রমিকদের ভোগদ্রব্য উৎপাদনের কাজে লাগান হয়। লোকে যখন সঞ্চয় করে তখন যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উৎপাদক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। অতএব ভোগ এবং সঞ্চয়ের পরিমাণের পার্থক্য দ্বারা শ্রমিক কোন্ প্রকারের কাজে বেশি সংখ্যায় নিযুক্ত হয় ইহা নির্ণীত হয়। দীর্ঘকাল অবশ্য সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ বাড়িলে যন্ত্রপাতি, কারখানাও বাড়ে।

এই সমস্ত উপকরণ বাড়িলে শ্রমিকদের উৎপাদনক্ষমতা বাড়ে। ইহাই এই তত্ত্বের একমাত্র সত্য।

কিন্তু মজুরী তহবিলের পরিমাণ স্থির থাকে না। এই তহবিলকে টাকার পরিমাণ অথবা বস্তুর পরিমাণ মনে করা যায়। টাকার পরিমাণ অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। ইহা লাভক্ষতির সম্ভাবনা, ব্যাঙ্কের নীতি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। ব্যবসাবাণিজ্য ভাল চলিলে ব্যবসায়ীরা বেশি টাকা ব্যয় করিয়া শ্রমিক নিয়োগ করিবে। ব্যবসায়ের বাজার মন্দা হইলে বিপরীত ঘটিবে। তেমনি শ্রমিকদের ভোগ্যবস্তুর পরিমাণ অর্থাৎ চলমান মূলধনের পরিমাণ স্থির নহে। অল্প সময়ের জন্য কোন কোন বস্তুর পরিমাণ নির্দিষ্ট বলা যায়, কেন না, ধর, এক বৎসরের উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট। কিন্তু ইহা সব সময়ের জন্য নির্দিষ্ট নয়। চলমান (টাকার) তহবিলের পরিমাণ জনসাধারণের বিনিয়োগ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

মজুরী নির্ধারণের বর্তমান নীতি

প্রান্তিক উৎপাদন ও মজুরী (Marginal productivity and wages): বর্তমান কালের লেখকেরা বলেন যে মজুরীর হার শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়। জিনিসের বেলায় যেমন বলা হয় ইহার দাম ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়, শ্রমিকের বেলাতে মজুরী ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান হয়। অন্যান্য উপকরণ একই রাখিয়া ধর, ৫০ জন শ্রমিকের স্থানে হয়ত ৫১ কি ৪৯ জন শ্রমিক নিযুক্ত করা যায় অর্থাৎ একজন শ্রমিক বাড়াইলে বা কমাইলে উৎপাদন যে পরিমাণ বাড়ে বা কমে, ইহার মূল্যকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে। অন্যান্য উপকরণের সরবরাহ না বাড়াইয়া অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু এই বৃদ্ধির হার ক্রমে কমিয়া যাইবে। মালিক শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াইতে বাড়াইতে এমন এক অবস্থায় আসিবে যখন একজন শ্রমিকের মজুরী এবং তাহার উৎপাদনের মূল্য সমান হইবে। এই শ্রমিককে প্রান্তিক শ্রমিক এবং তাহার উৎপাদিত দ্রব্যকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে। মজুরীর হার প্রান্তিক উৎপাদনের সমান। মজুরীর হার প্রান্তিক উৎপাদন অপেক্ষা বেশি হইলে মালিকেরা কম শ্রমিক নিযুক্ত করিবে। কারণ শ্রমিক যাহা উৎপাদন করে

ইহার মূল্য বেতন হইতে কম। আবার মজুরীর হার শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন হইতে কম হইলে মালিকের লাভ বেশি হইবে ও সে বেশি শ্রমিক নিয়োগ করিতে চাহিবে। কিন্তু বেশি শ্রমিক নিয়োগ করিলে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন কমিয়া যাইবে এবং ইহা অবশেষে মজুরীর হারের সমান হইবে। ইহার পর মালিক অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করিবে না।

কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রান্তিক শ্রমিক যে অপটু তাহা নয়। তাহার সাধারণ দক্ষতা আছে এবং তাহার কাজের ফলে মালিকের স্বাভাবিক লাভ (অবশ্য মজুরী দেওয়ার পর) থাকে, কিন্তু তাহার চেয়ে বেশি থাকে না। সে প্রান্তিক এই অর্থে যে তাহার নিয়োগের ফলে শ্রমিক সরবরাহ এমন এক সংখ্যায় আসে যেখানে মালিক সেই মজুরীতে আর ইহার বেশি শ্রমিক নিয়োগ করা লাভজনক মনে করে না।

এই তত্ত্ব, শ্রমিক সরবরাহের দিক, তত বেশি আলোচনা করে নাই। মজুরী শ্রমিকের শুধু পারিশ্রমিক নহে, তাহার আয়ও বটে; সুতরাং মজুরীর হারের উপর তাহার দক্ষতা নির্ভর করে। মজুরী শুধু প্রান্তিক উৎপাদনের সহিত সমান হইলে চলে না, শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার মত হওয়া চাই। মজুরী যদি জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার মত না হয় তাহা হইলে শ্রমিকের দক্ষতা কমিয়া যাইবে এবং ফলে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন কম হইবে। অথবা জন্মের হার কমিয়া গিয়া শ্রমিকের সরবরাহ কমিয়া যাইবে এবং প্রান্তিক উৎপাদন বাড়িবে। সুতরাং সরবরাহের উপর মজুরীর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে এই কথা তত্ত্বটিতে ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকের বাজারে কখনও পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে না। মালিকেরা প্রায় সময় সংঘবদ্ধ থাকে। পক্ষান্তরে শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিক সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকিলে মজুরীর হার প্রান্তিক উৎপাদনের সমান নাও হইতে পারে। অতএব ইহাকে মজুরীর হার নির্ণয় সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব বলা চলে না।

মজুরীর পার্থক্য (Differences of wages): মজুরী নির্ণয়ের তত্ত্বগুলি মজুরীর সাধারণ হার কিভাবে স্থির হয় ইহা আলোচনা করে। মজুরীর হারের পার্থক্য কেন হয় একথা এই তত্ত্বগুলি আলোচনা করে না।

কেন মজুরীর হারের পার্থক্য হয়? কেন কোন শ্রমিক সপ্তাহে মাত্র ১০৲ টাকা করিয়া পায় আর অন্য লোকে সেখানেই সপ্তাহে ২০০৲ টাকা করিয়া বেতন পায়?

প্রথমে ধরা যাক, যে সকল শ্রমিকের দক্ষতা সমান এবং তাহারা ইচ্ছামত যে কোন কাজ বাছিয়া লইতে পারে। এই অবস্থায় কি মজুরীর হারের পার্থক্য হয়? অবশ্যই হইবে এবং Adam Smith ইহার নিম্নলিখিত কারণ দেখাইয়াছেন।

(১) কাজের প্রকৃতির উপরে মজুরীর হার নির্ভর করে। যে কাজ পছন্দসই সেখানে লোকে যে মজুরীতে কাজ করিতে রাজী হইবে অপছন্দ কাজ হইলে বেশি মজুরী দিতে হইবে। তাহা না হইলে কেহ অপছন্দ কাজ করিতে চাহিবে না। কাজ যত অপছন্দ হইবে ততই তাহাতে মজুরীর হার বেশি হইবার সম্ভাবনা।

(২) শিক্ষার সময় ও ব্যয়। অনেক কাজ আছে যাহা শিখিতে দীর্ঘ সময় লাগে ও অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হয়। এই কাজে বেশি বেতন না পাওয়া গেলে লোকে ইহা শিক্ষা করিতে সময় ও অর্থ ব্যয় করিবে না।

(৩) কাজটি পাকা না সাময়িক ইহার উপরেও মজুরীর হার নির্ভর করে। যে কাজ মাঝে মাঝে চলে ও মাঝে মাঝে বন্ধ হয়, সেখানে বেশি মজুরী না দিলে পোষায় না। কাজটি পাকা ও নিয়মিত হইলে কম মজুরী হইলেও লোকে তাহা পছন্দ করিবে। অনিয়মিত ও অস্থায়ী কাজে বেশি মজুরী না দিলে লোক পাওয়া যাইবে না।

(৪) কাজের দায়িত্ব। জহুরী এবং স্বর্ণকারদের বেতন বেশি, কারণ তাহারা মূল্যবান জিনিসের দায়িত্ব লয়। গুরুতর দায়িত্ব লইতে হয় বলিয়া কোম্পানীর পরিচালকদের বেতন বেশি। কাজ যত বেশি দায়িত্বপূর্ণ হইবে সাধারণত তত বেশি বেতন দিতে হয়।

(৫) সাফল্যের সম্ভাবনা। কোন কাজে যদি সাফল্যের এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে তবে সে কাজে অনেক লোক যাইতে চাহিবে। ফলে ইহাতে মজুরীর হার কম হইবে। আইনব্যবসায় ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ব্যবসায়ে কয়েকজন লোক বহু অর্থ রোজগার করে বলিয়া অনেকে ওকালতি করিতে চায়। কিন্তু এই ব্যবসায়ে গড়পড়তা আয় বেশি নহে।

শ্রমিকদের দক্ষতা যদি সমান হয় এবং এক কাজ হইতে অন্য কাজে যাওয়ার যদি কোন অসুবিধা না থাকে তবে উপরিলিখিত কারণগুলির জন্য মজুরীর পার্থক্য হয়। কিন্তু শ্রমিকদের দক্ষতা সমান নয়—কেহ কর্মকুশল, কেহ নয়। সুতরাং দক্ষতা অনুসারে মজুরীর হারের পার্থক্য হয়।

ইচ্ছামত কাজ বাছিয়া লইবার সুযোগ সকলের পক্ষে সমান থাকে না। প্রথমত, শ্রমিকদের শিক্ষা ও জ্ঞান কম বলিয়া কোন্ কাজে কত বেতন, কি সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদি তাহারা জানে না। দ্বিতীয়ত, বাসস্থান ত্যাগ করিয়া বেশি বেতনের লোভে বহুদূরে যাওয়া অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না। তৃতীয় কারণ, বিশেষ কাজের নৈপুণ্য। যাহারা একপ্রকার কাজ শিখিয়াছে তাহারা সহসা অন্য কাজ করিতে পারে না। যে বিদ্যুতের কাজ শিখিয়াছে সে হঠাৎ কম্বল বোনার কাজ করিতে পারিবে না। চতুর্থত, অধিকাংশ শ্রমিকই দরিদ্র। তাহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনমত অর্থ ব্যয় করিতে পারে না। সুতরাং যে সব কাজে ব্যয়বহুল শিক্ষার প্রয়োজন, তাহাদের ছেলেমেয়েরা সে সমস্ত কাজ পায় না। গরিবের ছেলে কম শিক্ষা পায় ও তাহার "মামার জোরও" থাকে না। অর্থাৎ ভাল সুপারিশ থাকে না বলিয়া সে ভাল কাজ পায় না। তাহাকে সেইজন্য সাধারণ বেতনে সাধারণ কাজ লইয়া সারা জীবন কাটাইতে হয়। এইসব কারণে দেখা যায় সাধারণ কাজের মজুরী কম হইলেও বহু লোক সেখানে ভীড় করে। আর বেশি বেতনের কাজে উচ্চশিক্ষা ও অন্যান্য সুবিধার (যেমন মামার জোর) প্রয়োজন হয় বলিয়া কম লোকই প্রার্থী হইতে পারে। এই জন্য যাহারা এই ধরনের কাজ পায়, তাহাদের বেতনও বেশি থাকে। মজুরীর হারের পার্থক্যের ইহা একটি প্রধান কারণ।

স্ত্রীলোকদের বেতন কেন কম হয় (Causes of lower wages of women): সাধারণত পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকদের বেতন কম হয় যদিও তাহারা একই ধরনের কাজ করে। ইহার কারণ কি?

প্রথমত, তাহাদের শারীরিক শক্তি পুরুষের চেয়ে কম। দ্বিতীয়ত, স্ত্রীলোকেরা সাধারণত স্থায়ীকর্মী নয়। তাহারা চিরকালের জন্য কাজ করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা বিবাহপূর্বের কাজ নেয় এবং

বিবাহের পর কাজ ছাড়িয়া দেয়। যে সব কাজ সহজে শেখা যায় তাহারা সেইসব কাজ করে।

প্রধান কারণ এই যে তাহাদের উপযুক্ত কাজের সংখ্যা কম। তাহারা ইচ্ছামত কাজ বাছিয়া লইতে পারে না। নানা কারণে তাহারা সব রকমের কাজ পছন্দ করে না। শিক্ষকতা, নার্সিং, টাইপ করা ইত্যাদি যে সব কাজ সাধারণত তাহারা করে সেখানে চাহিদার চেয়ে যোগান বেশি; সুতরাং বেতন কম হয়।

তাহাদের দরদস্তুর করার ক্ষমতা কম। তাহারা সাময়িক কাজ করে, পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্বও তাহাদের নাই। অতএব তাহাদের কোন সংঘ নাই। তাই তাহাদের বেতন কম।

উচ্চ বেতন দেওয়ার লাভ (Economy of high wages): সাধারণভাবে মনে হয় যে মালিক শ্রমিককে যত কম মজুরী দিবে ততই তাহার লাভ বেশি হইবে। শ্রমিককে যত কম মজুরী দেওয়া যায় সেই দিকেই মালিকদের স্বার্থ। কিন্তু ইহা সব সময়ে ঠিক নহে। মালিকের লাভ নির্ভর করে উৎপাদনব্যয় যত কম করা যায় ইহার উপর। বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও উৎপাদনব্যয়ের পার্থক্যই লাভ। মজুরীর হার কম হইলেই যে উৎপাদনব্যয় কম হইবে এমন কোন কথা নাই। যে শ্রমিক কম মজুরী পায় তাহার জীবনযাত্রার মানও খুব নীচু। সে হয়ত স্বচ্ছন্দভাবে খাইতে পরিতে পারে না ও অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করিতে বাধ্য হয়। ফলে তাহার দক্ষতাও অনেক কম। দক্ষতা কম হইলে উৎপাদনের পরিমাণ কম হয়। ফলে প্রত্যেক ইউনিটের উৎপাদনব্যয় কম না হইয়া বেশি হইতে পারে। তাহা হইলে মালিকের লাভও কম হইবে। কম মজুরীর শ্রমিক যে খুব সস্তায় জিনিস উৎপাদন করে একথা বলা যায় না।

বরং অনেক সময়েই দেখা যায় মজুরীর হার বেশি হইলে উৎপাদনব্যয় কম পড়ে। যে শ্রমিক বেশি মজুরী পায় সে ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করিতে পারে; স্বাস্থ্যকর বাড়িতে বাস করিবার মত অর্থ রোজগার করে; নিজের ও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় প্রয়োজনমত অর্থ ব্যয় করিতে পারে। ফলে তাহার দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ও সে অনেক বেশি জিনিস উৎপাদন করিতে পারে। সুতরাং মজুরীর হার চড়া হইলেও উৎপাদনব্যয় কম পড়ে। একটি উদাহরণ

দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। ধর, ভারতীয় কাপড়ের কলের শ্রমিক মাসে ১০০৲ টাকা মজুরী পায় ও মোট ১০০০ গজ কাপড় তৈয়ারি করে। কাপড় তৈয়ারিতে মজুরী বাবদ ব্যয় ১০ গজে ১৲ টাকা করিয়া পড়ে। আমেরিকান শ্রমিক সেখানে মাসে ৫০০৲ টাকা রোজগার করে। কিন্তু সে মোট ৭৫০০ গজ কাপড় উৎপাদন করে। আমেরিকান মিলে কাপড়ের মজুরী বাবদ ব্যয় ১৫ গজে ১৲ টাকা করিয়া পড়ে। অর্থাৎ আমেরিকান শ্রমিকের মজুরী পাঁচ গুণ বেশি হইলেও তাহার দক্ষতার জন্য উৎপাদন এত গড়পড়তা অধিক হয় যে উৎপাদনব্যয় বেশ কম পড়ে। এইরূপ হইলে বেশি হারে মজুরী দেওয়াই লাভ। ইহা যে সত্য তাহার প্রমাণ বৃটিশ ও আমেরিকান শ্রমিকদের খুব উচ্চ হারে মজুরী দিতে হয়। কিন্তু ভারতীয় ব্যবসায়ী এদেশী শ্রমিকদের ইহার চেয়ে অনেক কম হারে মজুরী দেয়। এই সুবিধা সত্ত্বেও ভারতের ব্যবসায়ীরা বহু বিষয়ে ইংরাজ ও আমেরিকান ব্যবসায়ীদের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে না।

আরো দুইটি কারণে বেশি হারে মজুরী দেওয়া লাভজনক হইতে পারে। প্রথমত, কোন ব্যবসায়ী যদি অন্যদের অপেক্ষা বেশি হারে মজুরী দেয় তবে ভাল ও দক্ষ শ্রমিকেরা তাহার নিকট কর্মপ্রার্থী হইবে। সে অন্য পরিচালক অপেক্ষা বেশি হারে মজুরী দেয় বলিয়া বাজারের মধ্যে দক্ষতম শ্রমিক নিয়োগ করিতে পারিবে। ফলে তাহার উৎপাদনব্যয় কম পড়িবে। দ্বিতীয়ত, ভাল মজুরী দিলে শ্রমিকেরা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে। অন্তত তাহাদের অসন্তোষ যে কম হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। টাটা আয়রণ ও স্টীল কোম্পানী শ্রমিকদের অপেক্ষাকৃত উচ্চহারে মজুরী ও বোনাস দেয় বলিয়া এই কোম্পানীর শ্রমিকদের মধ্যে কম অসন্তোষ দেখা যায় ও এখানে ধর্মঘটও বিশেষ হয় না। শ্রমিকেরা সন্তুষ্ট থাকিলে উৎপাদনের দিক দিয়া সুবিধা হয়। ইহাতে তাহাদের কাজের ইচ্ছা বাড়ে ও ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সুতরাং মজুরীর হার উচ্চ হইলেই যে উৎপাদনব্যয় বেশি হইবে ইহা ঠিক নয়। বরং আজকালকার দূরদর্শী পরিচালকেরা শ্রমিকদের যতদূর সম্ভব বেশি হারে মজুরী দেওয়ার পক্ষপাতী।

Exercises

Q. 1. Examine the marginal productivity theory of wages. (C.U. 1956).

Q. 2. Discuss the factors that determine wages. Why are wages higher in the U.S.A. and lower in India ? (C. U. 1953).

Q. 3. Explain what is meant by the "economy of high wages." (Viswa. 1957 ; C.U. B.Com. 1958, 1954).

Q. 4. Show how the wages of labour are related to the standard of living of the workers and their productivity. (Viswa. 1956 ; C. U. B. Com. 1955).

Q. 5. Is there any relation between wages and the standard of living of the workers ? (C. U. B. Com. 1952 ; Viswa 1954).

Q. 6. Point out the reasons for which, while one man gets a wage of Rs. 60 per month, another gets Rs. 6000 per month. (Viswa. 1952).

Q. 7. Examine the causes of differences in wage rates. Will all rates be equalised if competition were perfect in the labour market ? (C. U. B. Com. 1953).

Q. 8. How far is it true today that the theory of wages is an application of the general theory of value ? (C. U. 1917, 1940).

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

শ্রমিকসংঘ ও শ্রমিক সমস্যা

(Some Labour Problems)

শ্রমিকসংঘ (Trade Unions) : শ্রমিকের বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সময় সঞ্চয় করা যায় না। আজ যদি কেহ কাজ না করে তবে এই সময় সে আর পাইবে না এবং এই সময়ে যেটুকু পরিশ্রম বা কাজ করিতে পারিত ইহা চিরকালের জন্য হারাইবে। সুতরাং শ্রম সঞ্চয় করা যায় না। শ্রমিকেরা সাধারণত গরিব। কাজ না করিলে তাহাদের আহার্যের সংস্থান হয় না। তাহারা এইজন্য বেশি বেতনের আশায় বসিয়া থাকিতে পারে না। ইহা ছাড়া বাজারের অবস্থা এবং ব্যবসায়ের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে তাহাদের জ্ঞান কম। সুতরাং সে মালিকের সহিত মজুরীর হার সম্বন্ধে দরদস্তুর করিতে পারে না। কিন্তু একা তাহার পক্ষে যাহা সম্ভব হয় না অন্য শ্রমিকদের সহিত সংঘবদ্ধ হইয়া ইহা করা যায়। শ্রমিক-সংঘের মূল কথা হইতেছে যে একতাই বল।

Sydney এবং Beatrice Webb বলিয়াছেন যে, "কাজের অবস্থার অবনতি বন্ধ করা এবং অবস্থার উন্নতি করার উদ্দেশ্যে গঠিত শ্রমিকদের মিলিত প্রতিষ্ঠানকে শ্রমিকসংঘ বলে।" সুতরাং যে সব সুবিধা আদায় করা হইয়াছে সেইগুলি বজায় রাখা এবং দ্বিতীয়ত, অবস্থার আরও উন্নতি করাই শ্রমিকসংঘের উদ্দেশ্য। সংঘের কাজকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একদিকে এই সংঘ শ্রমিকদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হইলে লড়াই করে। আবার অন্যদিকে আপদে-বিপদে, রোগে ও অক্ষমতায় শ্রমিকসংঘ নিজের সভ্যদের সাহায্য করে। সুতরাং ইহার কাজের দুই দিক আছে। একদিকে ইহা দেবী রণচণ্ডী, আবার অন্যদিকে অভয়দাত্রী কল্যাণময়ী বরদা।

সুতরাং শ্রমিকসংঘের প্রথম ও প্রধান কাজ মজুরীর হার ও কাজের অন্যান্য শর্ত সম্বন্ধে সংঘবদ্ধ ভাবে মালিকের সঙ্গে চুক্তি করা। কোন শ্রেণীর শ্রমিককে কত মজুরী দিতে হইবে—দিনে কত ঘণ্টা কাজ করা হইবে, সপ্তাহে ও বৎসরে কত ছুটি দিতে হইবে ইত্যাদি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে

শ্রমিকসংঘ মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা চালায়। যে বিষয়ে উভয়পক্ষের মতের মিল হয় ইহা দলিলে লেখা থাকে এবং সেই চুক্তি অনুযায়ী কারখানায় কাজ চলে। শ্রমিকেরা সকলে মিলিয়া একসঙ্গে মালিকের সঙ্গে কাজের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে কথাবার্তা চালায় বলিয়া এই কাজকে collective bargaining বা সমবেত চুক্তি বলা হয়। শ্রমিকসংঘের কাজ মালিকের সঙ্গে সমবেত চুক্তি ঠিক করা। এই সমবেত চুক্তির প্রভাবে কি মজুরীর হার বাড়ে? আমরা এখন এই বিষয় আলোচনা করিব।

শ্রমিকসংঘ ও মজুরী (Trade Unions and wages): মজুরী বৃদ্ধিই শ্রমিকসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্বে শ্রমিকনেতারা মনে করিতেন যে সংঘবদ্ধ হইয়া মালিকের উপর চাপ দিয়া মজুরীর হার বাড়ান যায়। শ্রমিক একাকী মালিকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু সংঘবদ্ধ হইলে এই দুর্বলতা দূর হয় ও তাহারা মালিককে ন্যায্য বেতন দিতে বাধ্য করিতে পারে। কিন্তু সেকালের অর্থশাস্ত্রীরা একথা স্বীকার করিতেন না। তাঁহারা মনে করিতেন যে শ্রমিকসংঘের দ্বারা মজুরীর হার বাড়ান যায় না। যদি মজুরীর হার বেশি মাত্রায় বাড়ান হয় তবে লাভের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। লাভ কম হইতে থাকিলে মালিকেরা ক্রমে ক্রমে ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিবে বা কারবার কমাইয়া দিবে। ফলে ছাঁটাই আরম্ভ হইবে ও দেশে বেকার শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। ইহার ফলে মজুরীর হার কমিয়া যাইবে।

এই মত যে অনেকখনি সত্য একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শ্রমিকেরা সংঘ গঠন করিয়া কোন মতেই মজুরীর হার বাড়াইতে পারে না —এ মতবাদ সমর্থন করা যায় না; শ্রমিকসংঘ দুইটি উপায়ে সাধারণ মজুরীর হার বাড়াইতে পারে। প্রথমত, মজুরীর হার যদি শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন অপেক্ষা কম থাকে তবে শ্রমিকসংঘ চাপ দিয়া মালিককে প্রান্তিক উৎপাদনের সমান মজুরী দিতে বাধ্য করিতে পারে। শ্রমিকের বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা বজায় থাকে তবেই মজুরীর হার শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়। কিন্তু শ্রমিকের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা কদাচিৎ থাকে। শ্রমিকেরা দরিদ্র বলিয়া অনেক সময়ে ন্যায্য মজুরী অপেক্ষা কম মাহিনায় কাজ করিতে বাধ্য হয়। একাকী ধনী মালিকের বিরুদ্ধে

লড়াই করা সম্ভব হয় না। কিন্তু সংঘবদ্ধ হইয়া তাহারা ধর্মঘট করিতে পারে এবং মালিককে বেশি মজুরী দিতে বাধ্য করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, শ্রমিক-সংঘের কার্যের ফলে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ান যাইতে পারে। মনে রাখিতে হইবে যে শ্রমিকের দক্ষতা পরিচালকের দক্ষতার উপরও কিছুটা নির্ভর করে। সব পরিচালকের দক্ষতা সমান নয়। মজুরীর হার কম দিয়া যদি লাভের পরিমাণ ঠিক রাখা যায়, তবে অনেক অলস পরিচালক ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য সেই রকম পরিশ্রম করে না। কিন্তু শ্রমিকসংঘের চাপে মজুরীর হার বাড়িলে লাভের পরিমাণ কমিতে পারে। লাভ কম হইলে পরিচালকেরা বেশি পরিশ্রম করিবে ও উৎপাদনব্যবস্থার উন্নতির জন্য অধিক মনোযোগ দিবে। শ্রমিকসংঘ এইরূপ পরোক্ষভাবে শ্রমিকদের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইতে পারে। সাধুতা, শৃঙ্খলা, সংযম ইত্যাদি শিক্ষা দিয়া শ্রমিকসংঘ শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ায়। দক্ষতা বাড়িলে তাহাদের মজুরী বাড়ে।

কোন বিশেষ এক শ্রেণীর শ্রমিকদের সংঘ ধর্মঘট করিয়া সভ্যদের মজুরীব হার বাড়াইয়া লইতে পারে। কি অবস্থায় এই শ্রমিকসংঘ মজুরীর হার বাড়াইতে সক্ষম হইবে? প্রথমত, সেই শ্রেণীর শ্রমিকের চাহিদা অস্থিতি-স্থাপক হওয়া চাই। অর্থাৎ সেই শ্রেণীর শ্রমিকের কাজ অন্য শ্রেণীর শ্রমিকের সাহায্যে না করা গেলেই শ্রমিকসংঘটির ধর্মঘট সফল হইতে পারে। সেই শ্রেণীর শ্রমিকের পরিবর্তে অন্য শ্রমিক দিয়া যদি কাজ চালান সম্ভব হয় তবে ধর্মঘট সফল হইবে না ও মজুরীর হার বাড়িবে না। দ্বিতীয়ত, সেই শ্রমিকেরা যে জিনিস তৈয়ারি করে ইহার চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হওয়া চাই। শ্রমিকেরা ধর্মঘট করিলে জিনিসটির উৎপাদন কমিয়া যাইবে। যদি ইহার চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তবে উৎপাদন কমিবার ফলে ইহার মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে। পূর্বাপেক্ষা বেশি দাম পাইলে পরিচালক শ্রমিকদের বেশি হারে মজুরী দিতে পারে। তৃতীয়ত, সেই শ্রেণীর শ্রমিকের বেতন মোট উৎপাদনব্যয়ের অতি ক্ষুদ্র অংশ হওয়া চাই। তাহা না হইলে মজুরীর হার কিছু বাড়িলেও মোট উৎপাদনব্যয় বিশেষ বাড়িবে না এবং মালিকেরাও কিছু বেশি মজুরী দিতে গররাজী হইবে না। আর একটি শর্তের কথা বলা প্রয়োজন। একদল শ্রমিক ধর্মঘট করিলে উৎপাদন বন্ধ হইবে। ফলে অন্য সহকারী শ্রমিকের

দলেরও কাজ থাকিবে না। তাহাদের আর্থিক অবস্থা যদি খারাপ হয় তবে তাহারা বেকার বসিয়া থাকা অপেক্ষা কম মজুরীতে কাজ করিতে রাজী হইতে পারে। দ্বিতীয় শ্রমিকদলের মজুরীর হার কমিলে যে টাকা বাঁচিবে ইহা দিয়া ধর্মঘটী শ্রমিকদের কিছু বেশি মজুরী দেওয়া সম্ভব হয়। ইহার কোন একটি শর্ত পূরণ হইলে এক শ্রেণীর শ্রমিক নিজেদের মজুরী বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইতে পারে।

শ্রমিকসংঘের ক্ষমতার সীমা (Limits to the bargaining power of trade unions) : কোন কোন অবস্থায় শ্রমিকসংঘ মালিকের উপর চাপ দিয়া মজুরীর হার বাড়াইতে পারে ইহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু শ্রমিকসংঘের এই ক্ষমতা তিনটি প্রধান দিক হইতে সীমাবদ্ধ।

প্রথমত, মালিক যদি ধর্মঘটী শ্রমিকদের পরিবর্তে অন্য শ্রমিক বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারে তবে মজুরীর হার বৃদ্ধি নাও হইতে পারে। ধর্মঘটের সময় মালিক যদি অন্য শ্রমিক নিয়োগ করিয়া কাজ চালাইয়া লইতে পারে তবে ধর্মঘট সফল হইবে না কিংবা ধর, ধর্মঘট সফল হইল ও মজুরীর হার বাড়িল। পরিচালক তখন শ্রমিকেরা যে কাজ করিতেছে ইহার জন্য নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিবে। কিংবা অটোমেটিক বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারে। পূর্বে মজুরীর হার কম থাকায় সে এই প্রকারের যন্ত্র বসাইবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। আজ মজুরীর হার বৃদ্ধির জন্য মালিক এই ধরনের যন্ত্র বসাইবে। ফলে শ্রমিকদের চাহিদা কমিবে ও অনেক শ্রমিক বেকার হইতে পারে। এইরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা যত বেশি থাকিবে ততই শ্রমিকসংঘের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইবে।

দ্বিতীয়ত, ধর্মঘটী শ্রমিদের পরিবর্তে অন্য শ্রমিক বা যন্ত্র ব্যবহারের সম্ভাবনা কতটা আছে—শুধু ইহা দেখিলেই চলিবে না। অন্য শ্রমিক বা যন্ত্রের সরবরাহ কতকটা স্থিতিস্থাপক ইহার উপরেও শ্রমিকসংঘের ক্ষমতার সীমা নির্ভর করে। যেমন তেজীর বাজারে বেকারের সংখ্যা কম থাকে। তখন ধর্মঘট ভাঙ্গাইবার উদ্দেশ্যে অন্য শ্রমিক পাওয়া শক্ত হইতে পারে। তখন সব ব্যবসায়ের ভাল অবস্থা যাইতেছে বলিয়া পরিচালকেরা বহু যন্ত্রপাতির অর্ডার দিয়া রাখিয়াছে এবং যন্ত্রনির্মাণশিল্পের পরিচালক এই অর্ডার অনুযায়ী কাজ

করিতে ব্যস্ত থাকে। এই অবস্থায় তাহার পক্ষে অল্পদিনের মধ্যে হঠাৎ নূতন যন্ত্র তৈয়ারির অর্ডার লওয়া সম্ভব নাও হইতে পারে। সুতরাং যে কারখানায় ধর্মঘট চলিতেছে—ইহার মালিক অল্পদিনের মধ্যে যন্ত্রের ডেলিভারি পাইবে না। এই সমস্ত কারণের জন্য সাধারণত তেজীর বাজারে ধর্মঘট সফল হইবার সম্ভাবনা অধিক। আবার মন্দার সময় ধর্মঘট সফল না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ তখন বহু শ্রমিক বেকার বসিয়া আছে ও মালিক তাহাদের নিযুক্ত করিয়া, ধর্মঘট ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতে পারে।

তৃতীয়ত, শ্রমিকেরা যে জিনিস তৈয়ারি করে ইহার চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয় তবে ধর্মঘট সফল নাও হইতে পারে। চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয় তবে মালিক বর্ধিত হারে মজুরী দেওয়ার ক্ষতিপূরণস্বরূপ জিনিসটির দাম বাড়াইয়া দিতে পারে। কিন্তু স্থিতিস্থাপক চাহিদার দাম বাড়াইলে চাহিদা কমিয়া যাইবে। ইহাতে লোকসানের সম্ভাবনা আছে। সুতরাং মালিক মজুরী বৃদ্ধির দাবি প্রতিরোধ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে।

ধর্মঘটের অধিকার (Right to strike) : ধর্মঘটই সংঘের প্রধান অস্ত্র। মালিকেরা যেমন ছাঁটাই করার ভয় দেখাইতে পারে, শ্রমিকেরাও তেমনি ধর্মঘট করিতে পারে।

কাজের অবস্থার উন্নতি করার ইচ্ছা লইয়া সেই কাজ হইতে সমবেতভাবে বিরত থাকার নাম ধর্মঘট। নিজেদের শর্তে কিংবা পূর্বাপেক্ষা ভাল শর্তে পুরানো কাজে ফিরিয়া যাওয়াই ধর্মঘটের উদ্দেশ্য। শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার আছে কিনা এবিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। কাজের অবস্থা যদি ভাল না হয় এবং মালিক যদি অবস্থার উন্নতি করিতে না চায় তবে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট করার অধিকার শ্রমিকদের থাকা উচিত। কিন্তু সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানে কি হইবে? অনেকে বলেন যে, জলসরবরাহ, রেলপথ ইত্যাদি সাধারণের উপকারার্থে যে কাজ তাহাতে ধর্মঘট করিলে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের অসুবিধা হয়। সুতরাং এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট সমর্থন করা যায় না। অতিপ্রয়োজনীয় কাজের প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে নিয়মিতভাবে চলে তাহা লক্ষ্য করা সকলের কর্তব্য। কিন্তু শ্রমিকদের অবস্থাও উন্নত করা দরকার। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি যাহাতে পূরণ হয় সে

ব্যবস্থাও করিতে হইবে। শ্রমিক ও মালিকের মিলিত কমিটি করিয়া কাজের অবস্থা উন্নত করিবার ক্ষমতা শ্রমিকদের দিতে হইবে। ধর্মঘট করার অধিকার নিরঙ্কুশ অধিকার নহে, সমাজের কল্যাণের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

শিল্পে শান্তিস্থাপনের উপায় (Agencies for industrial peace): ধর্মঘটের অনেক কুফল আছে এবং ইহার ফলে শ্রমিক, মালিক ও সমাজের ক্ষতি হয়। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সহৃদয় সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ধর্মঘট যাহাতে একেবারে না হয় সেই ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে :—

(১) **লভ্যাংশ বণ্টন** (Profit-sharing): এই পদ্ধতি অনুসারে ব্যবসায়ের লাভের একটি অংশ শ্রমিকদের দেওয়া হয়। ব্যবসায়ে ব্যয় বাদ দিয়া যে লাভ থাকে, যদি তাহার অর্ধেক শ্রমিক ও অর্ধেক মালিক পায় অথবা সুদ ও মজুরীর অনুপাত অনুসারে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বণ্টন করা হয়। অনেক সময় শ্রমিকদের প্রাপ্য লভ্যাংশ তাহাদিগকে না দিযা তাহাদেব নামে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা হয় ও তাহারা সেই মূল্যের শেয়ারের মালিক হয়।

এই পদ্ধতি হইতে অনেক কিছু আশা করা গিয়াছিল। অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে এই পদ্ধতির দ্বারা শ্রমিক ও মালিকের সহিত মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হইবে, বিবাদ কম হইবে, শ্রমিকেরা উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে এবং কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সতর্ক হইবে। এইভাবে উৎপাদন বাড়িয়া শ্রমিক, মালিক ও সমাজের সকলে উপকৃত হইবে। কিন্তু এই আশা পূর্ণ হয় নাই। ধর্মঘট বন্ধ হয় নাই। শ্রমিকসংঘগুলি এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করে, কারণ, ইহা শ্রমিকদের দুর্বল করে এবং সংঘের প্রতি আনুগত্য কমাইয়া দেয়। সেইজন্য এই ব্যবস্থা শ্রমিকদের অপ্রিয় হইয়াছে। আবার ইহার বিরুদ্ধে অনেকে বলেন যে, শুধু লাভের অংশ লইলেই চলিবে না, ক্ষতির অংশও শ্রমিকদের বহন করিতে হইবে। সুখের বেলায় ভাগ বসাইতে হইলে দুঃখের ভাগও লইতে হইবে। সব সময় যে শ্রমিক ও মালিকের যোগ্যতার উপর লাভ নির্ভর করে তাহা নহে, অন্যান্য অনেক জিনিসের উপর লাভের পরিমাণ নির্ভর করে। যেমন দাম একটু পড়িয়া গেলে ক্ষতি

হইতে পারে। শ্রমিকেরা যদি লাভের অংশ দাবি করে তবে ক্ষতির অংশও তাহাদের লইতে হইবে। সুতরাং সর্বত্র লভ্যাংশ বণ্টন পদ্ধতি গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

(২) **আনুপাতিক মজুরী** (Sliding scale) : এই পদ্ধতি অনুসারে দ্রব্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত মজুরীর হ্রাস করা হয়। প্রথমে বর্তমান মূল্যস্তরের উপর হিসাব করিয়া মূল মজুরীর হার স্থির করা হয়। মূল্য যদি বাড়ে তবে মজুরীর হারও বাড়ান হয়। এইভাবে শ্রমিকেরা ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতির অংশ গ্রহণ করে। একটি সর্বনিম্ন মজুরীর হার বাঁধা থাকে, মজুরী কখনও ইহার কম হয় না ; কখনও কখনও লাভের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত মজুরীর হ্রাসবৃদ্ধি হয়। লাভ বাড়িলে মজুরীও বাড়ে। অনেক সময় সংসার খরচ (cost of living) বাড়া-কমার সহিত মজুরী বাড়ান-কমান হয়। সংসার বাড়িলে মজুরী বাড়ান হয়।

এই পদ্ধতির সমালোচনা করিযা বলা হইয়াছে যে, উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতি, যানবাহনের সুবিধা, পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নতি ইত্যাদির জন্য যদি দাম কমে তবে শ্রমিকদের কম বেতন লইতে হইবে। ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তাই উৎপাদনব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটিলে মূল মজুরীর হার পুনরায় নির্ণয় করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই পদ্ধতি গ্রহণ করিলে মজুরীসমস্যা কিছুটা সমাধান হইবে।

(৩) **কর্ম-সমিতি** (Works Council) : কাজের শর্ত স্থির করার অধিকার শ্রমিকদের আছে এই পদ্ধতিতে তাহা স্বীকার করা হইয়াছে। ১৯১৭ সালে ইংলণ্ডের Whitley Committee র বিখ্যাত রিপোর্টে প্রথম এই পদ্ধতির ব্যাখ্যা করা হয়। প্রথমত, শ্রমিক ও মালিকের সমসংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া কর্ম-সমিতি গঠন করা হয়। কোন কোন সময়ে এই সমিতি শুধু শ্রমিকদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয় ; তবে পরিচালকদের সহিত এই সমিতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। নিয়মিত যুক্তবৈঠকে বিবাদের কারণগুলি আলোচনা করিয়া মীমাংসা করা হয়। দ্বিতীয়ত, প্রতি এলাকায় শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধি লইয়া জেলা কমিটি গঠিত হয়।

কর্ম-সমিতি বা Whitley Council নামে পরিচিত সমিতিগুলির মারফত শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক সহজ হইয়াছে। পরিচালনা ব্যবস্থার সম্পর্কে

আসিয়া শ্রমিকেরা অধিকতর দায়িত্বশীল হইয়াছে। বিবাদ-বিসম্বাদ আপোষে মিটাইয়া ফেলার মনোভাব দেখা দিয়াছে।

বিবাদ নিষ্পত্তি (Settlement of disputes): সকল প্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও বিবাদ দেখা দেয়। সুতরাং এই সব বিবাদ-নিষ্পত্তির একটি উপায় বাহির করা প্রয়োজন। আপোষ-মীমাংসা এবং পঞ্চায়েৎ,—বিবাদ-নিষ্পত্তির দুইটি প্রধান উপায়।

(১) **আপোষ-মীমাংসা** (Arbitration and conciliation): আপোষ-মীমাংসার মূলকথা এই যে, দুই পক্ষ মিলিত হইয়া আলোচনা করিয়া বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করিবে। বিবাদ উপস্থিত হইলে সাময়িকভাবে যুক্তবোর্ড গঠন করা অপেক্ষা একটি স্থায়ীবোর্ড গঠন করা বাঞ্ছনীয়। আমদের দেশে, ১৯৪৭ সালের Industrial Disputes Act অনুসারে সরকার মীমাংসার জন্য এই ধরনের বোর্ড গঠন করিতে পারে। দুই পক্ষের শুভেচ্ছা থাকিলে এই বোর্ডগুলি সফল হইতে পারে।

(১) **ট্রাইবিউন্যাল** (Tribunal): এই পদ্ধতি অনুসারে নিরপেক্ষ কোন ট্রাইবিউন্যালকে বিবাদ-মীমাংসার ভার দেওয়া হয়। ইহা সরকারী অথবা বেসরকারী প্রতিনিধির দ্বারা গঠিত হইতে পারে, স্বেচ্ছামূলক অথবা বাধ্যতামূলক হইতে পারে। অর্থাৎ ইহার সিদ্ধান্ত পক্ষগুলি মানিয়া লইতে পারে, না-ও লইতে পারে। দুই পক্ষ যদি স্বেচ্ছায় বিবাদের বিষয়টি ট্রাইবিউন্যালের হাতে দেয় এবং তাহাদের সিদ্ধান্ত মানিয়া লয় তাহা হইলে ভাল হয়। ইহাতে দুই পক্ষের সম্মানও বজায় থাকে।

ট্রাইবিউন্যাল প্রথমে বিবাদের আপোষ-মীমাংসা করার চেষ্টা করে। যদি তাহা না হয় তবে বিবাদের সম্পূর্ণ অনুসন্ধান করিয়া নিজেদের অনুমোদনসহ একটি রিপোর্ট বাহির করে। শ্রমিক মালিক দুই পক্ষই ইহার রায় না-ও মানিয়া লইতে পারে। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে ট্রাইবিউন্যালের রায় দুই পক্ষ মানিতে বাধ্য। ধর্মঘট করা বা কারখানা বন্ধ করা বে-আইনী এবং তাহার জন্য জেল অথবা জরিমানা হয়। কিন্তু কোন পক্ষ না মানিয়া লইলে অনুমোদনগুলি কার্যকরী করা কষ্টকর।

Exercises

Q. 1. Describe the functions and utility of trade unions. (C. U. 1938, 1936).

Q. 2. Point out the limits to the bargaining power of trade unions. (C. U. B. Com. 1958, 1957, 1954 ; Viswa. 1957).

Q. 3. Can you suggest a method by which the society can avoid the present conflict between labour and capital ? (C. U. 1949).

উনত্রিংশ অধ্যায়

লাভ

(Profit)

মোটলাভ ও নীটলাভ ঃ ব্যবসায়ের মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং মোট উৎপাদনব্যয়ের পার্থক্যকে লাভ বলে। জমির মালিককে খাজনা, মূলধনের মালিককে সুদ এবং শ্রমিককে মজুরী ইত্যাদি দিয়া ব্যবসায়ীর হাতে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই তাহার লাভ। অর্থশাস্ত্রের লেখকরা ইহাকে মোট (gross) লাভ আখ্যা দিয়াছেন। ইহার মধ্যে অনেক জিনিস আছে যাহাকে ঠিক লাভের পর্যায়ে ধরা উচিত হইবে না। মোট লাভের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকিতে পারে—(১) পরিচালকের নিজের জমির খাজনা। নিজের জমিতে যদি কারখানা থাকে তবে সেই জমির খাজনা কারখানার উৎপাদনব্যয়ের হিসাবে নাও ধরা হইতে পারে। পরিচালকের মোট লাভ সেইজন্য বেশি হইতে পারে। কিন্তু এই খাজনাকে লাভের মধ্যে ধরা ঠিক হইবে না। এই খাজনা বাবদ অর্থ অন্য কাহাকে দিতে না হইলেও তাহা মোট লাভ হইতে বাদ দিতে হইবে। (২) মূলধনের সুদ। ধার করা টাকার জন্য যে সুদ দিতে হয়, পরিচালক তাহা উৎপাদনব্যয়ের মধ্যে ধরে। কিন্তু তিনি নিজের পকেট হইতে যে টাকা কারখানায় লগ্নী করিয়াছেন সে টাকার সুদ সাধারণত ব্যয়ের হিসাবে ধরা না-ও হইতে পারে। নীট লাভ হিসাব করার সময় পরিচালকের নিজের মূলধন বাবদ সুদ বাদ দেওয়া উচিত। (৩) নীট লাভ। উপরের দুইটি অঙ্ক বাদ দিয়া যাহা থাকে তাহাকেই পরিচালকের প্রকৃত লাভ বলিতে হইবে।

নীট লাভের উপকরণ (Elements in net profits) **ঃ** মোট লাভ হইতে ব্যবসায়ীর নিজের জমির খাজনা ও নিজের মূলধনের সুদ বাদ দিয়া যাহা থাকে ইহাকেও অনেকে খাঁটি লাভ বলেন না। তাঁহারা বলেন যে, এই লাভের ভিতর পরিচালনার অর্থাৎ ব্যবসায়চালনার পারিশ্রমিক ধরা আছে। অন্যত্র এই ধরনের কাজ করিলে পরিচালক যে বেতন পাইতেন তাহাকে লাভ না বলিয়া মজুরী বলিয়া ধরা উচিত। ঐ মজুরী প্রকৃতপক্ষে

স্বাভাবিক উৎপাদনব্যয়ের (normal cost of production) অন্তর্গত। স্বাভাবিক উৎপাদনব্যয় এবং মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পার্থক্যকে আসল লাভ বলে। কোন যৌথ কোম্পানীর লাভের হিসাব দেখিলে ইহা সহজে বোঝা যায়। এই সব কোম্পানীর পরিচালনার দায়িত্ব বেতনভোগী ম্যানেজারের উপর ন্যস্ত আছে। ম্যানেজারদের বেতন দেওয়া হয় ও ইহা উৎপাদনব্যয়ের হিসাবে ধরা যায়। সুতরাং অংশীদারদের মধ্যে যে লভ্যাংশ বণ্টন করা হয় পরিচালনার পারিশ্রমিক ইহার অন্তর্গত নয়। পরিচালনার মজুরী বাদ দিলে যাহা থাকে ইহাকে নীট লাভ বা খাঁটি লাভ বলা হয়।

নীট লাভ বা খাঁটি লাভ (pure profit) নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য পাওয়া যায। প্রথমত, ইহার মধ্যে ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা বহন করার পারিশ্রমিক ধরা থাকে। উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করা পরিচালকদের একটি বিশেষ কর্তব্য। পুরস্কার পাইবার আশা না থাকিলে কেহই ঝুঁকি বহিতে রাজী হইবে না। পুরস্কার পাওয়া যায় বলিয়াই ব্যবসায়ীরা ঝুঁকি নেয়। এই পুরস্কার নীট লাভের একটি অংশ।

দ্বিতীয়ত, প্রায় প্রত্যেক পরিচালকের কিছু না কিছু একচেটিয়া অধিকার থাকে। সেইজন্য অথবা অন্য কোন কারণে প্রতিযোগিতা অপূর্ণ হইতে পারে। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে পরিচালক স্বাভাবিক লাভ হইতে কিছু বেশি টাকা লাভ করিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বাজারের উপর প্রত্যেক পরিচালকের কিছু না কিছু আংশিক একাধিকার আছে। তিনি পূর্ণ-প্রতিযোগিতার বাজারে যে দাম থাকিত ইহার তুলনায় কিছু বেশি দাম লইতে পারেন। সুতরাং তাহার কিছু অতিরিক্ত আয় হয়। প্রতিযোগিতা অপূর্ণ হইলে অন্যভাবেও লাভ বাড়ে। শ্রমিক অথবা অন্যান্য উপকরণের বাজারে প্রতিযোগিতা অপূর্ণ হইলে পরিচালকেরা তাহাদিগকে প্রান্তিক উৎপাদনের চেয়ে কম বেতন দিতে সক্ষম হয়। ইহাতে তাঁহাদের লাভ বাড়ে। শ্রমিকদের বাজারেই ইহা সব চেয়ে বেশি সম্ভব হয়। অধিকাংশ শ্রমিক দরিদ্র ও অশিক্ষিত। সুতরাং ঠিক মজুরীর হার তাহারা নাও জানিতে পারে, কিংবা জানিলেও দুরবস্থার জন্য কম মজুরীতে কাজ লইতে বাধ্য হইতে পারে। ইহা যতটা করা সম্ভব হয় ততই পরিচালকের লাভ

বাড়ে। একচেটিয়া অধিকার বা অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকার জন্য যেটুকু লাভ হয় ইহা নীট লাভের দ্বিতীয় অংশ।

তৃতীয়ত, অনেক আকস্মিক কারণেও লাভ কম বেশি হয়। হঠাৎ কোন জিনিসের চাহিদা বাড়িলে ইহার দাম বৃদ্ধি ঘটিবে এবং পরিচালকের লাভ হইবে। আবার চাহিদা কমিয়া দাম পড়িয়া গেলে লোকসান হইতে পারে। আকস্মিক কারণের জন্য লাভও নীটলাভের অংশ।

সুতরাং নীট লাভের মধ্যে তিনটি অংশ আছে। প্রথমত, ব্যবসায়ের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার ; দ্বিতীয়ত, অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকার জন্য অতিরিক্ত আয় ; তৃতীয়ত, কোন আকস্মিক কারণে প্রাপ্ত আয়।

লাভের বৈশিষ্ট্য (Distinguishing features of profit) : মজুরী, সুদ ও খাজনা,—এই তিনটির সহিত লাভের কি কোন পার্থক্য আছে? উৎপাদনের আর তিনটি উপাদানের আয় ও ব্যবসায়ীর লাভের মধ্যে তিনটি পার্থক্য দেখা যায়।

প্রথমত, মজুরী, সুদ এবং খাজনার হার সাধারণত পূর্ব-নির্ধারিত থাকে। অর্থাৎ শ্রমিককে কত মজুরী, মূলধনের মালিককে কত সুদ ও জমির মালিককে কত খাজনা দিতে হইবে—ইহা কাজ শুরু হওয়ার পূর্বেই ঠিক করিয়া দেওয়া হয়। ব্যবসায়ী ও শ্রমিকের মধ্যে চুক্তি করিয়া মজুরী ঠিক হয়। কাজেই মজুরী, সুদ ও খাজনার হার চুক্তির দ্বারা নির্ণীত। কিন্তু লাভ পূর্ব নির্দিষ্টও নহে এবং চুক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয় না। ব্যবসায়ী হয়ত মনে মনে আশা করিতে পারে যে, সে এত টাকা লাভ করিবে। কিন্তু ইহা গ্যারান্টি দিয়া কেহ তাহার সহিত চুক্তি করিবে না কিংবা আগে হইতে ঠিক করিয়া দিবে না।

দ্বিতীয়ত, মজুরী, সুদ কিংবা খাজনার পরিমাণ শূন্য বা ইহারও নীচে কোন সময়ে যায় না। শ্রমিক বড় জোর বিনা পয়সায় কাজ করিতে পারে। কিন্তু এ রকম দেখা যায় না যে, শ্রমিক সারাদিন পরিশ্রম করিয়া গেল এবং যাইবার সময় মালিককে কিছু অর্থ দিয়া গেল। অর্থাৎ শ্রমিকের মজুরী শূন্যের সমান হইলেও হইতে পারে। কিন্তু কোন সময়েই ইহার নীচে নামে না। আসলে মজুরী বা সুদের হার কোন সময়েই শূন্যে পরিণত হয় না। কিন্তু ব্যবসায়ে কোন লাভ না হওয়া খুব অসাধারণ ব্যাপার নয়। অনেক

সময়ে ব্যবসায়ে লাভ ত হয়ই না, যথেষ্ট লোকসানও হয়। এইখানে লাভের সহিত অন্য উপকরণের আয়ের পার্থক্য।

তৃতীয়ত, মজুরী, সুদ ও খাজনার হার অনেক সময়ই বাড়ে-কমে। কিন্তু লাভের অঙ্কের যেরূপ সহসা পরিবর্তন হয় এবং যত বেশি হয় ইহার তুলনায় সুদ ও মজুরীর হারের পরিবর্তন অতি সামান্য। এক বৎসরের লাভের হার হয়ত শতকরা আট পারসেণ্ট হইল। আবার পরের বৎসরেই হয়ত লাভ না হইয়া লোকসান হইল। মজুরীর হার সুদের হার এই অনুপাতে বাড়ে-কমে না। এখানে আজ নবাব ও কাল ফকির হইবার সম্ভাবনা খুবই কম।

লাভ যোগ্যতার খাজনা (Rent theory of profit): আমেরিকান লেখক ওয়াকারের মতে ব্যবসায়ের লাভকে ব্যবসায়ীর যোগ্যতার খাজনা (rent of ability) বলা উচিত। জমির উৎপাদিকা শক্তির যেমন পার্থক্য আছে, পরিচালকদের যোগ্যতার তেমনি পার্থক্য আছে। ফোর্ডের ন্যায় অতি দক্ষ পরিচালক আছে। আবার কোন প্রকারে সামান্য লাভে এমন কি বিনা লাভে ব্যবসায় চালাইয়া যায় এমন পরিচালকও আছে; এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন পরিচালক আছে। উৎপাদিকা শক্তি অথবা অবস্থানের পার্থক্যের জন্য যেমন জমিতে খাজনা দেখা দেয়, তেমনি ব্যবসায় পরিচালনার যোগ্যতার পার্থক্যের জন্য লাভ দেখা দেয়। খাজনা-বিহীন প্রান্তিক জমি যেমন আছে তেমনি বিনা লাভের ব্যবসাও অনেক আছে। এই সব ব্যবসায়ীর উৎপাদনব্যয় ও বাজারমূল্য সমান। তাহাদিগকে প্রান্তিক পরিচালক বলা চলে। ইহাদের চেয়ে যাহাদের যোগ্যতা বেশি, তাহারা কম ব্যয়ে উৎপাদন করে বলিয়া লাভ হয়। যে জমিতে যত বেশি উর্বরতা ইহার খাজনাও তত বেশি হওয়া সম্ভব। এইরূপ যে পরিচালক যত বেশি দক্ষ তাহার তত বেশি লাভ হয়। জমির উর্বরতা যেমন প্রকৃতিদত্ত, পরিচালকের দক্ষতাও তাহাই। লাভ নির্ণয়নীতি ও খাজনা নীতির মধ্যে কোন পার্থক্য করা যায় না।

কিন্তু লাভ ও খাজনা একই পদ্ধতিতে স্থির হয়, একথা বলা ঠিক হইবে না। জমির যোগান যতখানি অস্থিতিস্থাপক পরিচালকদের যোগান তাহার চেয়ে অনেক বেশি স্থিতিস্থাপক। ক্রমাগত বেশি লাভ পাওয়া গেলে বহু

লোক ব্যবসায় নামিবে। দ্বিতীয়ত, খাজনা দামের অংশ নহে। কিন্তু লাভ দামের অংশ নয় একথা বলা সব সময়ে ঠিক হইবে না। দীর্ঘকালীন বাজার দামের মধ্যে লাভ ধরা হয়। কারণ ঠিকমত লাভ না হইলে পরিচালকেরা ক্রমে সে ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবে। ফলে উৎপাদন কমিবে ও দাম বাড়িবে। সুতরাং লাভ ও খাজনা নির্ধারণ নীতি এক নিয়মে হয় না।

লাভ ও মজুরী (Profit and Wages) : অনেক লেখক লাভকে ব্যবসায়ীর শ্রমের মজুরী বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। Taussig এবং Davenport এই মতের সমর্থক। Taussig বলেন যে "লাভ মজুরী ছাড়া আর কিছু নয়।" ব্যবসায়ীর আয়ের কোন স্থিরতা নাই। উৎপাদনব্যয় বাদ দিয়া যাহা থাকে তাহাই তাহার লাভ। পরিচালনার বুদ্ধি ও যোগ্যতা না থাকিলে ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করা যায় না। এই সব গুণের পুরস্কারই লাভ। দুইটি কারণে মজুরীর সহিত লাভের তুলনা করা যায়। প্রথমত, পরিচালকের কাজ এক ধরনের শ্রম ছাড়া আর কিছু নয়—অবশ্য ইহা মানসিক শ্রম এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ঝুঁকি বহন করা ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আইনজীবি এবং চিকিৎসকের আয়কে মজুরী বলা হয়। কিন্তু তাঁহারাও মানসিক শ্রম করেন, তাঁহাদেরও কাজে কৌশল, বিচারবুদ্ধি ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। পরিচালকের কাজ প্রায় এই ধরনেরই। সুতরাং লাভকে মজুরী বলাই ভাল। দ্বিতীয়ত, পরিচালনার কাজের নানা স্তর আছে। যেমন সর্দার (foreman), পরিদর্শক (superintendent), সাধারণ পরিচালক (general manager), সভাপতি (president) ইত্যাদি। ইহাদের কাজের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে ও যে যোগ্য লোক সে অনেক সময় নীচে হইতে শুরু করিয়া ক্রমে ক্রমে উচ্চস্তরে পৌঁছিতে পারে। সুতরাং বলা যায় যে, ইহাদের সকলের আয়ই এক নিয়মে বা মজুরীর হার নির্ধারণ নীতির দ্বারা ঠিক করা চলে।

তিনটি কারণে মজুরী ও লাভের মধ্যে পার্থক্য করা উচিত। প্রথমত, ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা বহন করাই পরিচালকদের প্রধান দায়িত্ব। অবশ্য শ্রমিকদেরও কিছু ঝুঁকি লইতে হয়। তাহারা যে কাজ জানে সে কাজের চাহিদা কমিয়া যাইতে পারে এবং মজুরীর হার নামিয়া যাইতে পারে।

কিন্তু পরিচালকের ঝুঁকি অনেক বেশি এবং অন্য ধরনের। দ্বিতীয়ত, লাভের মধ্যে আকস্মিক আয়ের ভাগ বেশি, মজুরীর মধ্যে ইহা নাই বলিলেও চলে। মজুরীর মধ্যে শ্রমের পারিশ্রমিকই বেশি অংশ এবং লাভে এই অংশ খুব কম আছে। তৃতীয়ত, প্রতিযোগিতার অপূর্ণতায় লাভের পরিমাণ বাড়ে, কিন্তু মজুরীর হার কমিতে পারে। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রয় করিলে ব্যবসায়ী প্রতিযোগিতার দামের তুলনায় হয়ত বেশি দাম পাইতে পারে। কিন্তু শ্রমিকের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে মজুরীর হার কমিয়া যায়। যৌথ কোম্পানীর নীট লাভের হিসাব করিলে, লাভ এবং মজুরীর পার্থক্য বোঝা যায়। এখানে লাভ এবং পরিচালনার মজুরী সম্পূর্ণ পৃথক। সাধারণ অংশীদারেরা পরিচালনার কাজে বিশেষ কোন অংশ গ্রহণ করে না। তাহারা শুধু ঝুঁকি বহন করে ও লাভ করে। এই সমস্ত কারণে লাভ এবং মজুরীর পার্থক্য করার প্রয়োজন আছে।

ঝুঁকিবহন এবং লাভ (Risk and Profits): উৎপাদকের কাজে ঝুঁকি আছে বলিয়া লাভ দেখা দেয়, এ বিষয়ে সকলে একমত। ঝুঁকিবহন করাই পরিচালকের সর্বপ্রধান কাজ। উৎপাদনে ঝুঁকি আছেই এবং সেই ঝুঁকিবহন না করিলে উৎপাদন চলিতে পারে না। কিন্তু ঝুঁকিবহন করা অপ্রীতিকর এবং কষ্টদায়ক। সুতরাং পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে কেহ ঝুঁকিবহন করিবে না। পরিচালকেরা ঝুঁকিবহন করে বলিয়া লাভ পায়। যে ব্যবসায়ে ঝুঁকি বেশি সেখানে সাধারণ আয় অপেক্ষা বেশি লাভ না হইলে কেন লোকে সেখানে মূলধন লগ্নী করিবে? সুতরাং লাভ ঝুঁকিবহনের পুরস্কার এবং কমবেশি ঝুঁকির উপর লাভের পরিমাণ নির্ভর করে।

অনেক সময়ে ঝুঁকি বহন করিতে হয় বলিয়া নূতন লোক ব্যবসায় নামিতে চাহে না। এইজন্য পরিচালকের সংখ্যা কমিয়া যায় এবং যাহারা টিকিয়া থাকে, তাহারা কম সংখ্যায় আছে বলিয়া অতিরিক্ত লাভ করে।

লাভের মধ্যে একটি বড় অংশ যে ঝুঁকিবহন করার পুরস্কার একথা কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু তাই বলিয়া লাভের মধ্যে ঝুঁকিবহনের পুরস্কার ছাড়া আর কিছু নাই একথা ভুল। Carver বলেন যে পরিচালকেরা ঝুঁকি-বহন করে বলিয়া লাভ পায় না। দক্ষ পরিচালকেরা ঝুঁকি কমায় বলিয়া

বেশি লাভ পায়। তাহারা এমন দক্ষতার সহিত কারবার চালায় যে তাহাদের ঝুঁকি কমিয়া যায় ও লাভ বেশি হয়। যে যত ঝুঁকি কমাইতে পারে তাহার ততই লাভ হয়। সুতরাং বলা যায় যে, ব্যবসায়ীরা ঝুঁকিবহন করে বলিয়া লাভ পায় না, তাহারা যে ঝুঁকিবহন করে না ইহার জন্য লাভ পায়। আবার অধ্যাপক Knight বলিয়াছেন যে, সকল প্রকারের ঝুঁকিবহনের জন্য লাভ হয় না। কয়েক প্রকারের ঝুঁকির প্রকৃতি পূর্ব হইতে জানা যায়। যেমন একটি দেশের গড়পড়তা মৃত্যুর হার জানা যায় এবং সেই ঝুঁকিবহন করার জন্য একটি মূল্য (premium) স্থির করা যায়। এই শ্রেণীর ঝুঁকিবহনের মূল্য উৎপাদনব্যয়ের অন্তর্গত করা হয়। যে সমস্ত ঝুঁকি এড়াইবার ব্যবস্থা পূর্ব হইতে সম্ভব হয না সেই অজ্ঞাত ঝুঁকিবহন করার জন্যই লাভ পাওয়া যায়।

অনিশ্চয়তা বহন ও লাভ (Uncertainty-bearing and profit) : বহু আধুনিক লেখকের মতে অনিশ্চয়তা বহন ও লাভের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অনিশ্চয়তা বহন করা কষ্টকর কাজ এবং কম লোকেই তাহা করিতে চাহিবে। সুতরাং ইহার জন্য যে অনিশ্চয়তা বহন করিতে রাজী আছে তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিতে হয়। পরিচালকেরাও কারবারে অনিশ্চয়তা বহন করে বলিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি পায। সুতরাং অনিশ্চয়তা বহন করার পুরস্কারই লাভ।

ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? অধ্যাপক Knight ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে পার্থক্য করেন। সব রকমের ঝুঁকিতে অনিশ্চয়তা নাই। কয়েকপ্রকারের ঝুঁকি আছে, যেমন মৃত্যু, যাহা পূর্ব হইতে আন্দাজ করা যায় এবং এই ঝুঁকির জন্য একটি মূল্য ধার্য করা যায়। এইগুলি শুধু ঝুঁকি, ইহাতে অনিশ্চয়তা নাই। কিন্তু কতকগুলি ঝুঁকি পূর্ব হইতে জানা যায় না। এইগুলির মধ্যে অনিশ্চয়তা আছে। এই অনিশ্চয়তা বহন করার যে পুরস্কার তাহাই লাভ।

লাভ যে কেবলমাত্র অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার ইহা ঠিক নহে। অনিশ্চয়তা বহন পরিচালকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা ছাড়াও তাহার অন্য কাজ আছে—যেমন উদ্ভাবনা করা ইত্যাদি। এই সব কাজের জন্যও সে লাভ আশা করে ও পায়।

উদ্ভাবনা শক্তি ও লাভ (Dynamic theory of profit): আমেরিকার প্রসিদ্ধ লেখক J. B Clark বলেন যে, লাভের জন্ম হয় নিত্য নূতন পরিবর্তন বা উদ্ভাবনের মধ্য দিয়া। পরিচালকের আসল কাজ ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান অথবা ঝুঁকিবহন করা নয়, ইহা বেতনভোগী ম্যানেজারকে দিয়া করান চলিবে। তাহার মুখ্য কাজ নূতন উৎপাদনপদ্ধতির উদ্ভাবনা করা ও তাহা ব্যবসায়ে প্রয়োগ করা এবং সেইজন্য সে লাভ করে।

মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং উৎপাদনব্যয়ের পার্থক্যই লাভ। যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে এবং নূতন কোন পরিবর্তন না করা হয় তবে উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য সমান হইবে। এই অবস্থায় তত্ত্বাবধানের কাজের জন্য মজুরী ছাড়া পরিচালক অতিরিক্ত কোন লাভ পাইবে না। এইরূপ অবস্থায় লাভ হয় না। (অর্থাৎ পরিবর্তনহীন দীর্ঘ সময়ের বাজারে Stationary State) পরিচালনার মজুরী পাওয়া যায়। কিন্তু লাভ থাকে না।

এই সাধারণ অবস্থার পরিবর্তন করিয়া নূতন কিছুর প্রবর্তন করাই পরিচালকের আসল কাজ। উন্নততর উৎপাদনব্যবস্থার উদ্ভাবনা করিয়া পরিচালক ব্যয় কমায় এবং ফলে তাহার লাভ হয়। নূতন পদ্ধতির দ্বারা উৎপাদন করিলে ব্যয় কম হইবে। ব্যয় কমিলে লাভ হইবে। কিন্তু কিছুদিন পরে আবার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে। অন্যান্য পরিচালকেরাও এই নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিবে, ফলে উৎপাদন বাড়িবে এবং দাম পড়িয়া যাইবে। ইহা ছাড়া পরিচালকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে মজুরী এবং সুদের হার বাড়িবে। তাহার ফলে ব্যয় বাড়িয়া দামের সমান হইবে। তখন কোন লাভ থাকিবে না। অর্থাৎ নূতন কোন উৎপাদনপদ্ধতির উদ্ভাবনের ফলে পরিচালক লাভ করিতে পারে। কিন্তু এই লাভ সাময়িক। কিছুদিন পরে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে এই লাভের তিরোধান ঘটিবে। সুতরাং লাভের পরিমাণ অনিশ্চিত এবং তাহা সাময়িকভাবে পাওয়া যায়। নূতন নূতন উদ্ভাবনের ফলে সাময়িকভাবে লাভ হয় এবং পরিচালকেরা লাভের আশায় নূতন পরিবর্তন আনিবার চেষ্টা করে। যে পরিচালক নূতন পথে অগ্রসর হয় সাময়িকভাবে সে কিছু লাভ করে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে লাভ আর থাকে না—হয় দাম কমে, না-হয় মজুরী অথবা সুদ বাড়ে।

সুতরাং লাভকে পরিবর্তনের বা উদ্ভাবনা শক্তির (Innovation) সন্তান বলা বলা চলে। স্ট্যাটিক অবস্থায় অর্থাৎ যখন নূতন কোন পরিবর্তন আসে না তখন কোন পরিচালকই লাভ করে না। অবশ্য ইহার অর্থ এই নহে যে স্ট্যাটিক অবস্থায় পরিচালকেরা বিনা উপার্জনে কারবার চালাইয়া যায়। তাহার কারবার চালাইবার শ্রম বা দক্ষতার জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায়। কিন্তু এই পারিশ্রমিককে লাভ বলা হয় না। ব্যবসায় পরিচালনার পারিশ্রমিক উৎপাদনব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। উৎপাদনব্যয় ও দামের পার্থক্যকেই লাভ বলা হয়। স্ট্যাটিক অবস্থায় প্রত্যেক পরিচালক ন্যায্য পারিশ্রমিক পায়। কিন্তু লাভ করে না। কারণ তাহার উৎপাদনব্যয় দামের সমান থাকে। উৎপাদনব্যয় দাম অপেক্ষা কম করিতে পারিলেই লাভ হয়। একটি পরিচালক উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগ করিয়া নূতন পরিবর্তন বা উন্নততর উৎপাদন প্রণালী অবলম্বন করে। ফলে তাহার উৎপাদনব্যয় কমিয়া যায় ও সে লাভ করে। কিন্তু এই লাভ সাময়িকমাত্র। আবার স্ট্যাটিক অবস্থা আসিলেই লাভ থাকিবে না।

লাভের যৌক্তিকতা (Justification of profit) : সমাজতন্ত্রবাদীরা লাভের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। Marx-এর মতে শ্রমিকেরা প্রকৃত উৎপাদক, সব জিনিস তাহাদেরই প্রাপ্য। কিন্তু শ্রমিকদের বঞ্চিত করিয়া মালিক অতিরিক্ত মূল্য (surplus value) বা লাভ পকেটস্থ করে। সুতরাং লাভ "আইনসম্মত চৌর্য" ছাড়া আর কিছু নয়।

একথা ঠিক যে লাভের ভিতর এমন অনেক জিনিস আছে যাহা সমর্থন করা যায় না। অসহায় শ্রমিকদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া মালিকেরা লাভ করে। অন্যান্য অসাধু উপায়েও অনেক লাভ হয়। আইনসভার সভ্যদের উৎকোচ দিয়া সংরক্ষণশুল্ক বসান হয়। অনেকে শেয়ার বাজারে অসাধু উপায়ে লাভ করিবার চেষ্টা করে। এইরূপ নানাপ্রকার অসাধু উপায় অবলম্বন করার ফলে লাভের অঙ্ক মোটা হইতে পারে সন্দেহ নাই। অসদুপায়ে অর্জিত লাভ কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। ব্যবসায়ে নৈতিক মান নীচু বলিয়াই এইরূপ ঘটে। বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বজায় রাখার চেষ্টা করা এবং নৈতিক মান উন্নত করাই ইহার একমাত্র প্রতিকার। কিন্তু সদুপায়ে অর্জিত লাভ নিন্দনীয় নয়। ইহা ব্যক্তিগত সম্পত্তির

অবশ্যম্ভাবী ফল। সঞ্চয় করার জন্য যেমন পুরস্কার দিতে হয়, ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা বহন করার জন্যও সেই রকম পুরস্কার দিতে হয়। ঝুঁকিবহন করিয়া এবং সুষ্ঠুভাবে উৎপাদনের কার্য পরিচালনা করিয়া পরিচালকেরা সমাজের প্রভূত কল্যাণ করে। সেইজন্য তাহাদের পারিশ্রমিক দিতে হয়। শ্রমিকের কাজের চেয়ে পরিচালকের কাজের মূল্য কিছুমাত্র কম নয়। ব্যবসায়বুদ্ধি, ঝুঁকিবহন করার ক্ষমতার দ্বারা সে উৎপাদন বাড়ায়; লাভই উন্নতি করার প্রেরণা দেয়। অবশ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি তুলিয়া দিলে লাভের আর কোন দরকার নাও হইতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি তুলিয়া দিবার প্রশ্ন পরে আলোচিত হইবে।

লাভ ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Profits in a Socialistic State): যে দেশে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাস্বত্ব মানিয়া লওয়া হয় সে দেশে পরিচালকদের ন্যায্য লাভ না করিতে দিলে উৎপাদন কমিয়া যাইবে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হয় না। সেখানে সরকার সমস্ত শিল্প ও ব্যবসায় পরিচালনা করে। সুতরাং ব্যবসায়ে যে লাভ হইবে ইহা কোন ব্যক্তির পকেটস্থ হইবে না—সরকারের তহবিলে জমা হইবে এবং কোন শিল্পে বা ব্যবসায় হইতে কত লাভ রাখা হইবে ইহা সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী ঠিক করা হইবে। যেমন ভারতের দ্বিতীয় প্লানে ঠিক করা হইয়াছে যে ঘাটতি পূরণের জন্য রেলওয়ে ও ডাকবিভাগ হইতে বেশি রাজস্ব তুলিতে হইবে। সেইজন্য বাজেটে রেলের ভাড়া ও ডাক টিকিটের দাম বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ধনতান্ত্রিক দেশে যে কারণের জন্য পরিচালকদের লাভ হয়, সে কারণগুলির অনেকাংশই সমাজতন্ত্রেও বর্তমান থাকিবে। সরকারী পরিচালনার ফলে ব্যবসায়ের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা অনেকটা কমিবে সন্দেহ নাই। একচেটিয়া কারবারী উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিয়া যে বেশি লাভ করে তাহার পথও বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু কিছু ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা থাকিয়া যাবেই। হাজার সেচখাল কাটিয়া ও বাঁধ দিয়াও বর্ষা কম-বেশি হওয়ার ঝুঁকি ও ঝড়-বন্যার অনিশ্চয়তা দূর করা যাইবে না। কিংবা হয়ত কোন কোন শিল্পে নানা কারণে যতটা উৎপাদনের প্ল্যান করা হইয়াছিল তাহা করা সম্ভব হইল না। আবার কোন শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ হয়ত খুব

বেশি হইয়া গেল। সমাজতান্ত্রিক দেশেও এইরূপ নানা প্রকারের অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি থাকিয়া যাইবে। তবে সেই ঝুঁকিবহনের জন্য কাহাকেও মোটা টাকা লাভ বাবদ দিতে হইবে না। এই সব ঝুঁকির দায়িত্ব সরকারের বা দেশের সকল লোকের ঘাড়ে পড়িবে। কাজেই সমাজতান্ত্রিক দেশে লাভের পরিমাণ সরকারী হিসাবের খাতাপত্রে ঠিক করা হইবে। দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য বৎসরে কত মূলধন বিনিয়োগ করা হইবে এবং ইহা কি কি উপায়ে তোলা হইবে;—ইহার একটি হিসাব করিয়া সরকার বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়ে প্রয়োজনমত অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করে।

Exercises

Q. 1. Indicate the nature and composition of profits and discuss the position of profits under a socialistic regime. (C. U. B. A. 1957).

Q. 2. How does profits differ from other kinds of income ? (C. U. B. Com. 1954, '51).

Q. 3. Define normal profit and explain why it is included in the normal cost of production. (C.U. B.A. 1954).

Q. 4. How would you define profit ? How would you find out profits (a) in the case of a private firm, and (b) in the case of a joint-stock Company ? (C.U. B.A. 1948, '46 ; C.U. B. Com. 1953 ; Viswa. 1953).

Q. 5. Discuss the relation of profits to progress. Would profits disappear in the static state ?

Q. 6. Analyse profits into its various elements to show which of them constitutes the pure profit. (Viswa. 1956).

বিংশ অধ্যায়

আয়ের বণ্টন

(The Distribution of Income)

প্রত্যেক উপকরণের আয় কিভাবে স্থির হয় তাহা আলোচনা করা হইল। একজন লোক নানাপ্রকারের আয় করে। তাহার আয়ের কিছু অংশ হয়ত খাজনা, কিছু অংশ মজুরী, কিছু অংশ লাভ হইতে পারে। কয়েকটি কারণে জাতীয় আয়ের ব্যক্তিগত বণ্টনের আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে ইহার দ্বারা স্পষ্ট ধারণা করা যায়।

আয়ের অসাম্য (Inequality of Income): আয়ের অসাম্য বর্তমান সমাজব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য। প্রায় সকল দেশেই ধনীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। দরিদ্রের সংখ্যা অগণিত। অর্থাৎ মোট জাতীয় আয়ের অধিক অংশ সামান্য কয়েকজন লোক ভোগ করে। Lord Stamp-এর Wealth and Taxable Capacity বইএর হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯২০ সালে ইংল্যাণ্ডে শতকরা ১'৩ ভাগ ধনী লোক মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ২৪'২ ভাগ ভোগ করে; আর শতকরা ৭১'৩ ভাগ লোক জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র ২৯ ভাগ ভোগ করে। মোটের উপর শতকরা ৯৫ জন লোক মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ আর শতকরা ৫ জন লোক শতকরা ৪০ ভাগ জাতীয় আয় ভোগ করে। আমেরিকাতেও অনুরূপ হিসাব পাওয়া যায়। ১৯২৬ সালে শতকরা ২'৮৯ জন লোক সর্বাপেক্ষা কম বেতন পাইত এবং তাহারা জাতীয় আয়ের শতকরা '৩১ ভাগ পাইত। পক্ষান্তরে সর্বাপেক্ষা ধনী শতকরা ১ জন লোক জাতীয় আয়ের শতকরা ১৮ ভাগ পাইত আর শতকরা ৪৮'৪ জন লোকও প্রায় সেই পরিমাণ আয় করিত। Shah এবং Khambataর হিসাব মত ১৯১৪ সালে ভারতবর্ষে শতকরা ৫ জন লোক জাতীয় আয়ের ⅓ ভোগ করিত। বাকী ⅓ শতকরা ৩৫ জন লোক এবং শতকরা ৬০ জন লোক জাতীয় আয়ের শতকরা ৩০ ভাগ ভোগ করিত।

এ বিষয়ে আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। Stamp এবং Bowlyর মতে ইংলণ্ডে গত একশত বৎসরে জাতীয় আয়ের এইরূপ বণ্টন প্রায়

সমান আছে। মাথাপিছু আয় যাহা বাড়িয়াছে তাহা প্রায় সমান ভাবে সকল শ্রেণীর মধ্যে বণ্টিত হইয়াছে। অর্থাৎ ধনী আরও ধনী হইতেছে বটে কিন্তু দরিদ্রের দারিদ্র্য বাড়িতেছে না।

সম্পত্তি বণ্টনেও অসাম্য আছে। W. J. King এর হিসাব মত আমেরিকায় ১৯২১-২৩ সালের মধ্যে যত লোক মরিয়াছে তাহার শতকরা ৫৭ জন প্রোবেট নেওয়ার মত কোন সম্পত্তি রাখিয়া যায় নাই, শতকরা ২৪'৭৯ জন প্রত্যেকে ১০০০ হাজার ডলারের কম সম্পত্তি রাখিয়া মরিয়াছে; শতকরা ৩৭'৬ জন ১০০০ হইতে ৫০০০ ডলারের সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছে; আর শতকরা ২'২ জন ১০,০০০ ডলারের বেশি সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে শতকরা ৯৪ জন লোকের ১০০০ পাউণ্ডের কম সম্পত্তি আছে। সর্বাপেক্ষা ধনী শতকরা ২ জন লোক মোট সম্পত্তির শতকরা ৬৭ ভাগ ভোগ করে।

সাধারণত সম্পত্তির অসাম্যের জন্য আয়ের অসাম্য হয়। অর্থাৎ যাহার আয় বেশি তাহার সম্পত্তিও বেশি। কিংবা যাহার সম্পত্তি বেশি তাহার আয়ও বেশি। কিন্তু তাহা না হইতে পারে। ডাক্তার, উকিল প্রভৃতি পেশাজীবী লোক বহু আয় করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের হাতে বেশি সম্পত্তি নাও থাকিতে পারে। বহু কৃষকেরই কিছু জমিজমা ও গরুবাছুর অর্থাৎ সম্পত্তি আছে। কিন্তু তাহাদের আয় অত্যন্ত কম।

আয়ের অসাম্যের ফলে সমাজের প্রগতি ও শান্তি নষ্ট হয়। যাহাদের প্রভূত অর্থ আছে তাহারা উৎপাদনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে। তাহারা খনি ও কারখানার মালিক। এইভাবে কতিপয় লোক লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা গণতন্ত্রবিরোধী। বহুদিন পূর্বে Aristotle বলিয়াছিলেন যে অসাম্যই বিপ্লবের প্রধান কারণ। আয়ের অসাম্যও বহু অশান্তির কারণ।

তিনটি কারণে আয়ের অসাম্য দেখা দেয়। প্রথমত, মানুষের স্বাভাবিক ক্ষমতার পার্থক্য আছে। যাহাদের প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা বেশি তাহারা বেশি আয় করে। দ্বিতীয়ত, উত্তরাধিকার প্রথার ফলে আয়ের অসাম্য দীর্ঘস্থায়ী হয়। একজন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যবসায়ী মৃত্যুর পর প্রভূত অর্থ ও সম্পত্তি সন্তানসন্ততির জন্য রাখিয়া যান। তৃতীয়ত, অবস্থা ও সুযোগের পার্থক্যের জন্যও অসাম্য দেখা দেয়। যাহাদের বেশি আয় বা সম্পত্তি আছে

তাহারা জীবনে অধিকতর সুযোগ পায়। সুতরাং তাহাদের আয়ও বাড়ে।

অধিকাংশ লেখক আয়ের অসাম্যের কুফল সম্বন্ধে একমত। প্রগতিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে আয়ের অসাম্য দূর করার চেষ্টা হইতেছে। বর্ধমান হারে আয় কর বসাইয়া ধনীদের আয়ের একটি মোটা অংশ, রাষ্ট্র আদায় করিয়া নেয়। মৃতের সম্পত্তির উপর উচ্চ হারে কর বসাইয়া সম্পত্তি বণ্টনের অসাম্য দূর করার চেষ্টা হয়। ধনীদের উপর কর ধার্য করিয়া সরকার যে টাকা পায় তাহা দরিদ্রের উপকারে ব্যয় করা হয়। বার্ধক্য-ভাতা (old age pension), অসুস্থতার বীমা, প্রসূতি পরিচর্যা, বিনামূল্যে খাদ্য, শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দরিদ্রের অবস্থার উন্নতি করা হয়। শ্রমিকদের সর্বনিম্ন বেতনের হার বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। এই সব ব্যবস্থার ফলে আয়ের অসাম্য কমে।

চরমপন্থীরা উত্তরাধিকার ব্যবস্থা একেবারে তুলিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রস্তাব গ্রহণ করার অনেক বাধা আছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিবে অথচ উত্তরাধিকার প্রথা তুলিয়া দিলে সঞ্চয় কমিয়া যাইবে। মৃত্যুর পরে সমুহ সম্পত্তি যদি রাষ্ট্র গ্রহণ করে তবে জীবিতাবস্থায় লোকে সব সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলিবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য Rignano নামে একজন ইতালীয় লেখক একটি পদ্ধতি অবলম্বনের কথা বলিয়াছেন। এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্র মৃত্যুর পরে সম্পূর্ণ সম্পত্তি লইবে না, ইহা ধাপে ধাপে লইবে। প্রথম ব্যক্তির মৃত্যুর পরে সম্পত্তির (ধরা যাক) এক-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্র লইল। তাহার সন্তানের মৃত্যুর পরে আর এক-তৃতীয়াংশ লইল; তাহার সন্তানের মৃত্যুর পর বাকী এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি রাষ্ট্র লইল। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে সঞ্চয় কমিবে না। অথচ তিন পুরুষের মধ্যে সমস্ত সঞ্চিত সম্পত্তি রাষ্ট্র পাইবে। অবশ্য এই পদ্ধতিরও অনেক অসুবিধা আছে এবং ভবিষ্যতে কোন রাষ্ট্র ইহা গ্রহণ করিবে কি না সন্দেহ আছে।

Exercise

Q. 1. Examine the causes of inequality of incomes. What steps are being taken by the modern states to reduce such inequality ?

একবিংশ অধ্যায়

মুদ্রার প্রকৃতি ও কাজ

(The nature and functions of money)

মুদ্রার সংজ্ঞা (Definition of money): সাধারণত মুদ্রার সংজ্ঞাতেই মুদ্রার কাজের কথা বলা হয়। যাহা মুদ্রার কাজ করে তাহাই মুদ্রা। যাহা মুদ্রার কাজ করে অর্থাৎ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহাই মুদ্রা। অতএব সকলে যাহা মুদ্রা হিসাবে গ্রহণ করে এবং কর্জ ও আদানপ্রদানের জন্য যাহা ব্যবহৃত হয় তাহাই মুদ্রা।

দ্রব্যবিনিময়ের অসুবিধা (Inconveniences of barter): দ্রব্যের সহিত সরাসরি বিনিময়কে দ্রব্যবিনিময় বলে। দ্রব্যবিনিময়ের অসুবিধাগুলি আলোচনা করিলে মুদ্রা প্রচলনের সুবিধা বোঝা যায়। দ্রব্য-বিনিময়ের অসুবিধা কি? প্রথমত, ইহাতে প্রায় ক্রেতা ও বিক্রেতার চাহিদার সামঞ্জস্য হয় না। যে পাট উৎপাদন করিয়াছে সে হয়ত জুতা কিনিতে চায়। কিন্তু যে জুতা বিক্রয় করিবে সে হয়ত পাট চাহে না। এইরূপ অবস্থায় বিনিময় হওয়া শক্ত। দ্বিতীয়ত, দ্রব্যবিনিময় প্রথায় বিভাগের অসুবিধার জন্য অনেক সময় বিনিময় করা চলে না। অসমমূল্যের দুইটি জিনিসের বিনিময় কি করিয়া হইবে?

তাঁতির একখানি কাপড় আছে; সে একটি রুটি চায়। কিন্তু একটি রুটির চেয়ে একটি কাপড়ের দাম অনেক বেশি। কাপড় ছিঁড়িয়া ভাগ করিয়া ফেলিলেও তাহা অব্যবহার্য হইবে। এক্ষেত্রে বিনিময় করা অসম্ভব হয়। তৃতীয়ত, এই প্রথায় কোন মূল্যমান (measure of value) নাই। যতগুলি জিনিস আছে ততগুলি মান। হাজার হাজার জিনিস যখন তৈয়ারি হয় তখন জিনিসের অসংখ্য অনুপাত পাওয়া যায়। সব জিনিসের কোন সাধারণ মান থাকে না। মুদ্রার দ্বারা এই সব অসুবিধা দূর হয়।

মুদ্রার কাজ (Functions of money): মুদ্রার অনেক কাজ আছে। মুদ্রার কাজ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ছড়া আছে।

Money is a matter of functions four
A medium, a measure, a standard, a

মুদ্রার সর্বপ্রধান কাজ বিনিময়ের মাধ্যম হওয়া। দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের বিনিময় না করিয়া, লোকে দ্রব্যের সহিত মুদ্রার বিনিময় করে। দ্রব্য-বিনিময়ের যে প্রধান অসুবিধা—ক্রেতা ও বিক্রেতার চাহিদার অসামঞ্জস্য—ইহা মুদ্রা বিনিময়ে দূর হয়। পাটের উৎপাদক মুদ্রার বিনিময়ে পাট বিক্রয় করিয়া সেই মুদ্রায় বাজারে জুতা কেনে। ফলে বিনিময়ের সুবিধা হয়। সকলেই মুদ্রা নিতে রাজী আছে বলিয়া অভাবের অসামঞ্জস্যের অসুবিধা কাহাকেও ভোগ করিতে হয় না।

মূল্যমানের কাজ করা মুদ্রার দ্বিতীয় কাজ। সব জিনিসের দাম মুদ্রায় প্রকাশ করা হয়—মুদ্রাই সাধারণ মান। ইহাতে সব জিনিস বেচাকেনা করার সুবিধা হয়। সব জিনিসের মূল্য মুদ্রায় মাপা হয়। যে মান অপরিবর্তিত থাকে তাহাই আদর্শ মান। যেমন এক ফুট একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যকে বোঝায়, এক পাউণ্ড একটি নির্দিষ্ট ওজনকে বোঝায় তেমনি এক টাকা একটি নির্দিষ্ট মূল্যকে বোঝায়। কিন্তু মুদ্রার মূল্য সব সময়ে সমান থাকে না; তাই মুদ্রাকে আদর্শ মান বলা চলে না।

তৃতীয়ত, মুদ্রা ধার শোধের মান। সভ্য জগতে ধার দেওয়া ও নেওয়ার উপরেই উৎপাদনব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। অল্প দিনের জন্য অথবা বেশি দিনের জন্য ধার নেওয়া হয়। এই ধার মাপার একটা মান চাই। মুদ্রা এই মান হিসাবে কাজ করে। মুদ্রাকে ভিত্তি করিয়া বিরাট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে।

চতুর্থত, মুদ্রা সঞ্চয়ের সুবিধা করে। গম অথবা অন্যান্য জিনিস বেশি দিন রাখা যায় না। দু'তিন বৎসর পরে তাহাদের দাম কি হইবে ইহাও বলা যায় না, মুদ্রার দ্বারা এই অসুবিধা দূর হয়। বহুদিন সঞ্চয় করিলেও মুদ্রা নষ্ট হয় না এবং মুদ্রার মূল্য সম্বন্ধে মোটামুটি সকলেরই একটি ধারণা আছে। এইজন্য সকলে মুদ্রা সঞ্চয় করে।

আধুনিক লেখকেরা মুদ্রার আর একটি বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিয়াছেন। মুদ্রা সকলে গ্রহণ করে। সুতরাং অন্য সম্পত্তি অপেক্ষা ইহার লিকুইডিটি বেশি। মুদ্রা থাকিলে যে কোন জায়গায় যে কোন জিনিস কেনা যায়। লোকে অন্য জিনিস লইতে অস্বীকার করিতে পারে; কিন্তু মুদ্রা লইতে কেহ অস্বীকার করে না। সুতরাং মুদ্রার লিকুইডিটি খুব বেশি। অন্যান্য

জিনিসের সহিত মুদ্রার ইহাই পার্থক্য। মুদ্রার চাহিদা মানেই লিকুইডিটির চাহিদা। মুদ্রার এই বৈশিষ্ট্যের উপর Keynes-এর সুদনির্ণয়তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত।

উত্তম মুদ্রার লক্ষণ (Qualities of good money): মুদ্রার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কখনও চা, কখনও তামাক, কখনও গরু, কখনও বা কড়ি মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু অবশেষে সোনা এবং রূপাকেই মুদ্রা হিসাবে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে ইহার কারণ কি?

প্রথমত, যে ধাতু সহজে ও কম খরচে এক স্থান হইতে অন্যত্র লওয়া যায় তাহাই মুদ্রা হওয়ার উপযুক্ত। পরিমাণে কম ও ওজনে বেশি হইলে অল্প খরচে অন্যত্র বহন করা যায়। সোনা ও রূপার এই গুণ আছে।

দ্বিতীয়ত, ধাতুটি সাধারণগ্রাহ্য হওয়া চাই। মুদ্রা হিসাবে ছাড়াও ইহার অন্য ব্যবহার থাকা চাই। সোনা ও রূপার অন্য ব্যবহার আছে। এবং সকলেই ইহা লইতে রাজী হয়।

তৃতীয়ত, ধাতুটি স্থায়ী হওয়া চাই, ক্ষয়ক্ষতি কম হওয়া চাই এবং এমন হওয়া চাই যেন ব্যবহার করিলেও মূল্য না কমে।

চতুর্থত, ধাতুটি সমজাতিক এবং বিভাগযোগ্য হওয়া চাই। সব টাকা এক রকমের এবং সমান ওজনের হওয়া উচিত। সেই ধাতু এমন হওয়া চাই যেন ভাগ করিলেও মূল্য না কমে। ইহা গালান এবং ইহাতে ছাপ দেওয়া সম্ভব হওয়া চাই।

পঞ্চমত, ধাতুটি যেন সহজে চেনা যায় এবং অপর ধাতুর সহিত ইহার পার্থক্য বোঝা যায়। শব্দ, স্পর্শ অথবা দর্শনের দ্বারা যেন ধরা যায়, অন্যথা জাল করার সুবিধা হইবে।

ষষ্ঠত, ধাতুটির মূল্য বহুদিন স্থির থাকা চাই। সব জিনিসের মূল্য টাকার দ্বারা মাপ হয়, সুতরাং টাকার মূল্য যেন স্থির থাকে।

মুদ্রার শ্রেণীবিভাগ (Classification of money): প্রথমে মুদ্রা (actual money) এবং হিসাবের ইউনিটের (unit of account) মধ্যে পার্থক্য বোঝা প্রয়োজন। যে মুদ্রা দিয়া আদান-প্রদান হয় এবং সঞ্চয় হয় তাহা বাস্তব মুদ্রা। পাউণ্ড, শিলিং, টাকা (rupee) ইত্যাদি মুদ্রার নিদর্শন। জিনিসের দাম ও কারবারের হিসাব যে মুদ্রায় রাখা হয় ইহাকে হিসাবের ইউনিট বলে। হিসাবের ইউনিট হইতেছে বর্ণনা বা নাম (description

or title), আর যে বস্তু সেই নামের অধিকারী তাহাই বাস্তব মুদ্রা। নাম অনেক সময়ে একই থাকে, কিন্তু বাস্তব মুদ্রা বদলাইয়া যায়। টাকা (rupee) ভারতবর্ষে হিসাবের ইউনিট। কিন্তু বাস্তব মুদ্রার ওজন বহুবার পরিবর্তিত হইতেছে। ১৯৬১ সালের পূর্বে এক টাকায় ১৬০ গ্রেণ রূপা থাকিত। কিন্তু এখন ইহা নিকেলের তৈয়ারি অথবা কাগজের নোট। হিসাবের ইউনিট ছাড়া বাস্তব মুদ্রা থাকিতে পারে না। ধার চুক্তি ইত্যাদি হিসাবের ইউনিটে প্রকাশ করা হয়, কিন্তু আদানপ্রদান বাস্তব মুদ্রায় হয়।

আসল মুদ্রাকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়—ধাতব মুদ্রা অথবা পূর্ণাঙ্গ মুদ্রা (commodity money or full-bodied money) এবং প্রতিনিধি মুদ্রা (representative money)। ধাতবমুদ্রার মুদ্রামূল্য ও ধাতুমূল্য সমান। এই মুদ্রা গলাইয়া যে পরিমাণ ধাতু পাওয়া যায় ইহার মূল্য মুদ্রামূল্যের সমান। আর এক শ্রেণীর মুদ্রা আছে যাহা ধাতবমুদ্রার প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহার বিনিময়ে সমমূল্যের ধাতবমুদ্রা পাওয়া যায়। এই মুদ্রাকে প্রতিনিধি মুদ্রা বলে। কাগজীমুদ্রা প্রতিনিধি মুদ্রার উদাহরণ। সরকার অথবা ব্যাঙ্ক প্রতিনিধি মুদ্রা চালু করে।

প্রতিনিধি মুদ্রাকে আবার বিনিমেয় (convertible) এবং অবিনিমেয় (inconvertible) এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। বিনিমেয় মুদ্রাকে ইচ্ছামত ধাতবমুদ্রায় ভাঙ্গান যায়; কিন্তু অবিনিময মুদ্রাকে ভাঙ্গান যায় না। অর্থাৎ ইহার বিনিময়ে ধাতবমুদ্রা দেওয়া হয় না।

বিহিত মুদ্রা (legal tender), স্বেচ্ছামূলক মুদ্রা এবং সহায়ক (subsidiary) মুদ্রা, এইভাবেও মুদ্রার শ্রেণীবিভাগ করা যায়। যে মুদ্রা গ্রহণ করিতে লোকে আইনত বাধ্য ইহাকে বিহিত মুদ্রা বলে। বিহিত মুদ্রাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়—অসীম বিহিত অথবা সসীম বিহিত মুদ্রা। যে মুদ্রার দ্বারা যে কোন পরিমাণ ঋণ শোধ করা যায় ইহাকে অসীম বিহিত মুদ্রা বলে; আর যে মুদ্রায় কেবলমাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ শোধ করা যায় তাহাকে সসীম বিহিত মুদ্রা বলে। টাকা (rupee) অসীম বিহিত মুদ্রা। ইংল্যণ্ডের পাউণ্ডও অসীম বিহিত মুদ্রা। কিন্তু শিলিংএ মাত্র ২ পাউণ্ড পর্যন্ত ঋণ শোধ করা যায়। শিলিং সসীম বিহিত মুদ্রার নিদর্শন।

যে মুদ্রা গ্রহণ করিতে লোকে আইনত বাধ্য নয়, অথচ যাহা সকলে

গ্রহণ করে তাহাকে স্বেচ্ছামূলক মুদ্রা বলে। ব্যাঙ্ক নোট, চেক ইত্যাদি স্বেচ্ছামূলক মুদ্রা।

খুচরা ভাঙ্গানীর জন্য যে মুদ্রা ব্যবহার করা হয় তাহাকে সহায়ক মুদ্রা বলে। আধুলি, সিকি, নয়া পয়সা ইত্যাদি সহায়ক মুদ্রা। খুচরা ভাঙ্গানীর জন্য ইহাদের ব্যবহার করা হয়,—নিকেল, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি অল্প মূল্যের ধাতুতে ইহা প্রস্তুত। সাধারণত ইহাদের সসীম বিহিত মুদ্রা করা হয় এবং সরকার প্রয়োজনমত এই সব মুদ্রা বাজারে চালু করে।

প্রামাণিক মুদ্রা (standard money) এবং সাংকেতিক মুদ্রা (token money) এই দুই ভাগেও মুদ্রাকে ভাগ করা যায়। যে মুদ্রা হিসাবের ইউনিট, ইহাকে প্রামাণিক মুদ্রা বলে। এই মুদ্রার দ্বারা অন্য সকল প্রকার মুদ্রার মূল্য স্থির করা হয়। ইহা সাধারণত সোনা অথবা রূপা দিয়া তৈরারি করা হয় এবং ইহার মুদ্রামূল্য ধাতুমূল্যের সমান। ইহা অসীম বিহিত মুদ্রা। সাংকেতিক মুদ্রার মুদ্রামূল্য ধাতুমূল্যের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ ইহা গলাইয়া বিক্রয় করিলে মুদ্রামূল্যের চেয়ে কম মূল্য পাওয়া যায়। একমাত্র সরকার এই মুদ্রা চালু করে। ইহাকে সাধারণত সসীম বিহিত মুদ্রা বলা হয়।

মুদ্রা এবং মুদ্রা প্রস্তুতপদ্ধতি (Coins ard coinage): কোন ধাতু যখন মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয় তখন প্রথম অবস্থায় প্রত্যেকবার বেচাকেনা করার সময় মাপ করিতে হইত। ইহার অনেক অসুবিধা। মুদ্রা প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ার পর মুদ্রা সমজাতিক এবং সমান ওজনের হইল ; ইহাতে পূর্বের অসুবিধা দূর হইল। জাল করা বন্ধ করার জন্য এখন মুদ্রার ধার কাটা থাকে এবং উপরে জটিল ছাপ থাকে।

যে দেশে প্রামাণিক মুদ্রা আছে সেখানে বিনা বাধায় ও বিনামূল্যে মুদ্রা প্রস্তুত করা হয়। যে কোন লোক যে কোন পরিমাণ ধাতু মুদ্রায় পরিণত করিতে পারে এবং ইহার জন্য কোন খরচ লাগে না।

যদি মুদ্রা প্রস্তুত করার খরচ মুদ্রা হইতে কাটিয়া লওয়া হয় তবে ইহাকে মিণ্টেজ অথবা ব্রাসেজ (mintage or brassage) বলে। যদি খরচের বেশি টাকা কাটিয়া লওয়া হয় তাহাকে সিনিয়োরেজ (seigniorage) বলে।

গ্রেসামের নিয়ম (Gresham's law): মহারানী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংল্যাণ্ডের মুদ্রা ব্যবস্থার সংশোধন করার চেষ্টা হইয়াছিল।

পূর্বের Tudor রাজারা বহুল পরিমাণে খাদ মিশ্রিত মুদ্রা চালু করিয়াছিলেন। নূতন ও ভাল মুদ্রা চালু করিয়া Elizabeth ঐসব মুদ্রার ব্যবহার বন্ধ করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নূতন মুদ্রা বাজারে চালু হইতে না হইতেই উধাও হইল। বিভ্রান্ত হইয়া এলিজাবেথ Sir Thomas Gresham-এর উপদেশ চাহিলেন। তিনি এই ঘটনার নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেন। সেইজন্য ইহাকে Gresham-র নিয়ম বলে। কিন্তু Gresham-এর পূর্বে অনেকে এ নিয়মের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সুতরাং কেন ইহাকে Gresham-এর নিয়ম বলে তাহা বোঝা কঠিন। McLeod প্রথমে ইহাকে Gresham-এর নিয়ম আখ্যা দেন।

যখন উত্তম মুদ্রা ও মন্দ মুদ্রা উভয়ই বাজারে চালু হয় তখন মন্দ মুদ্রা উত্তম মুদ্রাকে বাজার হইতে তাড়াইয়া দেয়। অর্থাৎ মন্দ মুদ্রা বাজারে চালু থাকে ও উত্তম মুদ্রার প্রচলন কমিয়া যায়। জাল খাদ মিশ্রিত অথবা কাটা টাকাকে মন্দ মুদ্রা বলে না। অল্প মূল্যের মুদ্রাকে মন্দ মুদ্রা বলে। সুতরাং আইনটি এভাবেও বলা যায়—উচ্চ মূল্যের মুদ্রার চেয়ে অল্প মূল্যের মুদ্রা বেশি চালু থাকে। যেমন কেবলমাত্র স্বর্ণ অথবা রৌপ্য মুদ্রা চালু থাকিলে পুরাতন, ঘসা ও কম ওজনের মুদ্রাকে মন্দ মুদ্রা বলে; ধাতব মুদ্রা ও কাগজী নোট চালু থাকিলে কাগজী নোট মন্দ মুদ্রা। প্রশ্ন এই, উত্তম মুদ্রার প্রচলন কিভাবে কমিয়া যায়? যখন উত্তম ও মন্দ মুদ্রা উভয়ই চালু থাকে তখন লোকে প্রয়োজন হইলে মন্দ মুদ্রা না গলাইয়া উত্তম মুদ্রা গলায়। স্বর্ণকার যদি গহনা তৈয়ারির জন্য মুদ্রা গলাইতে চায় তবে সে নূতন পুরা ওজনের মুদ্রাগুলিই গলাইবে, কম ওজনের পুরাতন মুদ্রায় হাত দিবে না। বিদেশীদের টাকা দেওয়ার সময়ও এই কথা খাটে। এদেশের স্বর্ণমুদ্রা অন্যদেশে চলে না। সুতরাং সোনা গলাইয়া বিদেশে পাঠাইতে হয়। বিদেশীরা সোনার ওজন দেখিবে, সুতরাং নূতন মুদ্রাগুলিই পাঠান ঠিক হইবে। সুতরাং বিদেশীদের ঋণ পরিশোধ করার ফলেও নূতন মুদ্রা বাজারে চালু থাকে না। লোক সঞ্চয় করিতে চাহিলে সাধারণত নূতন মুদ্রা সঞ্চয় করে।

ইহার প্রধান কারণ এই যে, দৈনন্দিন কেনাবেচায় মুদ্রার ভাল মন্দ কেহ বড় বিচার করে না। একটু কম ওজনের মুদ্রাও চলিয়া যায়। কেবল অতি সাবধানী লোকেরাই ইহা লক্ষ্য করে। তাড়াহুড়ার ভিতর তাহা

চলিয়া যায়। সুতরাং সাধারণ আদান-প্রদানের ব্যাপারে উত্তম ও মন্দ মুদ্রা সমান। কিন্তু অন্যক্ষেত্রে মুদ্রার ভাল মন্দ বিচার করার প্রয়োজন হয়। যেমন স্বর্ণকার শুধু গহনা তৈয়ারি করিবার জন্য উত্তম মুদ্রা গলায়।

এই আইন হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আধুনিক সরকার নিয়মিতভাবে বাজার হইতে কম ওজনের পুরাণো টাকা তুলিয়া লয় এবং নূতন টাকা চালু করে। কেবল একধাতুমান হইলেই যে এই নিয়ম দেখা যায় তাহা নহে, দ্বি-ধাতুমানের (Bimetallic standard) ক্ষেত্রেও দেখা যায়। দ্বি-ধাতুমানের ক্ষেত্রে আইননির্ধারিত মূল্যাপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ (over-valued) ধাতু অল্পমূল্যবান (under-valued) ধাতুকে বাজার হইতে তাড়াইয়া দেয়। স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে বিনিময়হার বাজারে একপ্রকার ও টাঁকশালে ভিন্ন হইলে একটি ধাতু অন্য ধাতুকে তাড়াইয়া দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ভারতবর্ষে অনুরূপ অবস্থা দেখা দিয়াছিল। গিনি এবং টাকা উভয়কেই অসীম বিহিত মুদ্রা করা হইয়াছিল। কিন্তু গিনি চালু হওয়ামাত্র উধাও হইল। সরকার সিদ্ধান্ত করিলেন যে ভারতবর্ষের লোক গিনি অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা চাহে না। কিন্তু Gresham-এর নিয়মের ক্রিয়ার ফলেই গিনি বাজার হইতে উধাও হইয়াছিল। টাকা (rupee) মন্দমুদ্রা। তাই সকলে গিনি সঞ্চয় করিয়াছিল। ধাতব মুদ্রার সহিত কাগজী নোট চালু থাকিলে, ধাতবমুদ্রা উধাও হয়। যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পরে অনেক দেশে কাগজী নোট ছাড়া হইয়াছিল এবং ফলে ধাতব-মুদ্রা একদম বাজারে চলিত না। সুতরাং বিভিন্ন অবস্থায় এই নিয়ম দেখা দেয়।

কিন্তু নিম্নলিখিত দুইটি অবস্থায় এই নিয়ম কার্যকরী হয় না। প্রথমত, উত্তম ও মন্দ মুদ্রার মোট সংখ্যা যদি প্রয়োজন অপেক্ষা কম হয় তবে এই নিয়ম খাটিবে না। ধরা যাক, আমার নিকট ভাল ও মন্দ মুদ্রায় মিশাইয়া মোট ৫০৲ টাকা আছে। আমাকে এমাসে নানা কারণে ৫০৲ টাকাই খরচ করিতে হইবে। অর্থাৎ আমার প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পরিমাণ ৫০৲ টাকা। এ অবস্থায় ৫০৲ টাকার সমস্তই খরচ করিতে হইবে। সুতরাং ভাল মন্দ সব রকম মুদ্রাই খরচ হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি আমার তহবিলে ৭০৲ টাকা থাকিত তবে ৫০৲ টাকা ব্যয় করিয়া ২০৲ টাকা জমা রাখিতে পারিতাম। তাহা হইলে ২০টি ভাল মুদ্রা জমা

রাখিয়া বাকী সমস্ত ব্যয় হইত অর্থাৎ বাজারে চালু হইত। কিন্তু ভাল মুদ্রা জমা থাকিয়া যাইত। দ্বিতীয়ত, লোকে মন্দ মুদ্রা লইতে একেবারে অস্বীকার করিলে এই নিয়ম খাটিবে না। এ অবস্থায় বাজারে উত্তম মুদ্রাও চালু থাকিবে। সুতরাং কাগজী মুদ্রা ও ধাতব মুদ্রা যদি বাজারে পাশাপাশি চালু রাখিতে হয় তবে উভয়ই কম পরিমাণে বাজারে ছাড়িতে হইবে।

Exercises

Q. 1. Write short notes on the Gresham's Law. When does this law operate ?

দ্বাবিংশ অধ্যায়

মুদ্রামান

(Monetary Systems)

কোন দেশে যদি কেবলমাত্র একটি ধাতুর মুদ্রাকে বিহিত অর্থ করা হয়, তখন সেই মুদ্রাব্যবস্থাকে এক ধাতুমান (Monometallism) বলে। যদি ধাতুটি স্বর্ণ হয় তবে স্বর্ণমান, আর যদি রৌপ্য হয় তবে রৌপ্যমান বলে।

যদি দুইটি ধাতুর মুদ্রাকে বিহিত অর্থ করা হয় তবে ইহাকে দ্বিধাতুমান (Bimetallism) বলে। যদি ধাতুর মুদ্রাই অসীম বিহিত অর্থ হিসাবে চালু থাকে, কিন্তু যদি একটি সাধারণত রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুত করার অধিকার সীমাবদ্ধ করা হয়, তবে ইহাকে খঞ্জমান (limping standard) বলে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। যদি এইরূপ ব্যবস্থা করা হয় যে সোনারূপার মিশ্রিত একটি তাল সরকার নির্দিষ্ট দামে কেনাবেচা করিবে, কিন্তু ইহাতে কতটা সোনা ও কতটা রূপা থাকিবে ইহা নির্দিষ্ট থাকিবে না, তবে সেই ব্যবস্থাকে মিশ্রমান বা সিমমেট্যালিজম্ (symmetallism) বলে। কেম্ব্রিজের অধ্যাপক মার্শাল এই নামকরণ করিয়াছিলেন।

দ্বিধাতুমান (Bimetallism): যখন সোনা ও রূপা এই দুইটি ধাতুর মুদ্রা বিনা দ্বিধায় ও নির্দিষ্ট অনুপাতে বাজারে অসীম বিহিত অর্থ বলিয়া চালু থাকে তখন ইহাকে দ্বিধাতুমান বলে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড দ্বিধাতুমান পরিত্যাগ করে, যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বর্ণই প্রকৃত মান ছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে দ্বিধাতুমান প্রবর্তিত হয় এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ইহা ফ্রান্স, বেলজিয়ম, সুইট্জারল্যাণ্ড এবং ইটালী লইয়া গঠিত Latin Monetary Union-এ প্রচলিত ছিল। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা দ্বিধাতুমান প্রবর্তন করে। অনেক তর্কবিতর্কের পর ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ইহা পরিত্যক্ত হয়।

দ্বিধাতুমান হইতে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যায়। প্রথমত, স্বর্ণমান অপেক্ষা দ্বিধাতুমানের মূল্যস্তর বেশি স্থির থাকিবার সম্ভাবনা। কোন একটি ধাতুর উৎপাদনের পরিমাণ স্থির থাকে না, কিন্তু দুইটির যুক্ত

উৎপাদনের হার স্থির থাকার সম্ভাবনা বেশি। সোনার উৎপাদন কমিলে রূপার উৎপাদন বাড়িতে পারে, অথবা রূপার উৎপাদন কম হইলে সোনার উৎপাদন বাড়িতে পারে। এইভাবে ইহাদের মোট উৎপাদন স্থির থাকে এবং তাহার ফলে মূল্যস্তরও স্থির থাকে। দ্বিতীয়ত, দ্বিধাতুমান প্রবর্তনের ফলে রূপার মূল্যহ্রাস বন্ধ হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে রৌপ্যের দাম খুব পড়িয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে প্রাচ্যের যে সব দেশে রৌপ্যমান ছিল, যেমন ভারতবর্ষের, তাহাদের ক্রয় ক্ষমতা কমিয়া যায়। রূপাকে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করিলে ইহার দাম বাড়িবে এবং সেই দেশগুলির ক্রয়ক্ষমতা বাড়িবে। ইহার ফলে পাশ্চাত্য দেশগুলির ব্যবসায়-বাণিজ্য বাড়িবে। তৃতীয়ত, দ্বিধাতুমান প্রবর্তনের ফলে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহারকারী এবং রৌপ্যমুদ্রা ব্যবহারকারী দেশগুলির ভিতর বিনিময়হার নির্দিষ্ট হইবে। ফলে এই দুই শ্রেণীর দেশের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা হয়।

কিন্তু দ্বিধাতুমানের অনেক অসুবিধা আছে। প্রথমত, ইহার ফলে যে মূল্যস্তর স্থির থাকিবে ইহার নিশ্চয়তা কি? স্বর্ণের উৎপাদন কমিলে রৌপ্যের উৎপাদন যে বাড়িবে ইহা বলা যায় না। যদি উভয় ধাতুর উৎপাদন একই দিকে যায়, অর্থাৎ একই সঙ্গে কমে বা বাড়ে, তবে মূল্যস্তর আরো বেশি হারে বাড়িবে বা কমিবে। দ্বিধাতুমানের আর একটি অসুবিধা এই যে সোনা ও রূপার বাজারমূল্য যখন পরিবর্তিত হয়, তখন তাহাদের মুদ্রামূল্যের অনুপাত (mint ratio) ঠিক রাখা যায় না। টাঁকশালে রৌপ্য ও স্বর্ণের বিনিময়ের হার ১৬ : ১ করা আছে। অর্থাৎ ১৬ আউন্স রূপায় যত টাকা হইবে তাহার মূল্য ১ আউন্স সোনায় যত টাকা হইবে তাহার সমান। বাজারের ১৫½ আউন্স রূপার মূল্য ১ আউন্স সোনার সমান সমান হইল। এ অবস্থায় টাঁকশালে মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য কেহ রূপা লইয়া যাইবে না, কেবল সোনা লইয়া যাইবে। ফলে সোনার মোহর, রূপার টাকাকে বাজার হইতে তাড়াইয়া দিবে এবং Gresham-এর নিয়ম অনুসারে বাজারে শুধু স্বর্ণমুদ্রা চালু থাকিবে। অতএব স্বর্ণ মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে কখনও শুধু স্বর্ণমুদ্রা চালু থাকিবে, কখনও বা শুধু রৌপ্যমুদ্রা চলিবে, অর্থাৎ কখনও স্বর্ণমান কখনও রৌপ্যমান প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ দ্বিধাতুমান অবলম্বন করিলে ইহা সফল হইতে পারিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দ্বিধাতুমান অবলম্বনের উদ্দেশ্যে দুইটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হইয়াছিল। কিন্তু কোনটিই সফল হয় নাই এবং তাহার পর একে একে সব দেশেই দ্বিধাতুমান তুলিয়া দিয়াছে।

স্বর্ণমান
(Gold Standard)

স্বর্ণমানের অর্থ দেশে সোনার মোহর চালু থাকা নয়। দেশে হয়ত শুধু কাগজী নোট চালু থাকিতে পারে। কিন্তু ইহার বদলে সরকার যদি নির্দিষ্ট দামে সোনা ক্রয়-বিক্রয় করে তবে সে দেশে স্বর্ণমান আছে বলা যায়। স্বর্ণমানের মূলকথা এই যে কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট দামে সোনা বেচা-কেনা করিবে এবং সোনা আমদানি-রপ্তানির উপর আইনত কোন বাধা থাকিবে না। যতদিন এই নীতি অনুসৃত হইবে ততদিন স্থানীয় মুদ্রার মূল্য ও স্বর্ণের মূল্য সমান থাকিবে। এই ব্যবস্থাকে স্বর্ণমান বলে।

স্বর্ণমানের প্রকারভেদ (Varieties of gold standard) : স্বর্ণমানের তিনটি রূপ আছে। ১৯১৪ সালের পূর্বে যে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল তাহাকে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনমান (gold circulation or gold currency standard) বলে। এই সময়ে নির্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণমুদ্রা বাজারে চালু ছিল। অন্য ধাতুনির্মিত মুদ্রা, কাগজী নোট ইত্যাদি স্বর্ণমুদ্রায় রূপান্তরিত করা যাইত। অর্থাৎ ইহাদের পরিবর্তে নির্দিষ্ট মূল্যে স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যাইত। স্বাধীনভাবে স্বর্ণ মুদ্রাকরণ (coinage) করা যাইত এবং স্বর্ণের আমদানি-রপ্তানির উপর কোন বাধা ছিল না।

কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইহার কিছু পরিবর্তন হইয়া নূতন ধরনের স্বর্ণমান প্রচলিত হইল। ইহাকে স্বর্ণধাতুমান (gold bullion standard) বলে। এই পদ্ধতিতে বাজারে স্বর্ণমুদ্রা চলিত না। শুধু কেবল কাগজী নোট অথবা অন্য মুদ্রা চলিত এবং ইহাদের বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার নির্দিষ্ট মূল্যে সোনার তাল ক্রয়-বিক্রয় করিত। ইংলণ্ডে নোটের বিনিময়ে প্রতি আউন্স ৩ পাঃ ১৭ শিঃ ১০ পেঃ মূল্যে ৪০০ আউন্স ওজনের সোনার তাল পাওয়া যাইত (১১/১২ ভাগ শুদ্ধ)। ১৯২৭ সালে এই পদ্ধতি ভারতে

প্রবর্তিত হইয়াছিল। সরকার প্রতি তোলা ২১৷৶১০ পাই দরে টাকার বদলে ৪০ তোলা সোনার তাল বিক্রয় করিতে বাধ্য ছিল।

তৃতীয় প্রকার স্বর্ণমানকে স্বর্ণ বিনিময়মান (gold exchange standard) বলে। ইহা প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতে এবং প্রাচ্যের কোন কোন দেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই পদ্ধতিতে দেশের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা চালু করা হয় না। সেখানে শুধু কাগজী নোট অথবা রূপার টাকা চালু ছিল। ইহার বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে বিদেশে স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যাইত। ১৯১৭ সালের পূর্বে ভারতবর্ষে যখন এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তখন এক টাকার বদলে সরকার লণ্ডনে ১ শিঃ ৪ পেনী দিত। তখন ইংলণ্ডে স্বর্ণমান ছিল বলিয়া পাউণ্ডের বদলে সোনা পাওয়া যাইত। সুতরাং এই ব্যবস্থায় টাকার বদলে বিলাতে পাউণ্ড মিলিত ও পাউণ্ডের বদলে সোনা পাওয়া যাইত।

স্বর্ণমানের গুণাগুণ (Merits and demerits of gold standard) : যাহারা স্বর্ণমানের সমর্থক তাঁহাদের মতে ইহার কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে। প্রথমত, দেশে যদি স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে তবে ইন্‌ফ্লেসন বা মুদ্রাস্ফীতির আশংকা থাকে না। সাধারণত মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ সরকার কর্তৃক কাগজী নোটের বহুল প্রচার করা। কিন্তু স্বর্ণমান বহাল থাকিলে সরকার ইচ্ছামত কাগজী নোট চালু করিতে পারে না। সরকারের তহবিলে সোনা থাকিলে তবেই কাগজী নোট চালু করা যাইবে। কারণ কাগজী নোটের বদলে সরকারকে সব সময়ে সোনা দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কাজেই তহবিলে যথেষ্ট পরিমাণ সোনা না থাকিলে সরকার অতিরিক্ত কাগজী নোট চালু করিতে পারিবে না। কাগজী নোট অতিরিক্ত পরিমাণে চালু না হইলে মুদ্রাস্ফীতির আশংকা থাকে না। স্বর্ণমান চালু না থাকিলে সরকার হয়ত বাজেট ঘাটতির সময় অতিরিক্ত ট্যাক্স না বসাইয়া অতিরিক্ত কাগজী নোট ছাপাইয়া ব্যয় নির্বাহ করিতে পারে। ট্যাক্স বসান সব সময়ই অতি অপ্রিয় কার্য। জনপ্রিয়তা নষ্ট হইবে এই ভয়ে সরকার হয়ত বেশি ট্যাক্স না বসাইয়া কাগজী নোট ছাপাইয়া খরচ মিটাইতে পারে। ফলে অনেক সময়েই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। কিন্তু স্বর্ণমান থাকিলে ইহা সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়ত, স্বর্ণমানে শুধু যে কেবল মুদ্রাস্ফীতির আশংকা কম থাকে

তাহা নয়, স্বর্ণমানে মূল্যস্তর বা জিনিসপত্রের গড়পড়তা দাম মোটামুটি স্থির থাকে। সরকারী তহবিলে স্থিত সোনার পরিমাণ সহসা বেশি বাড়ান যায় না। কাজেই খুব বেশি পরিমাণ কাগজী মুদ্রা চালু করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং মূল্যস্তরেরও পরিবর্তন খুব ধীরে ধীরে হয়। অবশ্য প্রতি বৎসরই সোনার খনি হইতে কম বেশি সোনা উৎপন্ন হয়। কিন্তু দেশের মধ্যে এত বেশি সোনা আছে যে কোন বৎসর একটু বেশি বা কম সোনা উৎপন্ন হইলেও মোট সোনার পরিমাণ বিশেষ পরিবর্তিত হয় না। যেমন সমুদ্রের জলে দু'চার ফোঁটা বেশি বা কম বর্ষা হইলেও জলের লেভেল একই থাকে। সোনার বেলাতেও সে কথা খাটে। দেশে যে সোনা আছে ইহার পরিমাণ বাৎসরিক উৎপাদনের তুলনায় এত বেশি যে কোন বৎসর একটু বেশি বা একটু কম সোনা উৎপাদন হইলেও মোট সোনার পরিমাণ একই থাকে। সোনার পরিমাণ একই থাকিলে কাগজী নোট ও অন্যান্য মুদ্রার পরিমাণও এক থাকিবে। তাহা হইলে মূল্যস্তরও স্থির থাকিবার সম্ভাবনা।

আরেকটি সুবিধা এই যে স্বর্ণমানে বৈদেশিক বিনিময়ের হার স্থির থাকে। দুইটি দেশের বিনিময়ের হারের ঘন ঘন পরিবর্তন হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অসুবিধা হয়। স্বর্ণমানে বিনিময়হার স্থির থাকে বলিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাড়ে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন দেশের মূল্যস্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়।

কিন্তু স্বর্ণমানে যে মূল্যস্তর স্থির থাকে একথা সব সময়ে বলা যায় না। বৎসরের পর বৎসর সোনার উৎপাদন বাড়িলে বা কমিলে মূল্যস্তর বাড়ে বা কমে। বস্তুত উনবিংশ শতাব্দীতে ইহাই ঘটিয়াছিল। ১৮৪৯ হইতে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য অনেক বাড়িয়াছিল, কারণ ঐ সময় অস্ট্রেলিয়া ও কালিফোর্নিয়ায় নূতন সোনার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছিল ও ফলে সোনার উৎপাদন খুব বাড়ে। পরে আবার সোনার উৎপাদন কমার ফলে ১৮৭৪ হইতে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য কমিয়া যায়।

স্বর্ণমানের সুবিধা ও অসুবিধা যাহাই থাকুক না কেন স্বর্ণমান কখনও ফিরিয়া আসিবে না। ১৯৩০ সালের পরে একে একে পৃথিবীর সমস্ত দেশই স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া মুদ্রাব্যবস্থায় সোনার

কদর যে কমিয়াছে একথা বলা যায় না। আন্তর্জাতিক মনেটারী ফাণ্ডের লেনদেনে অনেক সময়েই সোনার ব্যবহার করিতে হয়।

Exercises

Q. 1. "There are degrees of the gold standard." Illustrate this statement.

Q. 2. What are the essential characteristics of the gold standard ? What are its advantages and disadvantages ?

Q. 3. What do you understand by bimetallism ? What are its advantages and disadvantages ?

Q. 4. In what different ways is it possible to combine gold and silver in the currency system of a country ?

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ক্রেডিট ও কাগজী মুদ্রা

(Credit)

১

ইংরাজী ক্রেডিট কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ "বিশ্বাস করা" বা বিশ্বাসে দেওয়া।" নগদ কারবার কাহাকে বলে বুঝিলেই ক্রেডিটের কারবার বোঝা যায়। নগদ কারবারে জিনিস যখনই বিক্রয় হয় তখনই দাম দিতে হয়। কিন্তু ক্রেডিটের কারবারে বিক্রেতা নগদ দাম না লইয়া জিনিস বিক্রয় করে। ক্রেতা পরে নগদ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। ক্রেতা পরে দাম দিবে এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই বিক্রেতা তাহাকে ধারে মাল দেয়। যেহেতু নগদ টাকা না লইয়া জিনিস বিক্রয় করা হয়, সেইজন্য ক্রেতার প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস করিয়া বিক্রেতাকে জিনিস ছাড়িতে হয়। বিশ্বাসই ক্রেডিটের মূল। খাতকের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা ও ইচ্ছার উপর মহাজনের বিশ্বাস থাকা চাই। তবেই মহাজন তাহাকে ক্রেডিট দিবে।

নগদ কারবারের তুলনায় ক্রেডিটের কারবারের অনেকগুলি সুবিধা আছে। দ্রব্যবিনিময়ের অসুবিধাগুলি মুদ্রার দ্বারা দূরীভূত হইয়াছিল। কিন্তু মুদ্রাবিনিময়েরও অনেকগুলি অসুবিধা আছে। আমরা নগদ টাকা চাই, কিন্তু ৫ হাজার টাকার জিনিস বিক্রয় করিলে নগদ টাকা চাই না। অত টাকা লওয়া এবং সাবধানে রাখা অসুবিধাজনক। ইহা ছাড়া দূরের খরিদ্দারকে অত টাকার জিনিস বিক্রয় করিলে টাকা বহিয়া আনাও বিপজ্জনক। ক্রেডিটের কারবারে এই অসুবিধা থাকে না।

ক্রেডিটের উদ্দেশ্য অনুসারে ইহাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—(১) ভোগ ক্রেডিট (consumption credit) (২) উৎপাদন ক্রেডিট (production credit)। যদি ভোগের উদ্দেশ্যে ঋণের টাকা ব্যবহার করা হয়, তবে ইহাকে ভোগ ক্রেডিট বলে। নগদ টাকা দিতে পারে না বলিয়া দোকনদারেরা খরিদ্দারদের ধার দেয়। কিস্তিতে মাল বিক্রয় করাও ক্রেডিটের উদাহরণ। ক্রেডিটলব্ধ টাকা যদি উৎপাদনের কাজে বিনিয়োগ করা হয় তবে এই প্রকার ঋণকে উৎপাদন ক্রেডিট বলে।

ক্রেডিটকে আবার বাণিজ্য ক্রেডিট (Commercial credit) এবং ব্যাঙ্ক ক্রেডিট (Bank credit) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায় : পণ্যদ্রব্য উৎপাদন এবং বিক্রয়ের জন্য যে ঋণ ব্যবহার করা হয় তাহাকে বাণিজ্য ক্রেডিট বলে। পাইকারী বিক্রেতা খুচরা বিক্রেতাকে কিছু সময় পরে শোধ করার প্রতিশ্রুতিতে ধার দিতে পারে। অর্থাৎ সে বাণিজ্য ক্রেডিট দিল। হুণ্ডী বা Bill of Exchange বাণিজ্য ক্রেডিটের উদাহরণ। ব্যাঙ্ক-নোট ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের উত্তম উদাহরণ। ব্যাঙ্ক নোট ভাঙ্গাইয়া নগদ টাকা দিতে পারিবে এই বিশ্বাস তাহাদের আছে বলিয়াই লোকে ব্যাঙ্কনোট গ্রহণ করে।

বিভিন্ন প্রকারের ঋণপত্র (Types of credit instruments) : আধুনিক সমাজে বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্র প্রচলিত আছে, যথা (১) চেক (cheque), (২) ব্যাঙ্কনোট (Bank-note), (৩) সরকারী নোট (government note), (৪) হুণ্ডী (bill of exchange), (৫) প্রতিজ্ঞাপত্র (promissory note), (৬) ব্যাঙ্কের হুণ্ডী (banker's draft), (৭) বুক ক্রেডিট (book credit)।

(১) **চেক** (Cheque) : ব্যাঙ্কের নিজের আমানত হইতে কোন লোককে কিছু টাকা দেওয়ার লিখিত পত্রকে চেক বলে। যতদিন চেক ভাঙ্গান না হয় ততদিন চেক ঋণপত্র। চেক ভাঙ্গাইয়া নগদ টাকা মিলিলে তবেই কারবার শেষ হইল। যে চেক কাটে ও যে ব্যাঙ্কের উপর চেক দেওয়া হয় ইহাদের উপর বিশ্বাস না থাকিলে কেহই চেক লইবে না।

(২) **ব্যাঙ্কনোট** : ব্যাঙ্কনোট চাহিবামাত্র নগদ টাকা দিবার অঙ্গীকারপত্র। যাহাদের ব্যাঙ্কের উপর বিশ্বাস আছে তাহারা ব্যাঙ্কনোট গ্রহণ করে। সুপরিচিত ব্যাঙ্কনোট সহজে লোকে গ্রহণ করে এবং ইহাকে অনেক সময়ে বিহিত অর্থ করা হয়। এখন একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এইরূপ নোট চালু করিতে পারে।

(৩) **সরকারী নোট** : ব্যাঙ্কনোটের মত, শুধু পার্থক্য এই যে সরকারী নোট বিহিত অর্থ। লোকে বিশ্বাস করে যে সরকার নোটের বদলে টাকা দিবে এবং এই বিশ্বাসই সরকারী নোটের ভিত্তি।

(৪) **হুণ্ডী :** বিক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ের পরে ক্রেতাকে দাম শোধ দেওয়ার যে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেয় তাহাই হুণ্ডী। চেক চাহিবামাত্র ভাঙ্গাইয়া দিতে হয়, কিন্তু হুণ্ডী নির্দিষ্ট সময়ের পরে ভাঙ্গান যায়।

(৫) খাতক মহাজনকে টাকা শোধ দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি-পত্র দেয় তাহাকে **প্রমিসরি নোট** বা প্রতিজ্ঞাপত্র বলে।

(৬) এক ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কের উপর যে চেক কাটে তাহাকে ব্যাঙ্কের **হুণ্ডী** বলে। অন্য ব্যাঙ্কের কাছে ধার করিলে অথবা অসুবিধায় পড়িলে এই প্রকার হুণ্ডী কাটা হয়।

(৭) বিক্রেতা পণ্য বিক্রয় করিয়া যদি খাতায় লিখিয়া রাখে, অথবা টাকা ধার দিয়া যদি ব্যাঙ্ক তাহার খাতায় লিখিয়া রাখে তবে তাহাকে **বুক ক্রেডিট** বলে। খাতকের সহি না থাকিলেও খাতায় এই সব লেখা আইনত গ্রাহ্য। ব্যবসায়ীরা এইভাবে বহুল পরিমাণে ধার দেয় এবং পরস্পরের ধার হিসাব করিয়া কেবল বাকী টাকা দেয়। ক্লিয়ারিং হাউসের (Clearing house) মারফত ব্যাঙ্কের আদানপ্রদানের এইরূপ হিসাব হয়। তা'ছাড়া বণ্ড (Bond), ডিবেঞ্চার (debenture) ইত্যাদিও ঋণপত্র এবং বাজারে বেচা-কেনা হয়।

কাগজী নোট : ব্যাঙ্কনোট ও সরকারী নোট কাগজী নোটের নিদর্শন। সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাগজী নোট চালু করে। কোন কোন দেশে সরকারও কাগজী নোট চালু করিয়া থাকে।

কাগজী নোট দুই প্রকার—বিনিমেয় (Convertible) এবং অবিনিমেয় (Inconvertible)। যে কাগজী নোটের বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার নগদ টাকা দেয় তাহাকে বিনিমেয় নোট বলে।

যে কাগজী নোটের বিনিময়ে নগদ টাকা দেওয়া হয় না তাহাকে অবিনিমেয় নোট বলে। সাধারণত সরকারই এইরূপ নোট চালু করে। অবিনিমেয় নোটকে হুকুমী মুদ্রা (fiat money) বলে, কারণ এই নোট সরকারী হুকুমে চলে। সরকার ইহার মূল্য স্থির রাখিতে পারিবে এই বিশ্বাসে এই নোট লোকে গ্রহণ করে।

কাগজী নোট ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and disadvantages of paper money) **:** নোট ব্যবহারের অনেক

সুবিধা পাওয়া যায়। প্রথমত, নোট প্রচলন করিলে ধাতু মুদ্রার প্রচলন কম হয়। কাজেই ধাতু মুদ্রা প্রস্তুত করার খরচ অনেকটা বাঁচিয়া যায়। দ্বিতীয়ত, লোকে সহজেই অনেক নোট লইয়া চলাফেরা করিতে পারে; অনেক টাকার আদানপ্রদান করা যায় এবং দেশান্তরে সহজে টাকা পাঠান যায়।

নোটের অনেক অসুবিধাও আছে। প্রথমত, বাজেট ঘাটতি হইলে তাহা মিটাইতে সরকার অতিরিক্ত সংখ্যায় নোট চালু করিতে পারে। যদি নোটের সংখ্যা বেশি হয়, তবে তাহার মূল্য কমিয়া যায় এবং ভাঙ্গান যায় না। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক আদানপ্রদানের অসুবিধা হয়। বিদেশীরা দেশী নোট লইবে না। ধাতুমুদ্রা বিদেশে পাঠান যায়, কিন্তু নোট পাঠান যায় না। ধাতুমুদ্রার তুলনায় নোটের মূল্যের স্থিরতা কম। ধাতুমুদ্রার মূল্য ধাতুর মূল্যের উপর নির্ভর করে; কিন্তু নোটের মূল্য নোটের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। সাধারণত নোটের মূল্য অস্থির; অতএব বিনিময়ের হারও অস্থির। ইহার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নোট প্রচলনের নীতি (Principles of note-issue): সব দেশেই কাগজী নোট কি কি নিয়মে চালু করা হইবে এই সম্বন্ধে আইন করা থাকে। নোটের বদলে যাহাতে নগদ টাকা ঠিকমত পাওয়া যায় সেইজন্য নোট চালুকারীকে কত টাকা কি ভাবে জমা রাখিতে হইবে তাহা এই আইনে বলিয়া দেওয়া থাকে। এ সম্বন্ধে কি নীতি অনুসরণ করা উচিত তাহা লইয়া ইংলণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তর্ক চলিয়াছিল। এই তর্কের দুই পক্ষ ছিল। প্রথম পক্ষের লোকদের মত ছিল যে, নোটের বদলে সব সময়েই যাহাতে নগদ টাকা পাওয়া যায় ইহার জন্য নিয়ম করা উচিত যে যত টাকার নোট চালু করা হইবে ঠিক তত টাকার সোনা বা সোনার মোহর তহবিলে জমা রাখিতে হইবে। তহবিলে যদি সমমূল্যের সোনা বা মোহর জমা থাকে তবে কাগজী নোট কোন সময়েই অবিনিমেয় হইবে না। এই মতবাদের লোকদের নাম দেওয়া হইয়াছিল **কারেন্সী স্কুল**। দ্বিতীয় পক্ষের মত ছিল অন্যরকম। তাহাদের মতে যত টাকার কাগজী নোট বাজারে চালু করা হইবে ইহার সমস্তটাই একসঙ্গে বিনিময়ের জন্য আসিবে না; অর্থাৎ যাহারা কাগজী নোট পাইবে তাহারা প্রত্যেকেই

সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে গিয়া নোটের বদলে নগদ টাকা চাহিবে না। নোটের বদলে চাহিবামাত্র নগদ টাকা পাওয়া যাইবে এই বিশ্বাস থাকিলে লোকে নোট লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে। লোকে উহা তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গাইবার জন্য ব্যস্ত হইবে না। হয়ত কিছু সংখ্যক লোক ব্যাঙ্কে গিয়া নোট ভাঙ্গাইতে দিতে পারে। সুতরাং নোটের পিছনে সমমূল্যের সোনা, মোহর বা নগদ টাকা জমা রাখার কোন প্রয়োজন নাই। কিছু পরিমাণ রাখিলেই নোট ভাঙ্গাইবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। এই শ্রেণীর লেখকদের **ব্যাঙ্কিং স্কুল** নাম দেওয়া হইয়াছিল। এই মত অনুসারে কাজ করিলে তহবিলে যত মূল্যের সোনা বা নগদ টাকা থাকে, ইহার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে নোট চালু করা যায়।

১৮৮৪ সালে ইংলণ্ডে যখন নোট চালু সম্বন্ধে আইন করা হইল, তখন অবশ্য কারেন্সী স্কুলের মত গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে এই মত আর কেহ গ্রহণ করেন না। এখন প্রায় সব দেশেই ব্যাঙ্কিং স্কুলের মত অনুযায়ী নোট চালু করা হয়।

নোট চালু করার বিভিন্ন পদ্ধতি (Systems of note-issue): কাগজী নোট কি নিয়মে চালু করা হইবে, এই সম্বন্ধে তিন চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। আমরা একে একে ইহা আলোচনা করিব।

প্রথম পদ্ধতিকে ফিক্‌সড ফিডিউসারী ব্যবস্থা বলে। ১৮৪৪ সালের ব্যাঙ্ক চার্টার আইনে ইহা ইংলণ্ডে প্রথম প্রবর্তন করা হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট মূল্যের কাগজী নোট তহবিলে সোনা বা মোহর না রাখিয়া চালু করিতে পারে। কিন্তু ইহার বেশি মূল্যের নোট চালু করিতে হইলে তহবিলে সমমূল্যের সোনা বা মোহর জমা রাখিতে হইবে। ইংলণ্ডে প্রথমে নিয়ম ছিল যে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড সোনা না রাখিয়া ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের কাগজী নোট চালু করিতে পারিত। কিন্তু ইহার বেশি নোট চালু করিতে হইলে অতিরিক্ত প্রতি এক পাউণ্ডের নোটের জন্য এক পাউণ্ড মূল্যের সোনা বা সভরেন (বিলাতী স্বর্ণ মুদ্রা) তহবিলে জমা রাখিতে হইবে। ধরা যাক ব্যাঙ্ক সবশুদ্ধ ২ কোটি পাউণ্ড মূল্যের নোট চালু করিয়াছে। ইহার জন্য অন্তত ৬০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সোনা তহবিলে জমা রাখিতে হইবে। অবশ্য এই ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের নোটের পিছনে

সোনা না রাখিলেও সেই মূল্যের কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি জমা রাখিতে হয়।

এই পদ্ধতির মূল কথা এই যে কিছু পরিমাণ কাগজী নোট সব সময়েই বাজারে চালু থাকিবে। ইহা ভাঙ্গাইয়া দিবার জন্য তহবিলে সোনা জমা রাখার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহার বেশি নোট চালু করিতে হইলে সমমূল্যের সোনা তহবিলে রাখা দরকার। তাহা হইলে ব্যাঙ্ক সব সময়েই নোট ভাঙ্গাইয়া নগদ টাকা দিতে পারিবে। তাহা হইলে কাগজী নোট কোন সময়েই অবিনিমেয় হইবে না। কিন্তু এই পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহার ফলে বিশেষ প্রয়োজন হইলেও কাগজী নোট বেশি সংখ্যায় চালু করা যাইবে না, যদি না তহবিলে প্রচুর পরিমাণে সোনা জমা থাকে। এই পদ্ধতির ফলে কাগজী নোট চালুর ব্যবস্থা অস্থিতিস্থাপক হয়। প্রয়োজনের সময় ইহা খুবই অসুবিধার বিষয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতির নাম ম্যাক্সিমাম বা সর্বাধিক ফিডিউসিয়ারী পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তহবিলে সোনা জমা না রাখিয়া কত মূল্যের কাগজী নোট চালু করিতে পারিবে ইহার সর্বাধিক পরিমাণ ঠিক করিয়া দেওয়া থাকে। এই সর্বাধিক পরিমাণ দেশে সাধারণত যত টাকার নোট চালু থাকে ইহার বেশি হয়। এদেশে বর্তমানে মোট দুই হাজার কোটি টাকা মূল্যের নোট চালু আছে। এই পদ্ধতি বহাল থাকিলে তহবিলে কোন সোনা না রাখিয়া নোট চালুর পরিমাণ অন্তত দুই হাজার কোটি ঠিক রাখা হইত। পরে চালু নোটের সংখ্যা যদি বাড়িয়া যায় তবে বিনা সোনায় নোট চালুর পরিমাণও বাড়াইয়া দেওয়া হয়। এই সর্বাধিক পরিমাণের বেশি নোট চালু করিতে হইলে অবশ্য তহবিলে সমমূল্যের সোনা জমা রাখিতে হইবে। এই পদ্ধতির গুণ এই যে, ইহাতে নোটের পিছনে তহবিলে অনাবশ্যক সোনা জমা থাকে না ও প্রয়োজনমত নোট চালুর পরিমাণ বাড়ান যায়। আবার খুব বেশি বাড়ান যায় না, কারণ তাহা হইলে সমমূল্যের সোনা তহবিলে জমা রাখিতে হইবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পদ্ধতির মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে সন্দেহ নাই। উভয় পদ্ধতিতেই নির্দিষ্ট মূল্যের কাগজী নোট তহবিলে সোনা জমা না রাখিয়াও চালু করা যায়। কিন্তু প্রথম পদ্ধতিতে এইরূপ নির্দিষ্ট কাগজী নোটের

পরিমাণ অনেক কম করিয়া রাখা হয়। ধর, কোন দেশে মোট ১০০ কোটি টাকার কাগজী নোট চালু আছে। দ্বিতীয় পদ্ধতি বহাল থাকিলে সমস্ত কাগজী নোটই তহবিলে সোনা না রাখিয়া চালু করা চলিবে। কিন্তু প্রথম পদ্ধতিতে হয়ত ৪০ কোটি টাকার কাগজী নোট, সোনা জমা না রাখিয়া চালু করা যাইবে। বাকী ৬০ কোটি টাকার সোনা তহবিলে জমা রাখিতে হইবে।

আর এক পদ্ধতির নাম আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতি (Proportional Reserve System)। ইহার অর্থ যত টাকার নোট চালু করা হইবে ইহার শতকরা অন্তত ২৫ হইতে ৫০ ভাগ মূল্যের সোনাও তহবিলে জমা রাখিতে হইবে। পূর্বে আমাদের দেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে নিয়ম ছিল যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যত টাকার নোট চালু করিবে ইহার অন্তত ৪০ ভাগ মূল্যেব সোনা ও বৈদেশিক ঋণপত্র তহবিলে জমা রাখিতে হইবে। অর্থাৎ এক হাজার কোটি টাকার নোট চালু থাকিলে তহবিলে অন্তত ৪০০ কোটি টাকা মূল্যের সোনা ও বৈদেশিক ঋণপত্র জমা রাখিতে হইবে। এই পদ্ধতিতে নোট চালু খুব স্থিতিস্থাপক হয়। কারণ তহবিলে ৪০ টাকার সোনা জমা দিলে ১০০৲ টাকার নোট চালু করা যায়। নোট বাড়াইবার সুবিধা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্যদিকে আবার রিজার্ভ ফাণ্ড কমিলে খুব বেশি হারে নোট চালুর পরিমাণ কমাইতে হয়। ধরা যাক, দেশে এক হাজার কোটি টাকার নোট চালু আছে ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মাত্র ৪০০ কোটি টাকার সোনা তহবিলে রাখিয়াছে। শতকরা ৪০ ভাগ রাখাই আইন। তখন কেহ যদি ১০০৲ টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া ১০০ টাকার সোনা লইয়া যায় তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে আরো দেড়শো টাকার নোট বাদ দিতে হইবে, নচেৎ তহবিলে শতকরা ৪০ ভাগ সোনা জমা থাকিবে না।

বর্তমান যুগে অধিকাংশ দেশেই শেষোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। তবে অনেকের মতে এই পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ। ইহাতে অকারণে বহু সোনা তহবিলে আটক থাকে। কোন দেশেই আর স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন নাই। সুতরাং কাগজী নোটের বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা বা সোনা দিবার কোন প্রশ্ন উঠে না। এখন মুদ্রাব্যবস্থার জন্য তহবিলে সোনা রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। সোনার চাহিদা আসে শুধু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ঘাটতি পূরণের সময়। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তহবিলে কত সোনা রাখা

প্রয়োজন তাহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সাধারণত কি রকম ঘাটতি পড়িতে পারে ইহা অনুমান করিয়া ঠিক করিতে হইবে। নোট চালুর সঙ্গে সোনার আসলে কোন সম্বন্ধ নাই ও রাখারও কোন প্রয়োজন নাই। নোটের তহবিলে কি জিনিস কত পরিমাণ থাকা উচিত তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বিবেচনার পরে ছাড়িয়া দিলে কোন ক্ষতি হয় না। তবে পার্লামেণ্ট যদি ভয় পায় যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হয়ত খুব বেশি পরিমাণ নোট চালু করিবে ও ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে তবে সর্বাধিক কত টাকার নোট চালু করা চলিবে তাহা আইনে ঠিক করিয়া দিলেই হইল। অথবা যদি আশংকা হয় যে নোটের তহবিলে কিছু সোনা না থাকিলে সাধারণ লোক নোটের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়, তবে এই নিয়ম করা যাইতে পারে যে তহবিলে অন্তত কিছু মূল্যের সোনা জমা রাখিতে হইবে।

সুতরাং কাগজী নোটের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে তহবিলে সোনা রাখার কোন প্রয়োজন নাই। আজকাল কোন দেশেই নোটের বদলে সোনার বা রূপার টাকা দেওয়ার আইন বা রীতি নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে অবশ্য বলা আছে যে কেহ দাবি করিলেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দশ কি একশ কি তাহার বেশি টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া নগদ টাকা দিবে। ইহার অর্থ এই নয় যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে রূপার টাকা দিতে হইবে। ভারত সরকার যে এক টাকার নোট ইস্যু করে তাহাও রূপার টাকার মতই টাকা। সুতরাং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দশ টাকার নোটের পরিবর্তে দশটি এক টাকার নোট দিলেই ইহার দায়িত্ব শেষ হইবে। কেহই রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে রূপার টাকা দিতে বাধ্য করিতে পারে না। কাজেই এই উদ্দেশ্যে তহবিলে সোনা জমা রাখার কোন প্রয়োজন আর নাই।

Exercises

Q. 1. What is credit ? Distinguish between bank credit and commercial credit. (C. U. 1949, 1944).

Q. 2. What are credit instruments ? Describe them and indicate their utility. (C. U. 1953).

Q. 3. What is inconvertible paper money ? What are its defects ?

Q. 4. Discuss the different methods for the regulation of the Note issue. Which of them you prefer and why ? (C. U. 195

চতুর্বিংশ অধ্যায়

ব্যাঙ্কিং

(Banking)

ব্যাঙ্কের সংজ্ঞা (Definition of Bank) : ব্যাঙ্ককে ধারের কারবারী বলা হয়। ব্যাঙ্ক লোকের টাকা আমানত রাখে—অর্থাৎ লোকের নিকট হইতে টাকা ধার নেয় এবং উৎপাদক ও ব্যবসায়ীকে টাকা ধার দেয়। এক শ্রেণীর লোকের নিকট ধার নিয়া অন্য লোককে ধার দেওয়াই ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের সুদ দেয় ও তাহাদের চেক কাটিয়া টাকা তুলিবার সুবিধা ভোগ করিতে দেয়।

ব্যাঙ্ক ব্যাবসায় অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষ, গ্রীস ও রোমে ইহা প্রচলিত ছিল। যাহাদের উদ্বৃত্ত টাকা আছে তাহারা বিশ্বাসভাজন লোকের নিকট টাকা জমা রাখিত এবং প্রয়োজনমত সেই টাকা তুলিয়া লইত। যাহাদের নিকট এই উদ্বৃত্ত টাকা গচ্ছিত থাকিত, তাহারা এই টাকার একটি মোটা অংশ বাজারে ধার দিতে আরম্ভ করিল। কারণ তাহারা ক্রমে দেখিতে পাইল যে যাহারা উদ্বৃত্ত টাকা গচ্ছিত রাখিত, তাহারা খুব প্রয়োজন না হইলে টাকাটা তুলিত না। হয়ত অনেক সময় কথা থাকিত যে, এক বৎসরের মধ্যে তাহাদের টাকার দরকার হইবে না। সুতরাং যে মহাজনের নিকট টাকা জমা থাকিত সে স্বচ্ছন্দে ১১ মাস কি আরো কিছু বেশি দিনের জন্য টাকাটা ধার খাটাইতে পারিত। এইভাবে যাহারা টাকা জমা রাখিত তাহারা অপরের টাকা খাটাইয়া প্রচুর লাভ করিত। ধারের কারবার ক্রমশ লাভজনক হওয়ায় তাহারা এই আশায় গচ্ছিত টাকার উপর কিছু কিছু সুদ দিতে লাগিল যে ইহার ফলে লোকে বেশি টাকা জমা রাখিবে। অবশ্য সে ধার দিয়া যে সুদ পাইত গচ্ছিত টাকায় ইহার চেয়ে কম হারে সুদ দিত। কালক্রমে চেক প্রবর্তিত হইল।

ব্যাঙ্কের কাজ (Functions of Banks) : ব্যাঙ্ক বলিতে সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে (Commercial bank) বুঝি। এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ককে স্বল্প মেয়াদী ধারের কারবার বলা চলে। ইহা জনসাধারণের সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া তাহা অল্পদিনের জন্য ব্যবসায়ী ও অন্য শ্রেণীর লোকদের ধার দেয়।

জনসাধারণের সঞ্চয় সংগ্রহ করা ব্যাঙ্কের একটি প্রধান কার্য। সাধারণ লোক ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখে। দুইভাবে আমানতের সৃষ্টি হয়:—প্রথমত, লোকে টাকা আনিয়া ব্যাঙ্কে জমা দেয়, ব্যাঙ্ক তাহা খাতায় আমানত হিসাবে জমা করে। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্ক যদি টাকা ধার দেয় তাহা হইলেও ব্যাঙ্কের আমানত বাড়ে। ধার দেওয়ার সময় ব্যাঙ্ক খাতকের নামে টাকাটা আমানতী জমা করিয়া নেয়। আমানত দুই প্রকারের হয়—চল্‌তি ও মেয়াদী। চল্‌তি আমানতের টাকা যে কোন সময়ে তোলা যায়। আমানতকারী চেক কাটিয়া ব্যাঙ্কে পাঠাইলেই ব্যাঙ্ক ইহার বিনিময়ে নগদ টাকা দেয়। মেয়াদী আমানত তুলিতে হইলে ব্যাঙ্ককে কিছু দিনের নোটিশ দিতে হয় এবং নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হইলে ব্যাঙ্ক টাকা তুলিতে দেয়।

ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ ধার দেওয়া। ব্যাঙ্কের নিজের মূলধন বাবদ লব্ধ অর্থ ও আমানতের বেশি অংশ বাজারে ধার দেওয়া হয়। চল্‌তি আমানতের টাকা অবশ্য সব সময়ে তোলা যায়। কিন্তু ব্যাঙ্ক জানে যে অনেকেই টাকা তুলিবে না ও যাহারা তুলিবে তাহারাও হয়ত যত টাকা জমা রাখিয়াছে ইহার একটি অংশ মাত্র তুলিতে চাহিবে। সুতরাং আমানতী টাকার মোট অংশ ব্যাঙ্ক বাজারে ধার দিতে পারে। কতটা পর্যন্ত ধার দেওয়া চলে ইহা ব্যাঙ্ক ম্যানেজার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারে। ব্যাঙ্ক সাধারণত দীর্ঘদিনের জন্য টাকা ধার দেয় না এবং সোনা, কোম্পানীর কাগজ, ভাল ভাল শেয়ার, কিংবা পণদ্রব্য বন্ধক রাখিয়া দেয়। ভাল ভাল ব্যাঙ্ক জমি কিংবা বাড়ি বন্ধক দিয়া ধার দেয় না। আবার কোন কোন সময়ে ভাল ও বিশেষ জানা পার্টি হইলে বিনা বন্ধকীতেও ধার দেয়।

ব্যাঙ্কের তৃতীয় কাজ কাগজী নোট চালু করা। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বহু ব্যাঙ্ক কাগজী নোট চালু করিত। এখনও কানাডাতে দশটি ব্যাঙ্ক নোট চালু করে। তবে প্রায় সব দেশেই নোট চালু করার কাজ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। সব ব্যাঙ্কই আমানতকারীকে চেক বই দেয় ও চেকে টাকা তুলিতে দেয়। লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার চেক কাটিয়া চালান হয়। চেকে লেনদেনে উভয় পক্ষেরই সুবিধা হয়। এইভাবে চেক বিনিময়ের মাধ্যমের কাজ করে।

ব্যাঙ্ক মক্কেলদের সুবিধার জন্য নানা প্রকারের কাজ করে। যেমন

যাহারা বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে, বিদেশে জিনিস কেনে বা বিক্রয় করে, ব্যাঙ্ক তাহাদের হুণ্ডী কেনা-বেচা করিয়া তাহাদের ব্যবসায়ে সুবিধা করিয়া দেয়। যাহাকে বিদেশে কোন কারণে টাকা পাঠাইতে হয়, সে ব্যাঙ্কে গিয়া ড্রাফট্ কিনিয়া পাঠাইয়া দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্ক মক্কেলদের নির্দেশমত তাহাদের জন্য কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ইত্যাদি কেনা-বেচা করে। তাহাদের মূল্যবান দলিলপত্র, গহনা প্রভৃতি নিরাপত্তার জন্য গচ্ছিত রাখে। চিঠিপত্র রাখিয়া ঠিকানা কাটিয়া যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করে। কোন মক্কেল উইলে ব্যাঙ্ককে একৃজিকিউটার নিযুক্ত করিলে ব্যাঙ্ক তাহার সম্পত্তি দেখাশোনা এবং নির্দেশমত বিলিবন্দোবস্ত ও ভাগবাটোয়ারা করে।

ব্যাঙ্কের দেনাপাওনার হিসাব (Balance-sheet of Banks) : ব্যাঙ্কের দেনাপাওনা হিসাব করিলে ইহার কাজের সম্পর্কে ধারণা হয়। নীচে ব্যাঙ্কের লেনদেনের একটি হিসাব দেওয়া হইল।

দেনা (Liabilities)	**পাওনা** (Assets)
প্রাপ্ত মূলধন (Paid-up capital)	কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও নিজের তহবিলে নগদ জমা টাকা (Cash and balances with the Central Bank)
সংরক্ষিত তহবিল (Reserve Fund)	অন্য ব্যাঙ্কের নিকট জমা এবং চেক ভাঙ্গান বাবদ বাকী (Balances with and cheques in course of collection on other banks)
চলতি আমানত এবং অন্য আমানত (Current deposit or other accounts)	চাহিবামাত্র পরিশোধ করার শর্তে এবং অল্পমেয়াদী ধার (Money at call and short notice)
মক্কেলদের জন্য হুণ্ডী স্বীকার (Acceptances etc. for customers)	হুণ্ডী বাবদ প্রাপ্য টাকা (Bills discounted)
	বিনিয়োগ (Investment)
	ব্যবসায়ীদের হাওলাত (Advances to Customers)
	হুণ্ডী স্বীকারের জন্য মক্কেলদের দায়িত্ব (Liabilities of customers for acceptances, etc.)
	ঘরবাড়ি (Premises)

ব্যাঙ্ক শেয়ার বিক্রয় করিয়া যে টাকা তোলে তাহা ইহার প্রাপ্ত মূলধন বিপদআপদের জন্য সংরক্ষিত তহবিল রাখা হয়। এই দুইটি অংশীদারদের নিকট ব্যাঙ্কের দায়িত্ব। আমানত দুই প্রকারের—চলতি বা চাহিবামাত্র শোধ দেওয়ার শর্তে গৃহীত আমানত (Current or demand deposit) এবং মেয়াদী বা কিছু দিনের নোটিশ পাইবার পর দেয় আমানত (fixed or time deposit)। কিছু সময়ের নোটিশ দিয়া যে টাকা তুলিতে হয় তাহাকে মেয়াদী আমানত বলে। আমেরিকায় ইহাকে time deposit বলে। চলতি আমানতে সাধারণত কোন সুদ দেওয়া হয় না, কিংবা খুব কম হারে দেওয়া হয়। মেয়াদী আমানতে সুদ দেওয়া হয়। ব্যাঙ্ক অনেক সময়ে মক্কেলদের সুবিধার জন্য তাহাদের নির্দেশমত হুণ্ডী স্বীকার করে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিনে হুণ্ডীর টাকা দিবার দায়িত্ব নেয়। যদি মক্কেল হুণ্ডীর মালিককে সময়মত টাকা না দিতে পারে তবে ব্যাঙ্ককে টাকা দিতে হয়। সুতরাং ইহাকে অনিশ্চিত দায়িত্ব (Contingent liability) বলে।

পাওনার দিকের দফাগুলি হইতে ব্যাঙ্কের কাজ সম্পর্কে ভাল ধারণা হয়। প্রথম দফা ব্যাঙ্কের নগদ জমা—মক্কেলদের চাহিদা মিটাইবার জন্য রাখা হয়। প্রত্যেক ব্যাঙ্ক মোট আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ নগদ টাকায় জমা রাখে। তহবিলে মোট কত টাকা জমা রাখিলে সব চেক ভাঙ্গাইয়া টাকা দেওয়া সম্ভব হইবে ইহা অভিজ্ঞতার ফলে প্রত্যেক ব্যাঙ্ক বুঝিতে পারে। ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত আমানতের শতকরা ৮ কি ১০ ভাগ নগদ জমা রাখে। ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কের নিকট চেক জমা বাবদ যত টাকা পায় তাহা দ্বিতীয় দফায় লেখা থাকে। অল্পমেয়াদী ঋণ চাওয়ামাত্র পরিশোধ করার শর্তে অথবা খুব কম দিনের জন্য ধার দেওয়া হয়। ব্যাঙ্ক যাহাদের নিকট এই টাকা ধার দেয় তাহাদের সঙ্গে শর্ত থাকে যে, ব্যাঙ্কের প্রয়োজন হইলে চাহিবামাত্র কি বড়জোর সাতদিনের নোটিশে টাকা শোধ দিতে হইবে। খুব ভাল হুণ্ডী অথবা কোম্পানীর কাগজ বন্ধক রাখিয়া এই ধার দেওয়া হয়। যখনই ব্যাঙ্কের নগদ তহবিল কমিয়া যায়, তখনই ব্যাঙ্ক এই টাকা ফেরত চায় এবং নূতন ধার দেওয়া বন্ধ করা হয়। বৃটিশ ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত আমানতের শতকরা ৭ ভাগ এইভাবে ধার দেয়।

তিন মাসের জন্য হুণ্ডীতে টাকা খাটান ব্যাঙ্কের পক্ষে খুব সুবিধাজনক। এত অল্প দিনে হুণ্ডীর দাম বিশেষ কমিবার ভয় নাই, এবং হুণ্ডীর বাজার থাকিলে সেখানে সহজেই তাহা বিক্রয় করা যায়। হুণ্ডীর অভাবে আজকাল হুণ্ডীর গুরুত্ব কমিয়া যাইতেছে। ট্রেজারী বিলের (সরকার তিন মাসের জন্য যে বিল বিক্রয় করে) গুরুত্ব বাড়িতেছে এবং ব্যাঙ্ক ট্রেজারী বিল কিনিয়া অনেক টাকা লগ্নী করে। ব্যাঙ্ক নগদ জমা, অল্পমেয়াদী ঋণ এবং হুণ্ডী মিলাইয়া আমানতের শতকরা ৩০ ভাগ লগ্নী করে।

সরকারী ঋণপত্র, শেয়ার ইত্যাদিতে যে টাকা খাটে ইহাকে বিনিয়োগ বলে। এইগুলি হইতে প্রাপ্ত সুদের হার বেশি ও ব্যাঙ্কের আয়ও বেশি হয়। মক্কেলরা বেশি ধার চাহিলে ব্যাঙ্ক কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিয়া সেই চাহিদা মিটায়। আবার মক্কেলদের টাকার চাহিদা না থাকিলে বক্রী টাকা দিয়া কোম্পানীর কাগজ কেনে।

ব্যাঙ্ক বহু টাকা ব্যবসায়ী ও অন্য লোকদের ধার দেয়। এইরূপ ধার সাধারণত ছয় মাসের বেশি দেওয়া হয় না। ব্যবসায়ের সাময়িক প্রয়োজনে ব্যবসায়ীরা ধার করে। এই ধার দেওয়া টাকা হইতে ব্যাঙ্কের সবচেয়ে বেশি লাভ হয়। ইহার জন্য ব্যাঙ্ক অন্তত শতকরা পাঁচ ছয় টাকা অথবা ইহারও বেশি সুদ আদায় করে।

ব্যাঙ্কের মোট অর্থ ও ইহার বিনিয়োগ (Resources and the investments of banks): ব্যাঙ্কগুলি কোথা হইতে তাহাদের ব্যবসায়ে লগ্নী করিবার অর্থ সংগ্রহ করে? প্রথমত, অংশীদারগণ শেয়ার-ক্রয় বাবদ যে অর্থ দেয় এবং মোট আমানতী অর্থ যাহা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়—ইহাই ব্যাঙ্কের পুঁজি। ব্যাঙ্ক অংশীদারদের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করে। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্কে বহু লোকে টাকা আমানত রাখে। আমানত দুই প্রকারের হইতে পারে যাহা আমরা জানি—চলতি আমানত ও মেয়াদী আমানত। এই দুই প্রকারে ব্যাঙ্ক যে অর্থ সংগ্রহ করে তাহা নানাপ্রকারে লগ্নী করা হয়।

সাধারণ ব্যবসায়ের ন্যায় ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় লাভ পাইবার আশাতেই স্থাপন করা হয়। ব্যাঙ্ক চালাইতে খরচ আছে। কর্মচারীদের বেতন দিতে হইবে; আমানতকারীদের সুদ দিতে হইবে এবং অংশীদারদের মধ্যে

লভ্যাংশ বিতরণ করিতে হইবে। ব্যাঙ্কের হাতে মোট যত টাকা আছে ইহা লগ্নী করিয়া ব্যাঙ্ক চালাইবার খরচ তুলিতে হইবে ও লাভ করিতে হইবে। কি করিয়া লাভের পরিমাণ বাড়ান যায় প্রত্যেক ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে এই বিষয়ে কড়া নজর রাখিতে হয়।

সমস্ত টাকাই যদি অন্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে উচ্চ সুদে ধার দেওয়া যাইত তবে ব্যাঙ্কের সবচেয়ে বেশি লাভ হয়। কিন্তু ইহা করিবার অনেক বিপদ আছে। ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন অপেক্ষা আমানতী অর্থের পরিমাণ অনেক বেশি। ১৯৫৬-৫৭ সালে ভারতবর্ষের সমস্ত ব্যাঙ্কের মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৪০২'৩ কোটি টাকা। মোট আমানতী অর্থের পরিমাণ ছিল ১১৯৭'৪২ কোটি টাকা। আমানতী অর্থের মধ্যে আবার চলতি আমানতের পরিমাণ ছিল ৬৯০ কোটি টাকা ও মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ৫০৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ চলতি আমানতের পরিমাণই বেশি। চলতি আমানতের টাকা, আমানতকারী যে কোন সময়ে তুলিয়া লইতে পারে। সেই জন্য ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারকে সব সময়েই তহবিলে প্রয়োজনীয় নগদ টাকা জমা রাখিতে হয়। তহবিলে বেশি নগদ টাকা রাখিলে আবার ব্যাঙ্কের লোকসান হয়। কারণ নগদ টাকা ঘরে জমা রাখা লোকসান। টাকাটা বাজারে লগ্নী করা থাকিলেই ইহা হইতে কিছু সুদ পাওয়া যায়। সুতরাং ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে ডাঙ্গার বাঘ ও জলের কুমীর, এই দুই দিক হইতে সাবধান হইতে হয়। তহবিলে বেশি নগদ টাকা জমা রাখিলে ব্যাঙ্কের লোকসান হইবে। অপর দিকে আবার তহবিলে প্রয়োজনমত নগদ টাকা না থাকিলে আমানতকারীদের টাকা দাবি করা মাত্র ফেরত দেওয়া যাইবে না। তাহা হইলে ব্যাঙ্কের বদনাম হইবে ও হয়ত ব্যাঙ্ক উঠিয়া যাইবে। একদিকে লাভ কম হইবার ভয় ও অন্যদিকে আমানতী টাকা ঠিকমত না দিতে পারিলে দুর্ণামের ভয়, ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারকে এই দুই ভয়ের মধ্যে বাস করিতে হয়।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে সেইজন্য একদিকে যেমন লাভের কথা ভাবিতে হয় আবার তেমনি অন্যদিকে ব্যাঙ্কের লিকুইডিটি বা আমানতকারীদের দাবিমত নগদ টাকা পরিশোধ করিবার ব্যবস্থাও করিতে হয়। এই দুইটি অবস্থার সামঞ্জস্য করিবার জন্য ব্যাঙ্ক কিছু টাকা তহবিলে জমা রাখে ও বাকীটা

নানাভাবে লগ্নী করে। চল্‌তি আমানতের টাকা যে কোন সময়ে তোলা গেলেও আমানতকারীরা সব সময়ে টাকা তোলে না। যখন একজন চেক কাটিয়া টাকা তুলিতেছে তখন আর একজন হয়ত টাকা জমা দিতেছে। কাজেই বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে, ব্যাঙ্ক জানে যে সাধারণত মোট এত টাকার বেশি আমানত তোলা হইবে না। তহবিলে সেই পরিমাণ নগদ টাকা জমা রাখা হয়।

কিন্তু কোনদিন হয়ত একটু বেশি সংখ্যায় লোকে আমানত তুলিতে আসিল। এই বিপদ কাটাইবার জন্য ব্যাঙ্ক তিন রকমের ব্যবস্থা রাখে। প্রথমত, ভাল ভাল পার্টিকে কিছু টাকা এই শর্তে লগ্নী দিয়া রাখে যে তাহারা চাহিবামাত্র টাকা শোধ দিয়া দিবে। যে খাতকের ধার শোধ দিবার সামর্থ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই সেইরূপ পার্টিকেই এই প্রকারের ধার দেওয়া হয়। খাতকের মনে এই কথা থাকে যে নিতান্ত প্রযোজন না হইলে ব্যাঙ্ক এই ধার শোধ দিতে বলিবে না। এই প্রকারের লগ্নীকে money at call and short notice বলে। দ্বিতীয়ত, কিছু টাকা ব্যাঙ্ক ট্রেজারী বিল বা অন্য প্রকারের হুণ্ডী কিনিয়া লগ্নী করে। ট্রেজারী বিল সরকার হইতে ইস্যু করা হয় ও তিন মাস পরে সরকার টাকাটা শোধ দেয়। সাধারণ ব্যবসায়ী জিনিসপত্র কেনাবেচার টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য হুণ্ডী কাটে। হুণ্ডীর টাকা সাধারণত তিন মাস পরে শোধ দেওয়া হয়। কাজেই ট্রেজারী বিল বা কিনিয়া রাখিলে ব্যাঙ্কের টাকা বড জোর তিন মাসের জন্য আটক থাকে। তিন মাস পরে টাকা ফেরত পাওয়া যায়। ইহা ছাডা এই ধরনের লগ্নীর বড সুবিধা হইতেছে এই যে ট্রেজারী বিল বা ভাল হুণ্ডী যে কোন সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বিক্রয় করিয়া টাকা আনা যায়। হঠাৎ কোন সময়ে অতিরিক্ত টাকার দরকার হইলে ব্যাঙ্ক কতকগুলি ট্রেজারী বিল বা হুণ্ডী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা স্টেট ব্যাঙ্কের নিকট বিক্রয় করে ও টাকা আনিয়া নিজের প্রযোজন মিটায়।

তৃতীয়ত, ব্যাঙ্ক মোট টাকার কিছু অংশ কোম্পানীর কাগজে লগ্নী করে। অর্থাৎ কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া রাখে। কোম্পানীর কাগজ অবশ্য দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ। সরকার এই ঋণের টাকা পাঁচ দশ পনের কি আরো বেশি বৎসর পরে শোধ দিবে। সুতরাং এই ধরনের লগ্নীকে যথেষ্ট লিকুইড বলা

হয় না। অর্থাৎ ইহার পরিবর্তে সব সময়ে চট্ করিয়া নগদ টাকা পাওয়া নাও যাইতে পারে। কিন্তু কোম্পানীর কাগজ শেয়ার বাজারে বিক্রয় করিতে বেশি সময় লাগে না। সেই হিসাবে ইহাকে লিকুইড বলা চলে। কিন্তু শেয়ার বাজারে কোম্পানীর কাগজ বেচিলে যে সব সময়ে ভাল দাম পাওয়া যাইবে, অন্তত লোকসান হইবে না—একথা জোর করিয়া বলা যায় না। সুতরাং এই দিক দিয়া কোম্পানীর কাগজ যথেষ্ট লিকুইড নহে। কিন্তু ব্যাঙ্ক কোম্পানীর কাগজ বন্ধক রাখিয়া যে কোন সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিংবা অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট টাকা ধার করিতে পারে। এই ধারের টাকা দিয়া আশু প্রয়োজন অর্থাৎ আমানতকারীদের দাবি মিটাইতে পারে।

প্রয়োজনমত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে কত বেশি টাকা ধার পাওয়া যায় ইহার উপর বর্তমান যুগের ব্যাঙ্কের লিকুইডিটি বা "টাকা শোধ দিবার ক্ষমতা" আসলে নির্ভর করে। ব্যাঙ্কিং সমাজে আপদকালে গৌরী সেনের কাজ করার গুরুদায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঘাড় পাতিয়া নিয়াছে। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে সমস্ত দলিল বন্ধকী রাখিয়া টাকা ধার দিবে—এই সব দলিলে বা বণ্ডে প্রয়োজনমত টাকা লগ্নী রাখিলেই ব্যাঙ্কের লিকুইডিটি সম্বন্ধে দুর্ভাবনা থাকে না। অথচ এইসব লগ্নী হইতে কিছু কিছু সুদও পাওয়া যায়। কোম্পানীর কাগজ হইতেই সর্বাপেক্ষা বেশি আয় হয়, ইহার পর হয় ট্রেজারী বিল হইতে। প্রথম শ্রেণীর খাতকদের নিকট হইতে খুব কম হারে সুদ নেওয়া যায়।

বাকী সমস্ত টাকা ব্যাঙ্ক ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অন্য কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের নিকট উপযুক্ত জামিন রাখিয়া ধার দেয়। এই ধরনের লগ্নী হইতেই সর্বাপেক্ষা বেশি সুদ পাওয়া যায়। কিন্তু এই লগ্নী লিকুইড নহে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে কোন খাতকই ধার শোধ দিবে না এবং সাধারণত পাঁচ ছয় মাস কি ইহারও বেশি সময়ের জন্য এই ধার দিতে হয়।

রিজার্ভ ফাণ্ড বা সংরক্ষিত তহবিল (Reserves) : ঠিকমত রিজার্ভ ফাণ্ড রাখার উপর ব্যাঙ্কের সাফল্য নির্ভর করে। আমানতকারীদের টাকার চাহিদা মিটাইবার জন্য ব্যাঙ্ক নিজের তহবিলে যে নগদ টাকা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট যে টাকা জমা রাখে তাহাকে ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ফাণ্ড বা সংরক্ষিত তহবিল বলে। সংরক্ষিত তহবিল বেশিও হওয়া উচিত নয়, কমও নয়। যদি কম হয় তবে ব্যাঙ্ক চেক ভাঙ্গাইয়া ঠিকমত টাকা দিতে পারিবে

না। আর যদি বেশি টাকা রাখা হয় তবে লোকসান হয়। কারণ নগদ টাকায় সুদ পাওয়া যায় না। বেশি টাকা থাকিলে তাহা খাটাইয়া সুদ পাওয়াতেই ব্যাঙ্কের লাভ।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে হিসাব করিয়া রিজার্ভ ফাণ্ডে এমন টাকা রাখিতে হইবে যাহা তাহার প্রয়োজনের পক্ষে কমও নয়, বেশিও নয়। কম হইলে বিপদ, বেশি হইলে লোকসান। বিপদও থাকিবে না, আবার লোকসানও হইবে না এরূপ অবস্থা বহাল রাখাতে যথেষ্ট বুদ্ধির প্রয়োজন হয়।

রিজার্ভ ফাণ্ডে ঠিকমত টাকা রাখিলে বিপদ ও লোকসান দুই-ই থাকিবে না। ইহা নির্ণয় করিতে অনেক বিষয় চিন্তা করিতে হয়। ব্যাঙ্কের মক্কেলরা কি ধরনের কারবার করে তাহা দেখিতে হইবে। মক্কেলদের মধ্যে যদি বেশি সংখ্যক লোক কারখানার মালিক হয়, তবে সপ্তাহের বা মাসের শেষে বেতন দেওয়ার জন্য তাহারা বহু টাকা তুলিবে। অন্য সময়ে কম টাকা তুলিবে। সুতরাং সে সময় বেশি টাকা রিজার্ভ রাখিতে হইবে, অন্য সময়ে কম রাখিলেই চলে।

দ্বিতীয়ত, সময় অনুপাতেও তহবিলের কম বেশি টাকার প্রয়োজন হয়। পূজার সময়ে সকলে নূতন জামাকাপড় কেনার জন্যও বাহিরে যাইবার জন্য ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তোলে। কাজেই অন্য সময়ের তুলনায় পূজার সময় ব্যাঙ্কের তহবিলে বেশি টাকা রাখা দরকার।

ব্যাঙ্ক কি ক্রেডিট সৃষ্টি করে? (Do banks create credit): ব্যাঙ্কের আমানত দুইভাবে সৃষ্টি হয়। প্রথমত, জনসাধারণ ব্যাঙ্কে নগদ টাকা জমা দেয় এবং ফলে ব্যাঙ্কের আমানত বাড়ে। পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে-এ এইভাবে আমানত সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্ক মক্কেলদের ধার দেয়। তখন ব্যাঙ্ক খাতকের নামে একটি আমানতের হিসাব খোলে এবং চেক দিয়া সেই টাকা তোলার অধিকার দেয়। এইভাবে ধার দিবার ফলে ব্যাঙ্কগুলির আমানত বাড়ে।

Hartley Withers বলিয়াছেন যে, "ধার আমানত সৃষ্টি করে" (loans make deposit); অর্থাৎ ধার দিলে আমানত বাড়ে। ধরা যাক কোন ব্যাঙ্ক একজন ব্যবসায়ীকে ১ লক্ষ টাকা ধার দিল ও তাহার নামে হিসাবের খাতায় এই টাকা আমানত লিখিয়া দিল। ফলে সেই ব্যাঙ্কের আমানত

বাড়িল। ব্যবসায়ী অবশ্য ব্যাঙ্কে টাকা রাখিবার জন্য ধার লয় নাই। সে হয়ত কাঁচামাল কিনিবার জন্য টাকাটা ধার লইয়াছে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই বিক্রেতাকে কাঁচামালের দাম বাবদ চেক দিবে। কাঁচামাল বিক্রেতা সেই ব্যাঙ্কের মক্কেল হইলে সে ঐ ব্যাঙ্কে নিজের হিসাবে চেক জমা দিবে। তাহা হইলেও এই ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ বেশি থাকিবে। অথবা সে যদি অন্য ব্যাঙ্কের মক্কেল হয় তবে সেই ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিবে। তাহা হইলে প্রথম ব্যাঙ্কের আমানত কমিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাঙ্কটির আমানত বাড়িবে। যাহাই হউক, যতক্ষণ ধার শোধ দেওয়া না হইতেছে ততক্ষণ কোন না কোন ব্যাঙ্কের বা ব্যাঙ্কগুলির আমানত বেশি থাকিবে।

Dr. Walter Leaf এবং Cannan প্রভৃতি লেখকেরা এই মতবাদের সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ব্যাঙ্ক ধার দিলে আমানত বাড়ে একথা বলা ঠিক নয়। আসল কথা হইতেছে যে, আমানতকারীরা সকলে একসঙ্গে টাকা তুলিতে চায় না। সেইজন্য ব্যাঙ্ক আমানতের কিছু অংশ ধারে খাটাইতে পারে। সুতরাং ধার দেওয়ার ফলে আমানতের সৃষ্টি হয় না। বরং আমানতী টাকা সব তোলা হয় না বলিয়াই ব্যাঙ্ক ধার দিতে পারে। ডাঃ লিফ ও অধ্যাপক ক্যানান যে কথা বলিয়াছেন তাহা যে কোন একটি ব্যাঙ্কের পক্ষে খাটে। যে কোন একটি ব্যাঙ্ক আমানতের নির্দিষ্ট অংশের বেশি ধার দিতে পারে না ইহা সত্য। কিন্তু একটি ব্যাঙ্ক যাহা না করিতে পারে, ব্যাঙ্কগুলি মিলিতভাবে তাহা করিতে পারে। তাহাদের রিজার্ভ ফাণ্ডে যদি কোন সময়ে বেশি টাকা থাকে তবে তাহারা উদ্বৃত্ত টাকা বাজারে ধার দেয়। ধার দিলে তাহাদের মোট আমানত বাড়ে। যে ধার নেয় সে টাকাটা সবই খরচ করিতে পারে। কিন্তু সে যাহাদের টাকা দিয়াছে তাহারা নিজেদের ব্যাঙ্কে টাকাটা জমা রাখে। ধারের টাকা সবটা ব্যাঙ্কে জমা না হইলেও ইহার কিছু অংশ কোন না কোন ব্যাঙ্কে জমা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলে ব্যাঙ্কগুলির কাহারও কাহারও আমানত বাড়িবে এবং এই আমানত বৃদ্ধির কারণ পূর্বের দেওয়া ধার। কোন একটি ব্যাঙ্ক নিজের খুশিমত ধার দিতে পারে না। তাহার ধার দিবার ক্ষমতা তাহার আমানতের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। সুতরাং আমানতের উপর ধার দেওয়া নির্ভর করে একথা তাহার পক্ষে বলা ঠিক হইবে। কিন্তু

অন্য কোন ব্যাঙ্ক যদি ধার দেয় তবে প্রথম ব্যাঙ্কের আমানত বাড়িতে পারে। ধারের টাকা খরচ হইবার পর যাহাদের হাতে যায় তাহারা যে সব ব্যাঙ্কের মক্কেল সেই সব ব্যাঙ্কের আমানত বাড়িবে। সুতরাং ধার দিলে যে ব্যাঙ্কগুলির আমানত বাড়ে একথা অস্বীকার করা চলে না।

ব্যাঙ্ক যখন ধার দিতে যায় তখন ইহাকে দুএকটি বিষয় চিন্তা করিতে হয়। প্রথম, খাতক সমস্ত টাকাই নগদ তুলিয়া লইতে পারে। দ্বিতীয়, খাতক যদি অন্য লোককে চেকে টাকা দেয় তবে চেকগুলি ক্লিয়ারিং হাউসে পাঠান হইবে এবং ব্যাঙ্ককে ক্লিয়ারিং হাউসে এই বাবদ টাকা দিতে হইবে। সুতরাং ব্যাঙ্ককে দেখিতে হইতে যে তহবিলে নগদ টাকা যাহা আছে ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে যাহা আমানত আছে তাহা হইতে এই বাবদ দেয় টাকা মিটান যাইবে কিনা। অর্থাৎ রিজার্ভ ফাণ্ডে যথেষ্ট টাকা থাকিলেই ধার দেওয়া সমীচীন হইবে। সুতরাং ব্যাঙ্কগুলির ধার দেওয়ার পথে প্রধান বাধা ইহাদের রিজার্ভ ফাণ্ডের পরিমাণ। এই ফাণ্ডে প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত টাকা থাকিলেই ধার দেওয়া সম্ভব হয়।

ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভ ফাণ্ডের পরিমাণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি যথেষ্ট পরিমাণে কোম্পানীর কাগজ কেনে, তবে ব্যাঙ্কগুলির তহবিল বাড়ে; যখন কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করে তখন ব্যাঙ্কের তহবিল কমে। এতএব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ইচ্ছামত ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভ ফাণ্ডের পরিমাণ বাড়াইতে কমাইতে পারে। অর্থাৎ ব্যাঙ্কগুলি কি পরিমাণ ধার দিবে ও তাহাদের মোট আমানত কি হারে বাড়িবে কমিবে তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

ক্লিয়ারিং হাউস (Clearing House) : ক্লিয়ারিং হাউস ব্যাঙ্কগুলির মিলিত প্রতিষ্ঠান ; এই প্রতিষ্ঠানের মারফত তাহাদের পরস্পরের চেকের দেনাপাওনা হিসাব করা হয়। দেশে যখন অনেকগুলি ব্যাঙ্ক থাকে তখন প্রত্যেক ব্যাঙ্কের হাতে অন্য ব্যাঙ্কের চেক জমা হয়। সব ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারিং হাউসে চেকগুলি পাঠাইয়া দেয় ও সেখানে এই দেনাপাওনার হিসাব করা হয়। ধরা যাক A এবং B দুইটি ব্যাঙ্ক। দিনের ভিতর Aর হাতে Bর অনেক চেক জমা হইবে। তেমনি Bও Aর অনেক চেক পাইবে। দিনের শেষে Aর ও Bর প্রতিনিধি পরস্পরের চেক লইয়া ক্লিয়ারিং হাউসে যায়।

তারপর, A,Bর কাছে চেকের পেটেণ্ট বাবদ ১০,০০০ টাকা পাইবে এবং Bকে ১২,০০০ টাকা দিতে হইবে। ক্লিয়ারিং হাউসে দেনাপাওনার হিসাব কবিয়া প্রথম ব্যাঙ্ক দ্বিতীয় ব্যাঙ্ককে বাকী ২,০০০ টাকা দিবে। সাধারণত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারিং হাউসের কাজ করে। সব ব্যাঙ্ক কেন্দ্রায় ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখে এবং সেই আমানতী হিসাবের খাতায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রথম ব্যাঙ্কের হিসাব হইতে ২০০০৲ টাকা ডেবিট করিবে অর্থাৎ বাদ দিবে এবং দ্বিতীয় ব্যাঙ্কের হিসাবে ২০০০৲ টাকা ক্রেডিট বা জমা দিবে। এইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হিসাবের খাতায় দেনাপাওনার হিসাবের অদলবদল করিযা প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার চেকের পাওনা মিটান হইতেছে। ফলে নগদ টাকা ব্যবহারের কোন প্রয়োজন হয় না। ১৯৫৫-৫৬ সালে আমাদের দেশের ক্লিয়ারিং হাউসগুলিতে মোট ৬৬৩ কোটি টাকার চেকের পাওনা মিটান হইয়াছে। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার চেকের পাওনা ক্লিয়ারিং হাউসের মাধ্যমে দেওয়া হইয়াছে।

ক্লিয়ারিং হাউস থাকার ইহাই মস্ত সুবিধা। ইহা থাকার জন্য নগদ টাকার প্রয়োজন কমিয়া যায় ও নানা দিক দিয়া কারবারে বহু সুবিধা হয়।

Exercises

Q. 1. How do banks obtain the resources which they lend to their customers ? How are they able to lend more than the funds possessed by them ? (Viswa. 1957).

Q. 2. Examine the statement that the loans of the banking system create deposits. (Viswa. 1955 ; C. U. B. Com. 1958, 1955, 1953).

What are the limitations to such credit creation by banks ? (C. U. B. Com. 1959).

Q. 3. Draw a hypothetical balance-sheet of a commercial bank and explain the items on each side. (C. U. B. Com. 1946).

Q. 4. Describe the functions performed by a modern bank. (C. U. 1950, '47).

Q. 5. Explain the clearing house system and show how it leads to an economy in the use of money. (C. U. 1951 ; B. Com. 1941).

Q. 6. How do commercial banks invest their resources to ensure both their liquidity and profits ? (C. U. 1958).

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক
(Central Banking)

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলির কার্য নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যে ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করা হয় ইহাকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কিং সমাজের নেতা, উপদেষ্টা ও নিয়ন্ত্রক। ইহার কার্যের গুরুত্ব ক্রমেই উপলব্ধি হইতেছে বলিয়া বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলী (Functions of Central Bank): কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ দেশের মুদ্রাব্যবস্থার সমতা বজায় রাখা। এই ব্যাঙ্ক মোট টাকার পরিমাণ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবে যাহাতে মূল্যস্তর বেশি উঠানামা করে না। অর্থাৎ জিনিসপত্রের দাম মোটামুটি স্থির থাকে। দ্বিতীয়ত, দেশে বেকারের সংখ্যা যাহাতে সবচেয়ে কম থাকে বা পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বহাল থাকে সেদিকেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে নজর রাখিতে হইবে এবং টাকার পরিমাণ ও সুদের হার নিয়ন্ত্রণের দ্বারা এ সম্বন্ধে যতদূর সাহায্য করা সম্ভব তাহা করিতে হইবে। অর্থাৎ ব্যবসায় মন্দা দেখা দিলে সুদের হার কমাইয়া ব্যবসায়ীরা যাহাতে বেশি করিয়া টাকা ধার নেয় ও বিনিয়োগ করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে সেই চেষ্টা করিতে হইবে। আবার ইন্‌ফ্লেসনের তাণ্ডব নৃত্য শুরু হইবার আংশকা দেখা দিলে কঠোর হস্তে তাহা দমন করিতে হইবে। তৃতীয়ত, অনুন্নত দেশগুলিতে আজকাল এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে, দেশের উৎপাদনব্যবস্থায় উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজনমত অর্থ সংগ্রহের কাজে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অংশ গ্রহণ করা উচিত।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে কতকগুলি বিশেষ কাজের ভার দেওয়া হয়। প্রথমত, প্রায় সব দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে কাগজী নোট চালু করার পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই কাগজী নোট বিহিত অর্থ হিসাবে গণ্য করা হয়। নোট ভাঙ্গাইবার জন্য তহবিলে সোনা ও অন্য জিনিস কত পরিমাণ রাখিতে হইবে তাহা আইনে ঠিক করিয়া দেওয়া থাকে। শুধু কাগজী নোট নহে, অন্যান্য মুদ্রাও খুচরা আধুলি, সিকি, নয়াপয়সা সমস্তই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নির্দেশ মত চালু করা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্কারের কাজ করে। সরকারী সমস্ত টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা থাকে। হঠাৎ কোন কারণে প্রয়োজন হইলে সরকার এই ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সাময়িকভাবে ধার নেয়। সরকার যখন বাজার হইতে ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া টাকা কর্জ করিতে চায় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ইহার সমস্ত বন্দোবস্ত করে। কোম্পানীর কাগজ বা সরকারী ঋণপত্রের সুদ দেওয়ার কাজও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে করিতে হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কেরও ব্যাঙ্কারের কাজ করে। অন্যান্য ব্যাঙ্কের অধিকাংশকেই নিজেদের আমানতের কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয়। যেমন এদেশে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে চল্‌তি আমানতের শতকরা ৫ ভাগ ও মেয়াদী আমানতের শতকরা ২ ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয়। আবার এই সব ব্যাঙ্ক প্রয়োজনমত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপযুক্ত জামানত রাখিয়া কর্জ লইতে পারে। অনেক দেশেই (যেমন এদেশে) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে অন্যান্য ব্যাঙ্কের কাজ নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া আছে। যেমন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি প্রধান কাজ হইতেছে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের (scheduled banks) কার্য পরিদর্শন করা। তাহারা কিভাবে টাকা ধার দিবে, কিংবা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে দিবে না ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে। এইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে অন্য ব্যাঙ্কের সহায়ক ও নিয়ন্ত্রক বলা হয়।

বৈদেশিক মুদ্রার সহিত দেশের মুদ্রার বিনিময় হার স্থির রাখাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। সেইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিদেশী মুদ্রার নির্দিষ্ট দামে কেনা-বেচা করে। বাজারে বিভিন্ন বিদেশী মুদ্রার লেন-দেন কারবার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত থাকে। যেমন, একটি ছাত্র বিদেশে পড়িতে যাইবে। তাহাকে কত বিদেশী মুদ্রা দেওয়া হইবে তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঠিক করিয়া দেয় এবং সেই অনুসারে তাহাকে পারমিট বা অনুমতিপত্র দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে আরো নানাপ্রকারের কাজ করিতে হয়। যেমন, ইহা ক্লিয়ারিং হাউসের কার্য পরিচালনা করে এবং সরকারকে সকল অর্থঘটিত ব্যাপারে পরামর্শ দেয়।

অনেকের মতে সংকটের সময় গৌরী সেনের কাজ (Lender

of last resort) করাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। অর্থাৎ সংকটের সময়ে প্রয়োজনমত ধার দিয়া সলভেণ্ট পার্টি বা ব্যাঙ্ককে সাহায্য করাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। কোন ব্যাঙ্কের আসল অবস্থা হয়ত মোটামুটি ভালই। কিন্তু সেই ব্যাঙ্কের উপর যদি কোন কারণে "রাণ" হয়, অর্থাৎ আমানতকারীরা একসঙ্গে টাকা তুলিবার দাবি করে, তবে ব্যাঙ্ক ফেল পড়িবার আশংকা আছে। কারণ আমানতী টাকা ব্যাঙ্ক ঘরে জমা রাখে না। কিছু অংশ তহবিলে রাখিয়াই অধিকাংশই বাজারে লগ্নী করে। যাহাদের নিকট লগ্নী দেওয়া থাকে তাহারা আসলে হয়ত ভাল পার্টি। কিন্তু হঠাৎ একসঙ্গে সব ধার শোধ দেওযা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নাও হইতে পারে। এই অবস্থায় আমানতকারীরা ব্যাঙ্ক ফেলের গুজবে আতংকগ্রস্ত হইয়া যদি একই সঙ্গে টাকা তুলিতে চায, তবে ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ করা ছাড়া আর কোন উপায থাকে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি বোঝে যে ব্যাঙ্কের আসল অবস্থা ভাল, কিন্তু সাময়িক ভাবে ইহা বিপদগ্রস্ত হইয়াছে তবে ইহাকে গৌরী সেনের ন্যায় টাকা দিয়া আমানতকারীদের সকল দাবি মিটাইতে সাহায্য করিতে পারে। ইহা দুর্দিনের বন্ধুর কাজ, এবং এ কাজ কেবল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই করিতে পারে। কারণ ইহার জন্য অল্প সময়ের মধ্যে হয়ত বহু টাকার প্রয়োজন হইতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে নোট চালু করার মালিক বলিয়া অল্প সময়ের মধ্যে বহু টাকা বাহির করিবার ক্ষমতা রাখে। অবশ্য অধিকাংশ সময়েই বেশি টাকা দিবার প্রয়োজন হয় না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ঘোষণা করে যে, ইহা ব্যাঙ্ককে বা ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্য করিবে তাহা হইলেই সংকট কাটিয়া যাইবে। আমানতকারীরা টাকা তুলিতে চায এই আশংকায় যে ব্যাঙ্ক ফেল করিলে তাহারা নিজেদের টাকা আর তুলিতে পারিবে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক টাকা দিবে জানিলে আর আশংকার কারণ নাই। অধিকাংশ লোকই নিশ্চিন্ত মনে টাকা না তুলিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ (Central banks and control of credit): কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য আলোচনা করিবার সময় আমরা দেখিয়াছি যে, টাকার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেশের আর্থিক অবস্থার সমতা রক্ষা করা ইহার একটি প্রধান কাজ। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কিভাবে

টাকার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে, তাহাই এখন আলোচনা করা হইবে। মোট টাকার দুইটি অংশ :—কাগজী নোট এবং ব্যাঙ্ক ক্রেডিট। কাগজী নোট চালু করার পূর্ণ অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি উপায়ে ব্যাঙ্ক ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ করে ?

ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে—ব্যাঙ্ক রেট বা সুদের হার বাড়ান, কমান, কোম্পানীর কাগজ কেনা-বেচা এবং ব্যাঙ্ক রিজার্ভের পরিবর্তন। এইগুলির দ্বারা মোট ক্রেডিটের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হয়। আর একরকম ব্যবস্থা আছে যাহার দ্বারা কোন বিশেষ বিশেষ লাইনের ক্রেডিট দেওয়া নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইহাকে সিলেক্‌টিভ ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ বলে। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কগুলির উপর চাপ দিতে পারে। ইহাকে মরাল সুয়েসন (moral suasion) বলে।

ব্যাঙ্ক রেট (Bank rate) : কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে হারে ভাল পার্টির হুণ্ডী বাট্টা কাটিয়া ধার দেয় ইহাকে ব্যাঙ্ক রেট বলা হয়। অন্য সুদের হার—বিশেষত ব্যাঙ্কগুলি খাতককে যে সুদে ধার দেয় তাহার ও ব্যাঙ্ক রেটের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ব্যাঙ্ক রেট বাড়িলে অন্য ব্যাঙ্কগুলিও সুদের হার বাড়াইয়া দেয়। আবার ব্যাঙ্ক রেট কমিলে সুদের হারও কিছুটা নামে। কোন সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি লক্ষ্য করে যে, ব্যবসায়ীরা একটু বেশি পরিমাণ ধার লইতে:ছ, তবে ইহা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাঙ্ক রেট বাড়াইয়া দেয়। ব্যাঙ্ক রেট বাড়িলে অন্য ব্যাঙ্ক সুদের হার বাড়াইয়া দেয়। ধারের জন্য বেশি সুদ দিতে হইলে ব্যবসায়ীরা কম পরিমাণে ধার চাহিবে। আবার ব্যাঙ্ক রেট কমাইলে সাধারণভাবে বাজারের সুদের হার কমে। সুদের হার কমিলে ধারের চাহিদা বাড়িবে। অর্থাৎ ছয় পারসেণ্ট সুদে ব্যবসায়ীরা যত টাকা কর্জ চাহিবে, পাঁচ পারসেণ্ট সুদে আরও বেশি কর্জ চাওয়া স্বাভাবিক। এইভাবে ব্যাঙ্ক রেট বাড়িলে কমিলে ধার বা ক্রেডিটের পরিমাণ কমিবে বা বাড়িবে। ক্রেডিটের পরিমাণ কমার অর্থ ব্যবসায়ীদের ব্যয় কমা। ব্যয় কমিলে মোট আয় কমিবে ও ফলে জিনিসপত্রের মূল্য কমিবে। সুতরাং ব্যাঙ্ক রেট বাড়িলে মূল্যস্তর নিম্নমুখী হইবার সম্ভাবনা।

কোম্পানীর কাগজ কেনা-বেচা পদ্ধতি (Open Market Policy) : এই পদ্ধতির দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভ ফাণ্ডের পরিমাণ

বাড়াইতে বা কমাইতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি কোন সময়ে দেখে যে, ব্যাঙ্কগুলির তহবিলে উদ্বৃত্ত আছে ও ইহারা বেশি মাত্রায় ধার দিতেছে বা দিতে পারে, তখন সে উদ্বৃত্ত অর্থ টানিয়া লইবার জন্য বাজারে কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিতে শুরু করে। যাহারা এই কাগজ কিনিযাছে তাহারা মূল্যবাবদ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে চেক দেয়। যে ব্যাঙ্কের উপর এই সব চেক কাটা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাহাদের নিকট চেক পাঠাইয়া ভাঙ্গাইযা আনে। ফলে এই সমস্ত ব্যাঙ্কের তহবিলে নগদ টাকার পরিমাণ কমিযা যায় ও ফলে ইহাদের ধার দিবার ক্ষমতা কমে। আবার ব্যাঙ্কগুলির তহবিলে যখন কম টাকা থাকে তখন তাহারা কম পরিমাণ ধার দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ইহা অনুচিত মনে করিলে বাজার হইতে বেশি পরিমাণে কোম্পানীর কাগজ কিনিতে পারে। যাহারা এই কাগজ বিক্রয় করিয়াছে, তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা পাইয়া নিজের ব্যাঙ্কে জমা দেয়। ফলে ব্যাঙ্কগুলির তহবিলে বেশি টাকা জমা হয় ও তাহারা তখন বেশি পরিমাণে ধার দিতে পারে। এইভাবে বাজারে কোম্পানীর কাগজ কেনা-বেচা করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ক্রেডিটেব পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

কিন্তু কোন সময়ে ব্যাঙ্কগুলির তহবিলে হয়ত খুব বেশি উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিতে পারে। তখন যে পরিমাণ কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করা প্রয়োজন ইহা করিলে শেয়ার বাজারে কোম্পানীর কাগজের দাম হয়ত ভয়ানক পড়িয়া যাইবে ও ফলে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে। এইজন্য তৃতীয় পন্থার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক দেশেই নিয়ম আছে যে, ব্যাঙ্কগুলি ইহাদের আমানতের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখিবে। আমাদের দেশের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে নিজেদের চল্‌তি আমানতের শতকরা ৫ টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি দেখে যে, ব্যাঙ্কগুলির তহবিলে বেশি উদ্বৃত্ত অর্থ আছে এবং তাহারা অধিক পরিমাণ টাকা লগ্নী করিতেছে তবে তাহাদিগকে চল্‌তি আমানতের শতকরা ৫ টাকার স্থলে ১০ টাকা করিয়া জমা দিবার নির্দেশ দিতে পারে। অর্থাৎ এখন হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট আমানতের দশ ভাগ জমা রাখিতে হইবে। তাহা হইলে ব্যাঙ্কগুলির তহবিলে যে উদ্বৃত্ত অর্থ আছে ইহার অধিক অংশই আটক পড়িবে ও তাহারা আর বেশি ধার দিতে পারিবে না।

কিংবা ব্যাঙ্কগুলির তহবিলে বেশি অর্থ না থাকিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলিতে পারে যে এখন হইতে চল্‌তি আমানতের শতকরা তিন টাকা মাত্র জমা দিলেই হইবে। ইহার ফলে ব্যাঙ্কগুলির হাতে পূর্বের চেয়ে বেশি অর্থ থাকিবে ও তাহারা বেশি ধার দিতে পারিবে। এইভাবে ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভের অনুপাত পরিবর্তন করিয়া ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ইহাকে **রিজার্ভের পরিবর্তনীয় অনুপাত** (Variable reserve ratio) বলে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই তিনটি পদ্ধতি দ্বারা ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের মোট পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। কখনও কখনও কোন বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর ধারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। ধর, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি দেখে যে, ব্যাঙ্কগুলি ফট্‌কা বাজারের কারবারীদের বড় বেশি টাকা ধার দিতেছে, তবে ইহাদের এই ধরনের লগ্নী কম করিয়া দিবার নির্দেশ দিতে পারে। আমাদের দেশে ১৯৫৬ সালের প্রথম দিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেখিল যে, ব্যাঙ্কগুলি ধান ও গমের কারবারীদের পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি টাকা ধার দিতেছে ও সেই টাকা দিয়া ব্যবসায়ীবা মাল আটকাইযা রাখিতে পারিতেছে। তাহার ফলে ধান ও গমের দর চড়িতে থাকে। তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কগুলির উপর নির্দেশ দেয় যে, তাহারা ধান ও গমের কারবারীদের কম পরিমাণ টাকা ধার দিবে। ইহাকে **সিলেক্‌টিভ ক্রেডিট** (বা বিশেষ ধরনের ধার) **নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি** বলে। এই পদ্ধতি সর্বপ্রথম আমেরিকাতে ফেডারাল রিজার্ভ সিস্টেম প্রয়োগ করে। পরে ইহা অন্য দেশেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শেয়ার বাজারের ক্রেতাদের দেয় ধার, বাড়ি ও অন্য ভূসম্পত্তির ক্রেতাদের দেয় ধার এবং যাহারা মোটরগাড়ি, রেফ্রিজারেটার, রেডিও প্রভৃতি দাম কিস্তিবন্দীতে শোধ দিবার অঙ্গীকারে কিনিতে চাহে তাহাদের ক্রয়ের পরিমাণ এই পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ধরা যাক যে একটি মোটর গাড়ির দাম এগার হাজার টাকা। যাহারা কিস্তিবন্দীতে গাড়ি কিনিতে চাহে তাহাদিগকে প্রথমে কিছু থোক টাকা দিতে হয়। বাকী টাকা কিছুদিন ধরিয়া কিস্তিতে দিয়া শোধ দিতে হয় ও এই টাকার সুদ দিতে হয়। ধর, এগার হাজার টাকার মধ্যে তিন হাজার টাকা প্রথমে দিতে হইবে ও বাকী ৮০০০৲ টাকা ১৬ মাসে মাসিক কিস্তিতে শোধ দিতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি এই ধরনের কেনাবেচা কমাইতে চায় তবে

বলিতে পারে যে প্রথম কিস্তিতে ৪০০ টাকা দিতে হইবে ও বাকী টাকা দশ মাসে শোধ দিতে হইবে। অনেক ক্রেতা তাহা হইলে হয়ত গাড়ি কিনিবে না।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহিত অন্য ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কগুলির বিপদ-আপদের বন্ধু এবং সংকটকালে সকলকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হইতে হয়। এইজন্য অন্য ব্যাঙ্কগুলি সহসা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কোন অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি কোন সময়ে দেখে যে, ব্যাঙ্কগুলি যে পরিমাণ ধার দিতেছে তাহার ফল ভাল হইবে না, তখন সে অন্য ব্যাঙ্কগুলিকে সাবধান করিয়া দিতে পারে ও কম পরিমাণ ধার দিবার জন্য চাপ দিতে পারে। ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কথা মানিয়া চলিতে চেষ্টা করে। এইভাবে চাপ দিয়াও 'ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ' চেষ্টাকে ইংরাজীতে moral suasion বলে।

অবশ্য এই পদ্ধতিগুলি যে সব সময়েই কার্যকরী হয় তাহা নহে। সুদের হার বাড়িলে ধারের চাহিদা নাও কমিতে পারে। ব্যবসায়ীরা যদি কারবারে খুব বেশি লাভের প্রত্যাশা করে, তবে তাহারা সুদের হার দুই এক পারসেণ্ট বাড়িলেও ধার নিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। কারণ ধারের টাকা কারবারে খাটাইলে লাভ খুব বেশি হইবে। কাজেই সুদের হার চড়িলেও ধারের চাহিদা না কমিতে পারে। কোম্পানীর কাগজ বেশি পরিমাণে কেনা-বেচা করা সব সময়ে সম্ভব হয় না। রিজার্ভের পরিবর্তনীয় অনুপাত পদ্ধতিরও নানা অসুবিধা আছে। সেইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সব সময়ে মোট ধারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না একথা স্বীকার করিতে হইবে। আর ধারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও যে আর্থিক সমতা বজায় থাকিবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ আর্থিক সমতা বা মূল্যস্তর কেবলমাত্র টাকার পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে অন্য পদ্ধতি অবলম্বনেরও প্রয়োজন আছে। যেমন ফিস্ক্যাল বা সরকারী আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করা যাইতে পারে। যদি কোন সময়ে ব্যবসায় মন্দার ভাব দেখা যায় ও জিনিসপত্রের মূল্য কমিতে থাকে তবে শুধু ব্যাঙ্ক রেট কমাইয়া বা ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভের পরিমাণ কমাইলেই অবস্থার উন্নতি না হইতে পারে। তখন সরকার যদি আয়করের

হার কমাইয়া দেয় তবে ব্যবসায়ীদের মধ্যে মন্দার প্রভাব কমিতে পারে। মন্দার ফলে তাহাদের লাভ কমিবার আশংকা উপস্থিত হয়। কিন্তু ট্যাক্স কমিলে লাভের কম অংশ সরকারের ঘরে যাইবে ও বেশি অংশ নিজের পকেটে থাকিবে। কাজেই ট্যাক্সের বোঝা কম হইবার আনন্দে মন্দার আশংকা দূরীভূত হইতে পারে। আর্থিক সমতা রক্ষা করিতে হইলে অনেক সময়েই নানা পন্থা অবলম্বন করিতে হয়।

Exercises

Q. 1. What are the functions of a Central Bank? (C. U. B. Com. 1955, 1953, 1951 ; Viswa. 1955, 1952).

Q. 2. What are the different methods, old and new, of credit control by the Central Banks? How far are they successful? (Viswa. 1958).

ষড়বিংশ অধ্যায়

কতিপয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

(Some Central Banks)

ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড (Bank of England): এই ব্যাঙ্ক ১৬৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ইহার গঠনপ্রণালী ১৮৪৪ সালের Bank Charter Act দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। ১৯৪৬ সালের পূর্বে ইহা শেয়ার হোল্ডারদের ব্যাঙ্ক ছিল এবং তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হইত। ১৯৪৫ সালে বৃটিশ সরকার ইহাকে কিনিয়া লইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক দুই ভাগে বিভক্ত—ইস্যু বিভাগ (Issue Department) এবং ব্যাঙ্কিং বিভাগ (Banking Department)। ইস্যু বিভাগের কাজ হইতেছে কাগজী নোট চালু করা। ব্যাঙ্কিং বিভাগ সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং-এর কাজ করে, সরকারী অন্যান্য ব্যাঙ্কের এবং জনসাধারণের তহবিল গচ্ছিত রাখে, ব্যাঙ্ক রেট স্থির করে এবং সাপ্তাহিক ব্যালান্স সীট প্রচার করে। ব্যাঙ্কের কাজ Court of Directors দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহাতে গভর্ণর, ডেপুটি গভর্ণর এবং অন্যান্য ১৬ জন সরকার নির্বাচিত সভ্য থাকেন।

যে কয়টি ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণপদ্ধতির কথা আলোচনা করা হইয়াছে ইহার মধ্যে একটি ক্ষমতা ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের নাই। ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড অন্য ব্যাঙ্কের রিজার্ভের অনুপাত পরিবর্তন করিতে পারে না। বস্তুত অন্য ব্যাঙ্ককে আমানতের কোন অংশই আইনত ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের নিকট জমা রাখিতে হয় না। তবে নিজেদের কাজের সুবিধার জন্য সব ব্যাঙ্কই ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডে কিছু কিছু টাকা জমা রাখে। কিন্তু আইনে তাহাদের ইহা করিতে বাধ্য করে না। অবশ্য এই ক্ষমতা না থাকিলেও ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতেই কম নহে। ইহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে পাঁচটি ব্যাঙ্কের আকার ও প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি। ১০০ জনের কাজ নিয়ন্ত্রণ করার চেয়ে ৫ জনের কাজ দেখা অনেক সহজ। ইহা ছাড়া বহু দিনের অভ্যাসের ফলে অন্য ব্যাঙ্কগুলি ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের উপদেশ ও নেতৃত্ব

মানিয়া চলে। দ্বিতীয়ত, লণ্ডনে একটি সুগঠিত টাকার বাজার আছে, পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই। এই ধরনের সুগঠিত টাকার বাজার (অর্থাৎ যেখানে টাকা ধার-নেওয়া চলে) থাকার ফলে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের কাজ অনেক সুগম হইয়াছে। তৃতীয়ত, অন্য ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের নিকট হইতে ধার লয় না। কিন্তু তাহাদের সুদের হার ব্যাঙ্ক রেটের অনুগামী হয়।

ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম (Federal Reserve System): আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম বলে। ইহা ১৯১৩ সালে গঠিত হইয়াছে। ইহার গঠনপ্রণালী একটু স্বতন্ত্র ধরনের। সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একটি থাকে। আমেরিকার ১২টি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আছে। দেশটিকে ১২টি অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে ও প্রত্যেক অঞ্চলে একটি করিয়া ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আছে। এই ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দৈনন্দিন কাজগুলি করে। ইহারা অঞ্চলস্থিত কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক দ্বারা গঠিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনে গঠিত প্রত্যেক ব্যাঙ্ক, স্টেট আইনে গঠিত ব্যাঙ্কগুলির অধিকাংশই ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সভ্য। সভ্য ব্যাঙ্ককে ইহার প্রাপ্ত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ডের শতকরা ৬ ভাগ দিয়া এই ব্যাঙ্কের শেয়ার কিনিতে হয়। প্রত্যেক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি পরিচালক সভা আছে। তাহাতে ৯ জন করিয়া সভ্য আছে এবং ইহাদের মধ্যে ছয় জন সভ্য ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক নির্বাচিত। বাকী তিন জন ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক মনোনীত।

এই ১২টি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাথার উপরে একটি বোর্ড অফ্ গভর্ণরস্ অফ দি ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম আছে। ইহাকে অনেক সময়ে সংক্ষেপে ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড বলা হয়। এই বোর্ড ৭ জন সভ্য লইয়া গঠিত। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি সিনেটের অনুমোদন লইয়া সভ্যদের ১৪ বৎসরের জন্য নিযুক্ত করেন। এই বোর্ডের হস্তেই আসল ক্ষমতা দেওয়া আছে।

ইংলণ্ডের যেমন বড় বড় পাঁচটি ব্যাঙ্ক আছে, আমেরিকায় বহু ব্যাঙ্ক আছে। ইংলণ্ডে অন্য ব্যাঙ্ক তাহার আমানতের এক অংশ ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডে জমা রাখিতে আইনত বাধ্য নহে। কিন্তু আমেরিকাতে সভ্যব্যাঙ্ককে তাহার আমানতের এক অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিতে হয়।

এ বিষয়ে আইনে একটি বিশেষ ব্যবস্থা আছে। সভ্যব্যাঙ্কগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে :—ফেডারেল রিজার্ভ সিটিতে (অর্থাৎ যে শহরে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত আছে) অবস্থিত সভ্যব্যাঙ্ক, অন্য শহরে অবস্থিত সভ্যব্যাঙ্ক ও মফঃস্বলের সভ্যব্যাঙ্ক। প্রথম শ্রেণীর সভ্যব্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের চল্‌তি আমানতের শতকরা ১৩ ভাগ ও মেয়াদী আমানতের ৩ ভাগ, দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যব্যাঙ্কদের চল্‌তি আমানতের ১০ ভাগ ও মেয়াদী আমানতের ৩ ভাগ এবং তৃতীয় শ্রেণীর সভ্যব্যাঙ্কদের চল্‌তি আমানতের ৭ ভাগ ও মেয়াদী আমানতের ৩ ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিতে হয়। প্রয়োজন হইলে ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড এই রিজার্ভের অনুপাত বাড়াইয়া দ্বিগুণ পর্যন্ত করিতে পারে। অর্থাৎ যে সভ্যব্যাঙ্ককে আমানতের ১৩ ভাগ জমা রাখিতে হয়, তাহাকে ২৬ ভাগ পর্যন্ত জমা রাখিবার নির্দেশ দিতে পারে। ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের হস্তে ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভ অনুপাত পরিবর্তনের ক্ষমতা দেওয়া আছে।

ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কগুলি ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের নিকট হইতে ধার লয় না। ইহাই সে দেশের রীতি। কিন্তু ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সভ্যব্যাঙ্কগুলি সব সময়েই ধার লইয়া থাকে।

Exercise

Q. 1. Briefly discuss the differences in the organisation of the Bank of England and of the Federal Reserve System.

সপ্তবিংশ অধ্যায়

মুদ্রামূল্যের পরিমাপ

(Measuring the value of money)

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা বিভিন্নপ্রকার মুদ্রা তৈয়ারির সংগঠন এবং মুদ্রার প্রচলন পরিমাপের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। মুদ্রার মূল্য কিভাবে নির্ণয় করা হয় এখন আমরা তাহাই আলোচনা করিব। আমরা প্রথমে মুদ্রার মূল্য অথবা মুদ্রামূল্যের পরিবর্তন কিভাবে পরিমাপ করা যায় তাহাই নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। ইহার পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে মুদ্রার মূল্য সম্বন্ধে পুরাতনপন্থী অর্থশাস্ত্রীদের তত্ত্বগুলি আলোচনা করিব। পরিশেষে, আধুনিক লেখকেরা নিয়োগ, উৎপাদন ও মূল্য নির্ণয়ের যে পথ দেখাইয়াছেন তাহাই আলোচনা করিব।

সূচক সংখ্যা (Index numbers): সব জিনিসের দাম টাকায় হিসাব করা হয়। কিন্তু টাকার দাম টাকায় হিসাব করা যায় না। তাহা হইলে টাকার মূল্য নির্ধারণের উপায় কি? জিনিসপত্র কিনিবার জন্যই টাকার দরকার হয়। অতএব লোকে সাধারণত যেসব জিনিস কেনে ইহার গড়পড়তা দামের হিসাব করিলে মুদ্রার মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতা জানা যায়। জিনিসপত্রের গড়পড়তা দামকে মূল্যস্তর (price-level) বলে। কতকগুলি মূল্যস্তরের সংখ্যাকে সূচকসংখ্যা বলে। যে সমস্ত সংখ্যার দ্বারা মূল্যস্তরের পরিবর্তন নির্ণয় করা যায় ইহাকে সূচকসংখ্যা বলে। মুদ্রামূল্যের পরিবর্তন নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জিনিসের দামের যে গড়পড়তা হিসাব করা হয়, ইহাই সূচকসংখ্যা। মূল্যস্তর বাড়িলে টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমে অর্থাৎ মুদ্রামূল্য কমে। মূল্যস্তর বাড়িবার অর্থ জিনিসপত্রের দামবৃদ্ধি হইয়াছে। জিনিসপত্রের দামবৃদ্ধির অর্থ টাকার মূল্য কমা। আবার মূল্যস্তর কমিলে টাকার মূল্য বাড়ে। কারণ এক টাকায় এখন পূর্বের চেয়ে বেশি জিনিস কেনা যাইতেছে। সুতরাং, মূল্যস্তর ও মুদ্রামূল্য বিপরীতগামী।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে সব জিনিসের দাম একসঙ্গে বাড়ে কমে না। কোন জিনিসের দাম হয়ত কমিয়াছে, আবার কোন জিনিসের দাম

বাড়িয়াছে এবং ইহাদের হ্রাস অথবা বৃদ্ধির হার সমান নয়। কিন্তু বিভিন্ন জিনিসের দামের গতি এইরূপ বিভিন্নমুখী হইলেও সাধারণত মূল্যস্তরের একটি কেন্দ্রীয় গতি থাকে। সেই গতি যদি বাড়ে তবে অধিকাংশ জিনিসের দামই বাড়িবে। আবার ইহা যদি কমে তবে অধিকাংশ জিনিসের দামই কমিবে। সূচকসংখ্যার দ্বারা মূল্যস্তরের এই কেন্দ্রীয় গতি নির্ণয় করা যায়।

সূচকসংখ্যা প্রস্তুত করার জন্য প্রধানত নিম্নলিখিত বিষয় জানা প্রয়োজন :—(১) একটি ভিত্তিবৎসর ঠিক করিতে হয় এবং এই ভিত্তিবৎসরের সহিত অন্যান্য বৎসরের মূল্যস্তরের তুলনা করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, ইহার পর জিনিসগুলি বাছিয়া লইতে হয় এবং বিভিন্ন সময়ে ইহাদের দাম জানিতে হইবে এবং গড়পড়তা দাম হিসাব করিতে হইবে। একটি উদাহরণ লওয়া যাক।

ইং ১৯৩৯ সাল				ইং ১৯৪০ সাল		
চাল	প্রতিমণ	৬৲ টাকা	=১০০	৮৲	টাকা	=১৩৩⅓
ডাল	”	৫॥০ ”	=১০০	১১৲	”	=২০০
চিনি	”	৬৲ ”	=১০০	৯৲	”	=১০০
ম[illegible]	”	৫৲ ”	=১০০	৭৲	”	=১৪০
চা	”	১৲ ”	=১০০	১⅜	”	=১৩৭½
	গড় ৫০০÷৫		=১০০	৭৬০⅚÷৫		=১৫২⅙

সুতরাং ১৯৩৯ সালে পাঁচটি জিনিসের গড়পড়তা দাম যদি ১০০ হয় তবে ১৯৪০ সালে সেই সব জিনিসের দাম বাড়িয়া ১৫২⅙ হইয়াছে। অর্থাৎ শতকরা ৫২⅙ ভাগ বাড়িয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে প্রথম বৎসরে সব জিনিসের দামই ১০০ এর সমান বলিয়া ধরা হইতেছে এবং পরের বৎসরের দাম বাড়া-কমার হিসাব সেই অনুপাতে করা হইতেছে। আমাদের দেশে বর্তমানে ১৯৫২-৫৩ সালকে ভিত্তি বৎসর ধরা হইয়াছে এবং এই বৎসরের জিনিসপত্রের মূল্যস্তরকে ১০০ বলা হয়।

কিন্তু এই পদ্ধতিতে সূচকসংখ্যা নির্ণয় করিলে মুদ্রামূল্য পরিবর্তনের সঠিক হিসাব সব সময়ে পাওয়া যায় না। পূর্বোক্ত উদাহরণে সব জিনিসকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। চালের দাম হয়ত শতকরা ৩০ ভাগ

বাড়িয়াছে আবার তামাকের দাম হয়ত শতকরা ৩০ ভাগ কমিয়াছে। ইহাতে গড়পড়তা দাম সমান থাকিবে এবং সূচকসংখ্যার কোন পরিবর্তন হইবে না। কিন্তু তামাকের দাম কম হওয়াতে লোকের যেটুকু লাভ হইবে চালের দাম বাড়িবার ফলে তাহাদের অনেক বেশি ক্ষতি হইবে। চালের জন্য লোকে যত টাকা খরচ করে, তামাকের পিছনে ইহা করে না। যে পরিবারে মাসে দুইমণ চাল আসে সেখানে তামাক কেনা হয় হয়ত মাত্র আধ সের। চালের দাম ৬৲ হইতে ৮৲ টাকা হওয়ার ফলে সেই পরিবারকে মাসে ৪৲ টাকা বেশি খরচ করিতে হইতেছে। আর এক সের তামাকের দাম ৮৲ টাকা হইতে ৬৲ টাকা হওয়ার ফলে খরচ কমিতেছে মাসে মোট ১৲ টাকা মাত্র। সুতরাং এই দুইটি জিনিসের মূল্য পরিবর্তনের ফলে এই পরিবারের নিকট মুদ্রামূল্য কমিয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু সূচকসংখ্যায় ইহা দেখা যাইতেছে না। সুতরাং সঠিক হিসাব পাইতে হইলে সূচকসংখ্যা নির্ণয়ের সময় জিনিসগুলির যথার্থ গুরুত্ব দিতে হইবে। চালের গুরুত্ব যদি তামাকের চার গুণ হয় তবে চালের দামকে ৪ দিয়া এবং তামাকের দামকে ১ দিয়া গুণ করিতে হইবে। ধর, ১৯৩৯ সালে চাল ও তামাকের দাম ১০০। তাহাদের গড়পড়তা দামও ১০০। পরের বছর চালের দাম শতকরা ৩০ ভাগ বাড়িল এবং তামাকের দাম শতকরা ৩০ ভাগ কমিল। এখন ১৯৪০ সালের চালের দাম ১৩৩⅓ এবং তামাকের দাম ৬৬⅔, গড়পড়তা দাম ১০০। গুরুত্ববিহীন (unweighted) সূচকসংখ্যার কোন পরিবর্তন হইবে না। চালের গুরুত্ব যদি তামাকের গুরুত্বের চারগুণ হয়, তবে চালের দামকে ৪ দিয়া গুণ করিতে হইবে। ১৯৪০ সালের চালের দাম ১৩৩⅓ × ৪ অর্থাৎ ৫৩৩ এবং তামাকের দাম ৬৬⅔ × ১ অর্থাৎ ৬৬⅔। মোট ৫৯৯⅔ এবং আমরা ইহাকে গুরুত্বের পরিমাণ অর্থাৎ ৪ + ১ = ৫ দিয়া ভাগ করি তবে গড়পড়তা দাম হয় ১২০। এই সূচকসংখ্যা অনুসারে বোঝা যায় যে, জিনিসপত্রের দাম শতকরা ২০ ভাগ বাড়িয়াছে অর্থাৎ সেই পরিমাণ মুদ্রামূল্য কমিয়াছে। ইহা অনেকটা নির্ভুল, কারণ তামাকের দাম কমার ফলে লোকের যাহা লাভ হয়, চালের দাম বাড়ার ফলে ইহা অপেক্ষা অনেক ক্ষতি হয়। আয়ের কত অংশ জিনিসটির জন্য ব্যয় করে সেই হিসাবে জিনিসের গুরুত্ব স্থির করা হয়।

সূচকসংখ্যা হিসাবের অসুবিধা (**Difficulties in constructing index numbers**) : মূল্যস্তরের উঠানামার হিসাব করিবার সময় সূচক-সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। সাধারণ ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্যের গড়পড়তা হিসাবকে সূচকসংখ্যা বলা হয়। নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী সূচকসংখ্যা নির্ণয় করা হয়। প্রথমত, কোন একটি বৎসর বা সময় হইতে গণনা শুরু করা হয়। এই বৎসর বা সময়কে ভিত্তিবৎসর বলা হয়। এই ভিত্তিবৎসর (base-year) হইতে দ্রব্যমূল্যের গড়পড়তা হিসাব শুরু করা হয়। যে বৎসরে বা সময়ে বিশেষ কোন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে নাই ও জিনিপত্রের দাম মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল, সেই বৎসর বা সময়কে ভিত্তি বৎসর হিসাবে ধরা হয়। দ্বিতীয়ত, কোন জিনিসের দামের হিসাব করা হইবে ইহা ঠিক করিতে হইবে এবং ভিত্তি বৎসর ও অন্য সময়ে ইহাদের দাম নির্ণয় করিতে হইবে। এই দামের সংখ্যাগুলির গড়পড়তা হিসাব করা হয়। কোন জিনিসের কিরূপ গুরুত্ব তাহাও ঠিক করিতে হইবে ও জিনিসটির দাম, এই গুরুত্ব সংখ্যা দিয়া গুণ করিতে হইবে। এই পদ্ধতিতে সূচকসংখ্যা নির্ণয় করা হয়।

কিন্তু সূচকসংখ্যা নির্ণয় করিবার কয়েকটি অসুবিধা আছে। প্রথমত, কোন বৎসরকে ভিত্তি বৎসর বলিয়া ধরা হইবে ইহা ঠিক করা খুব সহজ নহে। কোন বৎসরে বা কোন সময়ে জিনিসপত্রের দাম মোটামুটিভাবে স্বাভাবিক আছে ইহার বিচার লইয়া যথেষ্ট মতভেদ হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, দেশের মধ্যে বহু প্রকারের দ্রব্য উৎপন্ন হয় ও কেনা-বেচা চলে ; সমস্ত জিনিসের দাম জানা ও হিসাব করা অসম্ভব। সেইজন্য বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি জিনিস ঠিক করিতে হয় এবং ইহাদের দামের হিসাব করা হয়। জিনিস ঠিকমত বাছিয়া লওয়া বেশ এক কঠিন সমস্যা। এমন সব জিনিস বাছিতে হইবে যাহাদের দ্বারা সকল শ্রেণীর লোকের ক্রয়ক্ষমতা পরিবর্তনের সঠিক হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর লোকে বিভিন্ন জিনিস কেনে। ধর, মাছ ও মাংসের দামের হিসাব ধরিয়া সূচকসংখ্যা তৈয়ারি করা হইল এবং শুধু ইহাদের দামের পরিবর্তনের জন্য সূচকসংখ্যাও ভিন্ন হইল। তাহা হইলে আমরা বলিব যে টাকার ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তন হইয়াছে। ইহা আমিষভোজীর পক্ষে সত্য হইতে

পারে। কিন্তু নিরামিষভোজীর নিকট টাকার ক্রয়ক্ষমতার কোন পরিবর্তন হয় নাই। কারণ অন্য জিনিসের দাম বাড়ে কমে নাই। ঠিক হিসাব পাইতে হইলে প্রত্যেক পরিবারের জন্য, এমন কি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, একটি আলাদা সূচকসংখ্যা তৈয়ারি করিতে হয়। কারণ প্রত্যেক পরিবারের এবং লোকের রুচি ভিন্ন। এমন কতকগুলি জিনিস খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত যাহা প্রায় সকলেই কেনে। ইহা ছাড়া ঠিকমত জিনিস বাছিয়া লইলেও ইহাদের গুণ যে কয়েক বৎসর পরেও সমান থাকিবে এমন কোন কথা নাই। ১৯২০ সালের ফোর্ড গাড়ি ও ১৯৫৭ সালের ফোর্ড গাড়ি হয়ত একই দামে বিক্রয় হইতে পারে। শুধু দামের কথা ধরিলে মুদ্রামূল্য সমান আছে বলিতে হইবে। কিন্তু ১৯৫৭ সালের গাড়ি যদি অনেক উন্নত ধরনের হয়, তবে আসলে মুদ্রামূল্য বেশি হইয়াছে বলিতে হইবে। দশ হাজার টাকায় ১৯২০ সালে যে ধরনের ফোর্ড গাড়ি পাওয়া যাইত, ১৯৫৭ সালে সেই টাকায় অনেক উন্নত ধরনের গাড়ি কেনা যাইতেছে। অর্থাৎ টাকার দাম আসলে বাড়িয়াছে।

আর একটি অসুবিধা এই যে, কয়েক বৎসর পরে লোকে হয়ত অন্য জিনিস কিনিতে পারে। অনেক পুরাতন জিনিসের চলন বন্ধ ও নূতন জিনিসের ব্যবহার হইতে পারে। পূর্বে সম্ভবত 'চা' কাহাকে বলে লোকে জানিত না। কিন্তু এখন সকলেই প্রাতঃকালীন চা পানে অভ্যস্ত হইয়াছে। পূর্বে যাহারা গাওয়া ঘি খাইত, এখন তাহারা বাধ্য হইয়া ভেজিটেবিল ঘি খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে। এ অবস্থায় সূচকসংখ্যার দ্বারা মুদ্রামূল্য পরিবর্তনের হিসাব পাওয়া যায় না। একটি পুরাতন জিনিসের পরিবর্তে নূতন জিনিস আমদানি হইলে আমাদের লাভ হইল কি ক্ষতি হইল, টাকার দাম বাড়িল না কমিল ইহা বলা মুস্কিল। দীর্ঘ সময়ের মুদ্রামূল্য পরিবর্তনের হিসাব করার কাজেও এইরূপ নানা অসুবিধা দেখা যায়।

সূচকসংখ্যা দ্বারা যদি টাকার ক্রয়ক্ষমতা ঠিকমত জানিতে হয়, তবে জিনিসগুলির দাম প্রত্যেক জিনিসের গুরুত্বসংখ্যা দ্বারা গুণ করিতে হইবে। যেমন ধর তামাকের গুরুত্ব যদি এক হয়, তবে চালের গুরুত্ব হয়ত চার হইবে। অর্থাৎ লোকে তামাক কিনিতে আয়ের যত অংশ ব্যয় করে চাল কিনিতে ইহার চার গুণ বেশি ব্যয় করে। এইভাবে প্রত্যেক জিনিসের

গুরুত্ব নির্ণয় করিতে হয়। কিন্তু এত বেশি জিনিসের প্রত্যেকটি গুরুত্ব নির্ণয় করা অতি কঠিন কাজ। ইহা ছাড়া যে কোন একটি জিনিসের গুরুত্ব বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের। আমেরিকায় মোটর গাড়ির যাহা গুরুত্ব এদেশে তাহা নহে। দ্বিতীয় অসুবিধা হইতেছে যে কালক্রমে জিনিসের গুরুত্বের পরিবর্তন হয়। আমাদের দেশে কয়েক বৎসর পূর্বেও চা-এর গুরুত্ব যাহা ছিল এখন ক্রমেই ইহা বাড়িতেছে। সুতরাং কিছু দিন অন্তর জিনিসের গুরুত্বের পরিবর্তন হইয়াছে কিনা দেখিতে হইবে ও তদনুযায়ী সূচকসংখ্যা নির্ণয় করিতে হইবে। ইহা করা মোটেই সহজ নহে।

সুতরাং সূচকসংখ্যার দ্বারা মুদ্রামূল্য পরিবর্তনের একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায় মাত্র। যে দুইটি বৎসরের তুলনা করা হয় ইহাদের মধ্যে ব্যবধান যত কম হয় ভুলের সম্ভাবনা তত কম। আর যত বেশি দূরের বৎসরের হিসাব নেওয়া হইবে ভুলের সম্ভাবনা তত বাড়িবে। কাছাকাছি সময়ে মানুষের রুচির তত পরিবর্তন হয় না, অথবা নূতন জিনিস আমদানি হয় না অথবা জিনিসের গুণেরও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না। অতএব পর পর দুই বৎসরের সূচকসংখ্যা হিসাব করিয়া মূল্য পরিবর্তনের পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টা যে ভ্রান্তিপূর্ণ একথা বলা চলে না।

Exercises

Q. 1. How do you measure changes in the value of money ? What are the main difficulties of such measurement ? (C. U. B. Com. 1957, 1951 ; B. A. 1957 ; Viswa. 1957, 1954).

Q. 2. What are index numbers ? Point out their usefulness. (C. U. 1955).

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

মুদ্রার পরিমাণ ও মুদ্রামূল্য

(The Quantity Theory and the Value of Money)

মুদ্রামূল্য কেন পরিবর্তিত হয়? কেন মূল্যস্তর কোন সময়ে বাড়ে আবার কোন সময়ে কমে? কয়েক শতাব্দী পূর্বে লেখকেরা মূল্যস্তর ও মুদ্রার পরিমাণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বলিয়াছেন। এই ধারণা ক্রমে বিস্তৃত হইয়া মুদ্রার পরিমাণতত্ত্ব নামে পরিচিত হইয়াছে।

মুদ্রার পরিমাণতত্ত্ব (Quantity theory of money) ঃ এই তত্ত্বে বলে যে মূল্যস্তরের পরিবর্তন মুদ্রার পরিমাণ কমবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। ধরা যাক সরকার প্রত্যেক নাগরিককে ৫০ টাকা করিয়া দান করিল। লোকে বেশি টাকা পাইয়া বেশি জিনিস কিনিতে চাহিবে। কিন্তু টাকা বাড়িয়াছে বলিয়া জিনিসের পরিমাণ বাড়িবে না। জিনিসের পরিমাণ না বাড়িয়া যদি বেশি পরিমাণ টাকার জিনিস কেনা হয় তবে জিনিসের দাম বাড়িবে। যত বেশি টাকা খরচ হইবে, জিনিসের পরিমাণ না বাড়িলে ইহাদের দাম তত বাড়িবে।

ইহা প্রমাণ করার জন্য এই তত্ত্বের সমর্থকেরা নিম্নলিখিত যুক্তির অবতারণা করেন। অন্যান্য জিনিসের মূল্যের মত দ্রব্যমূল্য মুদ্রার চাহিদা ও সরবরাহের দ্বারা নির্ণীত হয়। মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম। বেশি দ্রব্য বিনিময়ের জন্য বেশি মুদ্রার প্রয়োজন হয়। বাজারে বিক্রয়ের জন্য যে পরিমাণ পণ্য আসে তাহার উপর মুদ্রার চাহিদা নির্ভর করে। জিনিসের পরিমাণ কম বেশি হওয়া মোট উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। উৎপাদনের পরিমাণ উপকরণগুলির সরবরাহ দক্ষতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে, টাকার পরিমাণের উপর নহে। সুতরাং টাকার সংখ্যা বাড়িলেও উৎপাদনের পরিমাণ না বাড়িতে পারে। অর্থাৎ মুদ্রার সরবরাহ পরিবর্তিত হইলেও ইহার চাহিদা সমান থাকে। চাহিদা সমান থাকিলে মুদ্রার মূল্য মুদ্রার সরবরাহের দ্বারা স্থির হইবে। মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ হইলে মূল্যস্তরও দ্বিগুণ হয়।

মোট মুদ্রার পরিমাণ কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? বিক্রয়যোগ্য

পণ্য ক্রয় করার জন্য যে পরিমাণ টাকা ব্যবহার করা হয় ইহাই মুদ্রার মোট সরবরাহ। মোট টাকা, নোট এবং ব্যাঙ্কের আমানতের (bank deposit) পরিমাণ ও মোট মুদ্রার পরিমাণ এক নয়। একটি টাকা বেচাকেনার কাজে বহুবার ব্যবহার করা যায়। একটি টাকা বা নোট যতবার বেচা-কেনার কাজে ব্যবহার করা হয় ততই টাকার মোট সরবরাহ বাড়ে। এক সপ্তাহের মধ্যে একটি টাকা তিনবার ব্যবহৃত হইলে টাকার যোগান তিন টাকা বলিতে হইবে। নির্দিষ্ট সময়ে একটি টাকা যতবার হস্তান্তরিত হয় ইহাকে মুদ্রার গতিবেগ (velocity of circulation) বলে। সুতরাং মোট মুদ্রার পরিমাণ মুদ্রার মোট সংখ্যা ও মুদ্রার গড়পড়তা গতিবেগের গুণফলের সমান।

মোট মুদ্রার পরিমাণ যে হারে পরিবর্তিত হয়, মূল্যস্তরও সেই হারে পরিবর্তিত হয়। ইহাই আমেরিকান অধ্যাপক ফিসারের বিখ্যাত মুদ্রার পরিমাণতত্ত্ব। বিক্রেয় পণ্যের পরিমাণ অর্থাৎ মুদ্রার চাহিদা সমান থাকিলে মুদ্রার পরিমাণ যে অনুপাতে বাড়ে কমে মূল্যস্তরও সেই অনুপাতে বাড়িবে বা কমিবে। মুদ্রা বলিতে শুধু ধাতুমুদ্রা ও কাগজী নোট বুঝায় না। মুদ্রার গতিবেগের হিসাবও ধরিতে হইবে। মূল্যস্তরকে যদি P, মুদ্রার সংখ্যাকে M এবং মুদ্রার গতিবেগকে V বলা হয়, তবে—

$$P = \frac{MV}{T}$$

অর্থাৎ বাজারে যত টাকা চালু আছে ইহাকে মুদ্রার গতিবেগ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে মোট বেচা-কেনার পরিমাণ দিয়া ভাগ করিলে মূল্যস্তর কি জানা যাইবে।

কিন্তু সব দেশেই ধারেও কিছু কেনা-বেচা হয়। ব্যাঙ্কের চেক কাটিয়া জিনিসের কেনা-বেচা চলে। সুতরাং ব্যাঙ্কের আমানত এবং ইহার গতিবেগের হিসাবও মোট মুদ্রার সরবরাহের মধ্যে ধরিতে হইবে। Fisher নিম্নলিখিতভাবে তত্ত্বটি বলিলেন :

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

এখানে P হইতেছে মূল্যস্তর। M ধাতুমুদ্রা ও কাগজী নোটের পরিমাণ এবং V তাহাদের গতিবেগ ; M' ব্যাঙ্কে আমানতী টাকা, V' ইহার গতিবেগ

এবং T বিক্রেয় পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ। Fisher-এর মতে যখন শুধু মুদ্রার পরিমাণ পরিবর্তিত হয়, তখন T, V এবং V′ এর পরিবর্তন হয় না। T বা পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ মোট উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। মোট উৎপাদনের পরিমাণ আবার জমি, মূলধন, শ্রমিক প্রভৃতি উপকরণগুলির সরবরাহ এবং দক্ষতায় উপর নির্ভর করে। মুদ্রার পরিমাণ পরিবর্তিত হইলে জমি, মূলধন, শ্রমিকের সরবরাহ ও দক্ষতার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। সুতরাং যখন M পরিবর্তিত হয়, তখন T অর্থাৎ উৎপাদিত দ্রব্যের বা বেচাকেনা জিনিসের পরিমাণ একই থাকে; সাধারণত লোকের স্বভাব এবং ব্যবসায়-পদ্ধতির উপর মুদ্রার গতিবেগ নির্ভর করে। স্বভাব কিংবা ব্যবসায়পদ্ধতি সহসা বদলায় না, কিংবা টাকার কিছু কম-বেশি হওয়ার ফলে পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং টাকার পরিমাণ কমিলে বা বাড়িলে V এবং V′ সমান থাকে। T, V ও V′ যদি পরিবর্তিত না হয়, তবে মোট টাকার পরিমাণ যেভাবে বাড়িবে বা কমিবে, P অর্থাৎ মূল্যস্তর সেইরূপ বাড়িবে, কমিবে।

এই সমীকরণে দুইটি মূল কথা আছে। প্রথমত, মূল্যস্তর P শুধু মুদ্রার পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত হয়, অন্য কোন কারণে পরিবর্তিত হয় না। দ্বিতীয়ত, মুদ্রার পরিমাণ যে অনুপাতে বাড়ে কমে মূল্যস্তর ঠিক সেই অনুপাতে পরিবর্তিত হয়। Fisher-এর মতে ধাতুমুদ্রা ও কাগজী নোটের পরিমাণ এবং ব্যাঙ্কের আমানতের সহিত একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। ব্যাঙ্কের রিজার্ভে বা তহবিলে কত টাকা জমা আছে তাহার উপর ইহার আমানতের পরিমাণ নির্ভর করে। অর্থাৎ M ও M′ এর মধ্যেও নির্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমরা জানি যে টাকার পরিমাণ বদলাইলে V, V′ এবং T পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং M-এর পরিবর্তনের ফলে মূল্যস্তর একই অনুপাতে পরিবর্তিত হইবে। মুদ্রার পরিমাণ পরিবর্তিত হইলে মুদ্রার গতিবেগ অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ কোনদিন পরিবর্তিত হইবে না একথা Fisher বলেন না। কিন্তু, সে পরিবর্তন সাময়িক এবং অস্বাভাবিক। দীর্ঘ-সময়ে স্বাভাবিক অবস্থায় মুদ্রার পরিমাণ পরিবর্তিত হইলে ইহাদের পরিবর্তন হয় না ও ফলে মূল্যস্তর সমানুপাতে পরিবর্তিত হয়।

এই তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, টাকার পরিমাণ যখন বাড়ে কিম্বা কমে, তখন অন্যান্য জিনিসের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিবে। কিন্তু বাস্তব

জীবনে ইহা কম সময়েই ঘটে। টাকার পরিমাণের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জিনিসের উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিবর্তন হয়। কিন্তু অন্যান্য জিনিস পরিবর্তিত হইতে পারে বলিয়া এই তত্ত্বটি ভুল, একথা বলিবার কোন যুক্তি নাই। এইরূপ অবশ্যই ঘটে কিনা এখন তাহাই দেখিতে হইবে। Fisher বলিয়াছেন যে মুদ্রার গতিবেগ ও পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ মোট মুদ্রার পরিমাণ এবং মূল্যস্তরের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ মুদ্রার ও মূল্যস্তর যদি বাড়ে বা কমে, দ্রব্যের উৎপাদন ও মুদ্রার গতিবেগ ইহাতে সাধারণ অবস্থায় অপরিবর্তিত থাকিবে। কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে মুদ্রার গতিবেগ ও মূল্যস্তরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। মূল্যস্তর যখন বেশি হারে বাড়িতে থাকে তখন মুদ্রার গতিবেগও বাড়িতে দেখা যায়।

পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনও মূল্যস্তরের পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। যখন জিনিসপত্রের দাম বাড়ে তখন ব্যবসায়ীরা বেশি লাভ করে ও উৎপাদন-বৃদ্ধির চেষ্টা করে। আবার জিনিসপত্রের দাম নামিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের লোকসান হয় এবং তাহারা উৎপাদন কমাইতে থাকে। সুতরাং মূল্যস্তরের উঠানামার উপর উৎপাদনের পরিমাণ অনেক সময়েই নির্ভর করে। মুদ্রার পরিমাণ ও উৎপাদন এবং মূল্যস্তরের পরিবর্তনের হার দ্বারা প্রভাবিত হয়। যখন উৎপাদনবৃদ্ধি পায় কিংবা মূল্যস্তর বাড়ে অর্থাৎ জিনিসপত্রের দাম বাড়ে তখন বেশি টাকার প্রয়োজন হয়। ফলে দেশের মধ্যে টাকার প্রচলন বাড়ে। অধ্যাপক ফিসার অবশ্য এই সমস্ত কথা অস্বীকার করেন না। তবে তিনি বলেন যে এইরূপ যাহা ঘটে তাহা সাময়িক ও অল্পকালীন। দীর্ঘদিনের কথা চিন্তা করিলে দেখা যাইবে উৎপাদনের পরিমাণ টাকার বা মূল্যস্তরের উপর নির্ভর করে না,—উৎপাদনের উপকরণ ও ইহাদের দক্ষতা ও সরবরাহের উপর নির্ভর করে। কেবলমাত্র উৎপাদনের উপকরণগুলির দক্ষতা ও যোগানের পরিবর্তন হইলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ ভিন্ন হইবে। কিন্তু ইহা টাকার-পরিমাণ বা মূল্যস্তরের দ্বারা নির্ণীত হয় না। সুতরাং দীর্ঘদিনের কথা ভাবিলে V, V^1 ও T টাকার পরিমাণ বা মূল্যস্তরের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে না। ফিসারের এই কথা হয়ত অনেকটা সত্য হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ দীর্ঘকালীন তত্ত্বালোচনায় লাভ কি? দীর্ঘকালে আমরা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইব—Keynes-এর এই কথা এখানে খুব

খাটে। টাকার দাম দীর্ঘকালে কি দাঁড়াইবে—ইহা লইয়া আমরা আপাতত মাথা ঘামাইতেছি না। অল্প কয়েক মাসের মধ্যে টাকার মূল্য কেন এত কমিল—ইহাই আমাদের আলোচ্য বিষয় এবং এখানে অধ্যাপক ফিসারের তত্ত্ব আমাদের খুব বেশি কাজে লাগে না।

অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে মুদ্রায় পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও মূল্যস্তর বাড়ে নাই,—বরং কমিয়াছে। ১৯৩২ সালের পরে দু'তিন বৎসর এইরূপ ঘটিয়াছিল। মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলে মূল্যস্তর যদিও বা বাড়ে তবুও দেখা যায় যে ইহা খুব কম সময়েই সমান অনুপাতে পরিবর্তিত হয়। মুদ্রার প্রচলন দ্বিগুণ হইলে মূল্যস্তর কদাচিৎ দ্বিগুণ হয়। যখন দেশে অনেক লোক বেকার বসিয়া থাকে তখন মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন বাড়িতে পারে। ফলে পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ বাড়িবে ও মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি সত্ত্বেও মূল্যস্তর না-ও বাড়িতে পারে। সুতরাং মুদ্রার পরিমাণ ও মূল্যস্তর সমানুপাতে বাড়িবে একথা জোর করিয়া বলা যায় না।

মুদ্রার পরিমাণতত্ত্ব ও পূর্ণনিয়োগ (Quantity theory of money and full-employment): মুদ্রার পরিমাণতত্ত্বে বলে যে দেশের মধ্যে মোট মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে। একথা সব সময়ে ঠিক নহে। বহু লোক যদি বেকার বসিয়া থাকে সে সময়ে সরকার কাগজী নোট ছাপাইয়া বেকারদের কাজ দিবার উদ্দেশ্যে নানাভাবে ব্যয় করিতে পারে। ফলে দেশের মধ্যে মুদ্রার সরবরাহ বাড়িবে। তাহা হইলে কি জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে? ইহা না হইবার সম্ভাবনাই বেশি। সরকারের ব্যয়বৃদ্ধির ফলে বহু লোকের আয় বাড়িবে। আয় বাড়িলে ব্যয় বাড়ে—অর্থাৎ লোকে বেশি জিনিস কিনিতে চাহিবে। জিনিসের চাহিদা বাড়িলে ব্যবসায়ীরা উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। বহু লোক বেকার বসিয়া আছে বলিয়া ইহা সহজেই করা সম্ভব হইবে। কারণ বেকার লোকদের কাজে লাগাইয়া জিনিসের উৎপাদন বৃদ্ধি করা চলিবে। চাহিদা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হইতেছে বলিয়া জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা কম থাকিবে। কাজেই দেশে যখন বহু লোক বেকার থাকে ও তাহাদের কাজে লাগাইয়া, সহজেই জিনিসপত্রের উৎপাদনবৃদ্ধি করা যায় তখন মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলে মূল্যবৃদ্ধি হইবে না। অবশ্য জিনিসের উৎপাদন বাড়াইতে

গেলে যদি ইহাদের উৎপাদনব্যয় কিছু কিছু বাড়ে—অর্থাৎ জিনিসের উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম অনুযায়ী হয়—তবে উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে কিছু মূল্যবৃদ্ধি হইতেও পারে।

এইভাবে চলিলে ক্রমে প্রায় সমস্ত বেকার লোকই কর্মে নিযুক্ত হইবে ও দেশের মধ্যে পূর্ণনিয়োগ অবস্থা বর্তমান হইবে। সকলেই যখন কাজ করিতেছে, তখন নূতন লোক লাগাইয়া আর উৎপাদনবৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে না। উৎপাদন সম্বন্ধে আমরা ইংরাজীতে যাহাকে ceiling (বা ছাদ) বলে সেখানে পৌঁছিয়াছি। পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় পৌঁছিবার পর আর উৎপাদনবৃদ্ধি হইবে না। ইহার পরেও সরকার যদি কাগজী নোট ছাপাইয়া বাজারে চালু করিতে থাকে ও তাহার ফলে মোট মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া যায়—তবে লোকের আয় ও ব্যয় বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু জিনিসের উৎপাদন আর বাড়ান সম্ভব নয়। মোট উৎপাদন যদি একই থাকে এবং সেই অবস্থায় টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যায় তবে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি হইবে। এই অবস্থায় মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইবে। কাজেই পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় মুদ্রার পরিমাণতত্ত্ব বহাল হইবে একথা বলা চলে। অন্য সময়ে অর্থাৎ পূর্ণনিয়োগের পূর্বাবস্থায় ইহা বহাল না থাকিবার সম্ভাবনাই বেশি। যখন মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলে উৎপাদনবৃদ্ধি হইতে পারে তখন মূল্য নাও বাড়িতে পারে। বরং মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা খুবই কম আছে বলা চলে। কিন্তু পূর্ণনিয়োগে পৌঁছিলে—অর্থাৎ প্রায় সকলেই কাজে নিযুক্ত আছে এই অবস্থা আসিলে—মুদ্রার পরিমাণবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন বাড়িবে না, মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে।

সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও মূল্যস্তর (Saving, Investment and Price-level) ঃ কোন কোন লেখকের মতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্কের উপর মূল্যস্তর নির্ভর করে। ধরা, একজন লোক মাসে মাসে কিছু টাকা আয় করে। সে সব টাকা খরচ করিতে পারে, অথবা কিছু খরচ করিয়া কিছু সঞ্চয় করিতে পারে। দেশের সকল লোক মিলিয়া যাহা সঞ্চয় করে, তাহাই মোট সঞ্চয়। মোট আয় হইতে ভোগ্যদ্রব্যের জন্য মোট ব্যয় বাদ দিলে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ জানা যায়। যদি সকলে বেশি সঞ্চয় করিবে বলিয়া স্থির করে, তবে ভোগ্যদ্রব্যের জন্য ব্যয় কম হইবে। ধরা যাক,

মোট আয়ের পরিমাণ ১০০০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে লোকে ২০০ কোটি টাকা সঞ্চয় করিত এবং ৮০০ কোটি টাকা ভোগ্যদ্রব্যের জন্য ব্যয় করিত। যদি সঞ্চয়ের ইচ্ছা বাড়ে, তবে সকলে মিলিয়া, ধর, ৩০০ কোটি টাকা সঞ্চয় করিবে। অতএব ভোগ্যদ্রব্যের জন্য তাহার ৮০০ কোটির স্থলে ৭০০ কোটি টাকা খরচ করিবে। ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন যদি সমান থাকে, তবে ভোগ্যদ্রব্যের দাম কমিয়া যাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িলে মূল্যস্তর নিম্নগামী হইবে।

বিনিয়োগ বাড়িলে বা কমিলে মূল্যস্তর কিভাবে প্রভাবান্বিত হইবে ইহা এখন আলোচনা করা যাক। সাধারণ অর্থে বিনিয়োগ বলিতে জমিজমা, শেয়ার, সরকারী ঋণপত্র প্রভৃতি কেনা বোঝায়। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে বিনিয়োগ শব্দটিতে আমরা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উৎপাদনের সহায়ক দ্রব্যাদি ক্রয়ে ব্যয় করা বুঝি।

বিনিয়োগবৃদ্ধির অর্থ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মূলধন সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি। একজনের ব্যয় অন্যের বা অন্যদের আয়। বাড়িতে ঠাকুর-চাকরকে যে বেতন দেওয়া হয় তাহা গৃহস্বামীর ব্যয়, কিন্তু ঠাকুরচাকরের আয়। সুতরাং এক শ্রেণীর ব্যয় বাড়িলে অপরের আয় বাড়িবে। বিনিয়োগব্যয় বাড়িলে যন্ত্রপাতি প্রভৃতির বিক্রয় বাড়ে এবং ফলে এই জিনিসগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ইহাদের উৎপাদনে বেশি লোক নিযুক্ত হয় ও ফলে তাহাদের আয় বাড়ে। সুতরাং বিনিয়োগবৃদ্ধির অর্থ মোট আয়বৃদ্ধি।

বিনিয়োগ ব্যয়বৃদ্ধির ফলে মূল্যস্তর কিভাবে প্রভাবান্বিত হইবে? সঞ্চয়ের -পরিমাণ বাড়িলে আয় কমে ও ভোগ্যদ্রব্যের মূল্যস্তর নিম্নমুখী হয়। কিন্তু বিনিয়োগ বাড়িলে যে মূল্যস্তর বাড়িবে ইহা সব সময়ে বলা চলে না। দেশের মধ্যে যদি অনেক লোক বেকার বসিয়া থাকে, তবে বিনিয়োগবৃদ্ধির ফলে তাহারা অনেকে নূতন কাজ পাইবে। বিনিয়োগ বাড়িলে যন্ত্রপাতির বিক্রয় বাড়িবে এবং ইহা বেশি উৎপাদনের চেষ্টা হইবে। উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে হইলে নূতন লোক নিযুক্ত করিতে হইবে। এই লোকেরা নিজেদের উপার্জন প্রয়োজনমত ব্যয় করিবে। ফলে, ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা ও উৎপাদন বাড়িবে এবং তাহাতেও নূতন লোক নিযুক্ত হইবে। এইভাবে

নূতন নূতন লোক লাগাইয়া উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হইলে জিনিসপত্রের মূল্যস্তর না-ও চড়িতে পারে। বিনিয়োগব্যয় বৃদ্ধির জন্য বেশি লোক নিযুক্ত হইবে। তাহাতে মোট আয় বাড়ে, ব্যয়ও বাড়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি উৎপাদনের পরিমাণও বাড়ে, তবে দাম একই থাকিবার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু ক্রমে লোক নিযুক্ত হইতে হইতে পূর্ণনিয়োগের অবস্থা হইবে। অর্থাৎ কর্মপ্রার্থী লোক প্রায় সকলেই কাজ পাইবে। ইহার পর আর উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হইবে না। পূর্ণনিয়োগের অবস্থায় পৌঁছিবার পরও যদি বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়া চলে তবে উৎপাদন বাড়ান যায় না বলিয়া মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইবে।

Exercises

Q. 1. Describe the principal factors which may affect the purchasing power of money. (Viswa. 1956 ; C. U. B. Com. 1951, 1952).

Q. 2. Trace the relation between the price level and the quantity of money. (Viswa. 1954).

Q. 3. "The value of money, like the value of anything else, is mainly a question of demand and supply". Elucidate.

ঊনবিংশ অধ্যায়

জাতীয় আয়

(The National Income)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে মূল্যস্তরের পরিবর্তন (অথবা মুদ্রামূল্যের পরিবর্তন) নিয়োগ ও উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তনের সহিত জড়িত। সুতরাং যে সকল বিষয়ের উপর নিয়োগ ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে তাহাদের বাদ দিয়া মূল্যস্তরের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব নহে। কারণ এই বিষয়গুলি পরিবর্তনের ফলে মূল্যস্তরও পরিবর্তিত হয়। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা মোট নিযোগ ও উৎপাদন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা ফার্মের উৎপাদন ক্রেতার চাহিদা ইত্যাদি আলোচনা করিয়াছি। অর্থশাস্ত্রের এই অংশের নাম **micro-economics**। কিন্তু বর্তমানে আমরা যে অংশ আলোচনা করিব এই অংশ নিয়োগ, উৎপাদন, মুদ্রার মোট প্রচলন ইত্যাদির সম্মিলিত ফলের সহিত জড়িত। তাই এই অংশকে সামগ্রিক বা **macro-economics** বলা হয়।

অর্থশাস্ত্রের এই অংশে আমরা একটি বিশেষ সংজ্ঞা সামগ্রিক উৎপাদন (aggregate output) প্রায়ই ব্যবহার করিব। এই সামগ্রিক উৎপাদনের পরিমাণ কি ভাবে নির্ণীত অথবা পরিমাপ করা হয় বর্তমান অধ্যায়ে আমরা তাহাই আলোচনা করিব। কোন দেশের সর্বপ্রকার উৎপাদনের সামগ্রিক রূপকেই সেই দেশের জাতীয় আয় বলে।

জাতীয় আয় কাহাকে বলে ? (Definition) **:** দেশের লোক জমি চাষ করিয়া, খনিজ-পদার্থ তুলিয়া ও কলকারখানায় কাজ করিয়া প্রতি বৎসর বহু প্রকারের দ্রব্য উৎপাদন করে। প্রতি বৎসর খাদ্যশস্য, অন্যান্য শস্য, কয়লা, লৌহ, ইস্পাত, কাপড়, জামা, জুতা ইত্যাদি বহু প্রকারের জিনিস দেশে উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত জিনিসের সমষ্টি আমাদের জাতীয় আয়। কিন্তু এক কোটি মণ ধান পাট, এক লক্ষ টন ইস্পাত, ৫০০ কোটি গজ কাপড় প্রভৃতির সমষ্টি কি ভাবে করা যায় ? একই জিনিস হইলে

তাহা যোগ দেওয়া যায়। কিন্তু এক মণ ধান, এক টন লোহা, একশ গজ কাপড়—ইহাদের কি ভাবে যোগ দেওয়া যায়? সহজ উপায় হইতেছে এই দ্রব্যগুলির মূল্য যোগ দেওয়া। বৎসরে যত প্রকারের জিনিস তৈয়ারি হইতেছে ইহাদের পরিমাণ ও মূল্য যোগ দিয়া জাতীয় আয় নির্ণয় করা হয়। অবশ্য এই দ্রব্যগুলির মধ্যে কেবলমাত্র বাস্তব পদার্থ ধরা হয় না। চিকিৎসকের রুগী দেখিবার পরিশ্রম, শিক্ষকের শিক্ষা দিবার শ্রম প্রভৃতি কর্ম বা সার্ভিসেস্‌ও জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হয়। বৎসরে যে নানাজাতীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয় ও নানা শ্রেণীর কর্ম করা হয়, ইহাদের মূল্যসমষ্টিকে জাতীয় আয় বলে।

জাতীয় আয় নির্ণয়পদ্ধতি (How to measure the national income?): জাতীয় আয় দুই প্রকারে নির্ণয় করা যায়। প্রথমত, কাজে নিযুক্ত লোকেরা বৎসরে যে অর্থ উপার্জন করে ইহা যোগ দিলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। অর্থাৎ, শ্রমিক, জমির মালিক, পুঁজিদার ও ব্যবসায়ীদের মোট আয়ের সমষ্টি হইতেছে জাতীয় আয়। সব শ্রমিকের মজুরী, জমির মালিকের প্রাপ্য খাজনা, পুঁজিদারের প্রাপ্য সুদ ও মালিকদের লাভ এই সমস্ত যোগ দিলে জাতীয় আয় জানা যায়।

আর এক পদ্ধতিতে জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। বৎসরে যত ধান, গম প্রভৃতি শস্য,—কয়লা, অভ্র প্রভৃতি খনিজ পদার্থ,—লৌহ, ইস্পাত, বস্ত্র প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, ইহাদের মূল্যও এই সব দ্রব্যের উৎপাদনে লিপ্ত লোক ছাড়া অন্যান্য লোকের কাজের মোট দাম যোগ দিলে আয়ের পরিমাণ জানা যাইবে। প্রথম পদ্ধতিতে আয়-সমষ্টির পদ্ধতি (National Income Total) ও দ্বিতীয়টিকে দ্রব্য-সমষ্টির পদ্ধতি (National Product Total) বলা চলে। এই দুইটি পদ্ধতির বিশদ আলোচনা করা যাক। প্রথমে দ্বিতীয় পদ্ধতি লইয়া আলোচনা শুরু করা হইতেছে।

মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product): যত প্রকারের কৃষিজাত দ্রব্য, খনিজ পদার্থ ও শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয় ও নানা ধরনের কর্ম করা হয় তাহাদের মূল্য যোগ দিলে মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। ইংরাজীতে ইহাকে অনেক সময়েই সংক্ষেপে GNP বলে।

এই হিসাবের সময় একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে। একই জিনিস যাহাতে দুইবার হিসাবে ধরা না হয় সে বিষয়ে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। যেমন একটি বই-এর দাম ১০৲ ও তাহা হিসাবে ধরা হইল। বইটি ছাপাইতে ২৲ টাকা দামের কাগজ লাগিয়াছে। এই কাগজের দাম আবার আলাদা করিয়া হিসাবে ধরিলে ভুল করা হইবে। কারণ, কাগজের দাম বই-এর দামের মধ্যেই ধরা আছে। বই-এর দাম ১০৲ টাকা ও কাগজের দাম ২৲ টাকা আলাদা আলাদা করিয়া যোগ দিলে একই জিনিস (অর্থাৎ কাগজের মূল্য) দুইবার হিসাব করা হইবে। সেইজন্য মোট জাতীয় উৎপাদনের হিসাবের সময় শুধু সম্পূর্ণ দ্রব্যগুলির (final goods) অর্থাৎ যাহা অন্য দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় না ইহাদের মূল্য ধরিতে হইবে। যাহা অন্য দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাহা অসম্পূর্ণ দ্রব্য। যে জিনিস অন্য দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় নাই তাহাকেই সম্পূর্ণ দ্রব্য বলিয়া ধরা হয়। বই ছাপার ব্যবহৃত কাগজ অসম্পূর্ণ দ্রব্য। এখানে বই সম্পূর্ণ দ্রব্য। কিন্তু ছাত্রদের লেখাপড়ায় ব্যবহৃত কাগজের মূল্য জাতীয় উৎপাদনের হিসাবে ধরিতে হইবে। কারণ তাহা অসম্পূর্ণ দ্রব্য নহে—সম্পূর্ণ দ্রব্য। ইহার দাম অন্য কিছুর মধ্যে ধরা হয় নাই। অসম্পূর্ণ দ্রব্যগুলি, যেমন রুটি তৈয়ারির আটা, ময়দা, মোটর গাড়ির লোহা ও ইস্পাত, জুতা সেলাই-এর কাঁচা চামড়া, ইস্পাত তৈয়ারিতে ব্যবহৃত কয়লা প্রভৃতি জাতীয় আয়ের হিসাব ধরা হয় না। কারণ রুটির দাম, গাড়ির দাম ও ইস্পাতের দামের মধ্যে ইহাদের দাম ধরা হইয়া গিয়াছে। মোট জাতীয় উৎপাদনের হিসাবে কেবলমাত্র সেই জিনিসগুলির দাম ধরিতে হইবে যাহা অন্য জিনিসের উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় নাই। দ্বিতীয়ত, উৎপন্ন জিনিসগুলি বিক্রয় হইয়া গেলে হিসাবে তাহাদের বাজার মূল্য ধরা হইবে। আর বৎসরের মধ্যে যদি বিক্রয় না হয় তবে সেই জিনিসের উৎপাদনব্যয় ধরা হইবে।

নীট জাতীয় উৎপাদন (Net National Product): মোট জাতীয় উৎপাদন কি ভাবে নির্ণয় করা হয় তাহা এইমাত্র বলা হইল। বৎসরে যত শস্য, খনিজ পদার্থ, শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয় ও অন্যান্য কর্ম করা হয় ইহাদের মূল্য সমষ্টি হইল মোট জাতীয় উৎপাদন। কিন্তু যথার্থ হিসাব করিতে হইলে মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে কিছু কিছু জিনিস বাদ দিয়া

ধরা উচিত। যেমন, কৃষক যত ধান উৎপাদন করে তাহা সমস্তই সে আয়ের মধ্যে ধরে না। আগামী বৎসরের জন্য বীজ ধান ইহা হইতে আলাদা করিয়া রাখিতে হইবে। বাকী ধান তাহার আয় হিসাবে ধরা চলে অর্থাৎ বৎসরে এই পরিমাণ ধান বিক্রয়ের টাকা সে খরচ করিতে পারে। বৎসরের উৎপন্ন দ্রব্য হইতে যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি (depreciation) বাবদ হিসাবমত অর্থ সব কোম্পানীকেই আলাদা করিয়া রাখিতে হয়। মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে সেইরূপ যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি ও ব্যবহার কাঁচামালের দাম বাবদ টাকা বাদ দিলে নীট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ জানা যায়। ইংরাজীতে ইহাকে সংক্ষেপে N N P বলে। G N P হইতে যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি ও কাঁচামালের বাবদ অর্থ বাদ দিলে N N P নির্ণীত হয়।

সাধারণ ভাবে নীট জাতীয় উৎপাদনের সমষ্টিকেই জাতীয় আয় বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু কখনও কখনও মোট জাতীয় উৎপাদনের হিসাবেরও প্রয়োজন আছে। যেমন যুদ্ধের সময় বা এইরূপ অতি বিপদের সময় মোট জাতীয় উৎপাদনের হিসাবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তখন সমস্ত শক্তি ও সম্পদ্ যুদ্ধে জয়লাভ বা বিপদে উদ্ধারের জন্য প্রয়োগ করিতে হইবে। কড়াক্রান্তির চুলচেরা হিসাব করিবার সময় তখন নাই। ঘরবাড়ি বৎসর বৎসর ঠিকমত মেরামত না করিলে ভবিষ্যতে ক্ষতি হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধের সময় ঘর সারানোর কাজ বন্ধ রাখিয়া সেই লোক ও অর্থ যুদ্ধ জয়ের কাজে লাগান আরো বেশি প্রয়োজন। যুদ্ধে পরাজয়ের ক্ষতি দু'চার বৎসর ঘর মেরামত না করার ক্ষতি অপেক্ষা অনেক বড়। এ ছাড়াও যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা ও সেই বাবদ কত অর্থ বাদ দেওয়া উচিত হইবে ইহার হিসাব করা অনেক সময়েই সহজ হয় না। সেইজন্য নীট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ হিসাব করা কঠিন বলিয়া অনেকে মোট জাতীয় উৎপাদনের হিসাব লইয়া সন্তুষ্ট থাকেন।

আয়সমষ্টির পদ্ধতি (National Income Total) : মোট জাতীয় উৎপাদন জমি, মূলধন, শ্রমিক প্রভৃতি বিভিন্ন উৎপাদনের উপকরণের সহযোগে তৈয়ারি হয়। আবার এই সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা এই উপকরণগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত শ্রমিকেরা বেতন পায়; জমির মালিককে খাজনা

দেওয়া হয়, পুঁজিদার সুদ নেয় ও ব্যবসায়ের পরিচালকেরা লাভ বা লোকসান করে। সুতরাং বেতন, খাজনা, সুদ ও লাভ বাবদ প্রাপ্ত সমস্ত অর্থের যোগফলকে জাতীয় আয় বলা হয়। এই পদ্ধতিতেও জাতীয় আয় নির্ধারণ করা যায়।

ঠিকমত হিসাব ধরিলে দুই পদ্ধতিতে নির্ধারিত জাতীয় আয়ের পরিমাণ একই হওয়া উচিত। কারণ জিনিস উৎপাদন করিয়া বা কাজ করিয়াই শ্রমিকেরা বেতন পায়, পরিচালক লাভ করে। তবে কয়েকটি বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। প্রথমত, আয়সমষ্টির পদ্ধতিতে নির্ণীত জাতীয় আয়ের মধ্যে এমন লোকের আয় ধরা উচিত নয় যে কোন জিনিসই উৎপাদন করে না, বা কোন কাজ করে না। সব দেশেই এই শ্রেণীর কিছু কিছু লোক থাকে যেমন, সরকার উদ্বাস্তুদের যে অর্থ সাহায্য করে ইহা তাহাদের আয় বলিয়া গণ্য হয় বটে, কিন্তু বিনিময়ে উদ্বাস্তুরা কোন কাজ করে না বলিয়া তাহাদের আয় জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত হইবে না। এই ধরনের আয়, অর্থাৎ যাহা কোন জিনিস উৎপাদন করিয়া হয় না, বা আয়ের পরিবর্তে কোন কাজ করা হয় না, ইংরাজীতে transfer earnings বলিয়া পরিচিত। জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে ইহা বাদ না দিলে দুই পদ্ধতিতে নির্ণীত জাতীয় আয় এক হইবে না।

দ্বিতীয়ত, কোন কাজ না করিয়াও যেমন আয় হয়, তেমনি কাজের বদলে প্রাপ্য সম্পূর্ণ আয় সব সময়ে বিতরণ করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ যৌথ কোম্পানীর কথা ধরা যাক। টাটা কোম্পানী লোহা ও ইস্পাত বিক্রয় করিয়া বৎসরে যে টাকা লাভ করে তাহা সমস্তই অংশীদারদের মধ্যে বিতরণ করা হয় না। লাভের একটি অংশ রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা রাখা হয়। আবার যৌথ কোম্পানীর লাভের উপর কর ধার্য করিয়া সরকার আগেই লাভের কিছু অংশ আদায় করিয়া নেয়। কাজেই অংশীদারগণ লভ্যাংশ বাবদ যে আয় করে ইহা ছাড়াও গচ্ছিত তহবিলে নেওয়া লাভের অংশ ও সরকার কর বসাইয়া লাভের যে অংশ লইয়াছে তাহা, জাতীয় আয়ের হিসাবে যোগ দিতে হইবে। অর্থাৎ যৌথ কোম্পানীগুলির মোট লাভের সমস্তই জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে। ইহা ছাড়া আরো কতকগুলি বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। যেমন, বাড়িওয়ালা নিজে যে বাড়িতে বাস

করে, সেই বাড়ির আনুমানিক বার্ষিক ভাড়া জাতীয় আয়ের হিসাবে ধরিতে হইবে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জাতীয় আয়ের হিসাবে ধরা হয়—(১) শ্রমিকের মজুরী ও ভাতা, (২) যাহারা নিজের বাড়িতে বাস করে তাহাদের বাড়ির আনুমানিক ভাড়া সহ বাড়ি ভাড়া ও জমির খাজনা, (৩) মূলধনের নীট সুদ (৪) ব্যবসায়ের নীট লাভ (কৃষক প্রভৃতি একক ব্যবসায়ের লাভ. সমস্ত অংশীদারী কারবারের লাভ, যৌথ কোম্পানীর সমস্ত লাভ), (৫) উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি পেশাদার ব্যক্তির আয় ইত্যাদি। এইভাবে মজুরী, খাজনা, সুদ ও লাভের যোগফল দিয়া যে জাতীয় আয় নির্ধারিত হয় তাহা নীট জাতীয় উৎপাদনের সমান হইবে। ধরা যাক, কতকগুলি জিনিসের উৎপাদনব্যয় মোট ১,০০,০০০৲ টাকা। এই টাকা মজুরী, খাজনা, সুদ ও লাভ বাবদ উপকরণগুলিকে দেওয়া হইয়াছে। সরকার এই জিনিসগুলির উপর ১০,০০০৲ টাকার উৎপাদনকর ধার্য করিয়াছে। ফলে, জিনিসগুলির বাজারদর ১,১০,০০০৲ টাকা হইয়াছে। নীট জাতীয় উৎপাদন উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার দর হিসাব করিয়া ঠিক করা হয়। এ ক্ষেত্রে নীট জাতীয় উৎপাদন হইতেছে ১,১০,০০০৲ টাকা। অথচ উপকরণগুলির আয়ের ভিত্তিতে নির্ণীত জাতীয় আয়ের পরিমাণ হইতেছে মাত্র ১,০০,০০০ টাকা। সুতরাং জাতীয় আয় নীট জাতীয় উৎপাদন হইতে কম হইতেছে। কিন্তু সরকার উৎপাদন কর বসাইয়া যে টাকা আদায় করিতেছে তাহা বাদ দিলে জাতীয় আয় নীট জাতীয় উৎপাদনের সমান হইবে। কাজেই নীট জাতীয় উৎপাদন হইতে পরোক্ষ কর বাদ দিলে তবে জাতীয় আয়ের সমান হয়। সুতরাং হিসাব এইরূপ দাঁড়াইল :—

মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)—ক্ষয়ক্ষতি (depreciation) বাবদ ধার্য অর্থ = নীট জাতীয় উৎপাদন (NNP).

নীট জাতীয় উৎপাদন (NNP)—পরোক্ষকর = জাতীয় আয় অর্থাৎ উপকরণগুলির আয়ের যোগফল (National income at factor cost).

সুতরাং দুইটির মধ্যে যে কোন পদ্ধতিতেই জাতীয় আয় নির্ধারণের চেষ্টা করা যায়, ঠিকমত হিসাব ধরিলে একই ফল পাওয়া যাইবে। বৎসরে যত

রকমের দ্রব্য উৎপন্ন হয় ও যত কাজ ও পরিশ্রম করা হয় ইহাদের বাজার দরের সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলে। ইহা হইতে ক্ষয়ক্ষতি (depreciation) বাবদ ন্যায্য টাকা বাদ দিলে নীট জাতীয় উৎপাদন নির্ণীত হয়। আবার ইহা হইতে পরোক্ষকর বাবদ প্রদত্ত অর্থ বাদ দিলে যাহা থাকিবে তাহাকে এক কথায় জাতীয় আয় বলে। এই জাতীয় আয় হইতেই আবার শ্রমিক মজুরী পায়, জমির মালিক খাজনা নেয়, মূলধনের মালিক সুদ পায় ও কারবারী লোকের লাভের টাকা আসে। কাজেই সমস্ত শ্রমিকের মজুরী, মালিকের খাজনা, পুঁজিপতির সুদ ও কারবারীর লাভ ঠিকমত যোগ দিলেও জাতীয় আয় নির্ধারণ করা যাইবে। যে পথেই যাওয়া যাক—ভুলভ্রান্তি না করিলে ঠিকই রোমে পৌঁছান যাইবে।

ব্যক্তিগত আয় ও ডিসপোসেবল আয়ঃ জাতীয় আয় সম্পর্কে আরও দুইটি বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে যথা, ব্যক্তিগত আয় এবং ডিসপোসেবল আয়। লোকেরা নানাভাবে যে টাকা উপার্জন করে তাহা তাহাদের ব্যক্তিগত আয় (Personal Income)। উৎপাদনের উপকরণ-গুলির আয়ের সহিত ইহার দুইটি পার্থক্য বর্তমান। প্রথমত, সরকার যাহাদের অর্থ সাহায্য করে, যেমন উদ্বাস্তুদের, ইহা তাহাদের ব্যক্তিগত আয় বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু তাহা উৎপাদনের উপকরণগুলির আয়ের অংশ নয়। কারণ উদ্বাস্তুরা কোন কাজ না করিয়াই এই টাকা পায়। কোন দ্রব্য উৎপাদনের বিনিময়ে যে টাকা পাওয়া যায় কেবলমাত্র তাহাই জাতীয় আয়ে যোগ করা হয়। দ্বিতীয়ত, যৌথ কোম্পানীগুলির যে লভ্যাংশ বণ্টন করা হয় না তাহা ব্যক্তিগত আয় হইতে বাদ দেওয়া হয়, কিন্তু জাতীয় আয়ের হিসাবে ধরা হয়।

ব্যক্তিগত আয়ের সমস্তই ব্যয় করা যায় না। কারণ আয়ের পরিমাণ কিছু বাড়িলেই সরকারকে আয়কর ও অন্য প্রত্যক্ষ কর দিতে হয়। প্রত্যক্ষ কর দেওয়ার পর যে টাকা লোকের হাতে অবশিষ্ট থাকে তাহাকে ইংরাজীতে ডিসপোসেবল আয় (Disposable income) বলে। ব্যক্তিগত আয় হইতে প্রত্যক্ষ কর বাবদ দেয় অর্থ বাদ দিলে এই আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ের সম্পর্ক আলোচনা করার জন্য ডিসপোসেবল আয়ের হিসাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই আয়ের অধিকাংশ

ভোগ্যবস্তুর জন্য ব্যয় হয়, বাকী সঞ্চিত হয়। সুতরাং ব্যয় ও সঞ্চয়ের যোগফলের সহিত ইহা সমান। অর্থাৎ

ডিসপোসেবল আয় (Disposable Income) = ভোগের জন্য ব্যয় (C) + সঞ্চয় (S)।

উক্ত বিষয়গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক : এখন আমরা মোট জাতীয় উৎপাদন (G N P), নীট জাতীয় উৎপাদন (N N P), উপকরণ-গুলির মূল্যের হিসাবে নির্ধারিত নীট জাতীয় উৎপাদন, ব্যক্তিগত আয় ও ডিসপোসেবল আয়ের সম্পর্ক কি তাহা আলোচনা করিতে পারি।

G N P = খাজনা + সুদ + মজুরী + সমিতিবদ্ধ হয় নাই এমন সব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লাভ + লভ্যাংশ + অবন্টিত লাভ + সমিতির উপর ধার্য কর + প্রত্যক্ষ কর + পরোক্ষ কর + ক্ষয়ক্ষতি − সাহায্য বা দানের জন্য ব্যয়।

N N P (বাজার মূল্য) = G N P − ক্ষয়ক্ষতি (depreciation)।

N N P (উপকরণ মূল্য) = G N P − ক্ষয়ক্ষতি − পরোক্ষ কর।

ব্যক্তিগত আয় = N N P (উপকরণ মূল্য) + সাহায্য বা দানলব্ধ অর্থ − অবন্টিত লাভ − সমিতির উপর ধার্য কর = G N P + হস্তান্তরিত ব্যয় = (ক্ষয়ক্ষতি + পরোক্ষ কর + সমিতির উপর ধার্য কর + অবন্টিত লাভ)।

ডিসপোসেবল আয় = N N P (উপকরণ মূল্য) + সাহায্য বা দানলব্ধ অর্থ − (অবন্টিত লাভ + সমিতির উপর ধার্য কর + প্রত্যক্ষ-কর) = G N P + সাহায্য বা দানলব্ধ অর্থ = (ক্ষয়ক্ষতি + অবন্টিত লাভ + সমিতির উপর ধার্য কর + প্রত্যক্ষ কর + পরোক্ষ কর)।

জাতীয় আয় আলোচনার গুরুত্ব (Importance of the concept of national income) **:** জাতীয় আয় সম্বন্ধে আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। গড়পড়তা জাতীয় আয়ের পরিমাণ হইতে সেই দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান কিরূপ তাহা অনেকটা আঁচ করা যায়। অর্থশাস্ত্রের বহু বিষয়ের আলোচনা জাতীয় আয়ের পরিমাণ ও বণ্টনের পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়। জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান আলোচনা করিয়া আমরা জানিতে পারি

যে দেশের অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কিনা, সঞ্চয়ের সঙ্গে মূলধন নিয়োগের সমতা আছে কিনা ইত্যাদি। আজকাল প্রায় সমস্ত দেশেই সরকার, জাতীয় আয় বাড়াকমার পরিসংখ্যান আলোচনা করিয়া বাজেট ঠিক করে। কোন সময়ে ব্যবসায় মন্দার ফলে যদি জাতীয় আয় নিম্নমুখী হয় তবে বাজেট এমন ভাবে তৈয়ারি করা উচিত, যাহার ফলে, জাতীয় আয়ের নিম্নগতি বন্ধ হয় এবং সেই হিসাব করিয়া কর ধার্য করিতে হইবে ও ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। আমাদের দেশে প্লানিং বা পরিকল্পনার ফলে লোকের অবস্থা কতটুকু উন্নতি হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য প্লানিং কমিসন প্রতি বৎসরই জাতীয় আয়ের হিসাব করিয়া দেখিতেছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয় বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কি হারে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে তাহা এই সমস্ত দেশের জাতীয় আয় হিসাব করিয়া ঠিক করার চেষ্টা হইতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অর্থশাস্ত্রের বহু বিভাগেই জাতীয় আয় সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে। দেশের লোক সারা বৎসর পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উৎপাদন করে তাহাই আমাদের জাতীয় আয়। ইহাই আবার সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় এবং আমরা প্রত্যেকে যে, যে অংশ পাই তাহাই আমাদের ব্যক্তিগত আয়। ইহার উপরেই আমাদের জীবনযাত্রা নির্ভর করে। সুতরাং জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়িতেছে না কমিতেছে, ইহার বণ্টনব্যবস্থা পূর্বের চেয়েও সমভাবে বা অসমভাবে করা হইতেছে,—এই সম্বন্ধে আলোচনার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। ইহার সহিত আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সুখদুঃখ, হাসিকান্না বহুল পরিমাণে জড়িত আছে।

জাতীয় আয় গণনার সমস্যা (Problem of National Income Determination): কয়েক বৎসর হইল জাতীয় আয় নির্ধারণের দিকে বিভিন্ন সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান দৃষ্টি দিতেছেন। এ বিষয়ে প্রথম অসুবিধা হইতেছে যে উপযুক্ত তথ্যের অভাব। দেশের মধ্যে মোট কত শস্য উৎপন্ন হয়, কত বিভিন্ন প্রকারের শিল্পদ্রব্য তৈয়ারি হয়—এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য খুব কম দেশেই আছে। যে সমস্ত দেশে এই সব বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে, তাহাও প্রায়শই অসম্পূর্ণ ও সেরকম নির্ভরযোগ্য নহে। সেইজন্য বহু বিষয়েই অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয় ও ফলে জাতীয়

আয়ের তথ্য ভুলে ভরা থাকে। যেমন, আমাদের দেশে খুব কম সংখ্যক লোকই আয়কর দেয় এবং যাহারা দেয় তাহারাই ঠিকমত আয়ের রিটার্ণ দেয় না। প্রায় ক্ষেত্রেই নিজের আয় কম করিয়া দেখান থাকে। এই ত যাহারা আয়কর দেয় তাহাদের কথা। কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোকই আয়কর দেয় না এবং তাহাদের আয় কি সে সম্বন্ধে কোন কিছুই আমাদের জানা নাই। বাড়ি ভাড়া বাবদ কত টাকা আয় হয় ইহাও আমরা জানি না। কাজেই জাতীয় আয় নির্ধারণে আমাদের অনেক গোঁজামিল দিতে হইয়াছে।

নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব ছাড়াও অন্য অনেক বিষয়ে নানা সমস্যা আছে। কোন জিনিস জাতীয় আয়ের গণনার মধ্যে ধরিব কিনা এবং কি ভাবে ধরিব এই বিষয়ে মতভেদ আছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান বিষয়ের আলোচনা নীচে দেওয়া গেল।

জাতীয় আয় নির্ধারণে সরকারী আয়ব্যয় (Government accounts in national income calculations): জাতীয় আয়ের পরিমাণ দুই প্রকারে নির্ণয় করা যায়। প্রথম, দেশে যত দ্রব্য উৎপন্ন হয় ইহাদের মূল্য যোগ দিয়া এবং দ্বিতীয়, সমস্ত শ্রমিক, জমি, মূলধন ও ব্যবসায়ের মালিকের আয়ের হিসাব করিয়া। যে প্রকারের হউক, জাতীয় আয়ের হিসাবের সময় নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। ইহার মধ্যে সরকারী আয়ব্যয়ের হিসাবের সমস্যা অন্যতম। জনসাধারণের উপর কর ধার্য করিয়া সরকার রাজস্ব সংগ্রহ করে ও তাহা নানা প্রকারের দ্রব্য কিনিয়া ব্যয় করে। যদি দ্বিতীয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হয়, তবে সরকারী রাজস্ব সরকারের আয় হিসাবে ইহার মধ্যে ধরা হইবে কি? আর উৎপাদনের উপর ধার্য করলব্ধ আয় কোন হিসাবে ধরা হইবে—কর দিবার পূর্বের আয় না কর দেওয়ার পরে যে আয় তাহাদের হাতে থাকে তাহা? আর যদি প্রথম পদ্ধতিতে জাতীয় আয়ের গণনা করা হয়, তবে সরকার যে জিনিসগুলি কেনে তাহা কি সমস্তই জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হইবে? সরকারের বিভিন্ন বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুত সমস্ত জিনিসই কি সম্পূর্ণ দ্রব্য বলিয়া ধরা উচিত হইবে?

কর ধার্য করিয়া সরকার যে রাজস্ব আদায় করে তাহা জাতীয় আয়ের হিসাবে ধরা সম্বন্ধে দুই মত আছে। আমেরিকান লেখক কুজনেট্‌স্

বলিয়াছেন যে, যে সমস্ত কর উপকরণগুলির আয়ের উপর ধার্য করা হয় ও আয় হইতে দেওয়া হয় কেবলমাত্র সেই করলব্ধ রাজস্ব জাতীয় আয়ের হিসাবে গোনা হইবে। পরোক্ষ কর (যেমন বিক্রয় কর, উৎপাদনশুল্ক প্রভৃতি) উপকরণগুলির আয়ের উপর বসান হয় না, দ্রব্যের উপর বসান হয়। সুতরাং তাহা জাতীয় আয়ের হিসাবে ধরা হইবে না। কিন্তু আয়কর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করলব্ধ অর্থ সমস্তই জাতীয় আয়ে ধরা হইবে। কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধেও অনেক কথা বলা চলে। আমরা যদি কুজনেট্সের মত গ্রহণ করি তবে কোন্ করটি প্রত্যক্ষ ও কোনটি পরোক্ষ, প্রথমে তাহা ঠিক করিতে হইবে। অর্থাৎ কোন্ কর আয় হইতে দেওয়া হয় ও কোন্টি হয় না তাহা জানিতে হইবে। কিন্তু কি ভাবে করভার একজনের ঘাড় হইতে অন্যের ঘাড়ে চালান যায় সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এত সীমাবদ্ধ যে, বিভিন্ন করের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য করা সম্ভব হয় না। সুতরাং কুজনেট্সের মত গ্রহণ করিলে জাতীয় আয়ের হিসাব করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। হয় সমস্ত করলব্ধ অর্থই বাদ দিতে হয়, কিংবা সবই যোগ করিতে হয়। তবে সমস্ত কর বাদ দিলে সরকার যেসব সম্পূর্ণ জিনিস উৎপাদন করে তাহার হিসাব জাতীয় আয়ের মধ্যে গণনা করিতে হইবে। আর যদি করলব্ধ অর্থ বাদ দেওয়া না হয় তবে সরকার যে সব অসম্পূর্ণ জিনিস (intermediate goods) ক্রয় করে ইহার দাম বাদ দিতে হইবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জাতীয় আয়ঃ দেশের মধ্যে উৎপন্ন কিছু পণ্য বিদেশীয়দের হইতে পারে, আবার দেশের কোন কোন লোক বিদেশ হইতে আয় করিতে পারে। সুতরাং জাতীয় আয়ের হিসাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লগ্নীর হিসাব ধরিতে হইবে। ভারতবর্ষ হইতে কিছু টাকা যদি ইংরাজেরা লভ্যাংশ স্বরূপ পায়, তবে তাহা ইংলণ্ডের জাতীয় আয়ের অংশ, ভারতের নয়। যে জিনিস রপ্তানি করি তাহা জাতীয় উৎপাদনের অংশ; আর যে সব জিনিস আমদানি করি তাহা বিদেশের জাতীয় আয়ের অংশ। সুতরাং জাতীয় আয়ের হিসাবে আমদানি, রপ্তানি এবং বিদেশের সঙ্গে টাকা আদান-প্রদান ইত্যাদির কথা ধরিতে হইবে। দেশের লোকের নিকট হইতে বিদেশীরা কিছু সম্পত্তি কিনিলে তাহা আমরা জাতীয় আয়ের হিসাবে বাদ দিইনা। ধর, কোন বিদেশী দিল্লীতে একটি বাড়ি কিনিল এবং ভারতীয়

ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা হইতে তাহার দাম দিল। ইহাতে জাতীয় আয়ের হিসাব পরিবর্তনের কোন দরকার নাই। তত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে এইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু জিনিসটি আমদানি অথবা রপ্তানি না হইলে সাধারণত জাতীয় আয়ের হিসাবে ইহাকে ধরা হয় না। আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের পার্থক্যকে জাতীয় আয়ের হিসাবে ধরা হয়। আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশি হইলে সেই উদ্বৃত্ত টাকা বিদেশে লগ্নী বলিয়া ধরা হয় এবং রপ্তানি যদি কম হয় তবে সেই কম্‌তি টাকা আয় হইতে বাদ দেওয়া হয়।

জাতীয় আয় বিশ্লেষণ করিতে গেলে এরকম অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। অর্থশাস্ত্রীরা এ বিষয়ে চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন নাই।

সামাজিক হিসাবনিকাশ (Social accounting)**ঃ** জাতীয় আয়ের হিসাবের উপর ভিত্তি করিয়া সামাজিক হিসাবনিকাশ নির্ণয়ের চেষ্টা আজকাল প্রায় সব দেশেই করা হইতেছে। যৌথকোম্পানী যেমন উদ্বৃত্ত হিসাবের তালিকা অথবা লাভক্ষতির তালিকা তৈয়ারি করে তেমন সমস্ত দেশের বা জাতিরও এইরূপ হিসাব তৈয়ারি করা যায়। এই সামাজিক হিসাব-নিকাশ নানাভাবে বিচার করিয়া দেখা যায়। যেমন আমরা মজুরী, সুদ, খাজনা ইত্যাদি বাবদ দেশের সমস্ত লোক কত আয় করিতেছে, একদিকে ইহার হিসাব তৈয়ারি করিতে পারি। আবার অন্য দিকে লোকেদের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ও সঞ্চয়ের হিসাবের তালিকাও প্রস্তুত করা যায়। এই দুই তালিকায় মিল হওয়া উচিত। কারণ লোকে যাহা আয় করে ইহা হয় ভোগদ্রব্য কিনিতে ব্যয় করে, নচেৎ সঞ্চয় করে। সুতরাং মোট ব্যক্তিগত আয়ের হিসাবও মোট ব্যক্তিগত ব্যয় ও সঞ্চয়ের যোগফল একই হওয়া উচিত। না হইলে বুঝিতে হইবে যে কোথায়ও হিসাবে গরমিল রহিয়াছে। আবার আর একটি তালিকা করিয়া দেখা যাইতে পারে ব্যক্তিগত সঞ্চয় যৌথ-কোম্পানীগুলির সঞ্চয় এবং বিভিন্ন সরকারের ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং নূতন বাড়িঘর, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সম্পত্তি বৃদ্ধির পরিমাণ সমান হইতেছে কিনা। তাহা না হইলে আবার নূতন করিয়া হিসাব দেখিতে হইবে। কারণ মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ মোট সম্পত্তি বৃদ্ধির সমান হইবে। অনেক সময়ে বৈদেশিক লেনদেনের হিসাবের তালিকাও প্রস্তুত

করা হয়। এই তালিকায় আমরা বিদেশ হইতে বৎসরে কত অর্থ পাইব ও কত অর্থ আমাদের দিতে হইবে ইহার নির্ভুল হিসাব করা হয়।

এই সব নানা ধরনের হিসাবের তালিকাকে সামাজিক হিসাবনিকাশ বলা হয়। এই বিভিন্ন তালিকা দ্বারা আমার হিসাব ঠিক হইতেছে কি না ইহা পরখ করিতে পারি। যেমন ব্যক্তিগত আয় ও ব্যয়ের তালিকা হইতে যে সঞ্চয়ের হিসাব পাইতেছি ইহার সহিত মোট সঞ্চয় ও সম্পত্তি বৃদ্ধির তালিকা মিলিতেছে কি না ইহা পরীক্ষা করা যায়। ইহার ফলে হিসাবের ভুল কম হইবার সম্ভাবনা। সামাজিক হিসাবনিকাশের তালিকায় দেশের অর্থনৈতিক বিশেষ পরিবর্তনের ছবি প্রতিভাত হয়।

Exercises

Q. 1. "Most of the major problems in economics involve the conception of the National Income and an understanding of the factors governing it." Examine the statement. (C. U. B. Com. 1953).

Q. 2. How do you define and measure the national income of a country ? (C. U. B. Com. 1959, 1956).

Q. 3. Examine the importance of the concept of national income in the study of economics. (Viswa. 1956).

Q. 4. Write short notes on social accounting. (C. U. B. Com. 1957).

ত্রিংশ অধ্যায়

নিয়োগতত্ত্ব

(The Theory of Employment)

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে জাতীয় আয় নির্ধারণের পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা নিয়োগতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিব। দেশের মধ্যে যত লোক কর্মানুসন্ধী তাহাদের মধ্যে কত লোক নিযুক্ত আছে তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে কখন কিছু সংখ্যক লোক বেকার বসিয়া আছে। আবার প্রায় সকলেই কোন না কোন কর্মে নিযুক্ত আছে। এইরূপ কর্মে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা কখনও কম আবার কখনও বেশি হয় কেন এবং কি কি বিষয়ের উপর নিয়োগাবস্থা নির্ভর করে তাহাই বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

বিভিন্ন ধরনের কর্মে কত লোক নিযুক্ত থাকিবে ইহা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? প্রথমে যে কোন কারখানার কথা ধরা যাক। এই কারখানায় কতজন লোক নিযুক্ত করা হইবে তাহা মালিক কি কি বিষয়ের কথা চিন্তা করিয়া ঠিক করে? উৎপাদন বেশি কি কম করা হইবে প্রধানত এই কথা ভাবিয়াই মালিক ঠিক করে যে বেশি কি কম লোক নিযুক্ত করা হইবে। উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে বেশি লোকের প্রয়োজন। উৎপাদন কম বেশি করা হইবে ইহা নির্ভর করে জিনিসটির চাহিদার উপর। মালিক যে জিনিস তৈয়ারি করিতেছে যদি তাহার চাহিদা বাড়ে তবে বেশি উৎপাদনের প্রয়োজন হয়। লোকে জিনিসটি বেশি পরিমাণে কিনিতে চাওয়ার অর্থ তাহারা ইহার জন্য বেশি অর্থব্যয় করিতে রাজী আছে। লোকে জিনিসটি বা জিনিসগুলি কিনিবার জন্য কত অর্থব্যয় করিতে রাজী আছে ইহার উপর চাহিদা নির্ভর করে। চাহিদার উপর উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে এবং উৎপাদনের পরিমাণের উপর কম বেশি নিয়োগের সংখ্যা নির্ভর করে। সমস্ত দ্রব্যের বেলাতেও একই কথা খাটে। মোট সমস্ত দ্রব্যের চাহিদা সবরকম ক্রেতাদের মোট ব্যয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। সুতরাং মোট কত লোক কাজে নিযুক্ত থাকিবে, দেশে

পূর্ণনিয়োগ হইবে না অনেক লোক বেকার বসিয়া থাকিবে—ইহা নির্ভর করিতেছে দেশের জনসাধারণ দ্রব্যাদি ক্রয়ে কত অর্থব্যয় করিতেছে ইহার উপর। দেশের সমস্ত কর্মপ্রার্থী লোক যদি কাজে নিযুক্ত থাকে তবে যে পরিমাণ দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইবে ইহা কিনিবার খরিদ্দার যদি পাওয়া যায় তবে মালিকেরা সকল কর্মপ্রার্থীকেই কাজ দিবে এবং দেশে পূর্ণনিয়োগ অবস্থা বহাল থাকিবে। আবার যদি সব জিনিসের খরিদ্দার না পাওয়া যায় তবে অনেক জিনিস তৈয়ারি হইবে না এবং মালিকেরা কম সংখ্যক লোককে কাজ দিবে। ফলে দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়িবে।

সুতরাং নিয়োগ কম বেশি হওয়া নির্ভর করিতেছে লোকেদের মোট অর্থব্যয়ের পরিমাণের উপর। মোট অর্থব্যয় বলিতে কি বুঝায়? ক্রেতারা বহু প্রকারের দ্রব্য কিনিতে অর্থব্যয় করে। এই দ্রব্যগুলিকে সাধারণভাবে দুইশ্রেণীতে ভাগ করা হয়। সাধারণ লোকে চাল ডাল গম মাছ মাংস কাপড় জামা প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু ক্রয়ে অর্থব্যয় করে। এই ধরনের সমস্ত জিনিস ক্রয়ে যে অর্থব্যয় হয় তাহার সমষ্টিকে ভোগ্যব্যয় বলা হয়। আবার ব্যবসায়ীরা নানা প্রকারের যন্ত্র কাঁচামাল ইত্যাদি ক্রয়ে অর্থ বিনিয়োগ করে। এই শ্রেণীর ব্যয়ের সমষ্টিকে বিনিয়োগব্যয় বলা হয়। মোট ব্যয়ের পরিমাণকে এইভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—ভোগ্যব্যয় ও বিনিয়োগব্যয়। সাধারণ ব্যবসায়ী অথবা মালিকেরা যন্ত্রাদি ক্রয়ে ও কারখানার কাজে যে অর্থব্যয় করে ইহার সমষ্টিকে বেসরকারী বিনিয়োগব্যয় বলে। প্রায় সব দেশেই সরকারও নানা ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করে। ইহার সমষ্টিকে সরকারী বিনিয়োগব্যয় বলে। দেশে যে যে দ্রব্য প্রস্তুত হয় ইহার সমস্তই দেশের মধ্যে বিক্রীত হয় না। ইহার এক অংশ বিদেশে রপ্তানি করা হয় এবং বৈদেশিক ক্রেতারা ইহা কেনে। রপ্তানি দ্রব্যের মূল্যসমষ্টিকে বৈদেশিক বিনিয়োগব্যয় বলা হয়। সুতরাং মোট ব্যয়ের পরিমাণ মোট ভোগ্যব্যয়, বেসরকারী বিনিয়োগব্যয়, সরকারী বিনিয়োগব্যয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগব্যয়ের সমান।* মোট ব্যয়ের পরিমাণ কখনও বেশি কখনও কম আবার কখনও ঠিক হয় কেন ইহার কারণ জানিতে হইলে এই বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যয়ের বিষয় আলোচনা করিতে হইবে।

ভোগব্যয় (Consumption) : চাল-ডাল মাছ-মাংস জামা-কাপড় তেল-সাবান প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু ক্রয়ে যে অর্থ ব্যয় হয় ইহার সমষ্টিকে মোট ভোগব্যয় বলা হয়। মোট ভোগব্যয়ের পরিমাণ কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? ইহা প্রধানত লোকের আয়ের দ্বারা নির্ণীত হয়। অধিকাংশ পরিবার ভোগ্যদ্রব্যব্যয়ে কত টাকা খরচ করিবে ইহা তাহাদের আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। সাধারণভাবে বলা যায় যে প্রায় সকল পরিবারেই আয়ের অধিক অংশ ভোগ্যদ্রব্যক্রয়ে ব্যয় করে এবং আয় বাড়িলে তাহারা ভোগ্যদ্রব্যক্রয়ে পূর্বাপেক্ষা অধিক অর্থব্যয় করে। আয় বাড়িলে ভোগব্যয়ের পরিমাণও বাড়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে আয় যে পরিমাণ বাড়িতেছে ভোগব্যয়ের পরিমাণ তুলনায় কম বাড়িতেছে। অর্থাৎ কোন পরিবারের মাসিক আয় যদি ৫০৲ টাকা করিয়া বাড়ে সেই পরিবার ইহার সব টাকাই ভোগ্যদ্রব্যক্রয়ে ব্যয় করে না। হয়ত ভোগ্যদ্রব্যক্রয়ে পরিবারটি এখন ৪০৲ টাকা বেশি ব্যয় করিতেছে। বাকী দশ টাকা সঞ্চয় করিতেছে।

ভোগ্যব্যয়ের পরিমাণ মোট আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। মোট আয়ের সংখ্যাকে মোট ভোগ্যব্যয়ের সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে যে আনুপাতিক সংখ্যা পাওয়া যায় ইহাকে ভোগ্যব্যয়ের প্রবণতা (Propensity to consume) আখ্যা দেওয়া হয়।

$$\text{ভোগ্যব্যয়ের প্রবণতা} = \frac{\text{মোট আয়}}{\text{মোট ভোগব্যয়}}$$

ইহাকে **কনসাম্পসন ফাঙ্কসন** বা **ভোগঅপেক্ষক**ও বলা হয়। ভোগঅপেক্ষক কত ইহা জানা থাকিলে আমরা যে কোন সময়ে মোট আয়ের পরিমাণ হইতে ভোগ্যব্যয়ের পরিমাণ কত হইবে তাহা বলিতে পারি। ধরা যাক, আমরা জানি যে লোকেরা তাহাদের আয়ের গড়পড়তা ৮০ ভাগ ভোগ্যদ্রব্যক্রয়ে ব্যয় করে। অবশ্য ইহার অর্থ এই নহে যে সকল পরিবারই তাহাদের আয়ের ৮০ ভাগ ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় করে। বহু পরিবারের লোকই আয়ের প্রায় সকল অংশই সংসার চালাইতে ব্যয় করিতে বাধ্য হয়। অনেকে দেনা করিয়া সংসার চালায়। আবার ধনীদের অনেকেই আয়ের অধিকাংশও ভোগ্যদ্রব্যক্রয়ে ব্যয় করে না।

ধনী দরিদ্র কৃপণ, অকৃপণ সকল রকমের পরিবারের গড়পড়তা হিসাব ধরিলে হয়ত দেখা যায় যে ভোগব্যয়ের পরিমাণ মোট আয়ের ৮০ ভাগের বেশি হইতেছে না। যদি ভারতের জাতীয় আয় ১২০০৲ কোটি টাকা হয় তবে আমরা বলিতে পারি যে ভোগব্যয়ের পরিমাণ ৯৬০৲ কোটি টাকা হইবে।

$$\left(\frac{১২০০৲ \times ৮০}{১০০}\right)$$
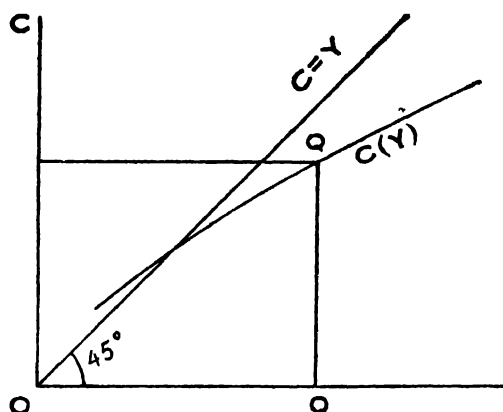
ভোগব্যয়প্রবণতা রেখা

ভোগব্যয়ের প্রবণতা রেখাচিত্রে দেখান যায়। উপরের রেখাচিত্রের OY অক্ষে আয়ের পরিমাণ এবং OC অক্ষে ভোগব্যয়ের পরিমাণ মাপা হইতেছে। কেন্দ্র O হইতে ৪৫ ডিগ্রি মাপ করিয়া একটি রেখা টানা হউক। আয়ের সম্পূর্ণ টাকাই ভোগব্যয়ে খরচ করা হয়—এই অবস্থা এই রেখার দ্বারা সূচিত হইতেছে। এই রেখার যে কোন বিন্দু হইতে OY অক্ষে এবং OC অক্ষে দুইটি লাইন টানিলে দেখা যাইবে যে দুইটি রেখাই সমান। অর্থাৎ আয় যাহাই হউক না কেন, সমস্তই ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হইতেছে। সাধারণত তাহা হয় না। আয়ের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পায়, ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়ের পরিমাণ সমান সমান বাড়ে না, বরঞ্চ ক্রমেই কম হারে বাড়ে। ইহা উপরোক্ত রেখা চিত্রে C(Y) লাইনে দেখান হইতেছে। C(Y) লাইনটি ভোগব্যয় প্রবণতার রেখা। এই রেখার Q বিন্দু হইতে একটি OY

কক্ষের দিকে ও আর একটি OC অক্ষের দিকে লাইন টানা হউক। যখন আয়ের পরিমাণ OQ এর সমান, তখন ভোগ্যদ্রব্যক্রয়ে ব্যয় হইতেছে QQ পরিমাণ অর্থ। QQ লাইন OQ লাইন হইতে ছোট। অর্থাৎ আয়ের সমস্ত অংশই ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হইতেছে না, কিছু অংশ সঞ্চিত হইতেছে। আয় যত বাড়ে, সঞ্চয়ের পরিমাণ সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। সেইজন্য C.Y) রেখা (আয় = ভোগব্যয়) রেখার নীচে অবস্থিত থাকে।

ভোগব্যয়ের প্রবণতা বা ভোগঅপেক্ষক মোট আয় ছাড়া অন্য কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? প্রথমত, আয় বণ্টনব্যবস্থার উপরেও এবিষয় কিছুটা নির্ভর করে। যাহাদের আয় কম তাহারা তাহাদের আয়ের প্রায় সব টুকুই সংসার প্রতিপালনে ব্যয় করিতে বাধ্য হয়। আবার ধনীরা গরিবদের তুলনায় আয়ের কম অংশই ভোগ্যদ্রব্যক্রয়ে ব্যয় করে। দেশের মধ্যে আয় বণ্টনব্যবস্থা যদি বর্তমান অপেক্ষা কম অসম হয়,—অর্থাৎ গরিব মধ্যবিত্ত ধনীর পার্থক্য কমিয়া যায়—তবে মোট ভোগব্যয়ের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু ধনী যদি আরো ধনী এবং গরিব আরো গরিব হয়, তবে ভোগব্যয়ের প্রবণতা কমিয়া যাইবে। সরকার যদি ধনীর উপর উচ্চহারে কর বসায় ও করলব্ধরাজস্ব গরিব মধ্যবিত্তদের জন্য ব্যয় করে, তবে ধনীদের আয় কমিবে ও অন্যদের আয় বাড়িবে। ফলে ভোগব্যয়ের প্রবণতা বাড়িবে। সুতরাং ভোগব্যয়ের প্রবণতা করের হার এবং কি কি ধরনের কর বসান হইতেছে ইহার উপরেও অনেকটা নির্ভর করে। সাধারণভাবে বলা যায় যে বিক্রয়কর ও উৎপাদনশুল্কের বোঝা গরিব মধ্যবিত্তদের উপর যতটুকু পড়ে ধনীদের স্কন্ধে ততটুকু নহে। অর্থাৎ এই কর দেওয়ার ফলে গরিব মধ্যবিত্তের আয় যে পরিমাণে কমে, ধনীদের আয় তাহার চেয়ে অনেক কম পরিমাণে কমে। সুতরাং এই ধরনের কর বেশি ধার্য করা হইলে ভোগব্যয়ের প্রবণতা যতটুকু কমিবে, শুধু আয়কর বা উত্তরাধিকার করের ফলে ইহা অপেক্ষা কম পরিমাণ কমিবে।

ভোগব্যয়ের প্রবণতা লোকের সঞ্চয় প্রবৃত্তির উপরও কিছুটা নির্ভর করে। সঞ্চয়ের স্পৃহা বাড়িলে ভোগব্যয়ের প্রবণতা কমে। এই সঙ্গে কথা আসে যে সুদের হারের সহিত ভোগব্যয়ের প্রবণতার কোন সম্বন্ধ আছে কি? সুদের হার যদি বাড়ে তবে কি সঞ্চয়ের স্পৃহা বাড়ে? যদি

তাহা হয়, তবে ভোগব্যয়ের প্রবণতা কমিবে। এই সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রীরা এখনও একমত হইতে পারেন নাই। অনেকের মতে সুদের হারের সহিত ভোগব্যয়ের প্রবণতা (বা সঞ্চয়স্পৃহা)-র কোন সম্বন্ধ নাই। আবার অন্য লোকেরা বলিয়াছেন যে সুদের হার বাড়িলে সঞ্চয়স্পৃহা বাড়ে।

ভোগব্যয়ের প্রবণতার সহিত কি সম্পত্তির মালিকানার কোন সম্বন্ধ আছে? অনেকের মত এই যে যাহার অনেক সম্পত্তি আছে (যেমন বাড়ি, কোম্পানীর কাগজ, যৌথকোম্পানীর শেয়ার ইত্যাদি) তাহাদের সঞ্চয়ের প্রয়োজন কম। কিন্তু যাহাদের বিশেষ কোন সম্পত্তি নাই তাহাদিগকে আয়ের বেশি অংশ সঞ্চয় করিতে হয়। যে পরিবারের নিজের বাড়ি আছে এবং মাসে এক হাজার টাকা আয় তাহারা ভোগ্যদ্রব্যক্রয়ে যত টাকা ব্যয় করিতে পারে। সেই পরিমাণ টাকা অন্য একটি হাজার টাকা রোজগারী পরিবারের পক্ষে ব্যয় করা সম্ভব হয় না যদি সেই পরিবারের বাড়ি না থাকে। প্রথম পরিবারকে বাড়ি করার টাকা জমাইতে হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় পরিবারকে তাহা করিতে হইবে। সম্পত্তিবিশিষ্ট লোক তাহার আয়ের যত অংশ ভোগ্যদ্রব্যক্রয়ে ব্যয় করিতে পারে সম্পত্তিবিহীন লোকের পক্ষে তাহা করা সম্ভব হয় না।

বিভিন্ন পরিবারের ভোগব্যয়ের প্রবণতা নানা বিষয়ের দ্বারা নির্ণীত হয়—মাসিক বা বাৎসরিক আয়, করভার, সঞ্চয়প্রবৃত্তি, সম্পত্তির পরিমাণ, সুদের হার ইত্যাদি। ভোগব্যয়ের প্রবণতা সাধারণত পরিবারের লোকের প্রয়োজন ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। আয়ের এবং মূল্যের বেশি পরিবর্তন না হইলে লোকেরা মাসের পর মাস একই রকমের ও পরিমাণের জিনিস কেনে। সেই জন্য অনেক অর্থশাস্ত্রীর মত যে ভোগব্যয়ের প্রবণতার পরিবর্তন বিশেষ হয় না। আয়ের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, গড়পড়তা ভোগব্যয়ের প্রবণতা মোটামুটি একই থাকে। অর্থাৎ আয় বাড়িলে কোন পরিবার প্রথম প্রথম হয়ত অতিরিক্ত আয়ের কম পরিমাণ অংশ ভোগ্যদ্রব্যক্রয়ে খরচ করিতে পারে। কিন্তু ক্রমশ ইহার পূর্বাভ্যাস ফিরিয়া আসিবে এবং কিছুদিন পরে দেখা যাইবে যে এই পরিবারটি পূর্বের অনুপাতেই আয়ের নির্দিষ্ট অংশ ভোগ্যদ্রব্যক্রয়ে ব্যয় করিতেছে।

আমরা এতক্ষণ গড়পড়তা ভোগব্যয়ের প্রবণতার বিষয় আলোচনা

করিতেছিলাম। এখন ভোগব্যয়ের প্রান্তিক প্রবণতার কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। কোন লোকের মাসিক আয় যদি, ধর, ৫০৲ টাকা করিয়া বাড়ে, তবে দেখা যাইবে যে তাহার ভোগব্যয়ের পরিমাণ ৪০৲ টাকা বাড়িয়াছে। অতিরিক্ত আয়ের যে অংশ ভোগ্যদ্রব্যক্রয়ে ব্যয় করা হয় তাহাকে ভোগ-ব্যয়ের প্রান্তিক প্রবণতা (marginal propensity to consume) বলা হয়। যদি বলা হয় যে ভোগব্যয়ের প্রান্তিক প্রবণতা শতকরা ৮০ ভাগ, তবে ইহার দ্বারা এই জানা যায় যে কোন পরিবারের আয় ১০০৲ টাকা বাড়িলে, সেই পরিবারের লোক ভোগ্যদ্রব্যক্রয়ে অতিরিক্ত ৮০৲টাকা ব্যয় করিবে। ভোগ-ব্যয়ের প্রান্তিক প্রবণতার বিষয় আলোচনার সার্থকতা নীচে বলা হইতেছে।

গুণক (multiplier): যদি কোন কারণে একটি পরিবারের মাসিক আয় ১০০৲ টাকা বাড়িয়া থাকে, এবং ভোগব্যয়ের প্রান্তিক প্রবণতা যদি শতকরা ৮০ হয়, তবে এই পরিবারের লোক ভোগ্যদ্রব্যব্যয়ে ৮০৲ টাকা বেশি খরচ করিবে। ব্যাপার এইখানেই শেষ হয় না। এই পরিবারটি পূর্বাপেক্ষা ৮০৲টাকার বেশি জিনিস কিনিতেছে। ফলে জিনিসগুলির বিক্রেতা বা উৎপাদকদের আয় ৮০৲ টাকা বাড়িবে। একজনের যাহা ব্যয় অন্যের তাহা আয়। সুতরাং কোন পরিবারের ব্যয় বাড়িলে অন্যদের আয় বাড়িবে। ধরা যাক যে প্রথম পরিবারটির ব্যয়বৃদ্ধির ফলে জিনিসবিক্রেতাদের আয় ৮০৲ টাকা বাড়িয়াছে। প্রত্যেক লোকই আয় বাড়াইলে ব্যয় বাড়াইবে এবং তাহাদের ভোগব্যয়ের প্রান্তিক প্রবণতা যদি প্রথম পরিবারের ন্যায়ই হয় তবে প্রথমোক্ত জিনিস বিক্রেতাদের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৬৪৲ (৮০ × $\frac{৮০}{১০০}$) টাকা বাড়িবে। ইহারা যে জিনিস কিনিতেছে তাহার ক্রেতাদের আয় এখন ৬৪৲ টাকা বাড়িবে। আবার তাহাদের ব্যয় (৬৪ × $\frac{৮০}{১০০}$) ৫১'২০৲ টাকা বাড়িবে। এইভাবে ক্রমে আয় ও ব্যয়বৃদ্ধির ঢেউ চলিবে এবং সর্বশেষে দেখা যাইবে যে প্রথম একশত টাকা আয়বৃদ্ধির ফলে মোট আয়ের পরিমাণ পাঁচগুণ বাড়িয়াছে—(১০০৲ + ৮০৲ + ৬৪৲ + ৫১'২০৲ + ৪০'৯৬ + ৩'৫৭ = ৫০০৲)। প্রথম আয়বৃদ্ধির ফলে শেষ পর্যন্ত আয়ের পরিমাণ যতগুণ বাড়িবে তাহাকে অর্থশাস্ত্রীরা "গুণক" আখ্যা দিয়াছেন। গুণক যদি পাঁচ হয়, তবে শেষ পর্যন্ত আয়ের পরিমাণ পাঁচগুণ বাড়িবে।

গুণকের সংখ্যার সহিত ভোগব্যয়ের প্রান্তিক প্রবণতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ভোগব্যয়ের প্রবণতা যদি শতকরা ৮০ হয় তবে বাকী ২০ ভাগ সঞ্চয় করা হইতেছে। অর্থাৎ সঞ্চয়ের প্রান্তিক প্রবণতা (marginal propensity to save) শতকরা ২০ ভাগ হইবে। ইহার অর্থ অতিরিক্ত আয়ের এক পঞ্চমাংশ সঞ্চয় করা হইতেছে। অতিরিক্ত আয় যদি এক টাকা হয়, তবে ইহার যে অংশ সঞ্চয় করা হয়, গুণক সেই সংখ্যার সমান হইবে। সঞ্চয়ের প্রান্তিক প্রবণতা যদি এক চতুর্থাংশ হয়, তবে গুণকের সংখ্যা হইবে চার; সঞ্চয়ের প্রান্তিক প্রবণতা যদি এক তৃতীয়াংশ হয়, তবে গুণক তিনের সমান হইবে।

ভোগব্যয়ের প্রান্তিক প্রবণতাকে যদি প বলা হয়, তবে সঞ্চয়ের প্রান্তিক প্রবণতা ১ – প হইবে। অর্থাৎ ভোগ্যব্যয়ের প্রান্তিক প্রবণতা যদি ·৮ হয়, তবে সঞ্চয়ের প্রান্তিক প্রবণতা (১ – ৮) বা ·২ হইবে। গুণকের সংখ্য $\frac{১}{১ - প}$ হইবে। ভোগব্যয়ের প্রান্তিক প্রবণতা (প) যদি ·৮ হয় তবে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা হইবে ২ অথবা ১/৫

$$\text{সুতরাং গুণক} = \frac{১}{১ - প} = \frac{১}{১ - ·৮} = \frac{১}{·২} = \frac{১}{\frac{১}{৫}} = ৫$$

বিনিয়োগব্যয়: বিনিয়োগব্যয়ের পরিমাণ কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? সরকারী বিনিয়োগব্যয় সরকারী নীতি অনুযায়ী নির্ণীত হয়। যেমন ভারত সরকার ঠিক করিয়াছে যে বর্তমান বৎসরে বিভিন্ন শিল্প প্রসারের কাজে ও কৃষির উন্নতিকল্পে মোট নয় শত কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। ইহা সমস্তই তৃতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির করা হয়।

বিনিয়োগব্যয়ের মধ্যে আসল হইতেছে বেসরকারী বিনিয়োগব্যয়। ইহার পরিমাণ বিভিন্ন বৎসরে খুবই পরিবর্তিত হয়।—কোনও বৎসর বহু অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। আবার কখনও বিনিয়োগের পরিমাণ কমিয়া যায়। ইহার কারণ কি? কোন এক ব্যবসায়ীর কথা ধরা যাক্। সে ব্যবসায়ে কত অর্থ বিনিয়োগ করিবে তাহা ঠিক করিতে দুইটি বিষয়ের কথা ভাবিবে। প্রথম, বিনিয়োগের ফলে ভবিষ্যতে কত লাভ বাড়িতে পারে। ধর, এক লক্ষ টাকা খরচ করিয়া একটি নূতন যন্ত্র বসাইবার কথা হইতেছে। যন্ত্রটি বসান হইলে প্রতি বৎসর উৎপাদনের

পরিমাণ কত বাড়িবে এবং তাহা বাজারে বিক্রয় করিলে কত টাকা পাওয়া যাইবে—প্রথমে ইহার হিসাব সে করিবে। পরে তাহাকে যে এই যন্ত্রটি চালাইবার খরচ, কাঁচামাল ইত্যাদি বাবদ ব্যয় প্রভৃতি সব কিছুর হিসাব করিতে হইবে। প্রথম অঙ্কটি হইতে দ্বিতীয়টি বাদ দিলে লাভের পরিমাণ সম্বন্ধে আঁচ করা যাইবে। দ্বিতীয়ত, তাহাকে দেখিতে হইবে বাজারে কত সুদে টাকা ধার পাওয়া যায় বা বাজারে টাকা খাটাইলে কত সুদ পাওয়া যাইতে পারে। ধর দেখা গেল যে যন্ত্রটি কিনিলে সব খরচ বাদ দিয়াও শতকরা দশ টাকা লাভ থাকিতে পারে এবং যন্ত্র কিনিবার টাকাটা বাজার হইতে শতকরা ছয় টাকা সুদে কর্জ পাওয়া যায়। এই অবস্থায় যন্ত্র বসাইতে অর্থ বিনিয়োগ করাই যুক্তিযুক্ত হইবে। অন্যান্য বিনিয়োগের সম্বন্ধে এই একই ধরনের কথা প্রযোজ্য। বিনিয়োগের পরিমাণ বিনিয়োগ হইতে নীট লাভ কত হইতে পারে ও সুদের হারের উপর নির্ভর করে।

বিনিয়োগের ফলে ব্যবসায়ী যে হারে নীট লাভ করিবে বলিয়া আশা করে তাহাকে লর্ড কেইন্‌স্ "মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনদক্ষতা" (marginal efficiency of capital) এই আখ্যা দিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যবসায়ী কারখানা বা ব্যবসায় খুলিবার পূর্বে মোট কত মূলধন লাগিতে পারে, কত উৎপাদন হইতে পারে, উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিলে কত দাম পাওয়া যাইতে পারে, উৎপাদনব্যয় কত পড়িতে পারে ইত্যাদি বিষয় হিসাব করিয়া নীট কত লাভ হইতে পারে তাহার হিসাব করে। নিজের ব্যবসায় বৃদ্ধির সময়ও এইরূপ হিসাব তাহাকে করিতে হয়—নূতন যন্ত্র-ব্যবহারে কত পরিমাণ উৎপাদন বাড়িবে; তাহা বাজারে বিক্রয় করিতে পারিলে মোট কত দাম পাওয়া যাইবে, উৎপাদনব্যয় কত পড়িবে ও যন্ত্রটি কত দিন টিকিবে ইত্যাদি বিষয়ের হিসাব করিয়া নীট লাভের অঙ্ক নির্ণয় করিতে হয়। এই নীট লাভকে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনদক্ষতা বলা হয়। এই উৎপাদনদক্ষতার হার যদি সুদের হার হইতে বেশি হয় তবেই ব্যবসায়ী অর্থ বিনিয়োগ করিবে। কিন্তু এইরূপ বিনিয়োগের ফলে প্রান্তিক উৎপাদনদক্ষতার হার ক্রমে কমিতে থাকিবে। কারণ যত বেশি বিনিয়োগ হইবে—নূতন নূতন যন্ত্র বসান হইবে—ততই উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িবে

এবং ফলে বাজার দর কমিবার সম্ভাবনা দেখা দিবে। বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িবার ফলে প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা কমিতে থাকিবে এবং ইহা ক্রমে সুদের হারের সমান হইবে। যতক্ষণ প্রান্তিক উৎপাদনদক্ষতা সুদের হারের বেশি থাকিবে—ততদিন বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িবে। প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা সুদের হারের সমান হইলে পর আর নূতন বিনিয়োগ হইবে না। কারণ তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদনদক্ষতার হার সুদের হারের কম হইবে। অর্থাৎ টাকা কর্জ করিতে যে সুদ দিতে হইবে—ইহা বিনিয়োগ করিলে তাহা অপেক্ষা কম নীট লাভ হইবে। কোন ব্যবসাযী এইরূপ কাজ করিবে না যাহাতে তাহার লোকসান হয়। তাহার হিসাব ঠিক না হইতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ সে মনে করিতেছে যে তাহার হিসাব ঠিক এবং হিসাব মত নীট লাভেব হার সুদের হারের কম ততক্ষণ সে আর ব্যবসায় বাড়াইতে অর্থ বিনিয়োগ করিবে না। মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ততটুকুই হইবে যাহার ফলে প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতাব হার (বা নীট লাভেব হার) সুদের হারের সমান হইবে।

মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতার হারের হিসাব করিবার সময ব্যবসায়ীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির কথা চিন্তা করে। প্রথমত, উৎপন্ন দ্রব্যটির বা দ্রব্যগুলির চাহিদা কিরূপ হইতে পাবে? শুধু ছয মাস কি এক বৎসর নয়; পর পর কযেক বৎসরের হিসাব তাহাকে করিতে হয়। অর্থাৎ আগামী পাঁচ বৎসরে দ্রব্যটির চাহিদা কিরূপ থাকিতে পারে। দ্রব্যেব চাহিদার হিসাব করিবার সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথাও ভাবিতে হইবে। কারণ জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার যদি বেশি থাকে তবে সাধারণভাবে সব জিনিসের চাহিদা বাড়িবে। দ্বিতীয়ত, এই ধরনের যন্ত্র অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও হয়ত বসাইবে বা বসাইতেছে। এইরূপ বিনিয়োগ কি পরিমাণ হইতেছে তাহার কথাও ভাবিতে হইবে। যদি বহু সংখ্যক ব্যবসায়ী এই ধরনের ব্যবসায় খুলিবার বা এই যন্ত্র বসাইবার চেষ্টা করিতেছে জানা যায় তবে কিছু দিনের মধ্যে দ্রব্যটির উৎপাদন বাড়িবে। যোগান বাড়িলে দাম কমিবে ও ফলে নীট লাভের হার কম হইতে পারে। তৃতীয়ত, করের হারের হিসাবও দেখিতে হইবে। করভার বৃদ্ধি পাইলে নীট লাভের পরিমাণ কমিবে। ব্যবসায়ের অবস্থা সাধারণ ভাবে মন্দা বা তেজী যাইতেছে এবং ভবিষ্যতে

এই অবস্থা কত দিন থাকিতে পারে—ইহার হিসাবও করা হয়। ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল থাকিলে লাভের সম্ভাবনাও বেশি। ব্যবসায় মন্দার সময় জিনিসের ভাল দাম পাওয়া যায় না ও লাভের আশাও কম থাকে।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে ভোগব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে আয়ের পরিমাণের উপর এবং বিনিয়োগব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন দক্ষতার হার ও সুদের হারের উপর। প্রান্তিক উৎপাদন দক্ষতার হার কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহা এইমাত্র আলোচনা করা হইয়াছে। সুদের হার কিসের উপর নির্ভর করে—এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। লর্ড কেইন্‌সের মতে সুদের হার নির্ভর করে টাকার পরিমাণ ও নগদ টাকা রাখিবার ইচ্ছার কম বেশির উপর। নিজেদের প্রয়োজন ও সুদের হারের কথা ভাবিয়া লোকেরা ঠিক করে যে তাহারা কত টাকা নগদ রাখিবে এবং কত টাকা বিভিন্ন ভাবে বিনিয়োগ করিবে। আয়ের যে অংশ আমরা সঞ্চয় করি তাহা সমস্তই নগদ রাখিতে পারি কিংবা কোম্পানীর কাগজ অথবা জাতীয় রক্ষা সার্টিফিকেট কিনিয়া কিংবা অন্য ভাবে বিনিয়োগ করিতে পারি। কত টাকা নগদ রাখিব ও কত অংশ বণ্ড বা কোম্পানীর কাগজে বিনিয়োগ করিব—ইহা কোম্পানীর কাগজের সুদের হারের উপর নির্ভর করে। ভবিষ্যতে সুদের হার বাড়িবার সম্ভাবনা থাকিলে সঞ্চয়ী লোকেরা এখন নগদ টাকা রাখাই পছন্দ করিবে। কারণ এখন যদি টাকাটা বিনিয়োগ করে তবে তাহা হইতে যে সুদ পাইবে—ভবিষ্যতে বিনিয়োগ করিলে বেশি সুদ পাওয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় টাকা নগদ রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। আবার ভবিষ্যতে সুদের হার বর্তমানের হার হইতে কমিতে পারে—এই আশঙ্কা থাকিলে বর্তমানেই টাকাগুলি বিনিয়োগ করিয়া রাখা ভাল। কারণ পরে আর এই হারে সুদ পাওয়া যাইবে না। এইভাবে বিভিন্ন সুদের হারে লোকেরা মোট কত টাকা নগদ ধরিয়া রাখিবে ইহার হিসাব করিতে পারি। ধর দেখা গেল যে সুদের হার শতকরা ৪৲ টাকা হইলে লোকেরা মোট ২০০০৲ কোটি টাকা নগদে রাখিতে পারে। কিন্তু সুদের হার শতকরা তিন টাকা হইলে তাহারা ২৫০০৲ কোটি টাকা রাখিতে পারে। আবার সুদের হার পাঁচ পারসেণ্ট হইলে মোট ১৬০০৲ কোটি টাকা ধরিয়া রাখিবে। এই অবস্থায়

সরকার বাজারে মোট ২২০০৲ কোটি টাকা চালু করিল। তাহা হইলে সুদের হার শতকরা চার পারসেণ্টের নীচে নামিয়া যাইবে। কারণ চার পারসেণ্ট সুদ যখন থাকিবে তখন জনসাধারণ মাত্র ২০০০৲ কোটি টাকা নগদ রাখিবে। সুদের হার না কমিলে তাহারা ইহার বেশি টাকা নগদ রাখিবে না। এইভাবে মোট টাকার পরিমাণ ও টাকা নগদ রাখিবার ইচ্ছার উপর সুদের হার নির্ভর করে। বিভিন্ন সুদের হারে জনসাধারণ মোট কত টাকা নগদ রাখিতে রাজি আছে ইহার একটি তালিকা প্রস্তুত করা যায়। এই তালিকাটির যদি কোন পরিবর্তন না হয়—অর্থাৎ টাকা নগদ রাখিবার ইচ্ছার কোন পরিবর্তন যদি না হয়—তবে সুদের হার টাকার পরিমাণের উপর নির্ভর করিবে। সরকার বেশি টাকা চালু করিলে সুদের হার কমিবে ও কম টাকা চালু করিলে সুদের হার বাড়িবে। ইহাই সাধারণ নিয়ম।

এই বিস্তৃত আলোচনা হইতে আমরা কি কি বিষয় জানিলাম? নিয়োগের পরিমাণ মোট ব্যয়ের পরিমাণদ্বারা নির্ণীত হয়। মোট ব্যয়ের পরিমাণ ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয়ের যোগফলের সমান। ভোগব্যয় মোট আয়ের পরিমাণ ও ভোগব্যয় প্রবণতার উপর নির্ভর করে। বিনিয়োগব্যয়—বিশেষত বেসরকারী বিনিয়োগব্যয়—একদিকে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনদক্ষতা ও অন্যদিকে সুদের হারের উপর নির্ভর করে; সুদের হার নির্ভর করে টাকা নগদ রাখিবার ইচ্ছা ও মোট টাকার উপর।
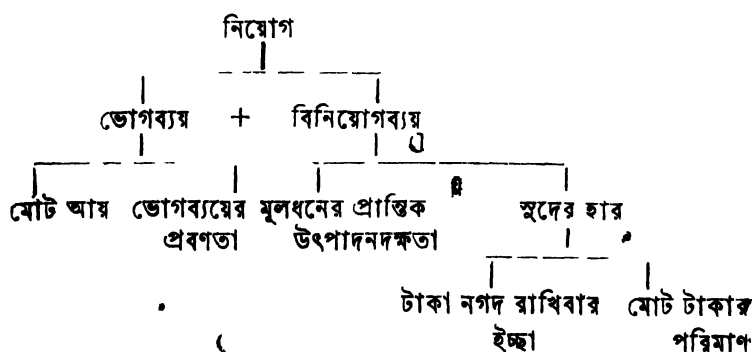
মোট আয় ও বিনিয়োগব্যয়ের সম্বন্ধ গুণকের দ্বারা নির্ণীত হয়। বিনিয়োগব্যয় যদি একশত কোটি টাকা বাড়ে এবং গুণকের সংখ্যা যদি

৪ হয়, তবে মোট আয়ের পরিমাণ চারগুণ (অর্থাৎ চারশত কোটি টাকা) বাড়িবে। গুণকের আলোচনার সার্থকতা এইখানে।

মোট আয় ও মোট টাকার পরিমাণ এই দুইটি বিষয় যদি ছাড়িয়া দিই, তবে নিয়োগের অবস্থা অপর তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করিবে—ভোগব্যয়ের প্রবণতা, মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনদক্ষতা এবং টাকা নগদ রাখিবার ইচ্ছা। ইহাদের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টির পরিবর্তন হইতে সময় লাগে। সুতরাং নিয়োগের পরিমাণ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনদক্ষতার পরিবর্তনের উপর নির্ভর করিতেছে বলা যায়। নিয়োগ বাড়াইতে হইলে অর্থাৎ বেকারের সংখ্যা কমাইতে হইলে হয় ভোগব্যয়ের প্রবণতা বৃদ্ধির চেষ্টা দেখিতে হইবে। কিংবা মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনদক্ষতা কি উপায়ে বাড়ে ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিংবা বেশি টাকা চালু করিয়া সুদের হার নামাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অধিকাংশ সময়ে এই তিনটি ব্যবস্থাই একসঙ্গে করিতে হইতে পারে। এই সব চেষ্টা সত্ত্বেও বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ঠিকমত নাও বাড়িতে পারে মনে করিলে সরকারী বিনিয়োগব্যয় বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা জানি যে যে কোন শ্রেণীর বিনিয়োগব্যয় বাড়িলে মোট আয়ের পরিমাণ কয়েকগুণ বাড়িবে। কতগুণ বাড়িবে তাহা গুণকের উপর নির্ভর করে। মোট আয়ের পরিমাণ বাড়িলে ভোগব্যয় বাড়িবে। কতটা বাড়িবে ইহা ভোগব্যয়ের প্রবণতার দ্বারা ঠিক হইবে। ফলে বাজারে চাহিদা বাড়িবে এবং নিয়োগ বাড়িবে। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় পৌঁছান সম্ভব হইতে পারে।

এই আলোচনার সহিত টাকা ও মূল্যস্তরের সম্বন্ধ কি তাহা জানা দরকার। টাকার পরিমাণ কমবেশি করিয়া সুদের হার বাড়ান কমান চলে। কারণ টাকা নগদ রাখিবার ইচ্ছার বিশেষ কোন পরিবর্তন না হইলে বাজারে চালু টাকার পরিমাণ যদি বাড়ান হয় তবে সুদের হার কমিবে সুদের হার কমিলে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িবে—যদি ইতিমধ্যে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের দক্ষতার কোন পরিবর্তন না হয়। বিনিয়োগ বাড়িলে মোট আয় বাড়ে, মোট আয় বাড়িলে নিয়োগ বাড়ে। নিয়োগ বাড়িলে উৎপাদন বাড়ে। অবশ্য যদি পূর্বে কিছুসংখ্যক লোক বেকার

বসিয়া থাকে, তবেই নিয়োগ এবং উৎপাদন বাড়িতে পারে। উৎপাদন বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যদি উৎপাদনব্যয় বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে কিছু কিছু মূল্যস্তর বৃদ্ধি ঘটিবে। এইভাবে নিয়োগ বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে দেশের মধ্যে পূর্ণনিয়োগ অবস্থার প্রবর্তন হইবে। তাহা হইলে আর উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে না। এইরূপ অবস্থায় টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া সুদের হার কমাইয়া, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ঘটিলে মূল্যস্তর বাড়িতে থাকিবে। টাকার পরিমাণ, সুদের হার, বিনিযোগব্যয়, নিযোগ, উৎপাদন ও মূল্যস্তর এইভাবে পরস্পরের সহিত জড়িত।

Exercises

1. Briefly describe the Keynesian theory of employment.
2. Write short notes on :—
   (a) Consumption function.
   (b) The Multiplier.
   (c) Marginal Efficiency of Capital.

একত্রিংশ অধ্যায়

বেকার সমস্যা ও পূর্ণ-নিয়োগ সম্বন্ধে অতিরিক্ত আলোচনা

(Further Notes on Unemployment And Full Employment)

সকল দেশের পক্ষেই বেকার সমস্যা একটি প্রধান সমস্যা। ব্যবসায়চক্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের চাহিদা কখনও বাড়ে, কখনও কমে। ফলে কখনও বেকারের সংখ্যা বাড়ে অথবা কমে। বেকার সমস্যার বিভিন্ন দিক ও ইহার সমাধান কি ভাবে হইতে পারে তাহা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে। প্রথমে "বেকার" কথাটির ব্যাখ্যা দরকার। বড়লোকের ছেলে কোন কাজ না করিয়া হয়ত চুপচাপ বাড়িতে বসিয়া থাকে। তাহাকে বেকার বলে না। যাহারা কাজ চায়, তাহাদের কাজের অভাব হইলেই বেকার বলে। কিন্তু আলস্যবশত যাহারা কাজ করে না, তাহাদিগকে বেকার বলে না। অন্য সকলে যে মাহিনায় কাজ করিতেছে সেই মাহিনায় যাহারা কাজ খুঁজিতেছে অথচ কাজ পায় না তাহাদিগকে বেকার বলে।

বেকারের শ্রেণীবিভাগ (Types of unemployment) : বেকার অবস্থার নানা শ্রেণীবিভাগ আছে। প্রথমত, সাময়িক (casual) বেকার অবস্থা। সব শিল্পেই ব্যবসায়ের অবস্থা কখনও ভাল, কখনও খারাপ থাকে। যখন চাহিদা বেশি থাকে ও উৎপাদন বাড়াইতে হয় তখন অনেক শ্রমিকের দরকার হয়। আবার মন্দার সময়ে সব শ্রমিককে কাজ দেওয়া যায় না। এইজন্য এই সব শিল্পে প্রায় সময়ই কিছু শ্রমিক রিজার্ভ হিসাবে (reserve of labour) রাখে। ইহার অর্থ এই সব শিল্পে কিছু সংখ্যক লোক বেকার থাকে।

দ্বিতীয়ত, কোন কোন শিল্পে বৎসরের কয়েক মাস কাজ পাওয়া যায়; অন্য সময়ে শ্রমিকদের বেকার থাকিতে হয়। চিনির কলগুলিতে নভেম্বর হইতে এপ্রিল, কি বড় জোর মে মাস পর্যন্ত কাজ চলে। বর্ষাকালে চিনির কলে কাজ বন্ধ থাকে ও ফলে এই কলের শ্রমিকেরা বেকার বসিয়া থাকে। কৃষকেরাও চাষ ও ধান কাটার সময় কাজ পায়, অন্য সময়ে বেকার থাকে। এই শ্রেণীর বেকারকে বিশেষ সময়ের বেকার (seasonal unemployment)

বলা হয়। ইহারা বৎসরের মধ্যে কিছু সময় কাজ করে ও অন্য সময়ে বেকার থাকে।

তৃতীয়ত, দেশব্যাপী ব্যবসায় মন্দা উপস্থিত হয় তখন বেকারের সংখ্যা বাড়ে। ব্যবসায়ের অবস্থা অনেক বৎসর তেজী ও কয়েক বৎসর মন্দা চলে। তেজীর সময় নিয়োগ বাড়ে, আর মন্দার সময় নিয়োগ কমে। অর্থাৎ অনেক লোক কাজের অভাবে বেকার বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। এই শ্রেণীর বেকারকে ব্যবসায়চক্র পরিবর্তনগত বেকার বা cyclical unemployment বলে।

চতুর্থত, শিল্পে উৎপাদনব্যবস্থার উন্নতির ফলে অনেক সময় বেকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। কোন শিল্পে নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ও কল-কব্জা ব্যবহারের ফলে অনেক সময়েই পুরাতন যন্ত্রশিল্পী বা পুরাতন ব্যবসায়ের লোক বেকার হয়। জুড়ীগাড়ির পরিবর্তে যখন মোটর গাড়ি চড়া ফ্যাসন হইল তখন বহু সহিস কোচওয়ান বেকার হইয়া পড়িল। কাপড়ের কলে সাধারণ যন্ত্রের পরিবর্তে যদি স্বয়ংক্রিয় (automatic) যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তবে কিছু শ্রমিক বেকার হইতে পারে। যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয় বলিয়া ইহা চালাইতে কম শ্রমিকের প্রয়োজন হইবে। তাঁত ও কাপড়ের কলের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে তাঁতিরা বেকার হইয়া পড়িতে পারে। র‍্যাসনালাইজেসনের ফলে বেকার সংখ্যা বাড়ে। কিংবা যখন এক জিনিসের পরিবর্তে অন্য জিনিস ব্যবহৃত হয় তখনও পুরাতন দ্রব্যটির উৎপাদনে নিযুক্ত লোকে বেকার হয়। ইহাকে যান্ত্রিক বেকারত্ব (technological unemployment) বলে। পরিশেষে, অনেক সময়েই দেখা যায় যে এক ছাড়িয়া অন্য কাজ খোঁজার সময় লোকে বেকার থাকে। সে হয়ত শীঘ্রই নূতন কাজ পায়। কিন্তু তবু সামান্য হইলেও কিছু সময়ের জন্য সে বেকার থাকে। ইহাকে কর্মান্তরগত বেকার (frictional unemployment) বলে।

বর্তমানে আর এক শ্রেণীর বেকারের কথা প্রায়ই শোনা যায়। যাহারা কোন কাজে নিযুক্ত আছে তাহারা সাধারণত কিছু না কিছু দ্রব্য উৎপাদন করে। যাহারা বেকার তাহারা কিছুই উৎপাদন করে না। আবার অনেক সময় দেখা যায়, কোন কোন শিল্পে এমন লোক নিযুক্ত আছে

যাহারা আসলে কিছুই উৎপাদন করে না। তাঁহাদের যদি সেই শিল্প হইতে সরাইয়া অন্যত্র লইয়া যাওয়া হয়, তবে উৎপাদনব্যবস্থার সামান্য পরিবর্তন করিলেই মোট উৎপাদনের পরিমাণ পূর্বের ন্যায়ই থাকে। অর্থাৎ নিযুক্ত লোকের সংখ্যা কমিলেও উৎপাদন কমে না। এই বাড়্তি লোকগুলি কর্মে নিযুক্ত আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাদের নিয়োগকে ছদ্মনিয়োগ বলা চলে। বাহিরের দৃষ্টিতে ইহাদের নিযুক্ত লোকসংখ্যার মধ্যে ধরা হইবে; বেকার বলিয়া গণনা করা হইবে না। কিন্তু ইহারা আসলে বেকার কারণ ইহারা কিছুই উৎপাদন করে না এবং ছদ্মনিয়োগ ছাড়িয়া দিলেও উৎপাদনের পরিমাণ কমে না। বেকার লোকেও কিছু উৎপাদন করে না। আমাদের দেশে কৃষিকর্মে এইরূপ বহু লোক নিযুক্ত আছে। গ্রামাঞ্চলে অন্য কোন কাজের সুযোগ নাই বলিয়া এই শ্রেণীর লোক বাধ্য হইয়া কৃষিকর্মেই ব্যাপৃত থাকে। ফলে কৃষিকর্মে অত্যধিক লোক নিযুক্ত আছে যাহার কোন প্রয়োজন নাই। কিছু সংখ্যক লোককে চাষের কাজ হইতে সরাইয়া অন্যত্র লাগাইলে ফসলের উৎপাদন কমিবে না। চাষের কাজে নিযুক্ত থাকিলেও আসলে ইহারা বেকার। কিন্তু বেকারের সংখ্যায় ইহাদের গণনা করা হয় না বলিয়া অর্থশাস্ত্রে ইহাদের গুপ্তবেকার (Disguised unemployment) বলা হয়।

বেকার সমস্যার কারণ (Causes of unemployment): লোকে কেন বেকার বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়? ইহার অবশ্য নানা কারণ আছে। প্রধান প্রধান কারণগুলি আলোচনা করা যাক। আবহাওয়া ও সামাজিক কারণে বিশেষ সময়ের বেকারত্ব দেখা দেয়। আবহাওয়ার জন্য কোন বিষয়ে শ্রমের চাহিদা থাকে, কোন সময়ে থাকে না। বর্ষার সময়ে জমিতে আখ হয় না বলিয়া সে সময় চিনির কলের কাজ বন্ধ রাখিতে হয়। ঘন বর্ষার সময় বাড়ি তৈয়ারির কাজ বন্ধ থাকে বলিয়া রাজমিস্ত্রী ও ঘরামী বেকার বসিয়া থাকে। (২) নূতন ব্যবসায়ের উন্নতি ও পুরাতন ব্যবসায়ের অবনতির ফলে অনেক সময়েই লোকে বেকার হইয়া পড়ে। সে যুগের ধনীরা ঘোড়ার গাড়ি চড়িতেন। আজকালকার ধনীরা মোটর গাড়ি চড়েন। ফলে সহিস ইত্যাদি অনেক লোকের চাকরী গিয়াছে। হস্তচালিত তাঁতের পরিবর্তে যন্ত্রচালিত তাঁতের ব্যবহারের ফলেও অনেকে বেকার হইয়াছে।

Rationalisation-এর ফলেও অনেকে বেকার হয়। ইহা হইল উন্নতির উল্টা দিক। যন্ত্রের উন্নতিতে দেশের ধনসম্পদ বাড়ে। কিন্তু ইহার ফলে গোড়ার দিকে হয়ত বেকার সমস্যা দেখা দেয়। (৩) সবচেয়ে প্রধান কারণ ব্যবসায়চক্রের পরিবর্তন। যখন ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়, তখন জিনিসপত্রের দাম কমে। ফলে লাভের পরিমাণ কমিয়া যায় ও অনেক সময়েই ব্যবসায়ীদের লোকসান দিতে হয়। চাহিদা নাই বলিয়া ব্যবসায়ীরা উৎপাদন কমাইতে চেষ্টা করে ও লোক ছাঁটাই করে। কাজেই মন্দার সময় বেকারের সংখ্যা অনেক বাড়ে। বেকার সমস্যার একটি প্রধান কারণ ব্যবসায়ে মন্দা।

ক্লাসিক্যাল লেখকদের মত ছিল যে শ্রমিকেরা যখন বাজারে চল্‌তি মজুরীতে কাজ লইতে অস্বীকার করে, তখন বেকার সমস্যা দেখা দেয়। শ্রমিকসংঘের চাপে বেতনের হার যদি খুব বেশি রকম বাড়ে, তবে ব্যবসায়ীরা অত উচ্চ বেতনে সব শ্রমিককে কাজ দিতে পারে না। তখন বেকারের সংখ্যা বাড়িবে। Lord Keynes এই মতের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে দ্রব্যের মোট চাহিদা কম বলিয়াই সব শ্রমিককে কাজ দেওয়া সম্ভব হয় না। আয়ের সবই যদি ভোগ অথবা বিনিয়োগের জন্য ব্যয় হয়, তবে সকলে কাজ পাইতে পারে। কিন্তু আয় যত বাড়িতে থাকে, লোকে ততই ইহার কম অংশ ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করে। ফলে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদকের আয় কম হইবে এবং তাহারা কম শ্রমিক নিয়োগ করিবে। অবশ্য বিনিয়োগ বাড়িলে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। কিন্তু ধনী দেশে বিনিয়োগের সুযোগ কম থাকে। অতএব লোকে বিনিয়োগ কম করে ও ইহার ফলে বেকারের সংখ্যা বাড়ে।

বেকার সমস্যা সমাধানের উপায় (Remedies for unemployment): বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়? সাময়িক বা casual বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য decasualisation প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রত্যেক ফার্মের প্রয়োজন বুঝিয়া একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান শ্রমিক নিয়োগ করিবে। এইজন্য Employment Exchange প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বেকার বা কর্মপ্রার্থিগণ এই প্রতিষ্ঠানে নাম রেজেস্ট্রি করিয়া রাখিবে। মালিকেরা তাহাদের প্রয়োজন এখানে জানাইয়া

দিবে এবং এই প্রতিষ্ঠানের মারফত বেকার শ্রমিকদের কাজ দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়ত, একটি সময়ের কাজকে অন্য একটি সময়ের কাজের সহিত যোগ করিয়া বিশেষ সময়ের বেকার সমস্যার সমাধান করা যায়। যেমন, যখন চাষের কাজ থাকে না, তখন কৃষকেরা কুটির শিল্পে কাজ করিতে পারে। তা'ছাড়া সম্ভব হইলে মালিকদের মাল মজুত করিতে উৎসাহ দিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে শ্রমিকেরা যাহাতে বিভিন্ন শিল্পের কার্যে দক্ষতা অর্জন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহারা একটি শিল্পে কাজ হারাইয়াছে, তাহাদের অন্য কাজের শিক্ষা দিতে হইবে। চতুর্থত, সরকার যদি প্রভূত পরিমাণে বিনিয়োগ করে তবে অনেক লোক কাজ পায়। যখন বেকার সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করে, তখন সরকারের উচিত রাস্তাঘাট, পার্ক, পোস্ট অফিস ইত্যাদি তৈয়ারি করিয়া লোককে কাজ দেওয়া। ইহাকে পাবলিক ওয়ার্ক্‌স্ পলিসি বলে। আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষের সময় অনেকটা এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত। সে সময় সরকার রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি নানা ধরনের কাজ আরম্ভ করিত এবং সেখানে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত লোকদের কাজ দেওয়া হইত। এই নীতিই ব্যাপকভাবে অবলম্বন করিলে বেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে। ব্যবসায়চক্র বিরোধী সরকারী আয়ব্যয়নীতি (compensatory fiscal policy) অবলম্বন করিয়া ব্যবসায় মন্দা করিতে পারিলে বেকার সমস্যার গুরুত্ব অনেক কমিয়া যাইবে। শিল্পগুলিতে rationalisation বা কারখানায় উন্নত ধরনের যন্ত্র ব্যবহারের পূর্বে হিসাব করিয়া দেখিতে হইবে যে ইহার ফলে বেকারের সংখ্যা কেমন বাড়িতে পারে। তদনুযায়ী এই ব্যবস্থা ধীরে ধীরে অবলম্বন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে বেকার শ্রমিকদের অন্যত্র কাজের সন্ধান দিতে হইবে।

কিন্তু যাহাই করা হউক না কেন কিছু লোক বেকার থাকিবেই। পাশ্চাত্য দেশের সরকার তাহাদের জন্য বেকারবীমা (unemployment insurance) প্রবর্তন করিয়াছেন। এই বেকারবীমা তহবিলে সরকার, মালিক ও শ্রমিক সপ্তাহে সপ্তাহে বা মাসে মাসে টাকা জমা দেয়। শ্রমিকেরা কাজ হারাইলে তাহাদের এই তহবিল হইতে বেকার থাকা কালীন অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়।

পূর্ণ নিয়োগ (Full employment) : বেকার সমস্যার বহু কুফল আছে বলিয়া আধুনিক সরকার ইহার সমাধান করিতে ব্যস্ত হয়। দেশের মধ্যে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বজায় রাখাই সরকারের লক্ষ্য। পূর্ণ নিয়োগ করার অর্থ দেশের সকল লোকই কাজে নিযুক্ত আছে তাহা বুঝায় না। যাহারা কাজ করিতে চায় তাহাদের মধ্যে শতকরা ৩।৪ ভাগ লোকও যদি বেকার বসিয়া থাকে, তবুও ইহা পূর্ণ বিনিয়োগ অবস্থা বলিয়া গণ্য হয়। যাহারা এক কাজ ছাড়িয়া অন্য কাজে যাইতেছে তাহারা সাময়িকভাবে বেকার থাকিতে পারে। পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বজায় রাখিতে হইলে শুধু এইটুকু করিতে হইবে যে, যাহারা সাময়িকভাবে বেকার আছে তাহারা যেন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ন্যায্য বেতনে নূতন কাজ পায়।

Keynes-এর মতে যত শ্রমিক কাজ চায়, তত শ্রমিকের চাহিদা থাকে না বলিয়া বেকার সমস্যা দেখা দেয়। শ্রমিকের চাহিদার অর্থ শ্রমিক যে জিনিস তৈয়ারি করে ইহার চাহিদা। সব শ্রমিক নিযুক্ত থাকিলে যত পরিমাণ জিনিস প্রস্তুত হইবে তাহার জন্য বাজারে চাহিদা থাকিলে পূর্ণ বিনিয়োগ হইবে। কিন্তু এতগুলি জিনিসের ঠিকমত চাহিদা থাকে না বলিয়াই লোক বেকার থাকে। ব্যয়ের উপর জিনিসের চাহিদা ও শ্রমিক নিয়োগ নির্ভর করে। মোট আয় যদি সমস্তই উৎপাদনের কাজে ব্যয় হয়, তবে পূর্ণ-নিয়োগ হইতে পারে। সাধারণত মোট আয়ের কিয়দংশ ভোগে ব্যয় হয়, কিয়দংশ সঞ্চিত হয় ও বিনিয়োগ করা হয়। যদি ভোগের জন্য মোট ব্যয় কম হয়, তবে বিনিয়োগের পরিমাণ সেই অনুপাতে বাড়া চাই। যদি তাহা না হয় তবে চাহিদা ঘাটতি (deficiency in demand) হইবে এবং সব শ্রমিককে কাজ দেওয়া যাইবে না। Keynes-এর মতে বিনিয়োগ ও ভোগবৃদ্ধির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে বেকার সমস্যা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

পূর্ণ নিয়োগের পন্থা (Road to Full employment) : নিম্নলিখিত দুইটির যে কোন একটি উপায়ে পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় পৌঁছান যায়, হয় ভোগের জন্য ব্যয় বাড়াইয়া, না হয় ব্যবসায়ে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইয়া। যখন কোন কারণে জিনিসের চাহিদা কমে ও ইহার ফলে উৎপাদন কমিয়া যায় তখন বেকার সংখ্যা বাড়িবে। এই অবস্থার সমাধান

করিতে হইলে এমন কিছু পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে যাহার ফলে জিনিসপত্রের চাহিদা ঠিকমত বাড়ে। লোকের আয় বাড়িলে তাহাদের ব্যয় বাড়িবে। অর্থাৎ জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়িবে। দরিদ্রকে আয়ের প্রায় সমস্ত অংশই ব্যয় করিতে হয়। ধনীরা আয়ের কম অংশ ব্যয় করে, বাকীটা সঞ্চয় করে। সুতরাং ধনীদের অর্থ দরিদ্রদের দিলে ভোগের জন্য ব্যয় বাড়িবে। ধনীদের উপর প্রত্যক্ষকরের হার বাড়াইয়া এবং দরিদ্রদের উপর পরোক্ষকরের হার কমাইয়া অথবা দরিদ্রদের পারিবারিক ভাতা দিয়া ইহা করা সম্ভব। কিন্তু এই প্রথার অসুবিধা এই যে, ধনীদের উপর করের হার বাড়াইলে তাহাদের সঞ্চয় কমিবে ও ফলে তাহারা ব্যবসায়ে কম টাকা বিনিয়োগ করিবে। ইহার ফলে বেকারের সংখ্যা বাড়িবে।

বিনিয়োগ বাড়ানই বেকার সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট পন্থা। বিনিয়োগ দুই প্রকারের—সরকারী শিল্পে ও বেসরকারী শিল্পে। বেসরকারী শিল্পে বিনিয়োগ বাড়াইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। লাভের পরিমাণ কম হয় বলিয়াই বেসরকারী শিল্পে বিনিয়োগ কম হয়। ইহা বাড়াইবার জন্য সুদের হার কমান যাইতে পারে। অথবা আয়করের হার এমনভাবে কমাইতে হইবে যে, বেসরকারী শিল্পে মুলধন বিনিয়োগ বাড়িয়া পূর্ণনিয়োগ অবস্থা বজায় থাকে। কিন্তু ব্যবসায় মন্দার সময় ব্যবসায়ীরা এতই নিরুৎসাহ হয় যে, এইসব প্রলোভন সত্ত্বেও তাহারা কম বিনিয়োগ করে। এইজন্য ব্যবসায় মন্দার সময় সরকারী শিল্পে ও সরকারী কাজে মূলধন বিনিয়োগ করা দরকার হয়। সেই সময়ে সরকার যদি রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, ডাকঘর, রেলওয়ে, সেচব্যবস্থা প্রভৃতি কাজের জন্য প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করিতে থাকে, তাহা হইলে বেকারদের কাজ দেওয়া যায়। ফলে দেশে মোট আয় বাড়ে ও জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়িতে থাকে। চাহিদা বাড়িলে নিয়োগ বাড়ে ও ক্রমে পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় পৌছান যায়। অর্থাৎ ব্যবসায়চক্রের বিপরীতমুখী সরকারী বিনিয়োগ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে পূর্ণনিয়োগ হইতে পারে।

ইহা ছাড়া আরো দুইটি পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হইতে পারে। অনেক সময়েই দেখা যায় যে দেশের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বেকারের সংখ্যা

সমান থাকে না। কোন কোন অঞ্চলের বেকার সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। এমনও দেখা যায় যে, অন্য অঞ্চলে হয়ত কেহই বেকার বসিয়া নাই। বরঞ্চ সেইসব অঞ্চলের শিল্পপতিরা শ্রমিকের অভাব বোধ করিতেছে। আবার কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে বহু লোক বেকার বসিয়া আছে। কিংবা একটি বা কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর লোকের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেশি। যেমন আমাদের দেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে অনেকেই বেকার বসিয়া আছেন। অথচ কারখানাগুলিতে হয়ত শ্রমিকের অভাব আছে। শুধু সাধারণভাবে সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইয়া গেলেই এইসব অঞ্চলের বা এইসব শ্রেণীর বেকারদের কাজ নাও জুটিতে পারে। সেইজন্য দুইটি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমত, এইসব বেকার-বহুল অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ শিল্পপ্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বড় বড় শহরে যেখানে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বেকারের সংখ্যা বেশি, সেখানে তাহাদের উপযোগী শিল্প বা অন্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। যে অঞ্চলে বেশি লোক বেকার বসিয়া আছে, সেখানে নূতন নূতন কারখানা খুলিতে হইবে,—কুটির শিল্প বা অন্যান্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, বেকার শ্রমিকদের কোন যান্ত্রিক শিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। যেমন, আজকাল ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন উঠিয়া যাইতেছে বলিয়া সইস্, কোচওয়ান বেকার হইতেছে। ইহাদের আর এই ধরনের কাজ দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ধর, মোটর গাড়ির চালক বা মিস্ত্রীর কাজ শিখাইবার জন্য প্রতিষ্ঠান খুলিতে হইবে। এইভাবে দেশের সকল কর্মপ্রার্থী যাহাতে নিজের যোগ্যতামত কাজ পায় সেই উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকারকে নানা ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।

Exercises

Q. 1. What are the different types of unemployment that occur in modern society? How should we try to cure the evil? (C. U. 1954, 1952; B. Com. 1957, 1953; Viswa. 1956, 1955).

Q. 2. Analyse the different types of unemployment. What are the causes of unemployment? (C. U. 1955).

Q. 3. What is meant by "Full employment"? Examine the methods by which full employment may be secured.

দ্বিত্রিংশ অধ্যায়

মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রাহ্রাস ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ

(Inflation, Deflation and Disinflation)

মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) **:** সাধারণ লোকে জিনিসপত্রের দাম চড়িতে থাকিলেই বলে যে ইন্‌ফ্লেসন বা মুদ্রাস্ফীতি উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির অর্থ মুদ্রাস্ফীতি নহে। উৎপাদনের ব্যয়বৃদ্ধির জন্য যদি মূল্যবৃদ্ধি হয় তবে ইহাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে না। আবার অনেক লেখক দেখাইয়াছেন যে, মূল্যবৃদ্ধি না হইলেও মুদ্রাস্ফীতি হইতে পারে। যখন উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতির ফলে উৎপাদনব্যয় কমে, অথচ জিনিসপত্রের দাম ঠিক থাকে বা রাখা হয় (১৯২৪—২৯ সালে আমেরিকায় যেমন ঘটিয়াছিল) তখন মুদ্রাস্ফীতির লক্ষণ দেখা দেয়। এই অবস্থাকে Keynes লাভস্ফীতি (profit-inflation) নাম দিয়াছেন এবং দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সহিত ইহার পার্থক্য দেখাইয়াছেন। তবে সাধারণত মুদ্রাস্ফীতির ফলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। যদিও সব সময়েই যে ইহা হইবে তাহা বলা চলে না।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে বিনিয়োগব্যয় বাড়িলে লোকের মোট আয় বাড়ে। আয় বাড়িলে ব্যয়ও বাড়ে, অর্থাৎ লোকে বেশি পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য কিনিতে চাহিবে। যে অনুপাতে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়ে, ইহাদের উৎপাদনও যদি সেই অনুপাতে বাড়ান যায় তবে মূল্যস্তর বাড়িবে না। যদি বেকার লোক ও যন্ত্রপাতি থাকে, তবে চাহিদা বাড়িলে সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনও বাড়ান যায়। সুতরাং চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেকার লোক কাজ পাইবে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে পূর্ণনিয়োগ অবস্থা হইবে, অর্থাৎ কর্মপ্রার্থী সকলেই কাজ পাইবে। ইহার পর আর উৎপাদন বাড়ান যায় না এবং বিনিয়োগের পরিমাণ যদি আরো বাড়ে তবে মূল্যবৃদ্ধি হইবে। এই অবস্থাকে খাঁটি মুদ্রাস্ফীতি বা pure-inflation বলে। খাঁটি মুদ্রাস্ফীতি পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় পৌঁছিবার পরই দেখা যায়।

সুতরাং পূর্ণনিয়োগের পরেও যদি বিনিয়োগব্যয় বাড়ে অথবা লোকদের আয় বাড়ে তবে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। অবশ্য কোন কোন সময়ে

ইহার পূর্বেও মুদ্রাস্ফীতি হইতে পারে। পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় পৌঁছিবার পূর্বেই কোন কোন উপকরণের অভাব পড়িতে পারে। এক্ষেত্রে যে যে জিনিস তৈয়ারির জন্য ঐ উপকরণ দরকার, ইহাদের দাম বাড়ে এবং এই জিনিসটি অন্যান্য জিনিস উৎপাদনে ব্যবহৃত হইলে ধীরে ধীরে অন্যান্য জিনিসের দামও বাড়িবে। এইরূপ অবস্থা থাকিলে, পূর্ণনিয়োগের পূর্বেই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। ইহাকে আংশিক মুদ্রাস্ফীতি (partial inflation) বলে।

মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্ন রূপ (Types of inflation) লোকদের মোট আয় যে হারে বাড়ে, উৎপাদনের পরিমাণ যদি সেই অনুপাতে বাড়ান সম্ভব না হয়, তবে মূল্যবৃদ্ধি হয় ও এই অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে। আগেকার দিনে এইরূপ মুদ্রাস্ফীতি প্রধানত সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির ফলে ঘটিত। যেমন যুদ্ধের সময় সরকারের ব্যয় খুব বেশি রকম বাড়ে। সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির অর্থ লোকদের আয় বৃদ্ধি। কারণ ইহার ফলে বহুলোক কাজ পাইবে ও সরকার বহু জিনিসপত্র কিনিবে। উহাদের সকলেরই আয় বাড়িবে। কিন্তু সরকার যদি কর বসাইয়া কিংবা ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া আয়ের অতিরিক্ত অংশ তুলিয়া লইতে পারিত তবে হয়ত মূল্যবৃদ্ধি হইত না। কিন্তু ইহা করিতে গেলে যে হারে কর বসাইতে হইবে, তত উচ্চ হারে কর বসান সরকার সম্ভব বলিয়া মনে করে না। সুতরাং করলব্ধ রাজস্বের পরিমাণ কম হয়। ফলে সরকারকে বাধ্য হইয়া কাগজী নোট ছাপাইয়া যুদ্ধের ব্যয় মিটাইতে হয়। অর্থাৎ ব্যয় অনুপাতে রাজস্ব কম হয় বলিয়া সরকারী বাজেটে ঘাটতি হয়। এই ঘাটতি পূরণের জন্য কাগজী নোট বেশি মাত্রায় চালু করিতে হয়। ফলে লোকের আয় বাড়ে। আয় বাড়িলে ব্যয় বাড়ে। ব্যয় বাড়ার অর্থ জিনিসের চাহিদা বৃদ্ধি হওয়া। অথচ যুদ্ধের সময়ে সাধারণের ব্যবহার্য জিনিসের উৎপাদন প্রয়োজন মত বাড়ান যায় না। সুতরাং জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি হয়। ইহাকে ঘাটতি-পূরণজনিত মুদ্রাস্ফীতি বা ডেফিসিট-ইণ্ডিউস্‌ড্ (deficit induced inflation) বলে।

কিংবা আর একটি কারণে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। শ্রমিকেরা যদি শক্তিশালী সংঘ গঠন করিয়া থাকে, তবে তাহারা জিনিসপত্রের দাম

কিছু কিছু বাড়িতে আরম্ভ করিলেই মালিকের উপর চাপ দিয়া বেতনবৃদ্ধি করিয়া লইতে পারে। ফলে তাহাদের আয় বাড়ে। কিন্তু সেই অনুপাতে যদি উৎপাদন না বাড়ে তবে মূল্য আরো বাড়িবে। ইহাকে মজুরীবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি বা ওয়েজ-ইণ্ডিউসড্ ইনফ্লেসন (wage-induced inflation) বলে।

উৎপাদনবৃদ্ধির পরিমাণ হইতে মোট আয়ের পরিমাণ যখন বাড়িতে থাকে তখন মূল্যবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সরকার কোন রকম মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে। এই অবস্থাকে Open Inflation বা খোলা মুদ্রাস্ফীতি বলে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি শুরু হইলে সরকার নানা ধরনের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অবলম্বন করে। যেমন ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের দাম বাড়াইতে দেওয়া হয় না এবং কেহ যদি সরকারী দামের বেশি আদায় করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহাকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করে। যে সকল অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের যোগান খুব কম ইহা রেসন করে বা সকলের মধ্যে সমান হারে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই সব ব্যবস্থার ফলে জিনিসপত্রের দাম হয়ত কম বাড়ে, অর্থাৎ যতটা বাড়িত ততটা বাড়ে না। এই অবস্থাকে repressed বা supressed inflation বা চাপা মুদ্রাস্ফীতি বলে।

মুদ্রা সংকোচ (Deflation) : উৎপাদনের তুলনায় আয় কমিয়া গেলে মুদ্রাসংকোচ বলে। মুদ্রাসংকোচ হইলে দাম এবং নিয়োগ কমিয়া যায়।

মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ (Disinflation) : এখন অনেকে মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ কথাটি ব্যবহার করেন। যুদ্ধের পরে প্রত্যেক দেশে দাম বাড়িয়াছে। সরকার দাম এবং ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাই মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের নীতি। মুদ্রাসংকোচের সহিত ইহার পার্থক্য আছে। মুদ্রাসংকোচের ফলে দাম কমে, মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের নীতি গ্রহণ করিলেও দাম কমে। কিন্তু মুদ্রাসংকোচের সময় উৎপাদন এবং নিয়োগও কমে। কিন্তু এই অবস্থায়, উৎপাদন এবং নিয়োগ না কমাইয়া মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ করা হয়। সরকার এমনভাবে দাম কমাইবার চেষ্টা করে যে, ইহার ফলে উৎপাদন এবং নিয়োগ কমে না।

মূল্য পরিবর্তনের ফলাফল (Effects of changes in prices) : জিনিসপত্রের দাম যখন বাড়ে তখন যদি সকল শ্রেণীর লোকের আয় সেই অনুপাতে বাড়িত তবে চিন্তার কোন কারণ থাকিত না। কিন্তু তাহা ঘটে নাই বলিয়াই মূল্যবৃদ্ধির ফলে ভিন্ন শ্রেণীর লোক ভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়। আয় বাড়া-কমার সম্ভাবনার দিক দিয়া দেশের লোককে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—স্থির আয়ের লোক, শ্রমিকদল ও ব্যবসায়ীদল। সরকারী কর্মচারী, সওদাগরি অফিসের চাকুরে, এই সব শ্রেণীর আয় মাসে ঠিক করা থাকে ও বয়স ও প্রমোশন অনুযায়ী নিয়মিত হারে বাড়ে। কিন্তু জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি হইলেই ইহাদের আয় বাড়ে না। ফলে ইহারা নানা অসুবিধায় পড়ে। আবার জিনিসপত্রের দাম যখন কমে, তখন এই শ্রেণীর লোকদের খুব সুবিধা হয়। তাহাদের আয় ঠিকই থাকে, কিন্তু অধিকাংশ জিনিস সস্তা হয়।

শ্রমিকদের অবস্থাও প্রথম শ্রেণীর লোকদের মত। মূল্যবৃদ্ধি হইলে তাহাদের মজুরী বাড়ে না। তবে তাহারা হয়ত ধর্মঘট করিয়া মালিকদের মজুরীর হার বাড়াইতে বাধ্য করিতে পারে। কিন্তু দেখা যায় যে মজুরীর হারবৃদ্ধি সম্ভব হইলেও মূল্যবৃদ্ধির হার হইতে ইহা সাধারণত কম থাকে। সুতরাং শ্রমিকদের অবস্থা প্রথম শ্রেণীর লোক অপেক্ষা কিছুটা ভাল। কিন্তু তাহাদের অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। আবার দাম কমিলে মজুরীর হার সেই অনুপাতে কমে না বলিয়া তাহাদের সুবিধা হয়। তবে আর একটি দিকের কথাও ভাবিতে হইবে। যখন জিনিসপত্রের দাম বাড়িতে থাকে, তখন উৎপাদকেরা বেশি লাভ করে ও বেশি উৎপাদন করিতে চেষ্টা করে। ফলে কাজের সংখ্যা বাড়ে ও বেকারের সংখ্যা কমে। ইহাতে শ্রমিকের লাভ হয়। আবার যখন দাম কমিতে থাকে তখন মালিকেরা লোকসান দেয় ও উৎপাদন কমাইতে চেষ্টা করে। ফলে কারখানাগুলিতে ছাঁটাই শুরু হয়—বেকার সংখ্যা বাড়ে। এ অবস্থা শ্রমিকদের পক্ষে মঙ্গল-জনক নহে।

মূল্যবৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ীদের লাভ বাড়ে। যখন দাম অপেক্ষাকৃত কম ছিল তখন তাহারা মাল কিনিয়া রাখিয়াছে এবং মাল যখন বিক্রয় করিতেছে তখন দাম বাড়িয়াছে। ফলে তাহাদের লাভ বাড়ে। আর

একটি কারণেও তাহাদের লাভ বাড়ে। অধিকাংশ ব্যবসায়ী ধারে কারবার করে। ধরা যাক সে যখন ১০০৲ টাকা কর্জ করিয়া ব্যবসায় শুরু করে, তখন এই টাকায় ১০ মণ গম পাওয়া যাইত। অতএব বলা যায় যে, মহাজন তাহাকে ১০ মণ গম বা ১০ মণ গমের মূল্য ধার দিয়াছে। এক বৎসর পরে ধার শোধ নিবার সময় গমের দাম (এবং অন্যান্য জিনিসের দাম) এমন বাড়িয়াছে যে ১০০৲ টাকায় মাত্র ৯ মণ গম পাওয়া যায়। ব্যবসায়ী ১০০৲ টাকা শোধ দিল বটে, কিন্তু আসলে সে ফেরত দিল মাত্র ৯ মণ গম বা ৯ মণ গমের দাম ও কিছু সুদ। সুতরাং মূল্য বৃদ্ধি হইলে দেনাদারদের লাভ হয় ও মহাজনের লোকসান যায়। অধিকাংশ ব্যবসায়ী দেনাদার বলিয়া তাহারা মূল্যবৃদ্ধির সময়ে লাভ করে। মূল্যস্তর নামিতে থাকিলে আবার তাহাদের লাভ কমে বা লোকসান হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ইন্‌ফ্লেসনের ফলে ব্যবসায়ী অর্থাৎ ধনীদের আয় বাড়ে। কিন্তু শ্রমিক ও বেতনভোগী অর্থাৎ গরিব ও মধ্যবিত্তদের আয় কমে। ধনী আরো ধনী হয় ও গরিব আরো গরিব হয়। জাতীয় আয় বণ্টন আরো বেশি পরিমাণে অসম হয়। ফলে সমাজে অশান্তি উপস্থিত হয়। মালিক শ্রমিক বিরোধ হয়, ধর্মঘটের সংখ্যা বাড়ে। ইহা সমাজের মঙ্গলের দিক দিয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। আবার দাম কমিলে অবশ্য গরিব ও মধ্যবিত্তের সুবিধা হয়। কিন্তু এ সময়ে কারখানায়, সওদাগরী অফিসে, দোকানে সর্বত্র লোক ছাঁটাই শুরু হয়। ছেলেরা লেখাপড়া শেষ করিয়া বৃথাই কাজের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। এইরূপ অবস্থাও শ্রমিক মধ্যবিত্তদের পক্ষে আনন্দদায়ক নয়।

মূল্য পরিবর্তনের ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও নানাদিকে পরিবর্তিত হয়। মূল্যবৃদ্ধির সময়ে ব্যবসায়ীদের লাভ বাড়ে। তাহারা উৎসাহিত হইয়া উৎপাদনবৃদ্ধির চেষ্টা করে ও ফলে বেশি সংখ্যক লোক কাজ পায়, উৎপাদন বাড়ে। এই দিক দিয়া দেখিলে মূল্য বৃদ্ধির ফল ভালই বলিতে হয়। কিন্তু ইন্‌ফ্লেশন চিরকাল চলিতে পারে না। শুক্লপক্ষের পর যেমন কৃষ্ণপক্ষ আসে, সেইরকম মূল্যবৃদ্ধির পরে বাজারমন্দা আসা অব্যর্থ। বাজারমন্দা উপস্থিত হইলে দাম কমিতে থাকে, ব্যবসায়ীরা লোকসান দেখি, ব্যবসায় গুটাইবার চেষ্টা করে ও উৎপাদন অনেক কমিয়া যায়। বেকারের সংখ্যা বাড়ে।

সুতরাং মূল্যবৃদ্ধি বা কমা দুই-ই অবাঞ্ছনীয়। অধিকাংশ অর্থশাস্ত্রী এইজন্য মূল্যস্তর স্থির রাখার নীতি সমর্থন করেন।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ (Control of inflation): মুদ্রাস্ফীতির অনেক কুফলের কথা আমরা জানি। ইহার ফলে ধনী আরো ধনী ও গরিব আরো গরিব হয়। সুতরাং ইহাকে যে কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নাই। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করা যাইতে পারে?

চিরাচরিত ব্যবস্থা হইতেছে টাকার যোগান কমাইবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা। টাকার পরিমাণ কমিলে লোকের আয় কমিবে এবং মূল্যের ঊর্ধ্বগতি বন্ধ হইবে। এই উদ্দেশ্যে সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে,—যেমন সুদের হার বাড়ান, ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে বেশি টাকা লগ্নী না করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বাজারে কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করা কিংবা ব্যাঙ্কগুলির তহবিলে বেশি টাকা জমা রাখার নির্দেশ দেওয়া ইত্যাদি। সুদের হার বেশি হইলে ব্যবসায়ীরা পূর্বের চেয়ে কম টাকা কর্জ করিবে ও ফলে তাহাদের বিনিয়োগব্যয় কমিবে। বিনিয়োগব্যয় কমিলে লোকদের আয় কমে ও মোট আয় কমিলে মূল্যবৃদ্ধির গতিও শ্লথ হইবে। ব্যাঙ্কের তহবিলে যদি বেশি টাকা থাকে তবে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের বেশি টাকা ধার দিবে। ইহা বন্ধ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দুইটি পন্থা অবলম্বন করে। প্রথম, বাজারে কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করা শুরু করে। যাহারা এই কাগজ কেনে তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে চেক দেয়। যে ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটা হইয়াছে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাহার নিকট চেক পাঠাইয়া দেয় ও টাকা তুলিয়া লইয়া যায়। ফলে ব্যাঙ্কের তহবিলের উদ্বৃত্ত টাকা কমিয়া যায়। ইহাকে ওপন মার্কেট পলিসি বা কোম্পানীর কাগজ কেনা-বেচা নীতি বলে। দ্বিতীয়ত, ধরা যাক, আইনে আছে যে, সব ব্যাঙ্ককে আমানতের শতকরা দশভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিতে হইবে। ব্যাঙ্কগুলির তহবিলে যদি উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্দেশ দিতে পারে যে প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে এখন হইতে আমানতের শতকরা ১৫ ভাগ জমা রাখিতে হইবে। এই নির্দেশ অনুযায়ী বেশি টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখিলে ব্যাঙ্কের উদ্বৃত্ত অর্থ কমিয়া যাইবে। ফলে

ইহা বাধ্য হইয়া কম টাকা লগ্নী করিবে। লগ্নীর পরিমাণ কম হইলে মোট ব্যয় কমিবে। ফলে মূল্যবৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রিত হইবে।

কিন্তু টাকার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সময়েই সম্ভব হয় না। প্রথমত, এই সমস্ত ব্যবস্থার ফলে যে টাকার পরিমাণ কমিবে এ কথা সব সময়ে বলা যায় না। দ্বিতীয়ত, টাকার পরিমাণ যদি কমেও তবে ইহার ফলে মোট ব্যয় হয়ত নাও কমিতে পারে। সুতরাং অনেক দেশেই সরকারী রাজস্ব ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করা হয়। সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর বেশি পরিমাণে ধার্য করে, সরকারী ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করে। ফলে লোকেদের হাতে কম টাকা থাকে ও তাহাদের চাহিদা কমিবে। টাকার পরিমাণ কমাইবার বিভিন্ন পদ্ধতির সহিত একসঙ্গে এই ব্যবস্থাও অর্থাৎ সরকারী রাজস্ব বাড়ান ও ব্যয় কমান নীতি অবলম্বন করা হইলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কাজ অনেকটা সহজ হয়।

ইহা ছাড়া, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, রেসনিং ইত্যাদির দ্বারাও মুদ্রাস্ফীতির কুফল কমান যায়। সরকার বিভিন্ন জিনিসের সর্বোচ্চ মূল্য ঠিক করিয়া দিতে পারে। কোন ব্যবসায়ীই ইহার বেশি দাম লইতে পারিবে না। লইলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের রেশন করা হয়। বিনিয়োগ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিয়ম করা হয় যে, ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করিবার পূর্বে, সরকারের অনুমতি লইতে হইবে। অনাবশ্যক বা কম আবশ্যক বিনিয়োগ বন্ধ করিয়া বিনিয়োগব্যয় কমান হয়। ফলে মুদ্রাস্ফীতিও কমে।

Exercises

Q. 1. Define 'Inflation', and explain its effects on production and the distribution of income. (C. U. 1956, 1952 ; B. Com. 1955).

Q. 2. To what causes is Inflation due ? What steps are taken by modern governments to deal with inflation ? (Viswa. 1956, '54 ; C. U. 1958, 1950, 1949).

Q. 3. What are the evils of Currency Inflation ? (C. U. 1951, 1949).

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়

ব্যবসায়চক্র

(Trade Cycle)

ব্যবসায়চক্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Trade-cycle): ব্যবসায়েও সুখদুঃখের ন্যায় উত্থান-পতন আছে। সাধারণত কিছুদিন ব্যবসায়ের অবস্থা বেশ ভাল যায়। কিন্তু ইহার পরেই মন্দা দেখা দেয়। ব্যবসায়ের এই উত্থান-পতনকে ব্যবসায়চক্র বলে। কিছুদিন ব্যবসায় ভাল চলে, বেশ লাভ হয়, উৎপাদন বাড়ে, বেকারের সংখ্যা কমে এবং ক্রমে জিনিসপত্রের মূল্য বাড়িতে থাকে। ইহার পরেই ব্যবসায়ের অবস্থা খারাপ হয়, উৎপাদন ও দাম কমিতে থাকে এবং বেকারের সংখ্যা বাড়ে। ব্যবসায়চক্রের দুইটি প্রধান লক্ষণ আছে। প্রথমত, উৎপাদন ও বেকার সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি। দ্বিতীয়ত, মূল্যস্তরের হ্রাস-বৃদ্ধি। ব্যবসায়চক্রের যখন উচ্চগতি হয় তখন উৎপাদন বাড়ে, বহু লোক কাজ পায় ও বেকার সংখ্যা কমে এবং ক্রমে ক্রমে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। আবার চক্রের গতি যখন নিম্নমুখী হয় তখন উৎপাদন কমিতে থাকে, কারখানায় লোক ছাঁটাই শুরু হয় ও বেকারের সংখ্যা বাড়ে এবং জিনিসপত্রের দাম নিম্নমুখী হয়। অর্থশাস্ত্রীরা ব্যবসায়চক্রের চারিটি স্তরের কথা বলেন। মন্দার পর কোন কারণে ব্যবসায়ের অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে যায়। ইহাকে রিকভারি বা মৃদু উত্থানগতি বলে। ইহাই ব্যবসায়চক্রের প্রথম স্তর। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল হইতে হইতে তেজীর দ্রুত তাল বা "বুম" (boom) শুরু হয়। অর্থাৎ লাভ খুব বেশি হারে বাড়িতে থাকে, উৎপাদন দ্রুত তালে বাড়ে ও জিনিসপত্রের দাম বেশি চড়িতে থাকে। এই অবস্থাকেই ইংরাজীতে 'বুম' বলে। কিন্তু কারবারের এইরূপ দ্রুতগতি চিরকাল চলিতে পারে না। দ্রুত চলার পথে একদিন সহসা নানা বাধা উপস্থিত হয়। ব্যবসায়ের আকাশে মেঘ দেখা দেয় ও কালক্রমে ঝড় আরম্ভ হয়। প্রথম দিকে দুই একটি অসাবধান ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান বেশি বাড়াবাড়ি করে বলিয়া পতনোন্মুখী হয়। ব্যাঙ্ক হয়ত সুদের হার বাড়ায় ও ব্যবসায়ীদের আর টাকা ধার দিতে ইতস্তত করে। তখন অনেক ব্যবসায়ী

অর্থের অভাবে বাজারে মাল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। ইহাই তৃতীয় বা মৃদু মন্দার (recession) অবস্থা। ইহার পর আসে চতুর্থ ধাপ। ক্রমে ক্রমে ব্যবসায়ের অবস্থা দ্রুত নীচের দিকে নামিতে থাকে ও কমিতে থাকে। কারখানায় কারখানায় লোক ছাঁটাই শুরু হয়। উৎপাদন কমিয়া যায়। বেকারের সংখ্যা বাড়ে। ইহাই হইল পূর্ণ মন্দার (depression) অবস্থা। ইংরাজীতে এই চারিটি স্তবকে রিকভারি, বুম, রিসেসন ও ডিপ্রেসন আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—মন্দা হইতে উত্থান লাভ ও মৃদু মৃদু তেজীর প্রকাশ, তেজীর দ্রুত তাল, মৃদু মন্দা ও পূর্ণ মন্দা।

এই উত্থান-পতনকে এই জন্য "সাইকৃল্ বা চক্র" বলা হয় যে, ব্যবসায়ের গতি যত উচ্চে উঠিবে, আবার অন্যদিকে ততটা নামিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। একদিকে যত হাসি, অন্যদিকে তত কান্না। ব্যবসায়ের এই পরিবর্তন সুখ-দুঃখের মতই চক্রবৎ চলে। উত্থানের ভিতরই পতনের বীজ নিহিত থাকে। ইহা ছাড়া এই উত্থান-পতনের ভিতরে কিছুটা সময়ের নির্দিষ্টতাও (periodicity) দেখা যায়। ব্যবসায়চক্রের বিভিন্ন স্তর প্রায় নিয়মিতভাবে ঘটে। পূর্বে বলা হইত যে, একটি ব্যবসায়চক্র পূর্ণ হইতে ১০।১২ বৎসর লাগে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সময়ের ব্যবধান এতটা নির্দিষ্ট নয়।

ব্যবসায়চক্রের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথমত, ব্যবসায়চক্র সর্বশিল্পে ও সর্বদেশে বিস্তার সমকালীন (synchronic)। অর্থাৎ তেজীর সময় প্রায় সব শিল্পেই তেজী ভাব দেখা দেয়; আবার মন্দার সময় প্রায় সব শিল্পেই মন্দ দেখা দেয়। একটি শিল্পের অবস্থা ভাল হইলে সেখানকার উৎপাদকেরা বেশি কাঁচা মাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কিনিবে ও বেশি শ্রমিককে কাজ দিবে। ইহার ফলে অন্যান্য শিল্পের বিক্রয় বাড়িবে, অবস্থার উন্নতি হইবে ও ক্রমে তেজীর ভাব দেখা দিবে। তেমনি মন্দার প্রভাবও এইভাবে এক শিল্প হইতে অন্য শিল্পে ছড়াইয়া পড়ে। অর্থাৎ ব্যবসায়চক্রের প্রভাব সংক্রামক। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়চক্র আন্তর্জাতিক। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বিনিময়ের দ্বারা বিভিন্ন দেশের ভিতর ঘনিষ্ঠতা এত বাড়িয়াছে যে, একদেশে মন্দা বা তেজীর ভাব আরম্ভ হইলে ইহা অন্য দেশেও শীঘ্রই ছড়াইয়া পড়ে। আমেরিকায় রিসেসন বা মৃদুমন্দা উপস্থিত, ইহার ফলে ভারতবর্ষে পাটজাত দ্রব্যের মূল্য কমিতে থাকে ও ক্রমে অন্যান্য ব্যবসায়েও

এই মৃদুমন্দার ভাব দেখা দেয়। তৃতীয়ত, একই সঙ্গে সব শিল্পে তেজী বা মন্দা দেখা দিলেও তেজী বা মন্দার প্রভাব সর্বত্র সমান নয়। সাধারণত দেখা যায় যে যন্ত্রশিল্প, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি গঠনমূলক শিল্পে (Constructional industries) উৎপাদন হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ বেশি। তেজীর সময় এইসব শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ অনেক বাড়ে, আবার মন্দার সময় এইসব শিল্পে ইহা একেবারে কমিয়া যায়। ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনশিল্পের চেয়ে উৎপাদক দ্রব্য উৎপাদনশিল্পে উত্থান-পতনের হার বেশি থাকে। ভোগ্যদ্রব্য (Consumer goods) উৎপাদনশিল্পেও অবস্থাব পরিবর্তন হয়। উৎপাদন বাড়ে, লাভ বেশি হয় ও অধিকসংখ্যক লোক কাজ পায়। কিন্তু ইহার তুলনায় সাধারণত উৎপাদকদ্রব্য (Produccer's goods) শিল্পে হ্রাসবৃদ্ধির হার অনেক বেশি। অর্থাৎ তেজীর সময় ইহারা অনেক বেশি প্রসার লাভ করে। আবার মন্দার সময় ইহাদেব অবস্থা খুব বেশি খারাপ হয়।

ব্যবসায়চক্রের কারণ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব (Theories of trade cycle) : ব্যবসায়চক্র সম্বন্ধে অনেকগুলি তত্ত্ব আছে। ইহার সবগুলি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আমরা প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলি আলোচনা করিব।

ঋতুমূলক তত্ত্ব (Climatic theory) : ইংরাজ লেখক Jevons বলিয়াছেন যে, "সূর্য কলঙ্কই" (sun spot) ব্যবসায়চক্রের প্রধান কারণ। প্রতি ১০'৪৫ বৎসরে একবার করিয়া সূর্যকলঙ্ক দেখা দেয়। Jevons হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে ব্যবসায়চক্রেরও গড়পড়তা ১০'৪৬ বৎসর। সূর্য-কলঙ্ক দেখা দিলে সূর্যের উত্তাপ কমিয়া যায়, ফলে ফসল কম হয়। ইহাতে কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়া যায় এবং মন্দা আসে। ফলে অন্যান্য ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়। একটু অন্যভাবে H. L. Moore এবং Sir William Beveridge এই তত্ত্ব সমর্থন করেন।

কৃষির উন্নতির উপর যে শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে একথা কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু ঋতুচক্রের সহিত ব্যবসায়চক্রের সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নয়। ব্যবসায়চক্রের উপর ঋতুর কিছুটা প্রভাব হয়ত থাকিতেও পারে। কিন্তু ইহার জন্য ব্যবসায়চক্র ঘটে একথা বলা চলে না। মন্দার চেয়ে তেজীর সময় উৎপাদকদ্রব্যের উৎপাদন কেন বেশি হয় তাহা এই তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।

অতি সঞ্চয় অথবা অল্প ভোগতত্ত্ব (Theories of oversaving or under-consumption) : Marx-এর সূত্র ধরিয়া Hobson বলিয়াছেন যে অতি সঞ্চয়ই ব্যবসায়চক্রের কারণ। আয়ের অসাম্য আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক দেশেই বড়লোকের সংখ্যা কম, গরিবের সংখ্যা বেশি। যখন ব্যবসায়ের অবস্থা উন্নত হয়, তখন ধনিকশ্রেণীর আয় বাড়ে এবং তাহারা ইহার অধিকাংশই সঞ্চয় করে। সঞ্চিত অর্থ ক্রমাগত ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করিয়া কলকব্জা, যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করা হয়। ইহার ফলে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন ক্রমে বাড়িয়া যায়। কিন্তু মোট আয়ের অধিকাংশই যাহাদের হাতে যায় অর্থাৎ ধনীরা ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে কম ব্যয় করে, বেশি সঞ্চয় করে। আর অধিকাংশ লোকের হাতে যায় মোট আয়ের কম অংশ। সুতরাং তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা সেই অনুপাতে বাড়ে না। একদিকে ক্রয় ক্ষমতা কম হারে বাড়ে, অন্যদিকে পণ্যের সরবরাহ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ফলে বাজারে মাল জমিয়া যায় এবং মন্দা দেখা দেয়। চাহিদার অভাব হেতু এরূপ ঘটে। অতিশয় সঞ্চয় করার ফলেই চাহিদার অভাব হয়। সুতরাং অতি সঞ্চয় বা অল্প ভোগ মন্দার কারণ।

এই তত্ত্বে মন্দার ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ব্যবসায়চক্রের নহে। মন্দার ব্যাখ্যা হিসাবেও ইহা ভ্রমাত্মক। কেন ব্যবসায়ীরা ক্রমাগত সঞ্চয় করিয়া যাইবে? তাহারা বিলাসব্যসনে ব্যয় করিতে পারে। ইহা ছাড়া এই তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, সঞ্চিত অর্থ সমস্তই বিনিয়োগ হয়। কিন্তু ইহা সত্য নহে। ব্যবসায়ের লাভের আশা কমিয়া গেলে সঞ্চিত অর্থ ব্যবসায়ে কম খাটিবে। এই তত্ত্বে বলে যে, ভোগ্যদ্রব্যের অত্যধিক উৎপাদনের জন্য বাজারে মন্দা দেখা দেয়। অতএব ভোগ্যদ্রব্যের মূল্যহ্রাস মন্দার প্রথম চিহ্ন হওয়া উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মন্দার সময় প্রথমে উৎপাদক দ্রব্যের দাম কমে। ভোগ্যদ্রব্যের দাম পরে কমে।

আর্থিকতত্ত্ব (Monetary Theory) : Hawtrey প্রভৃতি কয়েকজন লেখকের মতে টাকার পরিমাণ বাড়া-কমাই ব্যবসায়চক্রের প্রধান কারণ। ব্যবসায়ীরা ব্যাঙ্কের নিকট টাকা কর্জ করিয়া নিজেদের ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে। ব্যাঙ্কগুলির তহবিলে যখন বেশ টাকা জমা থাকে, তখন ইহারা কম সুদে বেশি পরিমাণ টাকা কর্জ দিতে রাজী থাকে। ব্যবসায়ীরা

এই টাকা কর্জ নেয় ও নানাভাবে ব্যবসায় বৃদ্ধির চেষ্টা করে। ফলে নিয়োগ বাড়ে ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এইভাবে উন্নতির বীজ এক ব্যবসায় হইতে অন্যত্র ছড়াইয়া পড়ে। সুদের হার কম থাকিলে পাইকারী ও খুচরা কারবারীরা বেশি দেনা করে ও বেশি মালের অর্ডার দেয়। বেশি অর্ডার পাওয়ার ফলে উৎপাদকেরা উৎপাদন বাড়ায়, বেশি শ্রমিক নিয়োগ করে ও কাঁচা মাল কেনে। ইহার ফলে জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়ে। ব্যবসায়ীরা দেখে যে তাহাদের মাল সবই বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। তাহারা আরও বেশি অর্ডার দেয় এবং উৎপাদকেরা আরও উৎপাদন বাড়ায়। ফলে আয় ও ব্যয় উভয়ই বাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দামও বাড়িতে থাকে। ভবিষ্যতে আরো দাম বাড়িবে এই আশায় ব্যবসায়ীরা বেশি করিয়া মাল মজুত রাখার চেষ্টা করে।

যতক্ষণ ব্যাঙ্কগুলি কম সুদে প্রয়োজনমত ধার দিতে রাজী থাকে, ততক্ষণ ব্যবসায়ের অবস্থা ভালই থাকে। কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির ফলে প্রত্যেককে এখন বেশি করিয়া টাকা হাতে রাখিতে হইতেছে। ফলে ব্যাঙ্ক হইতে লোকে টাকা তুলিতে থাকে ও ক্রমে ব্যাঙ্কের তহবিলে টান পড়ে। তখন ব্যাঙ্ক বাধ্য হইয়া সুদের হার বাড়ায় এবং আর বেশি ধার দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। ইহার ফলে তেজীর ভাব কাটিয়া যায়। ব্যবসায়ীরা কম ধার পায় বলিয়া কম মাল মজুত রাখে এবং কম মালের অর্ডার দেয়। উৎপাদকেরা উৎপাদন কমায় ও ফলে নিয়োগ কমিতে থাকে। এইভাবে মন্দা দেখা দেয়। আবার মন্দার সময়ে ব্যবসায়ীরা ধার কম নেয়। দাম কমিতে থাকে বলিয়া লোকেরা ব্যাঙ্ক হইতে কম টাকা তোলে। ফলে ক্রমে ক্রমে ব্যাঙ্কের তহবিলে টাকা জমা হয়। তহবিল এত বাড়ে যে ব্যাঙ্ক আবার সুদ কমায়। আবার চক্র ঘুরিতে আরম্ভ করে। ব্যাঙ্ক যদি সুদের হার ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া মূল্যস্তর স্থির রাখে, তবেই ব্যবসায়চক্রের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

অনেকে এই তত্ত্ব স্বীকার করে না। তাহাদের মতে ব্যবসায়চক্রের আসল কারণ মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ কমবেশি হওয়া। টাকার পরিমাণ কম বেশির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। অনেক সময়েই দেখা যায় যে, টাকার পরিমাণ বাড়াইলেও উৎপাদন বাড়ে না বা দাম চড়ে না।

বিশেষ করিয়া যখন দেশব্যাপী মন্দার ফলে ব্যবসায়ীরা হতাশ্বাস হইয়া পড়ে ও লাভের পরিবর্তে লোকসানের আশংকায় পীড়িত হয়, তখন সুদের হার কমাইয়া দিলেও তাহারা ব্যবসায়ে বিনিয়োগের জন্য কর্জ লইতে চাহিবে না। আবার মূল্যস্তর স্থির থাকিয়াও ব্যবসায়ের উত্থান-পতন হইতে পারে।

আশা-নিরাশা মনোভাবতত্ত্ব (Psychologicial Theory): কেম্ব্রিজের অধ্যাপক Pigou-র মতে ব্যবসায়চক্রের আসল কারণ ব্যবসায়ীদের মনোভাবের পরিবর্তন। যখন কোন ব্যবসায় ভাল চলে, বেশ ভাল হয়, তখন লোকে ভবিষ্যতে আরো লাভের আশা করে। তাহারা উৎপাদন বাড়ায়। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর বিশ্বাস অন্য শ্রেণীতে প্রসার লাভ করে। তেমনি এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের নিরাশা অন্য শ্রেণীতে ছড়াইয়া পড়ে। অধিক লাভের আশায় উৎপাদন বাড়াইতে বাড়াইতে অনেক সময় মাত্রা বেশি হইয়া যায়, ভুল হয়। ফলে কোন কোন ব্যবসায়ীর ক্ষতি হয় এবং আশাভঙ্গের ফলে তাহারা উৎপাদন কমায়। তাহাদের আশাভঙ্গের প্রভাব অন্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। এইভাবে ব্যবসায়ীরা আশা-নিরাশার স্রোতে দোল খায়। এই তত্ত্বের সমর্থকেরা অন্যান্য বিষয় যেমন, কৃষির অবস্থা, ইত্যাদির প্রভাব অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁহাদের মতে অন্য ঘটনার প্রভাব ব্যবসায়ীদের আশা-নিরাশার মনোভাবের মাধ্যমেই চারিদিকে ছড়াইয়া যায়।

এই তত্ত্বে যে কিছু সত্য আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্যবসায়ীদের মনোভাবের উপর ব্যবসায়ের অবস্থা অনেকাংশে নির্ভর করে। কিন্তু কেন তেজী আরম্ভ হয় এবং কি করিয়া নিরাশার পরে আশার আলো দেখা দেয় সে প্রশ্নের উত্তর ইহাতে পাওয়া যায় না। কেন আশা নিরাশায় পরিণত হয় ইহার সন্ধানও এই তত্ত্বে পাওয়া যায় না। এইজন্য অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করা দরকার। ব্যবসায়ীদের বিশ্বাস ফিরিয়া না আসিলে মন্দা কাটিলে তেজী দেখা দেয় না একথা সত্য।

আধুনিক তত্ত্ব (Modern Theory): Keynes এবং বর্তমান যুগের অন্যান্য লেখকদের মতে বিনিয়োগের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় বলিয়া ব্যবসায় চক্র দেখা দেয়। মন্দার শেষভাগে কোন কারণে হয় মূলধনের প্রান্তিক

উৎপাদনের হার (marginal efficiency of capital) বাড়ে, নয় সুদ কমে। নূতন উদ্ভাবন, নূতন উপকরণপ্রাপ্তি, যন্ত্রপাতির পরিবর্তন, অথবা মজুদ মালের ঘাটতির জন্য মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের হার বাড়ে। অর্থাৎ এইসব কারণের জন্য ব্যবসায়ীরা মনে করে যে, পূর্বের চেয়ে এখন লাভের সম্ভাবনা বেশি। ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা বাড়ার জন্য অথবা অন্য কারণেও সুদের হার কমে। দুইটির যে কোনটির জন্য মূলধন বিনিয়োগ বাড়ে। উৎপাদক দ্রব্যের উৎপাদন যতই বাড়ান যায়, ততই নিয়োগ বাড়ে। নিয়োগ বাড়িলে মোট আয় বাড়ে। এইভাবে বিনিয়োগবৃদ্ধির ফলে তেজীর সূচনা দেখা দেয় এবং যতদিন বিনিয়োগ বাড়িতে থাকে ততদিন তেজীর ভাব থাকে। কিন্তু কালক্রমে বিনিয়োগের সুযোগ কমিয়া যায়। আবার ক্রমাগত উৎপাদকদ্রব্য উৎপাদনের ফলে তাহাদের আয় বাড়ে। এই দুইটি কারণে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের হার কমিতে শুরু হয়। সুদ যদি না কমে বা কম পরিমাণে কমে, তবে বিনিয়োগ কমিয়া যায়। সাধারণত সুদ কমে না। পক্ষান্তরে আয় এবং ব্যবসায়বৃদ্ধির ফলে টাকার প্রয়োজন বাড়ে। ফলে ব্যাঙ্কের তহবিল হইতে বেশি টাকা লোকেরা তুলিয়া লয় বলিয়া সুদের হার বাড়ে। ফলে মূলধন বিনিয়োগ কমে। বিনিয়োগ কমিলে নিয়োগ ও আয় কমে এবং মন্দা দেখা দেয়।

ব্যবসায়চক্রের কারণ (Causes of the trade cycle) : ব্যবসায়-চক্রের কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনার পর শেষ কথা এই দাঁড়ায় যে, ইহার প্রধান কারণ মূলধন বিনিয়োগ (Investment) এর পরিবর্তন। নানাকারণে কোন সময়ে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ বেশি হারে বাড়িতে থাকে। তাহার ফলে তেজীর ভাব দেখা দেয়। আবার মন্দা উপস্থিত হওয়ার কারণ মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ বেশি হারে কমিয়া যাওয়া। মূলধন বিনিয়োগ বাড়া-কমার ফলে যে তেজী মন্দা দেখা যায় এ সম্বন্ধে আজকাল আর দ্বিমত নাই। সূর্যকলঙ্ক বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণের জন্য ব্যবসাযচক্র হয় না, কিংবা অতি সঞ্চয় বা ভোগাল্পতার জন্যও ব্যাপক-ভাবে তেজী মন্দা উপস্থিত হয় না।

কেন মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ কোন সময় বেশি বাড়ে, আবার অন্য সময় কমে, ইহার ব্যাখ্যা করিলেই ব্যবসায়চক্রের কারণ জানা যাইবে।

স্বচ্ছন্দ ধার না পাওয়া গেলে ব্যয়বৃদ্ধির সব সময়ে সম্ভব হয় না। ইহা অবশ্য ঠিক। কিন্তু তাই বলিয়া সুদের হার বাড়া-কমার সঙ্গে মূলধন বিনিয়োগের পরিবর্তনের কোন পাকাপাকি সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সুদের হার কম থাকিলেই যে মূলধন বিনিয়োগ বাড়িবে কিংবা সুদের হার বাড়িলে বিনিয়োগ কমিবে একথা সব সময়ে জোর করিয়া বলা যায় না। কিন্তু কোন সময়েই যে তাহা হইবে না একথাও বলা ঠিক হইবে না। সুতরাং মানিটারি থিওরী বা আর্থিক তত্ত্বকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কোন কোন সময়ে যে অর্থ, ব্যবসায়চক্ররূপ অনর্থের কারণ হইতে পারে. একথা মানিয়া লওয়া উচিত হইবে। বরঞ্চ অন্যান্য কারণে তেজীর সূচনা দেখা দিলে সুদের হার কম থাকা ও সহজে ব্যাঙ্কে ধার পাওয়ার সুবিধার জন্য হয়ত তেজীর ভাব অতি শীঘ্র ও দ্রুত তালে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। আবার কোন কারণে ব্যবসায়ী মহলে যখন তেজীর ভাব স্তিমিত হইয়া আসে, তখন যদি সুদের হার চাড়িতে থাকে ও ব্যাঙ্কে ধার পাওয়া কঠিন হইয়া উঠে. তবে মন্দার মৃদু গতি তাণ্ডবে পরিণত হইতে পারে। অর্থাৎ ধার পাওয়ার সুবিধা কম বেশি হওয়ার ফলে ব্যবসায়চক্র পূর্ণবেগ. মৃদু কি দ্রুত হইতে পারে।

অন্য কোন্ কোন্ কারণে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে কমে এ সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট মতান্তর আছে। বিভিন্ন লেখক এ বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং এখনও এই আলোচনার শেষ হয় নাই।

সমাধানের উপায় (Remedies) : ব্যবসায়ের এই উত্থান-পতনের সমস্যা বর্তমান যুগের প্রধান সমস্যা। কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের উপায় কি সে বিষয়ে মতভেদ আছে। রোগ নির্ণয়ের উপর ঔষধ প্রয়োগ নির্ভর করে। যাঁহারা মনিটারি থিওরিতে বিশ্বাস করেন তাঁহাদের মতে মুদ্রার পরিমাণ ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করিলেই সমস্যার সমাধান হইবে। তাঁহারা বলেন যে ব্যবসায়ের অতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিলে ব্যাঙ্কগুলির সুদের হার বাড়াইয়া দিবে ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাজারে কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিয়া দেশে চালু টাকার পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করিবে। তেমনি মন্দার সম্ভাবনা দেখা দিলে সুদ কমাইয়া এবং কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিয়া চালু অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। তাঁহাদের মতে এইভাবে

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাজারে কম বেশি পরিমাণ টাকা চালু করিয়া ব্যবসায়চক্র নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

যাঁহারা মনে করেন যে বিনিয়োগের পরিবর্তনই ব্যবসায়িচক্রের কারণ, তাঁহারা তেজীর সময় মূলধন বিনিয়োগ হ্রাস এবং মন্দার সময় বিনিয়োগ-বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। যখন ব্যবসায়ে অতিবৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায় ও মূল্যস্তর বেশি বাড়িবার সম্ভাবনা হয়, তখন সরকার এমন নীতি অবলম্বন করিবে যাহার ফলে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। আবার যখন চারিদিকে মন্দার হাওয়া বহিতে আরম্ভ করে, উৎপাদন কমিতে থাকে, বেকারের সংখ্যা বাড়ে তখন মূলধন বিনিয়োগ যাহাতে বাড়ে সেই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। মূলধন বিনিয়োগবৃদ্ধির জন্য সরকার তিনরকম পন্থা অবলম্বন করিতে পারে। প্রথম, সুদের হার কমাইয়া দেওয়া ও কম রাখা; দ্বিতীয়, আয়করের হার কমান, ও তৃতীয়, সরকার হইতে স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদির জন্য বাড়িঘর তৈয়ারি, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি কাজের প্রয়োজন মত অর্থব্যয় করা। সুদের হার কমাইয়া ব্যবসায়ীরা যাহাতে বেশি ধার লয় ও টাকাটা ব্যবসায়ে খাটায় ইহার চেষ্টা করিতে হইবে। আয়করের হার কমাইলে ব্যবসায়ীদের হাতে বেশি টাকা থাকিবে। ইহাতে আশা করা যায় যে তাহারা বেশি মূলধন বিনিয়োগ করিবে। সরকার নিজেই যদি সরকারী বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, রেলওয়ে ও সেতু প্রভৃতি নির্মাণের কাজ শুরু করিয়া বেকারদের কাজ দিবার ব্যবস্থা করে, তবে হয়ত মন্দার আবহাওয়া কাটিতে পারে। যত লোক কাজ পাইবে তাহাদের আয় বাড়িবে। আয় বাড়িলে ব্যয় বাড়িবে। অর্থাৎ জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়িবে। জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়িলে ব্যবসায়ীরা বেশি উৎপাদন শুরু করিবে। এইভাবে ক্রমে ব্যবসায়ের অবস্থা ভালোর দিকে যাইবে। আবার যখন ব্যবসায়ের অতিবৃদ্ধির আশংকা দেখা দেয়, তখন আয়করের হার বাড়াইয়া ব্যবসায়ীদের হাতের টাকা কমাইবার চেষ্টা করিতে হইবে ও সরকারী কাজে কম টাকা খরচ করিতে হইবে। বাড়ি, রাস্তাঘাট ইত্যাদি নির্মাণকার্য কমাইয়া দিতে হইবে। ইহার ফলে মোট বিয়োগের পরিমাণ কমিবে ও তাহার ফলে ব্যবসায়ের অতিবৃদ্ধি কমিতে পারে। এই সব ব্যবস্থাকে ব্যবসায়-চক্র

বিরোধী সরকারী আয়-ব্যয় নীতি (contra-cyclical fiscal policy) বলে।

এই নীতি অনুসারে তেজীর সময় ট্যাক্সের হার বাড়াইতে হইবে ও সরকারী ব্যয় কমাইতে হইবে। আবার মন্দার সময় ঠিক বিপরীত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ট্যাক্সের হার কমাইতে হইবে ও সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। এক কথায় বলা যায় যে, সব সময় যাহাতে সরকারী ও বেসরকারী মোট ব্যয়ের পরিমাণ এমন থাকে যাহার ফলে তেজী মন্দা কোন ভাবই দেখা দিবে না, এই নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। যখন বেসরকারী অর্থাৎ ব্যবসায়ী ও সাধারণ লোকের ব্যয়ের পরিমাণ বেশি মাত্রায় বাড়িবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন একদিকে বেশি ট্যাক্স বসাইয়া বেসরকারী ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করিতে হইবে ও অন্যদিকে প্রয়োজনমত সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ কমাইতে হইবে। আবার বেসরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে ও অন্যদিকে সরকারী ব্যয় বাড়াইয়া বেসরকারী ব্যয়ের ঘাটতি পূরণ করিতে হইবে। এই নীতি অনুযায়ী সরকারী ও বেসরকারী মোট ব্যয়ের পরিমাণ ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলে হয়ত ব্যবসায় জগতের চক্রবৎ পরিবর্তন বন্ধ করা সম্ভব হইতে পারে।

Exercises

Q. 1. Discuss the theories which have been put forward to account for the cyclical nature of trade fluctuations. (C. U. 1943 ; C. U. B. Com. 1953)

Mention some measures that have been suggested for the effective control of these fluctuations. (C. U. B.Com. 1952, '53c).

Q. 2. What are cyclical fluctuations ? Discuss their causes. Mention some measures that have been suggested for the effective control of such fluctuations. (C. U. 1943).

Q. 3. Account for the periodicity of business cycles. (C. U. 1953).

Q. 4. Examine the main features of business cycles and mention some measures that may be adopted to control these cycles. (C. U. B. Com. 1952).

Q. 5. Describe the phases of a typical business cycles. What remedial measures would you suggest for controlling these cycles ? (C. U. B. Com. 1955).

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

(International Trade)

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে সমস্ত আলোচনা করিতেছিলাম তাহাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই। দেশের মধ্যে কি কি জিনিস তৈয়ারি হয় ও ইহাদের মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হয় ইহাই আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল। অর্থাৎ আমরা ইংরাজীতে যাহাকে closed economy বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যবিহীন দেশ বলি ইহার বিষয়ই এতক্ষণ আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু সব দেশেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে,—বিদেশ হইতে নানা শ্রেণীর দ্রব্য ক্রয় করে ও বিদেশে নিজেদের তৈয়ারি জিনিস বিক্রয় করে। বিদেশের সঙ্গে এই কেনাবেচা কোন্ কোন্ কারণের জন্য হইতেছে? দেশীয় বাণিজ্য ও বিদেশী বাণিজ্যের মধ্যে কি কিছু বিশেষ পার্থক্য আছে? কেন আমরা বিদেশে পাট ও পাটের থলি রপ্তানি করি, আর কেনই বা বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানি করি? রপ্তানির কথা বোঝা সহজ, কারণ জিনিস বিক্রয় করিলে লাভ বাড়ে। কিন্তু যন্ত্রপাতি নিজেরা তৈয়ারি না করিয়া বিদেশ হইতে কেন আমদানি করা হয়? এই অধ্যায়ে এই ধরনের নানা প্রশ্নের আলোচনা করা হইবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি (Basis of international trade): শ্রমবিভাগের লাভই সকল ব্যবসায় বাণিজ্যের মূলভিত্তি। রামের হয়ত ডাক্তারির দিকে ঝোঁক আছে, স্বভাবতঃই রোগ ও পীড়া সে ভাল বোঝে। আবার শ্যাম কলকব্জা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে ভালবাসে; তাহার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দিকে ঝোঁক আছে। রাম যদি ডাক্তার ও শ্যাম ইঞ্জিনিয়ার হয়, তবে উভয়েরই লাভ। বাড়ি তৈয়ারির সময় রাম শ্যামের পরামর্শ লইবে। আর বাড়িতে রোগ হইলে শ্যাম রামকে কল দিবে। যে যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সে সে বিষয়ে কাজ করিলে সকলেরই লাভ। এইজন্য দেশের মধ্যে একজন লোক এক একটি কাজ লইয়া থাকে। যে যে কাজে দক্ষ সে তাহাই করে এবং নিজের প্রস্তুত দ্রব্য বা উপার্জিত অর্থের বিনিময়ে

আবশ্যকীয় জিনিস বাজার হইতে কেনে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও এই নিয়মের ভিত্তিতে অর্থাৎ শ্রমবিভাগ ও বিশেষজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। সব দেশ সব জিনিস তৈয়ারি করিতে পারে না। সোনার খনি, লোহার খনি বা কয়লার খনি সব দেশে নাই। অথচ দুইচারিটি থাকিলেও প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। বিলাতের জমি ও আবহাওয়াতে পাট, চা বা রবার হয় না। কাজেই এইসব দেশকে বিদেশ হইতে জিনিস আমদানি করিয়া নিজেদের অভাব মিটাইতে হয়। আর দেশের মধ্যে যদি সব রকম জিনিস পাওয়াও যায়, তবুও বিদেশ হইতে আমদানি করায় লাভ আছে। ধরা যাক ভারতবর্ষে সব রকম জিনিস তৈয়ারি করা যায়। আমরা পাট, চা, তামাক তৈয়ারি করি, আবার যন্ত্রপাতি, কলকব্জাও প্রস্তুত করিতে পারি। কিন্তু যন্ত্রপাতি তৈযারি করিতে যে খরচ পড়ে, বিদেশ হইতে ইহার চেয়ে কম খরচে জিনিসগুলি আমদানি করা যায়। আমাদের দেশের শ্রমিকেরা বিদেশীর তুলনায় এ কাজে তেমন দক্ষ নয়, আর যন্ত্রপাতি তৈয়ারিতে যে পরিমাণ টেকনিক্যাল জ্ঞানের প্রয়োজন, বর্তমানে তাহাও আমাদের নাই। সেইজন্য যন্ত্রপাতি তৈযারিতে খরচ বেশি পড়িয়া যায়। কিন্তু জমি ও আবহাওয়া অনুকূল বলিযা পাট, চা তৈয়ারিতে খরচ বেশ কম হয়। সুতরাং বিলাত ও জার্মানিতে পাট, চা রপ্তানি করিয়া সে দেশগুলি হইতে সস্তায় যন্ত্রপাতি আমদানি করিলে আমাদের এবং সকল দেশেরই লাভ হয়।

আন্তর্জাতিক ও অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের পার্থক্য (Difference between international trade and domestic trade): সব রকম বাণিজ্যের প্রকৃতি যদি একই হয়, তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে পৃথক আলোচনা করার প্রয়োজন আছে কি? আদম স্মিথ, রিকার্ডো প্রভৃতি লেখকেরা মনে করিতেন যে, আন্তর্জাতিক ও অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পৃথক আলোচনা করা প্রয়োজন। দেশের ভিতরে যে কোন অঞ্চলে বা শিল্পে বেশি মজুরী পাওয়া গেলে শ্রমিকেরা সেখানে বা সেই শিল্পে কাজ লওয়ার চেষ্টা করিবে। ফলে সেই অঞ্চলে শ্রমিকের সরবরাহ বাড়িবে। সরবরাহ বাড়িলে দাম কমিবে অর্থাৎ মজুরীর হার কমিয়া যাইবে। এইভাবে মজুরীর হার

কমিতে কমিতে অন্য অঞ্চলের বা শিল্পের মজুরীর হারের সমান হইবে। সুতরাং দেশের মধ্যে সকল অঞ্চলেই মজুরীর হার একই থাকিবে, অর্থাৎ সমান দক্ষ শ্রমিক দেশের সর্বত্রই সমান হারে মজুরী পাইবে। কিন্তু দুইটি দেশের মধ্যে একথা খাটে না। মানুষ স্বভাবত নিজের দেশে থাকিতে পছন্দ করে। সে নিতান্ত বাধ্য না হইলে বিদেশে পাকাপাকিভাবে বাস করিতে চায় না, যদিও সে জানে যে বিদেশে গেলে বেশি রোজগার হইতে পারে। বিলাতে মজুরীর হার অনেক বেশি জানিয়াও ভারতীয় শ্রমিক সে দেশে যাইতে চায় না। কিংবা সব সময়ে যাওয়া সম্ভবও হয় না। সুতরাং ইংরাজ শ্রমিক যে হারে মজুরী পায়, সমদক্ষ একজন ভারতীয় শ্রমিক ভারতে তাহার চেয়ে কম পায়। মূলধন সম্বন্ধেও একথা খাটে। সকলেই নিজের দেশে মূলধন বিনিয়োগ করা পছন্দ করিবে। বেশি হারে সুদ না পাওয়া গেলে কেহই বিদেশে টাকা লগ্নী করিতে চাহিবে না। সুতরাং বিভিন্ন দেশের মধ্যে একই রকম ঝুঁকি থাকিলেও সুদের হারের যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। দেশের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে তৈয়ারি হইলেও একটি জিনিসের উৎপাদনব্যয় সর্বত্র একই থাকিবে। কিন্তু দুইটি দেশের মধ্যে তাহা নাও হইতে পারে। কারণ ভারতের শ্রমিক যে বেতন পায়, সমান দক্ষ হইলেও ইংরাজ শ্রমিক ইহার চেয়ে বেশি বেতন পায়। দক্ষতা সমান বলিয়া দুইজনের উৎপাদন সমান হইবে। কিন্তু বেতন বেশি বলিয়া ইংরাজ শ্রমিকের তৈয়ারি জিনিসের উৎপাদনব্যয় বেশি থাকিবে। এইজন্য ব্যয়ের পার্থক্য হয় ও বাণিজ্যের গতি ভিন্ন হয়। আন্তর্জাতিক ও অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের মধ্যে এই কারণে পার্থক্য আছে।

এই মতবাদের অনেক সমালোচনা হইয়াছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বা শিল্পে যে বেতনের হার একই হইবে একথা জোর করিয়া বলা চলে না। কারণ, শ্রমিকেরা সাধারণত নিজের বাড়িঘর ছাড়িয়া যাইতে চায় না। একথা দেশের ভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধেও খাটে। আবার একদেশের শ্রমিক অন্য দেশে যাইতে চায় না তাহা নহে। অনেক ভারতীয় বর্মা দেশে, মালয় দেশে, দক্ষিণ আফ্রিকা, এমন কি কানাডা ও আমেরিকায় গিয়া বাস করিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শ্রমিকদের সব সময়ে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত নাই এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যেও যথেষ্ট যাতায়াত

আছে। আদম স্মিথ ও রিকার্ডো যে পার্থক্যের কথা বলিয়াছেন তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। এই সমালোচনার মধ্যে অনেক সত্য নিহিত আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও রিকার্ডোর মত অগ্রাহ্য করা চলে না। কারণ, যে বাঙ্গালী শ্রমিক কলিকাতায় ৫০৲ টাকা রোজগার করিতেছে, তাহাকে বোম্বাইতে ৬০৲ টাকা দিলে সে যাইতে চাহিবে না সত্য। কিন্তু হয়ত ১০০৲ টাকা পাইলে সে বোম্বাই যাইবে। আবার মাসে ২০০৲ টাকা পাওয়া যাইতে পারে জানিলেও বিলাতে যাইতে রাজী হইবে না। সুতরাং দেশ ও বিদেশের মধ্যে চলাচলের পার্থক্য যে কিছু আছে তাহা অস্বীকার করা ঠিক হইবে না। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যে হারে লোক চলাচল করে, দেশ বিদেশের মধ্যে ইহার চেয়ে অনেক কম পরিমাণে চলাচল করে। সুতরাং রিকার্ডোর মতকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

ইহা ছাড়া আর একটি কারণে আন্তর্জাতিক ও অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের পার্থক্য করা চলে। দেশের মধ্যে সব অঞ্চলেই উৎপাদন সম্বন্ধে সাধারণত একই ধরনের আইন বহাল থাকে। বোম্বাই ও বাংলাদেশের উৎপাদকেরা সকলে একই হারে আয়কর ও উৎপাদনকর দেয়, একই কারখানা ও শ্রমিক আইন মানিয়া চলে। শ্রমিকসংঘ গঠন একই আইনে করা হয়। কিন্তু বিলাতের উৎপাদক ভিন্ন হারে কর দেয়, ভিন্ন ধরনের শ্রমিক আইন মানিয়া চলে ও সেখানকার শ্রমিকসংঘের গঠন এবং শক্তিও তফাৎ। সুতরাং তাহাদের উৎপাদনব্যয় এই সমস্ত কারণেও পৃথক হইতে পারে। সব দেশেই উৎপাদনব্যবস্থার উপর সরকারের প্রভাব খুব বেশি। কিন্তু বিভিন্ন দেশে সরকার উৎপাদনব্যবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন নীতি অবলম্বন করে। সেইজন্য উৎপাদনব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু দেশের মধ্যে সর্বত্রই একই নীতি বহাল থাকে। এইজন্যও আন্তর্জাতিক ও অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের পার্থক্য হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের শর্ত (**Condition for the development of international trade**): উৎপাদনব্যয়ের পার্থক্যের জন্যেই বাণিজ্য হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ইহার ব্যতিক্রম নয়। বিষয়টি বুঝাইবার জন্য উদাহরণস্বরূপ দুইটি দেশের কথা ধরা যাক এবং ইহারা মাত্র দুইটি জিনিস উৎপাদন করে। প্রথম দেশে বা ভারতবর্ষে,

১০০ দিনের পরিশ্রমে ২০ মণ পাট উৎপন্ন হয়

অথবা ১০০ " " ৩০ মণ তুলা " "

দ্বিতীয় দেশে বা বর্মাদেশে

১০০ দিনের পরিশ্রমে ১০ মণ পাট উৎপন্ন হয়

অথবা ১০০ " " ১৫ মণ তুলা " "

এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে দুইটি জিনিসই বর্মাদেশের তুলনায় কম খরচে উৎপাদন করা যায়। এই দুইটি দেশে কি বাণিজ্য চলিতে পারে? ভারতবর্ষে ২০ মণ পাট তৈয়ারির যাহা খরচ ৩০ মণ তুলা তৈয়ারিতে তাহাই খরচ হয়। জিনিসের মূল্য যদি ইহার উৎপাদনব্যয়ের সমান হয় তবে ২ মণ পাটের বদলে ৩ মণ তুলা বিক্রয় হইবে। অর্থাৎ ভারতবর্ষে ২ মণ পাটের দাম ৩ মণ তুলার দামের সমান। বর্মাদেশে ১০ মণ পাটের দাম ১৫ মণ তুলার দামের সমান হইবে। অর্থাৎ ২ মণ পাটের দাম ৩ মণ তুলার দামের সমান। পাট ও তুলার উৎপাদনব্যয়ের অনুপাত (২ : ৩) দুই দেশেই এক। ভারতীয় ব্যবসায়ী যদি ২০ মণ পাট বর্মাতে পাঠায় তবে সেখানেও সে মাত্র ৩০ মণ তুলা পাইবে। অর্থাৎ তাহার কোন লাভ হইবে না। অতএব দুইটি জিনিস উৎপাদনেই বেশি দক্ষ হইলেও ভারতবর্ষ বর্মার সঙ্গে ব্যবসায় লাভ করিতে পারিবে না।

উদাহরণটির একটু পরিবর্তন করা যাক। ভারতবর্ষে

১০০ দিনের পরিশ্রমে ২০ মণ পাট হয়

অথবা ১০০ " " ৩০ " তুলা হয়।

বর্মাদেশে

১০০ দিনের পরিশ্রমে ১০ মণ পাট হয়

অথবা ১০০ " " ১০ " তুলা হয়।

বাণিজ্যের পূর্বে ভারতবর্ষে ২ মণ পাটের দাম ৩ মণ তুলার দামের সমান আছে। কিন্তু বর্মাতে ২ মণ পাটের দাম ২ মণ তুলার দামের সমান। ভারতীয় ব্যবসায়ী যদি ৩ মণের কম তুলা দিয়া ২ মণের বেশি পাট পায়, তবে সে বার্মাতে তুলা পাঠাইতে পারে। ২ মণ পাট দিয়া ২ মণের বেশি তুলা পাইলে বর্মাব্যবসায়ীরও লাভ হইবে। এই অবস্থায় দুইটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দুইটি জিনিসের ব্যয়ের

তুলনামূলক অনুপাত পৃথক হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলে। প্রথম উদাহরণে উভয় দেশেই পাট ও তুলার ব্যয়ের অনুপাত ২ : ৩ ছিল। অতএব তাহাদের মধ্যে বাণিজ্য হইল না। দ্বিতীয় উদাহরণে ভারতবর্ষে পাট ও তুলার ব্যয়ের অনুপাত ২ : ৩ এবং বর্মাতে ২ : ২। এখানে ব্যয়ের অনুপাতের পার্থক্য আছে বলিয়া বাণিজ্য সম্ভব হইবে। এই অবস্থায় ভারতীয় ব্যবসায়ী বর্মাদেশে তুলা রপ্তানি করিবে ও বর্মা হইতে পাট আমদানি করিবে। কারণ ভারতবর্ষ বর্মার তুলনায় দুইটি জিনিস উৎপাদনেই বেশি দক্ষ সন্দেহ নাই। কিন্তু তুলা উৎপাদনে তাহার দক্ষতা অপেক্ষাকৃত বেশি। এইজন্য সে তুলা উৎপাদন ও রপ্তানি করিবে।

তুলনামূলক উৎপাদনব্যয়ের নিয়ম (Law of comparative cost): দুইটি দেশের মধ্যে উৎপাদনব্যয়ের অনুপাতের পার্থক্য থাকিলে তাহাদের মধ্যে বাণিজ্য চলে। উৎপাদনব্যয়ের অনুপাতের পার্থক্য কেন হয়? ইহার প্রধান কারণ উৎপাদনের উপকরণের পার্থক্য। কোন দেশে সোনা, রূপা, কয়লা, লোহা ইত্যাদি খনিজ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, আবার কোন দেশে ইহা পাওয়া যায় না। বাংলা দেশের মাটি ও আবহাওয়া পাট এবং চা উৎপাদনের উপযুক্ত। আমেরিকার মাটি তুলা উৎপাদনের উপযুক্ত। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় প্রচুর মূলধন পাওয়া যায়, ভারতে মূলধনের অভাব। অতএব উৎপাদনের উপকরণের সরবরাহ সর্বত্র সমান নয়। সুতরাং তাহাদের পারিশ্রমিকের হারও সব দেশে সমান নয়। যে দেশে প্রচুর পরিমাণে প্রথম শ্রেণীর জমি পাওয়া যায় সে দেশে কৃষিকার্য উন্নত হয়। আর যে দেশে দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায় সে দেশে কারখানা শিল্প উন্নত হয়। এইজন্য দেখা যায় যে, কোন একটি দেশ একটি বা কয়েকটি জিনিস উৎপাদনে বিশেষ দক্ষ। আবার অন্য দেশ ভিন্ন জিনিস উৎপাদনে দক্ষ। যে দেশ যে জিনিস উৎপাদনে দক্ষ, সে সেই জিনিস উৎপাদন করে ও রপ্তানি করে এবং যে জিনিসে তাহার দক্ষতা সর্বাপেক্ষা কম ইহা বিদেশ হইতে আমদানি করে। ইহাকে তুলনামূলক উৎপাদনব্যয়ের নিয়ম বলে।

একটি উদাহরণ দিলে নিয়মটি সহজে বোঝা যাইবে। ধরা যাক, ভারতবর্ষ ও বর্মা এই দুইটি দেশ পাট ও সেগুন-কাঠ এই দুইটি জিনিস

উৎপাদন করে। আর উৎপাদন বাড়া-কমার ফলে প্রান্তিক উৎপাদনব্যয়ের তফাৎ হয় না। আর দুইটি দেশের মধ্যে বিনা খরচে জিনিস পাঠান হয়।

ভারতবর্ষে

১০০ দিনের পরিশ্রমে ২০ মণ পাট উৎপন্ন হয়

১০০ " " ২০ " সেগুণ কাঠ তৈয়ারি হয়।

বর্মাতে

১০০ দিনের পরিশ্রমে ১০ মণ পাট উৎপন্ন হয়।

১০০ " " ৩০ মণ সেগুণ কাঠ তৈয়ারি হয়।

বর্মার সঙ্গে বাণিজ্য হওয়ার পূর্বে ভারতবর্ষে ১ মণ পাটের দাম ১ মণ সেগুণ কাঠের দামের সমান; কারণ ইহাদের উৎপাদবব্যয় সমান। উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাত ১ : ১। বর্মাতে এক মণ পাটের দাম ৩ মণ সেগুণ কাঠের সমান। উভয়ের উৎপাদনব্যয়ের অনুপাত ১ : ৩। অতএব দুইদেশে উৎপাদমব্যয়ের অনুপাত পৃথক। ১ মণ পাট পাঠাইয়া যদি ১ মণের বেশি সেগুণ কাঠ পাওয়া যায় তবে ভারতবর্ষের লাভ। ৩ মণের কম সেগুণ কাঠ পাঠাইয়া যদি ১ মণ পাট পাওয়া যায় তবে বর্মার লাভ। অতএব ভারতবর্ষ যদি কেবলমাত্র পাট উৎপাদন করে এবং বর্মা যদি কেবলমাত্র সেগুণ কাঠ তৈয়ারি করে তবে উভয় পক্ষের লাভ। বাণিজ্যের পূর্বে ২০০ দিনের পরিশ্রমে ভারতবর্ষে ২০ মণ পাট ও ২০ মণ কাঠ তৈয়ারি হইত; বর্মার ২০০ দিনের পরিশ্রমে ১০ মণ পাট ও ৩০ মণ কাঠ হইত। অর্থাৎ দুই দেশের মিলিত পরিশ্রমে ৩০ মণ পাট ও ৪০ মণ কাঠ উৎপন্ন হইত। বাণিজ্যের পরে ভারতবর্ষ কেবল পাট উৎপন্ন করিবে। ২০০ দিনের পরিশ্রমে ৪০ মণ পাট হইবে। বর্মা কেবল কাঠ তৈয়ারি করিবে ও ২০০ দিনের পরিশ্রমে ৬০ মণ কাঠ উৎপন্ন হইবে। উভয় দেশের মিলিত পরিশ্রমে ৪০ মণ পাট ও ৬০ মণ কাঠ উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং বাণিজ্যের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যাইবে।

এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। আমরা ভারত-বর্ষের পাটের উৎপাদনব্যয়ের সহিত বর্মার পাট উৎপাদনব্যয়ের তুলনা করি না। ইহা করা সম্ভব নয়। কারণ বাণিজ্য আরম্ভ হইবার পূর্বে আমরা দুইটি দেশের মুদ্রার মধ্যে বিনিময়হার জানি না। জিনিস বেচা-কেনা ও

টাকা লেন-দেনের ফলে বিনিময়হার প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং বাণিজ্যের পূর্বে বিনিময়হার জানা যায় না। বিনিময় হার না জানিলে কোন্ দেশে কোন্ জিনিস সস্তা তাহা বলা যায় না। তুলনামূলক উৎপাদনব্যয়ের নিয়মে ভারতবর্ষে পাটের ও কাঠের উৎপাদনব্যয়ের অনুপাতের সহিত বর্মা দেশে পাট ও কাঠের উৎপাদনব্যয়ের অনুপাত তুলনা করা হয়। এই তুলনা করিতে উভয় দেশের মুদ্রার বিনিময়হার জানা প্রয়োজন হয় না। আমরা একথা বলি না যে, ভারতবর্ষে পাটের উৎপাদনব্যয় বর্মা হইতে কম বলিয়া ভারতবর্ষ পাট রপ্তানি করে। আমরা বলি যে, ভারতবর্ষে একমণ পাটের দামে যতটুকু সেগুণ কাঠ কেনা যায়, বর্মাতে যদি সেই পরিমাণ পাটের বদলে বেশি বা কম সেগুণ কাঠ পাওয়া যায়, তবে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য করা সম্ভব হয়। বাণিজ্য শুরু হইলে ভারতবর্ষ ক্রমে ক্রমে কেবল পাট উৎপাদনে লিপ্ত থাকিবে ও বর্মা সেগুণ কাঠ তৈয়ারি করিবে। যে যে কাজে সর্বাপেক্ষা বেশি দক্ষ, সে কেবল সেই কাজ লইয়া থাকিলে সকলেরই লাভ হয়। ইহাই তুলনামূলক উৎপাদনব্যয়ের নিয়মের মূলকথা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এই নিয়মে চলে।

তুলনামূলক ব্যয়নীতির বিভিন্ন দিক: তুলনামূলক ব্যয়নীতির আর একটি উদাহরণ ধরা যাক। ভারতবর্ষে

১০০ দিনের পরিশ্রমে ২০ মণ ধান হয়
অথবা ১০০ „ „ ৩০ মণ পাট হয়।

বর্মাদেশে

১০০ দিনের পরিশ্রমে ১৫ মণ ধান হয়
অথবা ১০০ „ „ ১৫ মণ পাট হয়।

বর্মাদেশের সহিত বাণিজ্য হইবার পূর্বে ভারতবর্ষে ২ মণ ধানের পরিবর্তে ৩ মণ পাট পাওয়া যাইত। অথবা ২ মণ ধান কিনিতে ৩ মণ পাট দিতে হইত। বর্মাদেশও বাণিজ্যের পূর্বে ২ মণ ধান দিয়া মাত্র ২ মণ পাট পাওয়া যাইত। উভয় দ্রব্যের উৎপাদনব্যয়ের তুলনামূলক অনুপাত পৃথক। ভারতবর্ষে পাট ও ধানের মধ্যে উৎপাদনব্যয়ের অনুপাত হইতেছে ৩ : ২। বর্মাদেশে ইহাদের উৎপাদনব্যয়ের অনুপাত ২ : ২। উৎপাদনব্যয়ের অনুপাত পৃথক বলিয়া দুইটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্ভব হইবে। ভারতীয় ব্যবসায়ী

যতক্ষণ পর্যন্ত ৩ মণের কম পাট বেচিয়া ২ মণ ধান পাইবে ততক্ষণ তাহার লাভ হইবে। আবার বর্মামুলুকের লোক যদি ২ মণ ধানের পরিবর্তে ২ মণের বেশি পাট পায় তবে তাহাবও লাভ হইবে। ধর, বাণিজ্যের লেন-দেনের ফলে দুই দেশেই ২ মণ ধানেব মূল্য আড়াই মণ পাটের মূল্যের সমান হইল। বর্মার সহিত ব্যবসায়ের পূর্বে ভারতবর্ষে ২ মণ ধান কিনিতে ৩ মণ পাট দিতে হইত। এখন আড়াই মণ পাট দিযা ২ মণ ধান পাওয়া যাইতেছে। কাজেই এই বাণিজ্যের ফলে ভারতীয়দের প্রতি ২ মণ ধানে আধ মণ পাট লাভ হইতেছে। বর্মাদেশেও অনুরূপ লাভ হইবে। কাবণ বাণিজ্যের পূর্বে বর্মায় ২ মণ ধানের পরিবর্তে মাত্র ২ মণ পাট পাওয়া যাইত। বাণিজ্যেব ফলে আড়াই মণ পাট পাওয়া যাইবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উভয় দেশেরই লাভ থাকিবে।

একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। উপরোক্ত উদাহরণে দেখান হইয়াছে যে, ভারতীয় শ্রমিক ধান ও পাট উভয় জিনিস উৎপাদনে বর্মাব শ্রমিক অপেক্ষা দক্ষ। বর্মায় যে পরিশ্রমে ১৫ মণ ধান হয় ভারতবর্ষে সেই পরিশ্রমে ২০ মণ ধান হয়। অর্থাৎ ধান উৎপাদনেও ভারতীয় শ্রমিক বর্মার শ্রমিক অপেক্ষা দক্ষ। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ বর্মা হইতে ধান আমদানি করিতেছে। ইহার কারণ কি? ভাবতবর্ষ দুইটি জিনিস উৎপাদনেই বর্মা হইতে দক্ষ সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্মী শ্রমিকেব তুলনায ভারতীয় শ্রমিক পাট উৎপাদনে যত বেশি দক্ষ ধান উৎপাদনে তত বেশি দক্ষ নহে। ভারতীয় শ্রমিক বর্মা অপেক্ষা দুইটি দ্রব্য উৎপাদনেই বেশি দক্ষ হইলেও পাট উৎপাদনে তাহার দক্ষতা তুলনায় সর্বাপেক্ষা বেশি। সুতরাং তাহাব পক্ষে পাট উৎপাদনের কাজে পূর্ণ মনোযোগ দিয়া বর্মা হইতে ধান আমদানি করিলেও যথেষ্ট লাভ হইবে। বর্মার সহিত বাণিজ্যের পূর্বে ভারতবর্ষে ৩ মণ পাট দিয়া ২ মণ ধান পাওয়া যাইত। বাণিজ্যের পরে হয়ত আড়াই মণ পাট দিয়া বর্মা হইতে ২ মণ ধান আমদানি করা যাইতেছে। সুতরাং ইহার ফলে ভারতবর্ষের লাভ ছাড়া লোকসান হইতেছে না। যে যে কাজে সর্বাপেক্ষা বেশি উপযুক্ত সে সেই কাজে লাগিয়া থাকিলেই তাহারও লাভ অন্যদেরও লাভ। একজন লোক ভাল ডাক্তার। সে আবার হয়ত ভাল রান্নাও জানে। আর একজন লোক ডাক্তারীর কিছুই জানে না। কিন্তু সে

অল্পবিত্তর রান্না জানে—যদিও প্রথম ব্যক্তির ন্যায় তত ভাল রাঁধিতে পারে না। অর্থাৎ প্রথম লোকটি দ্বিতীয় লোক অপেক্ষা ডাক্তারী ও রান্না দুইটি কাজই ভাল করিতে পারে। কিন্তু প্রথম লোকটি যদি কেবল ডাক্তারী করেন ও দ্বিতীয় লোকটিকে রান্নার কাজে লাগান তবে উভয়পক্ষেরই লাভ। প্রথম লোকটির রান্না দ্বিতীয় লোকের রান্না অপেক্ষা ভাল হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি রান্নায় যে সময় দিতেন সে সময়ে ডাক্তারী করিলে তাঁহারও রোজগার অনেক বেশি হইবে এবং রুগীদেরও উপকার হইবে। আর দ্বিতীয় লোকটিকেও বেকার থাকিতে হইবে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম খাটে। প্রত্যেক দেশ যে যে জিনিস উৎপাদনে সর্বাপেক্ষা বেশি দক্ষ সেই জিনিসই নিজে উৎপাদন করিয়া অন্য জিনিস বিদেশ হইতে আমদানি করে। ইহাতে দুই দেশেরই লাভ হয়। ভারতবর্ষে পাট ও ধান দুইটি ফসলই বর্মা হইতে কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু পাট উৎপাদনে দক্ষতা সর্বাপেক্ষা বেশি বলিয়া উৎপাদনব্যয়ও তুলনায় সর্বাপেক্ষা কম। কাজেই তাহার পক্ষে পাট চাষ করিয়া সেই পাটের বদলে বর্মা হইতে ধান আমদানি করিলেও লাভ।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ (Gains from international trade): শ্রমবিভাগের লাভ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ একই শ্রেণীর। শ্রমবিভাগের ফলে যে যে কাজের উপযুক্ত তাহাকে সেই ধরনের কাজ দেওয়া যায়। ফলে সকলের দক্ষতা বাড়ে, উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও ব্যয় কমে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও তাহাই হয়। যে দেশে লোহার খনি, কয়লার খনি নাই, সে বিদেশ হইতে এইগুলি আমদানি করিলে লাভবান হইবে। যে দেশে যে জিনিস সবচেয়ে সস্তায় তৈয়ারি হয়, সে দেশ হইতে সেই জিনিস কিনিলে আমাদের লাভ। ইংলণ্ড ও জার্মানির শ্রমিক যন্ত্রপাতি তৈয়ারিতে বেশ দক্ষ। সেখানকার উৎপাদকদের যন্ত্র তৈয়ারির টেকনিক্যাল জ্ঞানও আমাদের চেয়ে বর্তমানে বেশি। সুতরাং তাহারা যে খরচে যন্ত্র তৈয়ারি করিতে পারে, আমাদের ইহার চেয়ে অনেক বেশি খরচ পড়িয়া যায়। আবার আমরা পাট, চা এত সস্তায় উৎপাদন করি যাহা ঐ দুইটি দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের পক্ষে পাট, চা রপ্তানি করিয়া সস্তায় যন্ত্রপাতি আমদানি করিলে অনেক বেশি লাভ হইবে। বস্তুত উভয় পক্ষের

লাভ হয় বলিয়াই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা সব রকম বাণিজ্য চলে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা আমরা যে জিনিস তৈয়ারি করিতে পারি না তাহা পাই। আরো অনেক জিনিস সস্তায় কিনিতে পাই। আমরা যে জিনিস উৎপাদনে দক্ষ, তাহাই বেশি করিয়া উৎপাদন করি (কারণ তাহা রপ্তানি করিতে হয়) বলিয়া দক্ষতা আরো বাড়ে। যে দেশ যে জিনিস উৎপাদনের সুবিধা থাকে সে সেই জিনিস উৎপাদন করে ও অন্য জিনিস বিদেশ হইতে আমদানি করে। ফলে সকলেরই লাভ হয়।

বাণিজ্যের ফলে কোন্ দেশে কতটুকু লাভ হইবে ইহা নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর। প্রথম, আমরা বিদেশীর নিকট হইতে যাহা আমদানি করি সেই জিনিস উৎপাদনে তাহার দক্ষতা আমাদের চেয়ে কত বেশি? ধরা যাক, চা তৈয়ারির যন্ত্র তৈয়ারি করিতে আমাদের দেশে খরচ পড়ে হয়ত ১ লক্ষ টাকা। ইংলণ্ড কিংবা জার্মানিতে, ইহার চেয়ে যত কম খরচে এই যন্ত্র তৈয়ারি হয় ততই আমাদের লাভ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে। ঐদেশে যদি ৮০ হাজার টাকা যন্ত্রটির উৎপাদনব্যয় হয়, তবে মোট লাভের পরিমাণ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে। আবার এই দুইটি দেশের শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ার ফলে যন্ত্রটির উৎপাদনব্যয় ৭৫ হাজার টাকায় নামে, তবে আমাদের লাভের পরিমাণও বাড়িতে পারে। সেইরূপ আমাদের দেশে ইংলণ্ড ও জার্মানির তুলনায় কত কম খরচে চা তৈয়ারি হয় ইহার উপর লাভের পরিমাণ নির্ভর করিবে।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক দেশ কতটা লাভ করিবে তাহা সেদেশের লোকের বিদেশী জিনিসের চাহিদা ও আমাদের তৈয়ারি জিনিসের জন্য বিদেশীর চাহিদার উপর নির্ভর করে। বিদেশী জিনিসের জন্য আমাদের চাহিদা বেশি হয়, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে আমরা বেশি দাম দিয়াও বিদেশী জিনিস কিনিতে রাজী থাকিব। চা তৈয়ারি যন্ত্রের উৎপাদনব্যয় আমাদের দেশে ১ লক্ষ টাকা ও জার্মানিতে ৮০ হাজার টাকা হইতে পারে। আমরা ১ লক্ষ টাকা হইতে যত কম দিয়া কিনিতে পারি ততই আমাদের লাভ। আবার জার্মানির উৎপাদক ৮০ হাজারের যত বেশি দামে বিক্রয় করিতে পারে ততই তাহার লাভ। এই যন্ত্রটির জন্য আমাদের চাহিদা যদি বেশি থাকে, তবে আমরা ৮০ হাজারের অনেক বেশি দিয়াও

ইহা কিনিতে চাহিব। দাম ৮০ হাজার হইতে যত উপরে উঠিবে আমাদের লাভের পরিমাণ তওই কমিবে ও জার্মানির লাভ বেশি হইবে। সুতরাং আমরা কতটা লাভ করিব তাহা আমাদের চাহিদা কতটুকু অস্থিতিস্থাপক ইহার উপরে নির্ভর করিবে। আবার ধরা যাক, আমাদের দেশে চা তৈয়ারির খরচ পড়ে মণ প্রতি ৫০০৲ টাকা। জার্মানি নানারকম বৈজ্ঞানিক-ভাবে চাষ করিয়া কিছু চা উৎপাদন করিতে পারে। তাহার উৎপাদনব্যয় পড়ে মণ প্রতি ১০০০৲ টাকা। জার্মানির লোক ১০০০৲ টাকার যত কমে ভারতবর্ষ হইতে চা কিনিতে পারে, ততই তাহার লাভ বেশি হইবে। আর আমরা ৫০০৲ টাকার যত বেশি দাম পাইব ততই লাভবান হইব। জার্মানিতে যদি চায়ের চাহিদা বিশেষ না থাকে তবে আমাদের হয়ত ৫৫০৲ টাকা দামে চা বিক্রয় করিতে হইতে পারে। অপরপক্ষে জার্মানিতে চা খাওয়ার অভ্যাস যদি অনেক লোকেরই থাকে, তবে আমরা হয়ত ৮০০৲ টাকা দামে একমণ চা বিক্রয় করিতে সক্ষম হইব। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে তৈয়ারি জিনিসের জন্য যদি জার্মানির চাহিদা খুব বেশি হয় তবে আমাদের লাভ বেশি হইবে। চাহিদা কম হইলে আমরা কম লাভ করিব, জার্মানি বেশি লাভ করিবে। আমাদের জিনিসের জন্য বিদেশীর চাহিদা যদি বেশি থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী জিনিসের জন্য আমাদের চাহিদা কম হয়, তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে আমাদের লাভ সবচেয়ে বেশি হইবে। অর্থাৎ বিদেশীদের তুলনায় অনেক বেশি লাভ হইবে। অপরপক্ষে বিদেশী জিনিসের জন্য আমাদের চাহিদা যদি বেশি হয় ও আমাদের জিনিসের জন্য বিদেশীর চাহিদা কম থাকে, তবে এই বাণিজ্যে আমাদের লাভ বিদেশীর তুলনায় কম হইবে।

মজুরীর হার ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (Wages and international trade): আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর বিভিন্ন দেশে মজুরীর হারের পার্থক্যের ফল কি? সাধারণ লোকের ধারণা এই, যে দেশে মজুরীর হার কম, সে দেশে সব জিনিস সস্তায় তৈয়ারি হয়। সুতরাং ইহার সহিত প্রতিযোগিতায় বেশি মজুরীর দেশ হারিয়া যাইবে। মজুরী বেশি হইলে উৎপাদনব্যয় বেশি হয় এই বিশ্বাসের জন্যই লোকে এরূপ মনে করে।

এই ধারণা যে ভুল তাহা যুক্তি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা বোঝান যায়। মজুরী বেশি হইলেই যে উৎপাদনব্যয় বেশি হইবে এমন কোন কথা নাই। শ্রমিকের দক্ষতা যদি বেশি হয়, তবে প্রতি ইউনিটের ব্যয় কম হয়। সুতরাং দামও কম হয়। পরন্তু দক্ষতা কমের জন্য মজুরী কম হইতে পারে ; সুতরাং উৎপাদনব্যয় ও দাম প্রকৃতপক্ষে বেশি হইবে। দক্ষতা বেশি না হইলে সাধারণত মজুরী বেশি হয় না। অতএব মজুরী কম বলিয়াই এক দেশ অন্য দেশে সব জিনিস সস্তায় বিক্রয় করিতে পারে না।

ভারতীয় শ্রমিকদের চেয়ে ইংলণ্ডের শ্রমিকদের বেতন বেশি। তবুও ইংলণ্ড হইতে ভারতে বহু জিনিস আসিয়াছে এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীরা সে জিনিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না। আমেরিকায় বেতনের হার সবচেয়ে বেশি, তবু আমেরিকা বিদেশে অনেক জিনিস বিক্রয় করিতেছে। সুতরাং শুধু মজুরীর হারের কথা ভাবিলে চলিবে না। শ্রমিকের দক্ষতা কতখানি তাহাও দেখিতে হইবে। একজন শ্রমিক মাসে ১০০৲ টাকা বেতন পায় ও ২০ মণ পাট তৈযারি করে ; আর একজন হয়ত ১২৫৲ টাকা বেতন পায়, কিন্তু সে বেশি দক্ষ বলিয়া ৩০ মণ পাট উৎপাদন করে। প্রথম ক্ষেত্রে পাটের উৎপাদনব্যয় হয় মণ প্রতি ৫৲ টাকা, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পড়ে মণ প্রতি ৪·১৬ নয়া পয়সারও কম।

অবাধবাণিজ্য বনাম সংরক্ষণনীতি (Free trade vs. protection) : অর্থনৈতিক আলোচনার প্রথম হইতেই এক তর্ক চলিয়া আসিতেছে। বিদেশী জিনিসের প্রতিযোগিতা বন্ধ করার ইচ্ছা নানাভাবে প্রকাশ পায়। মনে মনে আমরা কেহই প্রতিযোগিতা পছন্দ করি না, বিশেষত বিদেশী প্রতিযোগিতা। বহুবার আলোচিত হইলেও অবাধ বাণিজ্য (free trade) এবং সংরক্ষিত বাণিজ্য সম্পর্কে বহু ভুল ধারণা আছে। এবার ইহাই আলোচনা করিব।

অবাধ বাণিজ্য (Free trade) : বাধাহীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে অবাধ বাণিজ্য বলে। ব্যবসায়ের যে স্বাভাবিক গতি আছে, তাহাকে বাধা না দেওয়াকেই অবাধ বাণিজ্য বলে।

তুলনামূলক উৎপাদনব্যয়ের নিয়ম এবং শ্রমবিভাগই অবাধ বাণিজ্য-নীতির ভিত্তি। অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য যতই বাধাহীন হইবে ততই তাহা

লাভজনক হইবে। দুইটি যুক্তির উপর অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, সরকারী নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে শ্রমিক ও মূলধন সর্বাপেক্ষা লাভজনক ক্ষেত্রে নিয়োজিত হইবে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক দেশের যে যে জিনিস উৎপাদনে তুলনায় সবচেয়ে বেশি সুবিধা আছে, সে সেই জিনিসগুলি উৎপাদন করিলে সারা পৃথিবীর এবং প্রত্যেক দেশের উৎপাদন বাড়িবে। অতএব অবাধ বাণিজ্যের ফলে সকলেরই লাভ হয়। আমদানি হওয়াতে প্রমাণ হয় যে, দেশের চেয়ে বিদেশে জিনিসটি সস্তা। যদি তাহা না হয়, তবে অবাধ বাণিজ্য থাকা সত্ত্বেও তাহা বিদেশ হইতে আনা হইত না। তৃতীয়ত, সংরক্ষণের ত্রুটিগুলির জন্য অবাধ বাণিজ্য সমর্থন করা হয়।

সংরক্ষণনীতি (Protection) : সরকারের সাহায্যে বিদেশী প্রতিযোগিতা বন্ধ করার নামই সংরক্ষণনীতি। নানাভাবে দেশী শিল্পকে সংরক্ষণ করা যায়। তাহার মধ্যে বিদেশী পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক বসাইয়া এবং দেশী শিল্পকে অর্থ সাহায্য করাই প্রধান সংরক্ষণ নীতি আদৌ বাঞ্ছনীয় কি না আলোচনা করা যাক।

সংরক্ষণের স্বপক্ষে যুক্তি (Arguments for protection) : সংরক্ষণ নীতির স্বপক্ষে অনেকগুলি যুক্তিই অসার। সহজেই ইহাদের ত্রুটি বাহির করা যায়। একে একে এই যুক্তি আলোচনা করা হইতেছে। এইখানে একটি গোড়ার কথা মনে রাখা প্রয়োজন। সব দেশেরই আমদানি ও রপ্তানির সহিত এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে যে কোন কারণে যদি আমদানি কমিয়া যায় তবে ধীরে ধীরে সে দেশের রপ্তানিও কমিতে থাকিবে। আমরা বিদেশে যে জিনিস বিক্রয় করি সেই টাকা দিয়া বিদেশ হইতে জিনিস কিনিয়া আনি। সাধারণত এই নিয়মেই জিনিস কেনাবেচা চলে। যদি বিদেশীরা আমাদের নিকট হইতে কম জিনিস কেনে তবে আমরা কম বিদেশী মুদ্রা পাইব ও ফলে কম বিদেশী জিনিস কিনিতে পারিব। অর্থাৎ আমাদের রপ্তানি কমিলে আমদানি কমিবে। আমরা বিদেশীদের নিকট হইতে কম জিনিস কিনিলে বিদেশীরাও আমাদের নিকট হইতে কম জিনিস কিনিবে। আমদানি কমিলে রপ্তানিও কমিতে থাকে।

বিদেশী জিনিস কিনিলে আমরা জিনিসটি পাই বটে, কিন্তু বিদেশীরা টাকা লইয়া যায়। দেশী জিনিস কিনিলে আমরা জিনিসও পাই ও দেশের টাকা

দেশেই থাকে। এই কথার দ্বারা অনেকে সংরক্ষণ নীতির সমর্থন করে, কিন্তু ইহার অর্থ কেহ সহজে বুঝিতে চায় না। বিদেশী জিনিস সস্তা বলিয়াই তাহা আমরা কিনি। দেশী জিনিস কিনিলে বেশি দাম দিতে হইবে। সুতরাং ক্রেতা হিসাবে আমাদের ক্ষতি হইবে। বিশেষ কারণে আমরা হয়ত কখনও কখনও এ ক্ষতি স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু সংরক্ষণ নীতির এই দিকটি জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। কারণ তাহাদিগকেই সংরক্ষণের ভার বহন করিতে হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা সংরক্ষণের পক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি। Mercantalist নামক লেখকেরা মনে করিতেন যে, সোনা আমদানি করাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে আমদানি কমাইতে হইবে এবং রপ্তানি বাড়াইতে হইবে যেন তাহার ফলে দেশে সোনা আমদানি হয়। ইহা অতি সহজ কথা যে, সকলে এই নীতি অনুসরণ করিলে কেহই সোনা পাইবে না। সকলে যদি কেবল বিক্রয় করিতে চায় এবং কেহ যদি কিনিতে না চায় তবে অবস্থা কি হইবে? টাকা বা সোনা সম্পদ নহে। সুখস্বাচ্ছন্দ্য সোনার পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, সুলভে জিনিস পাওয়ার উপর নির্ভর করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে সুলভে জিনিস পাওয়া যায়। তা'ছাড়া আমদানি ও রপ্তানি সমান হয়। অতএব আমদানি বন্ধ করিয়া দিয়া কেবল রপ্তানি করা সম্ভব নয়।

ইহার পর আসে দেশী বাজার রক্ষার যুক্তি। দেশের বাজারের উপর দেশীয় শিল্পের স্বাভাবিক দাবি আছে। দেশের বাজার যদি দেশী শিল্পের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়, তবে সংরক্ষিত শিল্পের প্রসার হইবে। ফলে বেশি লোক সেখানে নিযুক্ত হইবে এবং অন্য শিল্পের বাজার বাড়িবে। কিন্তু সংরক্ষণ নীতির ফলে আমদানি কমিবে এবং আমদানি কমিলে রপ্তানিও কমিয়া যাইবে। সংরক্ষিত শিল্প দেশে বাজার পাইবে বটে, কিন্তু রপ্তানি শিল্প বিদেশী বাজার হারাইবে। এই লাভ ক্ষতির হিসাবে দেশের শেষ পর্যন্ত সুবিধা কি অসুবিধা হইবে তাহা বলা শক্ত।

তারপর উচ্চ মজুরীর যুক্তি দেওয়া হয়। আমেরিকায় মজুরীর হার বেশি, জাপানে মজুরীর হার কম। আমেরিকার বাজারে যদি জাপানী জিনিস ঢুকিতে দেওয়া হয়, তবে প্রতিযোগিতায় আমেরিকান মালিক হারিয়া

যাইবে। আমেরিকার শিল্পগুলি একে একে উঠিয়া যাইবে ও ফলে মজুরীর হার কমিয়া যাইবে এবং আমেরিকান শ্রমিকের জীবনধারণের মান নীচু করিতে হইবে। এই ধরনের যুক্তির ত্রুটি পূর্বেই দেখান হইয়াছে। মজুরীর হার বেশি হইলেই যে উৎপাদনব্যয় বেশি হইবে একথা ঠিক নহে। শ্রমিকের দক্ষতা বেশি থাকিলে উচ্চ মজুরী সত্ত্বেও উৎপাদনব্যয় কম হইবে। তাহা না হইলে নিম্ন মজুরীর হারের দেশের শিল্পপতিরা উচ্চ মজুরীর হারের দেশের বিরুদ্ধে সংরক্ষণ চায় কেন? ভারতবর্ষে মজুরীর হার নীচু এবং ইংলণ্ডে মজুরীর হার উঁচু। তবুও ভারতের কাপড়ের কলের মালিক এতদিন ল্যাঙ্কাসায়ারের বিরুদ্ধে সংরক্ষণ দাবি করিত কেন? সুতরাং এই তত্ত্বের মধ্যে যুক্তি বিশেষ নাই।

সংরক্ষণনীতির পক্ষে আর একটি যুক্তিতে বলা হয় যে, ইহার ফলে দেশে বেকার সংখ্যা বাড়িবে। বিদেশীয় প্রতিযোগিতা হইতে দেশের শিল্পকে সংরক্ষণ করিলে শিল্পোন্নতি হইবে। শিল্পোন্নতির ফলে নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয় ও বেকার লোকেরা কাজ পায়। কাজেই এই লোকেরা সংরক্ষণ-নীতিকে বেকার সমস্যা সমাধানের একটি পন্থা বলিয়া দাবি করেন। কিন্তু এই লোকেরা কেবল একটি দিক দেখিতেছেন। সংরক্ষিত শিল্পগুলির প্রসার হয়ত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সংরক্ষণের ফলে আমদানি কমিবে। আমরা পূর্বে অনেক চিনি বিদেশ হইতে আমদানি করিতাম। কিন্তু দেশের শিল্প সংরক্ষণের জন্য বিদেশী চিনির উপব উচ্চ হারে কর বসান হইল। ফলে চিনির আমদানি বন্ধ হইয়া গেল। আমদানি কমিলে রপ্তানিও কমিবে। কারণ বিদেশীরা আমাদের দেশে তাহাদের জিনিস বিক্রয় না করিতে পারিলে আমাদের জিনিসও তাহারা কিনিবে না। যে সমস্ত শিল্পদ্রব্য রপ্তানি হইত তাহাদের চাহিদা কমিলে উৎপাদন কমিবে। সেখানে বেকার সমস্যা দেখা দিবে। ফলে মোট বেকারের সংখ্যা যে কমিবে একথা জোর করিয়া বলা যায় না। আর কিছু সংখ্যক বেকার লোক যদি কাজ পায়ও, তবুও মনে রাখিতে হইবে যে কেবল নিয়োগ বাড়িলেই সুখসম্পদ বাড়ে না। অর্থনৈতিক কর্মের উদ্দেশ্য নিয়োগ বৃদ্ধি নহে, সম্পদবৃদ্ধি। সংরক্ষণের ফলে যদি অযোগ্য শিল্পের প্রসার হয়, তবে দেশের মোট সম্পদ কমিবে। তাহাতে সকলেরই আয় কমিবে।

দেশ ও বিদেশের উৎপাদনব্যয় সমান করার জন্য সংরক্ষণ করার প্রস্তাব করা হয়। দেশের উৎপাদনব্যয় যদি শতকরা ১০৲ টাকা বেশি হয়, তবে বিদেশী পণ্যের উপর শতকরা ১০৲ শুল্ক বসাও। দেশী ও বিদেশী পণ্যের দাম সমান করিয়া দাও, তারপর তাহাদের প্রতিযোগিতা চলুক। আপাত দৃষ্টিতে এই যুক্তি খুব ন্যায্য মনে হয়। কিন্তু দেশের উৎপাদনব্যয় যত বেশি হয়, এই নীতি অনুসারে শুল্কের হারও তত বেশি হইবে। অর্থাৎ সব চেয়ে কম দক্ষতাসম্পন্ন শিল্প সবচেয়ে বেশি সংরক্ষণ পাইবে। ইহার অর্থ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অবসান, কারণ ব্যয়ের তুলনামূলক পার্থক্যই বাণিজ্যের ভিত্তি।

জার্মান লেখক List-এর "শিশু শিল্প" (infant industry argument) যুক্তিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, মানব শিশুকে যেমন সংরক্ষণ ও লালনপালন করা প্রয়োজন, দেশের শিশুশিল্পকে শিশু অবস্থাতেও তেমনি বিদেশীর প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করা উচিত। শিল্পগুলিও শিশু অবস্থায় অনেকটা অসহায়। অনেক শিল্পেরই ভবিষ্যৎ হয়ত উজ্জ্বল। এখন উৎপাদনব্যয় বেশি হইলেও বড হইবার পর উৎপাদনব্যয় কমিতে পারে। কিন্তু শিশু অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতায় তাহারা হয়ত দাঁড়াইতে কি বাড়িতে পারে না। গোড়ার দিকে অনেক অসুবিধা দেখা দেয়। এই সময় যদি তাহাদের সংরক্ষণ করা হয়, তবে ভবিষ্যতে ইহারা হয়ত বিদেশী উৎপাদকের সহিত সমান প্রতিযোগিতা চালাইতে পারিবে। সংরক্ষণের ফলে সাময়িক ক্ষতি হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে সে ক্ষতি পোষাইয়া যাইবে। অবাধ বাণিজ্যনীতির সমর্থকেরা এই যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, কোন শিশু শিল্পকে সংরক্ষণ করিলে ভবিষ্যতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে ও কোন্‌টি অযোগ্য তাহা শিল্পটির বাল্যাবস্থায় নির্ণয় করা খুব কঠিন। অযোগ্য শিল্পকে সংরক্ষণ করা হইলে লাভের চেয়ে লোকসান বেশি। কারণ সে কোন দিনই সাবালক হইবে না—নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিবে না। ফলে চিরকালই সংরক্ষণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, এই যুক্তিকে সাময়িক সংরক্ষণ করার সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু সংরক্ষণনীতির পথে একবার অগ্রসর হইলে আর সহজে সে পথ ত্যাগ করা যায় না। প্রায়ই দেখা যায় যে, সংরক্ষণের

পর শিশুশিল্প শিশুই থাকিয়া যায়, কখনও বড় হয় না; আর বড় হইলেও অধিকতর সংরক্ষণের দাবি করে। সংরক্ষণ ব্যবস্থা সাময়িক না থাকিয়া চিরস্থায়ী হইবার যথেষ্ট আশংকা রহিয়াছে।

দেশে বিভিন্ন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করার প্রস্তাব করা হয়। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠার অনেকগুলি যুক্তি আছে। প্রথমত, ইহার দ্বারা জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা যায়। দেশের মধ্যেই সব জিনিস তৈয়ারি করা গেলে, যুদ্ধের সময়ে কোন বিপদ থাকে না। কোন জিনিসের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভর করার মধ্যে বিপদ আছে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে, দেশের লোকেব শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ হইবে। যাহার যে ধরনের বৃত্তি, সে ঠিক সেই ধরনের কাজ খুঁজিয়া লইতে পারিবে। এগুলি অর্থনৈতিক যুক্তি নহে। দেশরক্ষার জন্য জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রয়োজন। সম্পদের চেয়ে অবশ্য দেশরক্ষার গুরুত্ব বেশি। কিন্তু এখানে দেশরক্ষার জন্য আমরা জানিয়া শুনিয়া ক্ষতি স্বীকার করিতেছি। কিন্তু সংরক্ষণনীতির ফলে যে দেশের ধনসম্পদ কমিয়া যায় একথা স্পষ্ট করিয়া বলা দরকার।

Dumping প্রতিরোধকল্পে সংরক্ষণ করা সকলেই সমর্থন করেন। Dumping অন্যায় প্রতিযোগিতা এবং ইহার ফলে দেশীয় শিল্পে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কিন্তু বরাবরের জন্য dumping করিলে আপত্তির কিছু নাই। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে dumping সাময়িক। ইহা দেশীয় শিল্পের ক্ষতি করে। অতএব dumping প্রতিরোধকল্পে শুল্ক ধার্য করা অন্যায় নহে। কিন্তু যেহেতু dumping সাময়িক, এই সব শুল্কও সাময়িক হওয়া উচিত। কিন্তু একবাব শুল্ক বসাইয়া আর তাহা তোলা হয় না এবং চিরকালীন শুল্ক দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক।

সংরক্ষণনীতির রাজনৈতিক অসুবিধাগুলিও গুরুতর। উৎপাদনের উন্নতি করার চেষ্টা না করিয়া সংরক্ষিত শিল্প শুল্কবৃদ্ধির জন্য আইনসভার সভ্যদের তদ্‌বিরে মন দেয়। সংরক্ষণ শুল্ক বাড়িতে থাকে এবং রাজনৈতিক আবহাওয়াকে কলুষিত করে। শুল্ক একবার বসাইলে তাহার বোঝা জনসাধারণকে চিরকাল বহন করিতে হয়। কয়েকটি ভিন্ন সংরক্ষণের যুক্তি ভিত্তিহীন।

Exercises

Q. 1. Discuss the basis of international trade. (C. U. 1958, 1943 ; B. Com. 1953, '51, '44).

Q. 2. Show how the comparative cost of producing different commodities in different countries determines international specialisation and trade. (C. U. B. Com. 1957 ; Viswa. 1954).

"The fact that a commodity is produced at a lower cost in one country than by another is no guarantee that it will pay the first country not to import it from abroad." Explain and illustrate. (C. U. 1958).

Q. 3. Why is it necessary to formulate a theory of international trade, distinct from that of internal trade ? (C. U. B. Com. 1953).

Q. 4. Explain with examples why certain countries export more than they import while others import more than they export. (C. U. 1940).

Q. 5. Do you advocate Free Trade or Protection ? Give reasons for your answer. (C. U. 1955, '52, Viswa. 1953).

Q. 6. How would you estimate the gains from international trade ? (C. U. 1954).

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্ত

(Balance of Payments)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে একটি দেশ অন্য দেশগুলি হইতে বহু জিনিস আমদানি করে ও নিজের উৎপাদনের এক অংশ বিদেশে রপ্তানি করে। রপ্তানির ফলে বিদেশীর নিকট সেই দেশের লোক অনেক টাকা পায়। আবার যে বিদেশীর নিকট হইতে জিনিস আমদানি হইয়াছে, তাহাদের দাম দিতে হয়। এইগুলি ছাড়াও এক দেশ অন্য দেশের নিকট হইতে অন্য হিসাবে অর্থ লাভ করে ও দিতে হয়। এই লেনদেনের হিসাব বৈদেশিক বিনিময় বাজারে হয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মুদ্রা প্রচলিত আছে। বৈদেশিক বাজারে লেনদেনের ফলে বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে বিনিময়হার ঠিক হয়। এই অধ্যায়ে আমরা এই সকল বিষয়ে আলোচনা করিব।

বৈদেশিক বিনিময় বাজারে লেনদেন কি ভাবে হয়? সাধারণত হুণ্ডি ও ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টের মারফত কারবার চলে। জিনিসের বিক্রেতা বিদেশী ক্রেতার নিকট মূল্য দিবার অনুরোধ করিয়া যে লিখিত-পত্র দেয়, তাহাকে বিদেশী হুণ্ডি বলে। ব্যাঙ্ক তাহার বিদেশস্থ ব্রাঞ্চ বা এজেণ্টের নির্দিষ্ট টাকা দিবার জন্য যে লিখিত-পত্র দেয় তাহাকে ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট্ বলে। ধরা যাক, আমি বিলাতে ৫ পাউণ্ড দামের বই-এর অর্ডার দিয়াছি। আমাকে এই বই-এর টাকা দিতে হইবে। আমি কোন ব্যাঙ্কে গিয়া একটি ৫ পাউণ্ডের ড্রাফ্‌ট্ কিনিলাম। অর্থাৎ ব্যাঙ্ক তাহার লণ্ডনস্থ এজেণ্টের নিকট চাহিবামাত্র ৫ পাউণ্ড দিবার আদেশ-পত্র আমাকে দিল ও আমার নিকট হইতে বিনিময়হার অনুযায়ী ৫ পাউণ্ডের যা মূল্য ঠিক হয় তদনুযায়ী টাকা লইল। আমি লণ্ডনের পুস্তক বিক্রেতার নিকট ড্রাফ্‌ট্ পাঠাইয়া দিলাম। বিক্রেতা ব্যাঙ্কের এজেণ্টের নিকট ড্রাফ্‌ট্ লইয়া গেলেই এজেণ্ট তাহাকে নির্দেশমত ৫ পাউণ্ড দিয়া দিল। ডাকে ড্রাফ্‌ট্ পাঠাইতে কিছু সময় লাগে। অনেক সময়ে তাড়াতাড়ি টাকা দেওয়ার কথা থাকিলে ব্যাঙ্কে গিয়া T. T. বা telegraphic transfer কেনা যায়। ইহা টেলিগ্রাম মনিঅর্ডারের মত।

ব্যাঙ্ক তৎক্ষণাৎ এজেণ্টকে টাকা দিয়া দিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়া দেয় ও অল্প সময়ের মধ্যেই টাকা দেওয়া হইয়া যায়।

হুণ্ডী দুই প্রকার—দর্শনী—(sight bills) এবং মেয়াদী (usance bills)। দর্শনী হুণ্ডী দেখা মাত্র ভাঙ্গাইয়া দিতে হয়। মেয়াদী হুণ্ডী কিছুদিন পরে, সাধারণত ৯০ দিন বা নির্দিষ্ট সময় পরে ভাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়।

বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত ও আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্ত (Balance of trade and balance of payment): কি কি কারণে বিদেশে টাকা পাঠাইতে হয় এবং কি কি কারণে বিদেশ হইতে টাকা আসে তাহা জানা দরকার। আমদানি জিনিসের দাম বাবদ বিদেশে টাকা পাঠাইতে হয়। রপ্তানি জিনিসের জন্য বিদেশ হইতে টাকা পাওয়া যায়। জিনিস কেনা-বেচা ছাড়াও অন্য অনেক কারণে বিদেশীর নিকট হইতে টাকা পাওয়া যায় বা দিতে হয়। যদি বিদেশী জাহাজে মাল আনা বা পাঠান হয়, বিদেশী ব্যাঙ্কের মারফত টাকা লেনদেন করা হয়, তাহা হইলে জাহাজ ভাড়া, ব্যাঙ্কের সুদ প্রভৃতি বাবদ বিদেশীদের টাকা দিতে হয়। বিদেশে যাহারা বেড়াইতে গিয়াছে বা যে বিদেশীরা বেড়াইতে আসিয়াছে তাহাদের হিসাব ধরিতে হইবে। আমেরিকার লোকেরা এদেশে বেড়াইতে আসিলে, আমরা আমেরিকার নিকট টাকা পাই। আমরা বিদেশে বেড়াইতে গেলে বিদেশীরা আমাদের নিকট টাকা পাইবে। দান ইত্যাদি কতকগুলি কারণেও লেনদেন হয। কোন বিদেশী সরকার যদি আমাদের অর্থ সাহায্য করে বা টাকা ধার দেয় তবে আমরা টাকা পাইব। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির জন্যও অনেক টাকার লেনদেন হয়। ভারতীয় পুঁজিবাদীরা যদি বিদেশে মূলধন বিনিয়োগ করে, তবে আমরা সুদ পাই। পরন্তু বিদেশী টাকা ধার করিলে তাহার সুদ বাবদ বিদেশীকে টাকা দিতে হয়।

আদান-প্রদানের সম্পূর্ণ তালিকাকে আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাব (balance of accounts অথবা balance of international indebtedness) বলে। এই তালিকার নানাপ্রকার শ্রেণী বিভাগ আছে। সাধারণত বিভিন্ন আইটেমগুলি দৃশ্য (visible) এবং অদৃশ্য (invisible) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। আমদানি ও রপ্তানি জিনিসগুলির

দৃশ্য পর্যায়ে পড়ে। Customs বিভাগের খাতাপত্রে তাহাদের হিসাব পাওয়া যায় বলিয়া তাহারা দৃশ্য। বাকী লেনদেনের হিসাব অদৃশ্য পর্যায়ে পড়ে। আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্য বা দৃশ্য বিষয়গুলির হিসাবকে বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত (balance of trade) বলে। আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশি হইলে বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত অনুকূল (favourable) বলা হয়। আমদানির চেয়ে রপ্তানি কম হইলে বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত প্রতিকূল (unfavourable) হয়। কিন্তু বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত স্বপক্ষে গেলেই যে দেশে সোনা আসিবে এমন কোন কথা নাই। ইহার অর্থ এই হইতে পারে যে, অন্যান্য কারণে আমরা বিদেশের নিকট ঋণী। হয়ত পূর্বে বিদেশে অনেক টাকা ধার করা হইয়াছে এবং তাহার জন্য বর্তমানে সুদ দিতে হইতেছে। অথবা হয়ত বিদেশী জাহাজ এবং ব্যাঙ্কের জন্য অনেক টাকা দিতে হইতেছে। এই সব টাকা দেওয়ার জন্য বিদেশে অতিরিক্ত মাল পাঠাইতে হইয়াছে।

আমদানি ও রপ্তানির সমতা (Equality of exports and imports) : আমরা প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে বহু জিনিস আমদানি করি, আবার বিদেশে বহু জিনিস রপ্তানি করি। রপ্তানি দ্রব্য ও আমদানি দ্রব্যের মূল্য সমান হইতে পারে, আবার নাও হইতে পারে। কিন্তু অর্থশাস্ত্রের লেখকেরা বলেন যে আমদানি রপ্তানির সমান হয়। আমরা বিদেশ হইতে যাহা আমদানি করি, রপ্তানি করিয়া ইহার দাম শোধ করি। অর্থাৎ বিদেশে জিনিস বিক্রয় করিয়া, বিদেশী বিক্রেতার ঋণ শোধ করি। সুতরাং আমদানি রপ্তানির সমান হইবে। কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায় যে, যত দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে ইহার চেয়ে বেশি বা কম মূল্যের দ্রব্য আমদানি হইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতবর্ষ মোট ৬৮২ কোটি টাকা মূল্যের জিনিস আমদানি করে ও ৬০৮ কোটি টাকা মূল্যের জিনিস রপ্তানি করে। ফলে বাণিজ্যের হিসাবে তাহার ৭৪ কোটি টাকার ঘাটতি পড়ে। ইহার সহিত আমদানি রপ্তানির সমান এই কথাটির সামঞ্জস্য কোথায়?

কিন্তু আসলে ইহাদের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নাই। আমদানি দ্রব্য ও রপ্তানির দ্রব্যের হিসাব সমান হইবে একথা কেহ বলে না। আমরা দ্রব্য ছাড়াও অন্য অনেক কিছু আমদানি রপ্তানি করি যাহার জন্য আমাদের দেনা পাওনা হয়। আমদানি রপ্তানির সমান কথার অর্থ এই যে, বিদেশের

সঙ্গে আমাদের সমস্ত দেনা-পাওনার হিসাব সমান হইবে। আমরা যাহা রপ্তানি করি, তাহা বিদেশে বিক্রয় করিয়া বিদেশীর নিকট টাকা পাই। আবার যাহা আমদানি করি ইহার জন্য বিদেশীকে টাকা দেই। দ্বিতীয়ত, যদি বিদেশী জাহাজে মাল পাঠাই বা আনি, বিদেশী ব্যাঙ্কের সঙ্গে কারবার করি, তবে বিদেশী কোম্পানীগুলিকে এই বাবদ টাকা দিতে হয়। আবার বিদেশীরা যদি ভারতীয় জাহাজে মাল পাঠায় বা নেয়, ভারতীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গে কারবার করে, তবে আমরা তাহাদের নিকট টাকা পাইব। যত বিদেশী ভারতবর্ষে বেড়াইতে বা পড়িতে আসিবে, তত আমরা বিদেশীর টাকা পাইব। আবার যত ভারতীয় বিদেশে বেড়াইতে বা পড়িতে যাইবে, ততই আমাদের বিদেশী টাকা দিতে হইবে। বিদেশে আমরা যদি টাকা ধার পাই, যদি ওয়াল্ড´ ব্যাঙ্ক রেলওয়ের উন্নতির জন্য আমাদের টাকা ধার দেয়, তবে, প্রথমে আমরা বিদেশের (বা ওয়াল্ড´ব্যাঙ্কের) নিকট ধারের টাকা পাইব। পরে বৎসর বৎসর ধারের সুদ বাবদ ও একদিন অথবা কয়েক বৎসর ধরিয়া আসল টাকা শোধ দিতে হইবে। তখন আমাদিগকে বিদেশে টাকা পাঠাইতে হইবে। বিদেশে যদি আমাদের পূর্বেকার জমান তহবিল থাকে, তবে আজ তাহা হইতে কিছু কিছু টাকা তুলিয়া বিদেশীকে দেয় পাওনা মিটাইতে পারি। সুতরাং আমাদের বিদেশস্থ সঞ্চিত তহবিলের পরিমাণ কমিতেছে, না বাড়িতেছে ইহার হিসাবও ধরিতে হইবে। ইহা ছাড়া বিদেশীরা আমাদের দান করিতে পারে, কিংবা আমরাও বিদেশীকে দান করিতে পারি। এই সমস্ত দেনা-পাওনার ঠিকমত হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, আমদানি বা সমস্ত দেনা রপ্তানি বা সমস্ত পাওনার সমান। এখানে আমদানি করার অর্থ শুধু আমদানি দ্রব্যের মূল্য নহে। আমরা যাহা আমদানি করি তাহার জন্য বিদেশীকে টাকা দিতে হয়। সুতরাং আমদানি বলিতে আমরা বিদেশীর নিকট আমাদের সমস্ত দেনার হিসাব বুঝি। রপ্তানি বলিতেও শুধু বিদেশে বিক্রিত দ্রব্যের মূল্য নহে, বিদেশীর নিকট হইতে আমাদের সমস্ত পাওনার হিসাব ধরি। এই দেনা-পাওনার সঠিক হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, কোন দিকেই কিছু উদ্বৃত্ত নাই।

প্রত্যেক লোকের বৎসরের সমস্ত দেনা-পাওনার হিসাব করিলে হিসাব

মিলিবে। সে যদি আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় করে, হয়ত তাহার পূর্ব সঞ্চিত অর্থ খরচ করিতে হইবে কিংবা ধার দিতে হইবে। না হইলে সে অতিরিক্ত ব্যয় করিতে পারিবে না। সুতরাং পাওনার ঘরে তাহার বাৎসরিক আয়, সঞ্চিত তহবিল যাহা কমিয়াছে তাহা কিংবা ধারের পরিমাণ যোগ দিতে হইবে। তখন দেনা-পাওনা সমান হইবে। আবার, আয় অপেক্ষা ব্যয় যদি কম হয়, তবে উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চিত তহবিলে জমা হইবে। নয়ত সে কাহাকেও টাকা ধার দিতে পারে। এক্ষেত্রেও ঠিকমত হিসাব করিলে দেনা-পাওনা সমান হইবে। দেশের বেলাতেও একথা খাটে। ঠিকমত হিসাব ধরিলে সব দেশেরই বৈদেশিক দেনা-পাওনা সমান থাকিতে বাধ্য। যদি কোথায়ও কিছু উদ্বৃত্ত দেখা যায় তবে বুঝিতে হইবে যে হিসাবের ভুল হইয়াছে।

ধর যদি কখনও এই অঘটন ঘটিয়াছে, অর্থাৎ আমদানি-রপ্তানির হিসাব ঠিকমত ধরিলেও মেলে না, তবে কিছু দিনের মধ্যেই ইহা ঠিক হইয়া যাইবে। ধরা যাক যে, কোন কারণে আমাদের মোট পাওনার পরিমাণ মোট দেনার পরিমাণ হইতে কম। ইহার অর্থ সেই বৎসর আমাদিগকে বকেয়া হিসাব বাবদ বহু টাকা বিদেশে পাঠাইতে হইবে। ফলে দেশে টাকার পরিমাণ কমিবে। মোট টাকার পরিমাণ কমিলে জিনিসপত্রের দাম কমিবে। আমাদের দেশে জিনিসের দাম কম হইলে বিদেশীরা আমাদের নিকট হইতে বেশি পরিমাণে জিনিস কিনিবে। অর্থাৎ আমাদের রপ্তানি বাড়িবে। এইভাবে রপ্তানি বাড়িতে বাড়িতে তাহা আবার আমদানির সমান হইবে। সুতরাং কোন সময়ে যদি আমদানি-রপ্তানির পার্থক্যও দেখা দেয় তবে অচিরেই এই অবস্থার অবসান ঘটিবে। প্রয়োজনমত মূল্যান্তরের পরিবর্তন হইয়া হয় রপ্তানি না হয় আমদানি বাড়িবে বা কমিবে ও অল্প সময়ের মধ্যেই হিসাবে গরমিল কাটিয়া যাইবে। সুতরাং আমদানি-রপ্তানির পার্থক্য থাকিলেও ইহা নিতান্তই সাময়িক এবং আপনা হইতেই সংশোধিত হইবে।

আমদানি ও রপ্তানির পার্থক্য (Excess of Imports or Exports): কোন কোন সময়ে বা কারণে আমদানি রপ্তানির দ্রব্যের হিসাবেও পার্থক্য থাকিতে পারে। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে আমদানি ও রপ্তানি বলিতে আমরা কেবলমাত্র পণ্যদ্রব্যের কথা ধরিতেছি।

আমদানি পণ্যের পরিমাণ কি কি কারণে রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ হইতে বেশি থাকিতে পারে? এই অবস্থাকে বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের প্রতিকূল হিসাব (Unfavourable balance of trade) বলা হয়। প্রথমত, আমরা যদি বিদেশে পূর্বে বহু টাকা ধার দিয়া থাকি তবে আজ সেই ধারের সুদ ও আসল বাবদ প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে কিছু টাকা পাইব। বিদেশীরা আমাদের নিকট জিনিস বিক্রয় করিয়া এই ধার শোধ করে। কাজেই তখন আমাদের আমদানি পণ্যের পরিমাণ রপ্তানি হইতে বেশি হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, আমরা বিদেশীর নিকট টাকা ধার লইয়া বিদেশে প্রয়োজন মত পণ্য কিনিতে পারি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা বিদেশ হইতে ধার লইয়া ও স্টার্লিং তহবিল খরচ করিয়া বহু যন্ত্রপাতি কিনিতেছি। এই যন্ত্রপাতি দিয়া এদেশে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হইবে। সুতরাং আমদানি পণ্যের পরিমাণ রপ্তানি হইতে বেশি হইতেছে।

বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের হিসাব অনুকূল (Favourable balance of trade) হওয়ার অর্থ মোট রপ্তানি পণ্যের মূল্য আমদানি পণ্যের মূল্য হইতে বেশি। ইহা কোন্ কোন্ অবস্থায় হইতে পারে? প্রথমত, আমরা পূর্বে বিদেশে যদি বহু কর্জ করিয়া থাকি তবে আজ সুদ ও আসল বাবদ টাকা পাঠাইতে হইবে। এই টাকা দিয়া বিদেশীরা আমাদের দেশে ইচ্ছামত জিনিস কিনিয়া লইয়া যাইতে পারে। ফলে রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ আমদানি হইতে বেশি থাকিতে পারে। দ্বিতীয়ত, আমরা যদি বিদেশীকে আজ টাকা ধার দিই, তবে সেই টাকা দিয়া তাহারা আমাদের তৈয়ারি জিনিস কিনিয়া লইয়া যাইতে পারে। কাজেই আমাদের রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ আমদানি হইতে বেশি থাকিতে পারে। পরে বিদেশীরা যখন সুদ ও আসল শোধ দিতে আরম্ভ করিবে, তখন অবশ্য আমাদের আমদানির পরিমাণ রপ্তানি হইতে বেশি হইতে পারে। তৃতীয়ত, আমরা যদি বিদেশী জাহাজে মাল পাঠাই, বিদেশী ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর সঙ্গে কারবার করি, তবে এই বাবদ বিদেশীদের টাকা দিতে হয়। এই টাকা দিয়া বিদেশীরা আমাদের জিনিস কিনিয়া লইয়া যাইতে পারে। তাহা হইলেও রপ্তানির পরিমাণ আমদানি হইতে বেশি হইতে পারে।

আমদানি-রপ্তানির হিসাবের উদ্বৃত্ত সংশোধন (An excess of exports or imports tends to correct itself): সাধারণত দেশের আমদানি রপ্তানির পরিমাণ সমান থাকে। কিন্তু অবস্থা বিশেষে আমদানি রপ্তানির বেশি কিংবা রপ্তানি আমদানির বেশি থাকিতে পারে। যেমন আমরা যদি বিদেশ হইতে পূর্বে বহু টাকা কর্জ করিয়া থাকি, তবে আজ কর্জের সুদ ও আসল বাবদ টাকা বিদেশে পাঠাইতে হইবে। বিদেশীরা সেই টাকা দিয়া আমাদের দেশ হইতে পণ্য কিনিয়া লইয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে আমাদের রপ্তানির পরিমাণ আমদানি হইতে বেশি হইতে পারে। অর্থাৎ মোট রপ্তানি পণ্যের মূল্য আমদানি পণ্যের মূল্যের চেয়ে বেশি থাকিতে পারে। আমাদের যতদিন দেনা শোধ দিতে হইবে ততদিন এই অবস্থা বহাল থাকিতে পারে। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে এ অবস্থাতেও "আমদানি রপ্তানি সমান" এই নীতি ব্যাহত হয় না। কারণ যখন আমরা এই কথা বলি তখন শুধু পণ্যের হিসাব ধরি না, দেনাপাওনার সব কিছুর হিসাব ধরি। এই অবস্থায় মোট রপ্তানি পণ্যের মূল্য ও মোট আমদানি পণ্যের মূল্য + সুদ ও আসল বাবদ পাওনা সমান হইবে।

ধরা যাক, কোন বৎসর আমরা বিদেশ হইতে বহু টাকার জিনিস কিনিয়া বসিয়াছি। আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বহু নূতন নূতন শিল্প ও কারখানা স্থাপন করা ঠিক হইয়াছে এবং সেই উদ্দেশ্যে আমরা ইংলণ্ড, জার্মানি প্রভৃতি দেশ হইতে বহু টাকার যন্ত্রপাতি কিনিয়াছি। ফলে আমাদের মোট আমদানি পণ্যের মূল্য হইতে অনেক বেশি হইয়াছে। যদি কোন সময়ে এইরূপ আমদানির পরিমাণ রপ্তানি হইতে বেশি হয়, তবে এই অবস্থার সংশোধন হইবে কি করিয়া?

প্রথমত, দেখা যাইতেছে যে, আমরা বিদেশে যত টাকার জিনিস বিক্রয় করিয়াছি ইহার চেয়ে বেশি টাকার জিনিস বিদেশ হইতে কিনিয়াছি। কাজেই বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি বাবদ আমাদিগকে বিদেশে অনেক টাকা পাঠাইতে হইবে। বিদেশী মুদ্রার চাহিদা বাড়িবে ও ফলে আমাদের টাকা ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময়হার আমাদের বিপক্ষে যাইবে। অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় বাজারে আমাদের টাকার দাম কমিবে এবং পাউণ্ড কি ডলারের কি মার্কের দাম বাড়িবে। পূর্বে যেখানে এক ডলার কিনিতে

৫\ টাকা দিতে হইত, আজ সেখানে হয়ত ৫'১২ দিতে হইতেছে। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাজারে যে আমেরিকানরা ফট্‌কাবাজী ব্যবসায় করে, তাহারা এই সময়ে ডলারের বদলে বেশি টাকা পাওয়া যায় বলিয়া অনেক টাকা কিনিয়া রাখিতে পারে। কারণ আজ এক ডলারের বদলে ৫'১২ পাওয়া যাইতেছে। দুই মাস পরে হয়ত বিনিময়হার পূর্বের ন্যায় এক ডলার পাঁচ টাকা হইতে পারে। তখন টাকা বেচিয়া ডলার কিনিলে সে ডলারে এক টাকা লাভ করিতে পারে। ডলারের দাম যখন ৫'১২ তখন সে আট ডলার দিয়া ৪১\ টাকা কিনিয়া রাখিল। পরে যখন ডলার পাঁচ টাকার সমান হইল তখন সে ৪০\ টাকা দিয়া ৮ ডলার কিনিতে পারে, কিংবা ৪১\ টাকা দিয়া ৮'২০ ডলার কিনিতে পারে। অর্থাৎ তাহার '২০ ডলার লাভ হইতে পারে। সুতরাং এইভাবে সাময়িকভাবে আমরা আমেরিকান ফট্‌কাবাজীর নিকট হইতে কিছু ডলার পাইতে পারি এবং তাহা দিয়া আপাতত বিদেশীর দেনা মিটাইতে পারি।

কিন্তু ইহার দ্বারা যে উপকার হয় তাহা নিতান্তই সাময়িক। আমদানির পরিমাণ রপ্তানির বেশি হইলে ঘাট্‌তি টাকা আমাদিগকে দিতে হইবে। যখন দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল তখন বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাট্‌তি পূরণের জন্য আমাদিগকে বিদেশে সোনা পাঠাইতে হইবে। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তহবিলে সোনার পরিমাণ কমিয়া যাইবে। তহবিলে সোনা কমিয়া গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে বাধ্য হইয়া ব্যাঙ্ক রেট্ বাড়াইয়া দিতে হইবে। ব্যাঙ্ক রেট্ বাড়িলে দেশের মধ্যে সুদের হার বাড়িয়া যাইবে। চড়া সুদে ব্যবসায়ীরা কম টাকা ধার লইবে এবং তাহারা কম অর্থ বিনিয়োগ (Investment) করিত। বিনিয়োগের পরিমাণ কমিলে লোকের আয় কমিবে ও ক্রমে জিনিসপত্রের দাম নিম্নমুখী হইবে। অন্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের জিনিসের দাম যখন সস্তা হইত, তখন বিদেশীরা আমাদের দেশ হইতে বেশি জিনিস কিনিতে শুরু করিত। ফলে ক্রমে আমাদের রপ্তানি বাড়িত ও বিদেশে আমাদের তুলনায় জিনিসের দাম বেশি বলিয়া বিদেশ হইতে আমদানির পরিমাণও কমিত। রপ্তানি বাড়িয়া ও আমদানি কমিয়া অবশেষে উভয়ই সমান হইত।

অবশ্য এখন কোন দেশেই স্বর্ণমান বহাল নাই। তাহা হইলে, ঘাট্‌তি

টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলে (Foreign exchange reserves) হইতে দিতে হইবে কিংবা স্বর্ণ পাঠাইয়া বিদেশীদের ধার শোধ দিতে হইবে। ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে বিদেশী মুদ্রা ও স্বর্ণের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। সাধারণত এই অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে কম টাকার কাগজী মুদ্রা চালু করিতে হয়। অর্থাৎ দেশে মোট টাকার পরিমাণ কমিয়া যাইবে। টাকা কম হওয়ার অর্থ জিনিসপত্রের মূল্য ধীরে ধীরে নিম্নমুখী হওয়া। আমাদের দেশের জিনিসপত্রের দাম কমিতে থাকিলে রপ্তানি বাড়িবে এবং বিদেশে জিনিসপত্রের দাম অপেক্ষাকৃত বেশি বলিয়া বিদেশ হইতে আমদানির পরিমাণ কমিতে থাকিবে। এইভাবে ক্রমে আমদানি-রপ্তানির সমতা বহাল হইবে।

Exercises

1. Distinguish between the Balance of Trade and the Balance of payments. How can a continuous deficit in the balance of payments be corrected ? (C.U. B.Com. 1959)

2. In what sense is it true to say that the exports of a country pay for its imports ? (C.U. 1953, B. Com. 1954; Viswa. 1954, 1953)

3. Explain how an excess of exports or imports tends to correct itself. (Viswa 1957)

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

বৈদেশিক বিনিময়

(Foreign Exchange)*

বৈদেশিক বিনিময়হার কিভাবে স্থির হয় ? (How is the rate of exchange determined) : দেশী ও বিদেশী টাকার অনুপাতকে বৈদেশিক বিনিময়হার বলে। বিদেশী টাকার সরবরাহ ও চাহিদার দ্বারা এই বিনিময়হার নির্ণীত হয়। বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ ও চাহিদা আবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের হিসাবের উপর নির্ভর করে। অতএব বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হিসাব দ্বারা বৈদেশিক বিনিময়হার স্থির হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত যদি বিপক্ষে যায়, অর্থাৎ রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি হয় তবে, বিদেশী বণিকদের ধার শোধ দিবার জন্য আমরা বিদেশী মুদ্রা কিনিতে চাহিব। ফলে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা বাড়িবে ও তাহার মূল্য বেশি হইবে। অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়হার পড়িয়া যাইবে। লেনদেনের হিসাব স্বপক্ষে গেলে বৈদেশিক বিনিময়ের হার বাড়িয়া যাইবে। ইহাকে Balance of trade তত্ত্ব বলে। বৈদেশিক বিনিময়হারের উপর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের হিসাবের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কেবলমাত্র ইহার দ্বারা বৈদেশিক বিনিময়হার নির্ধারিত হইবে একথা বলা যায় না। আমদানি অথবা রপ্তানির পরিমাণ কোন এক সময়ে বেশি ও অন্য সময়ে কম কেন ? কেন বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত কখনও আমাদের স্বপক্ষে, কখনও বিপক্ষে যায়। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত (balance of trade) কোন্ কোন্ বিষয় দ্বারা নির্ণীত হয় ? এই বিষয়গুলির দ্বারা বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ করা যায় না কি ? ইহা ছাড়া অনেক সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্তকে বৈদেশিক বিনিময়-হার নির্ধারণের কারণ বলা চলে না। বরঞ্চ অনেক সময়ে দেখা যায় যে, প্রথমে নানা কারণে বৈদেশিক বিনিময়হার পরিবর্তিত হয়। তাহার ফলে পরে ক্রমে ক্রমে বাণিজ্যের হিসাব পরিবর্তিত হয়। ধরা যাক যে এক

ডলারের সাধারণ দাম ৫৲ টাকা। কোন সময়ে ফাট্‌কাবাজীর জন্য ডলারের দাম বাড়িয়া ৫'১২ হইল। পূর্বে যে আমেরিকান জিনিস ৫৲ টাকা দামে বিক্রয় হইত এখন তাহার দাম ৫'১২ হইবে। অর্থাৎ আমেরিকা হইতে আমদানি জিনিসের দাম বাড়িবে। ইহাতে দাম বাড়িলে আমেরিকান জিনিসের চাহিদা কমিয়া যাইবে। ফলে আমেরিকান জিনিসের আমদানি কমিবে। প্রথমে বিনিময়হার কমিল ও ইহার ফলে আমদানির পরিমাণ কমিল। সুতরাং এই তত্ত্বে বিনিময় হারের প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

ক্রয়ক্ষমতা হার তত্ত্ব (Purchasing power parity theory): সুইডেনের অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক Gustav Cassel এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই তত্ত্বে বলে যে, দুইটি দেশের মুদ্রার বিনিময়হার ইহাদের মূল্যস্তরের অনুপাত অনুযায়ী স্থির হয়। টাকা ও পাউণ্ডের বিনিময়হার এমন হইবে যে, ১০০৲ টাকা দিয়া এদেশে যত জিনিস কেনা যায়, বিলাতেও তাহাই কেনা যাইবে। ১৫৲ টাকা খরচ করিয়া ভারতে যে পরিমাণ জিনিস পাওয়া যায়, বিলাতে সেই পরিমাণ জিনিসের দাম যদি এক পাউণ্ড হয়, তবে বিনিময়হার ১৫৲ টাকা=এক পাউণ্ড অর্থাৎ ১৲ টাকা=১ শি. ৪ পে. হইবে। আমরা বিদেশী মুদ্রা চাই, কারণ তাহা দিয়া বিদেশী জিনিস কেনা যায়। এবং দেশী জিনিসের দামের সহিত বিদেশী জিনিসের দামের সম্পর্ক আছে ইহার হিসাব করিলেই ব্যাপারটি বোঝা সহজ হইবে। দুইটি দেশের মুদ্রার বিনিময়হার ইহাদের আভ্যন্তরীণ অর্থাৎ নিজের দেশে ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতের সমান হইবে।

কিন্তু সাধারণত বিভিন্ন দেশের মূল্যস্তর বিভিন্ন স্তরে থাকে। সুতরাং কোন ভিত্তি-বৎসর না ধরিয়া মূল্যস্তরের তুলনা করা যায় না। ১৯৩৯ সালকে ভিত্তি-বৎসর ধরা যাক। ঐ বৎসরের মূল্যস্তর ও বিনিময়হারকে স্বাভাবিক হার ধরা হইল। দুইটি মূল্যস্তরের সম্পর্ক যদি পরিবর্তিত হয়, তবে বিনিময়-হারও পরিবর্তিত হইবে। ধরা যাক, ১৯৩৯ সালে আমেরিকার মূল্যস্তর ইংল্যাণ্ডের মূল্যস্তরের দেড়গুণ এবং ঐ বৎসর বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের হার ছিল ৪'৮ ডলার ১ পাউণ্ডের সমান। ১৯৪৯ সালে ইংল্যাণ্ডের মূল্যস্তর তিনগুণ এবং আমেরিকার মূল্যস্তর দ্বিগুণ হইল। তাহা হইলে বিনিময়হার হইবে ৩'২ ডলারের সমান ১ পাউণ্ড। ডলার হিসাবে পাউণ্ডের দাম পূর্বের

দামের দুই-তৃতীয়াংশ হইবে। কারণ ইংল্যাণ্ডের মূল্যস্তর তিনগুণ বাড়িয়াছে, অথচ আমেরিকার মূল্যস্তর দ্বিগুণ হইয়াছে।

এই তত্ত্ব প্রথম প্রথম অনেকেই গ্রহণ করেন, কিন্তু পরে ইহার বহু সমালোচনা হইয়াছে। বর্তমানে কম লেখকই এই তত্ত্ব স্বীকার করেন। বৈদেশিক বিনিময়হারের উপর মূল্যস্তর ছাড়াও আরো অনেক জিনিসের প্রভাব আছে, যেমন বৈদেশিক ধারের কারবার ইত্যাদি। ইহার ফলে বৈদেশিক বিনিময়হার কেবল মাত্র মূল্যস্তর দ্বারা নির্ধারিত বিনিময়হার হইতে পৃথক হইতে পারে।

বিনিময়হারের উঠা-নামা (Fluctuations of the rates of exchange): সাধারণত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়হার সরকার হইতে ঠিক করিয়া দেওয়া হয়। বৈদেশিক মুদ্রাবাজারের বিনিময়হার ইহাকে কেন্দ্র করিয়া অধিক সময়ে উঠা-নামা করে। ইহার কারণ কি? এই উঠা-নামার কারণ বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও সরবরাহের পরিবর্তন। যদি কোন কারণে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বাড়ে ও সরবরাহ কমে, তবে অন্যান্য জিনিসের ন্যায় বৈদেশিক মুদ্রারও মূল্য বাড়িবে। সব জিনিসেরই চাহিদা বাড়িলে ও সরবরাহ কমিলে দাম বাড়ে। বৈদেশিক মুদ্রার দাম বাড়ার অর্থ ইহার বিনিময়ে বেশি পরিমাণ দেশী মুদ্রা দিতে হইবে। এইভাবে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও সরবরাহ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিনিময়হার পরিবর্তিত হয়। কি কি কারণে চাহিদা ও সরবরাহের পরিবর্তন হয়? তিনটি কারণে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও সরবরাহ পরিবর্তিত হয়।—(১) বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাবের অবস্থা, (২) ধার দেওয়া-নেওয়ার প্রভাব এবং (৩) মুদ্রা-ব্যবস্থার প্রভাব।

(১) দ্রব্য আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণের উপর বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ ও চাহিদা নির্ভর করে। পণ্য আমদানি করা হইলে বিদেশীকে টাকা দিতে হইবে ও রপ্তানি হইলে বিদেশীর নিকট টাকা পাওয়া যাইবে। আমদানি দ্রব্যের চেয়ে রপ্তানি বেশি হইলে বিদেশীর নিকট আমাদের দেনার চেয়ে পাওনা বেশি হইবে। সুতরাং বিদেশের বাজারে আমাদের টাকার চাহিদা বাড়িবে ও বিনিময়হার আমাদের স্বপক্ষে যাইবে। অর্থাৎ এক টাকার পরিবর্তে সরকারী বিনিময়হারের চেয়ে একটু বেশি পরিমাণ বিদেশী

মুদ্রা পাওয়া যাইবে। আবার আমদানি দ্রব্যের চেয়ে রপ্তানি কম হইলে বিদেশীরা আমাদের নিকট টাকা পায়। ফলে বিদেশী মুদ্রার জন্য আমাদের চাহিদা বাড়িবে। অর্থাৎ আমরা রপ্তানি বাবদ বিদেশীদের নিকট যে পরিমাণ টাকা পাইব তাহার চেয়ে বেশি টাকা বিদেশীকে দিতে হইবে। কারণ আমরা রপ্তানির চেয়ে বেশি টাকার জিনিস আমদানি করিয়াছি। সুতরাং টাকার বদলে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা বাড়িবে। চাহিদা বৃদ্ধির অর্থ বিদেশী মুদ্রার মূল্য বাড়িবে। অর্থাৎ এক টাকার বিনিময়ে আমরা পূর্বের চেয়ে কম বিদেশী মুদ্রা, স্টার্লিং বা ডলার পাইব। এক্ষেত্রে বিনিময়হার আমাদের বিপক্ষে যাইবে। আমদানি ও রপ্তানির হিসাবে শুধু পণ্যের হিসাব ধরিলে চলিবে না, অদৃশ্য বিষয়গুলি ধরিতে হইবে, কারণ তাহাদের জন্যও বিদেশী মুদ্রার সরবরাহ ও চাহিদা বাড়ে বা কমে।

(২) ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ করা, সুদ দেওয়া ও পাওয়া, বৈদেশিক ঋণপত্র বেচা-কেনা, বিদেশীর নিকট দেশী ঋণপত্র বিক্রয় করা, ইত্যাদি হিসাবের পরিবর্তনের ফলেও বিদেশী মুদ্রার চাহিদা ও সরবরাহ বাড়ে বা কমে। আমরা যদি অন্য দেশকে বেশি করিয়া ধার দিই, তবে বিদেশী টাকার চাহিদা বাড়িবে এবং বিনিময়হার আমাদের বিরুদ্ধে যাইবে। আমরা বিদেশী ঋণপত্র কিনিলেও বিদেশী টাকার চাহিদা বাড়িবে এবং বিনিময়হার আমাদের বিরুদ্ধে যাইবে। কিন্তু বিদেশীরা যদি আমাদের ধার দেয়, অথবা আমাদের ঋণপত্র কেনে কিংবা যখন ধার শোধ দেয়, তখন বিনিময়হার আমাদের স্বপক্ষে আসিবে।

(৩) মুদ্রাব্যবস্থার প্রভাব: বিনিময়হারের উপর দেশের মুদ্রাব্যবস্থার প্রভাব আছে। যদি শোনা যায় যে, অতিরিক্ত কাগজী নোট চালু করার জন্য মুদ্রাস্ফীতি হইবে, তবে বিদেশে সে টাকার চাহিদা কমিয়া যাইবে। সুতরাং বিনিময়হার সে দেশের বিপক্ষে যাইবে। যদি বেশি রকম মুদ্রাস্ফীতি হইবার আশংকা থাকে, তবে অনেক সময় ধনী ও ফটকাবাজ লোকেরা টাকার বদলে বিদেশী মুদ্রা কিনিয়া রাখিতে চাহিবে। কারণ, দেশী মুদ্রার দাম দ্রুত কমিতেছে, কিন্তু বিদেশী মুদ্রার দাম সমান আছে। ইহাকে "মুদ্রা হইতে পলায়ন" (flight from currency) বলে। ইহার ফলে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা বাড়িবে ও বিনিময়হার সরকারী বিনিময়হারের অনেক নীচে

নামিয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন, স্পেকুলেশন ইত্যাদির দ্বারাও বিনিময়হার প্রভাবিত হয়।

যে কোন কারণে বিদেশে যদি আমাদের টাকার চাহিদা বাড়ে, কিন্তু সেই তুলনায় বিদেশী মুদ্রার জন্য আমাদের চাহিদা না বাড়ে, তবে টাকার দাম বাড়িবে ও বিনিময়ে বেশি পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ বিনিময়হার আমাদের অনুকূল হইবে। আবার যদি বিদেশে আমাদের টাকার চাহিদা কমে কিংবা বিদেশী মুদ্রার জন্য আমাদের চাহিদা বাড়ে, তবে টাকার বিনিময়হার কমিয়া যাইবে।

বিনিময়হার পরিবর্তনের সীমা (Limits to fluctuations in exchange-rates): বৈদেশিক বিনিময়হার চাহিদা ও সরবরাহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উঠা-নামা করে। এই উঠা-নামার কি কোন সীমা আছে? যখন দুই দেশেই স্বর্ণমান ছিল, তবে ইহাদের মুদ্রা বিনিময়হার টাঁকশাল হারকে (mint par) কেন্দ্র করিয়া স্বর্ণ-রপ্তানি ও আমদানি বিন্দু (gold points) দুইটির মধ্যে উঠা-নামা করিত। মুদ্রা দুইটির মধ্যে কত সোনা আছে তাহা দিয়া টাঁকশাল-হার স্থির হয়। ধরা যাক, যে এক পাউণ্ডে যে পরিমাণ সোনা আছে, ৪·৮৬ ডলারেও ঠিক সেই পরিমাণ সোনা আছে। তাহা হইলে পাউণ্ড ও ডলারের টাঁকশাল-হার ১ পাউণ্ড = ৪·৮৬ ডলার হইবে। পাউণ্ড ডলারের বিনিময়হার টাঁকশাল-হারের সমান হইলে ইহা সমবিন্দুতে (at par) আছে বলা হয়। সাধারণত বৈদেশিক বিনিময়-হার টাঁকশাল-হারের উপরে ও নীচে উঠা-নামা করে। সুতরাং স্বর্ণমান থাকিলে এই উঠা-নামার দুইটি সীমা থাকিত। ইহাদের স্বর্ণ-রপ্তানি ও স্বর্ণ-আমদানি বিন্দু বলা হইত। আমেরিকায় এক পাউণ্ড পাঠাইলে বিনিময়ে ৪·৮৬ ডলার পাওয়া যাইত বটে, কিন্তু ইহা পাঠাইবার খরচ ছিল, হাঙ্গামাও ছিল। অতএব টাঁকশাল হারের সহিত বিলাত হইতে সোনা বা স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইবার খরচ যোগ দিলে বিলাতী মুদ্রার স্বর্ণ-রপ্তানি বিন্দু (gold export point) পাওয়া যাইত। ধরা যাক, এক পাউণ্ড পাঠাইলে সবসুদ্ধ ১ পেনী খরচ হয় তবে স্বর্ণ-রপ্তানি বিন্দু ১ পাউণ্ড এক পেনীর সমান হইবে। তেমনি টাঁকশাল-হার হইতে সোনা আনিবার বা আমদানি করিবার খরচ বাদ দিলে স্বর্ণ-আমদানি বিন্দু (gold import

point) পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে আমদানি রপ্তানির খরচ একই হইলে, স্বর্ণ-আমদানি বিন্দু ১৯ শিলিং ১১ পেনী হইবে। হুণ্ডী বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টের দাম স্বর্ণ বিন্দু দুইটির মধ্যে থাকিলে ব্যবসায়ীরা হুণ্ডী বা ড্রাফ্‌ট কিনিবে। কিন্তু হুণ্ডীর বা ড্রাফ্‌টের দাম স্বর্ণ-রপ্তানি বিন্দুর বেশি হইলে ব্যবসায়ীরা ইহা না কিনিয়া সোনা পাঠাইবে। কারণ ইহাতেই তাহাদের লাভ হইবে। বৈদেশিক বিনিময়হার স্বর্ণ-আমদানি বিন্দুর চেয়ে বেশি হইলে সোনা আমদানি হইবে।

আজকাল কোন দেশেই স্বর্ণমান নাই এবং সব দেশেই কাগজী নোট প্রচলিত আছে। দুই দেশের মুদ্রা কাগজী নোট হইলে স্বর্ণবিন্দু বলিয়া কিছু থাকে না। সরকার আন্তর্জাতিক মনেটারী ফাণ্ডের অনুমতি লইয়া বিদেশী মুদ্রার সহিত দেশী মুদ্রার বিনিময়হার ঠিক করিয়া দেয়। ইহাই টাঁকশাল হারের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে বিনিময়হার এই সরকারী নির্ধারিত হারকে কেন্দ্র করিয়া উঠা-নামা করে। স্বর্ণমানের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, স্বর্ণমানে যেমন বিনিময়হার স্বর্ণবিন্দু দুইটির মধ্যে উঠা-নামা করে এবং সাধারণত স্বর্ণ রপ্তানি বিন্দুর উপরে উঠে না কিংবা স্বর্ণ-আমদানি বিন্দুর নীচে নামে না—কাগজী নোটের বেলায় বিনিময়হার উঠা-নামার এইরূপ কোন সীমা নাই। বিদেশী মুদ্রার চাহিদা ও সরবরাহের সে রকম পরিবর্তন হইলে, বিনিময়হার সরকারী বিনিময়হার হইতে অনেক তফাৎ হইতে পারে। এই অবস্থায় বিনিময়হার উঠা-নামার কোন সীমারেখা থাকে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক মানিটারী ফাণ্ডের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক দেশের সরকার শুধু যে বিদেশী মুদ্রার সহিত দেশী মুদ্রার বিনিময়হার ঠিক করে তাহা নহে, স্বর্ণ-রপ্তানি ও আমদানি বিন্দুদ্বয়ের মত আরো দুইটি বিনিময়হার ঠিক করিয়া দেয়। বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে বিনিময়হার এই দুইটি বিন্দুর মধ্যে উঠা-নামা করে। যদি সরকারের হাতে প্রয়োজনমত বিদেশী মুদ্রার তহবিল থাকে, তবে কাগজী মুদ্রাব্যবস্থাতেও বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়হার সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে উঠা-নামা করে।

কাগজী মুদ্রামান ও বিনিময়হার নির্ধারণ (Determination of the exchange rate under inconveritible paper currency):

যখন দুইটি দেশেই স্বর্ণমানের পরিবর্তে কাগজী মুদ্রামান প্রচলিত থাকে, তখন ইহাদের মধ্যে বিনিময়হার কিভাবে নির্ধারিত হয়? দুই দেশেই যদি স্বর্ণমান থাকে তাহা হইলে বিনিময়হার স্বর্ণ-আমদানি ও রপ্তানি বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে উঠা-নামা করে। কিন্তু দুই দেশের মুদ্রা কাগজী নোট হইলে স্বর্ণ আমদানি ও রপ্তানি বিন্দু বলিয়া কিছু থাকে না। তখন স্বাভাবিক অবস্থায় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়হার পরিবর্তনের কোন সীমা থাকে না। অর্থাৎ আজ যেখানে ৫ টাকায় এক ডলার রেট আছে, দুই সপ্তাহ পরে ইহা ৬ টাকা ডলার কিংবা ৪ টাকা ডলার হইতে পারে। তবে সব দেশেই মুদ্রা বিনিময়হার যাহাতে খুব বেশি রকম উঠা-নামা না করে সেইজন্য সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে। সরকার উচ্চ ও নীচ দুইটি বিনিময়হার নির্দিষ্ট করিয়া দেয় ও বিদেশী মুদ্রার বাজারে যাহাতে বিনিময়হার এই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিয়া যায় ইহার জন্য প্রয়োজনমত বিদেশী মুদ্রা কেনাবেচা করে। ধর, ভারত সরকার ঠিক করিল যে, টাকা ও ডলারের বিনিময়হার পৌনে পাঁচ টাকা ডলার ও সওয়া পাঁচ টাকা ডলার ইহার মধ্যে রাখিতে হইবে। যদি কোন সময়ে ডলারের চাহিদা এমনি বাড়ে যে ইহার দাম সওয়া পাঁচ টাকা ছাড়াইয়া যাইবার আশংকা দেখা দিতেছে, তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত চাহিদা মিটাইবার জন্য সওয়া পাঁচ টাকা হারে ডলার বিক্রয় করে। তাহা হইলে ডলারের দাম ইহার বেশি হইবে না। আবার ডলারের দাম নামিয়া পৌনে পাঁচ টাকার নীচে যাইতে আরম্ভ করিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঐ দামে ডলার বিক্রয় করে। ফলে ডলারের দাম ইহার নীচে নামিতে পারে না।

সুতরাং কাগজী মুদ্রামান বিদেশী মুদ্রা বিনিময়হার সরকারী নির্দিষ্ট বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে উঠা-নামা করে। কোন এক সময়ে এই বিনিময়হার কিভাবে নির্ণীত হয়? ইহা দুই দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। টাকা ও ডলারের বিনিময়হার ভারতবর্ষে টাকার ক্রয়ক্ষমতা ও আমেরিকায় ডলারের ক্রয়ক্ষমতার দ্বারা নির্ণীত হইবে। এক ডলার দিয়া আমেরিকায় যে জিনিস কেনা যায় ইহার দাম ভারতবর্ষে যদি ৫ টাকা হয়, তবে টাকা ও ডলারের বিনিময়হার ৫ টাকা ডলার হইবে। টাকা ও ডলারের ক্রয়ক্ষমতা এই দুইটি দেশের মূল্যস্তর দিয়া ঠিক করিতে হইবে

এবং মূল্যান্তরের পরিবর্তন সূচকসংখ্যা দ্বারা মাপা হয়। ধর, প্রথম বৎসর আমেরিকার সূচকসংখ্যা ১০০ ও ভারতের সূচকসংখ্যা ১২০। উভয় দেশের মুদ্রা ও বিনিময়হার ৫ টাকা ডলার। দুই বৎসর পরে আমেরিকার সূচকসংখ্যা হয়ত ১০০ রহিয়া গেল। কিন্তু ভারতে সূচকসংখ্যা বাড়িয়া ১৪৪ হইল। অর্থাৎ টাকার ক্রয়ক্ষমতা পূর্বের তুলনায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ কমিয়াছে। কিন্তু ডলারের ক্রয়ক্ষমতা পূর্বের ন্যায় রহিয়াছে। এই অবস্থায় ইহাদের বিনিময়হার ৬৲ টাকা ডলার হইবে। তাহা হইলে উভয় মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা সমান থাকিবে। প্রথম বৎসর আমেরিকাতে এক ডলার দিয়া যত জিনিস কেনা যাইত, দুই বৎসর পরেও তাহাই কেনা যাইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রথম বৎসরে সেই জিনিস কিনিতে পাঁচ টাকা লাগিত এবং দুই বৎসর পরে মূল্যবৃদ্ধির জন্য ছয় টাকা লাগিতেছে। সুতরাং বিনিময়হার ৬ টাকা ডলার হইবে। এই তত্ত্বকে ক্রয়ক্ষমতাহার তত্ত্ব (Purchasing power parity) বলে।

দুইটি মুদ্রার বিনিময়হার সাধারণত ইহাদের ক্রয়ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। ক্রয়ক্ষমতার পরিমাপ হইতেছে মূল্যান্তর। সুতরাং দুইটি দেশের মূল্যান্তরের পরিবর্তনের হিসাব করিয়া ইহাদের বিনিময়হার ঠিক করা যায়। অবশ্য সব সময়ে যে বিনিময়হার এই তত্ত্ব দ্বারা নির্ণীত হয় তাহা নহে, ক্রয়ক্ষমতা ছাড়াও অন্য অনেক বিষয়ের দ্বারা বিনিময়হার প্রভাবিত হয়। যেমন বৈদেশিক ঋণের হ্রাসবৃদ্ধি, উৎপাদন দক্ষতার হ্রাসবৃদ্ধি প্রভৃতি অনেক বিষয়ের উপর বিনিময়হার নির্ভর করে।

বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় নিয়ন্ত্রণ (Exchange control): আজকাল অধিকাংশ দেশেই সরকার বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কারবার নানা প্রকারে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। এখন কোন দেশেই স্বর্ণমান প্রচলিত নাই। দেশের সরকার বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের হার নির্দিষ্ট করিয়া দিতেছে এবং বাজারে যাহাতে এই বিনিময়হার বজায় থাকে সেইজন্য বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় কারবার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে। ধর, ভারত-সরকার ঠিক করিল যে আমাদের টাকা ও বিলাতী মুদ্রা স্টার্লিং-এর মধ্যে বিনিময় হার হইবে এক শিলিং ছয় পেন্স = ১ টাকা। স্বর্ণমান না থাকিলে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের হার বিনিময়ের বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা

ও যোগানের দ্বারা নির্ণীত হয়। চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে হয়ত বিনিময়হার ১ শিলিং ৬ পেন্স হইতে ভিন্ন হইতে পারে। ইহা যাহাতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে সরকার বিদেশী মুদ্রার চাহিদা ও যোগান নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এই ব্যবস্থাগুলির সমষ্টিকে বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় বলা হয়।

নানা উদ্দেশ্য লইয়া বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সাধারণত যখন বিদেশ হইতে আমদানির পরিমাণ রপ্তানি হইতে কম থাকে সেই সময় এইরূপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। আমদানি রপ্তানির চেয়ে বেশি হইলে আমাদের বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইবে। অর্থাৎ আমরা বিদেশীর নিকট যত টাকা পাইব ইহার বেশি টাকা বিদেশীকে দিতে হইবে। ইহার ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তহবিলে রক্ষিত সোনা ও বিদেশী মুদ্রার পরিমাণ ক্রমেই কমিতে থাকিবে। এই তহবিল বেশি কমিলে নানা অসুবিধা ও বিপদ দেখা দিতে পারে। আমদানির অপেক্ষা রপ্তানির পার্থক্য বেশি হইলে, হয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রাব তহবিল শূন্য হইবার আশংকা থাকে, নয় বৈদেশিক বিনিময়হার নির্দিষ্ট রাখা সম্ভব হয় না। এইজন্য সরকার বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রণের প্রধান উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তহবিলস্থিত বিদেশী মুদ্রা ও সোনার পরিমাণ যাহাতে বেশি না কমিয়া যায় এবং সরকার নির্দিষ্ট বৈদেশিক বিনিময় হার বাজারে বহাল থাকে। সরকার নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বিদেশ হইতে আমদানির পরিমাণ কমাইয়া দেয় এবং রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করে। ইহা প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও অনেক সময়ে আরো দু'একটি উদ্দেশ্য লইয়া এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। যেমন, আমদানির পরিমাণ কমাইতে হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির আমদানি না কমাইয়া অনাবশ্যক আমদানি ছাঁটাই করা ও বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণের একটি উদ্দেশ্য থাকে। অনাবশ্যকীয়, যেমন বিলাস সামগ্রী, দ্রব্যাদির আমদানি বন্ধ করা কিংবা প্রয়োজন মত কমান হয় এবং শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামাল, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়। আবার কখনও কখনও কোন বিশিষ্ট দেশের সহিত ব্যবসায় বাড়াইবার বা কমাইবার

উদ্দেশ্যেও এইরূপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। যেমন, আমাদের তহবিলে বেশি ডলার নাই ও শীঘ্র পাইবার সম্ভাবনাও কম। সুতরাং ডলারের দেশ হইতে (অর্থাৎ আমেরিকা, কানাডা, দক্ষিণ আমেরিকা ইত্যাদি) আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কোন কোন দেশে দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে এমন কি রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যেও এইরূপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

যেদেশে বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা হয় সেখানে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যলিপ্ত ব্যবসায়ীদের সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র লইতে হয়। কোন কোন বিশিষ্ট দ্রব্যের আমদানি হয়ত বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। আমদানি দ্রব্যকে আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। আবশ্যকীয় আমদানির মূল্য বাবদ দেয় অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল হইতে দেওয় হয়। অনাবশ্যকীয় আমদানি বাবদ দেয় অর্থ সম্বন্ধে নানা প্রকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয। যে ব্যবসায়ীরা বিদেশে রপ্তানি করে, তাহাদের প্রাপ্য বিদেশী মুদ্রা সমস্তই বা অধিকাংশই নির্দিষ্ট হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতে হয়। আমদানি নিয়ন্ত্রণের সময় বিভিন্ন দেশের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে প্রভেদ করা যাইতে পারে। যেমন ডলার দেশগুলি হইতে আমদানি কমান, এমন কি আবশ্যকীয় আমদানি কমান এবং স্টার্লিং প্রচলিত দেশ হইতে আমদানি বাড়াইবার ব্যবস্থা করা হয়। শুধু দ্রব্য আমদানি রপ্তানির উপর নিয়ন্ত্রণ বসান হয় না—অন্য সমস্ত দেনা-পাওনাও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যেমন বিদেশে টাকা পাঠাইতে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুমতি (পারমিট) লইতে হয়। বিদেশে বেড়াইতে গেলে বা ছেলেকে পড়াশুনার জন্য পাঠাইতে হইলে, বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন হয় এবং সেই সময়েও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুমতি লইতে হয়। এই বাবদ বিদেশে কত টাকা পাঠান যাইবে বা কত টাকা ব্যয় করা যাইবে ইহার পরিমাণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট করিয়া দেয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট বৈদেশিক বিনিময়হার বাজারে বহাল রাখা। সরকার অনেক সময়ে একটিমাত্র বিনিময়হার ঠিক না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে

ভিন্ন বিনিময়হার নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে। ধর, আমেরিকার বাজারে পাটের থলির খুব চাহিদা আছে। আবার চায়ের চাহিদা কম। সরকার নিয়ম করিয়া দেয় যে পাটের থলি বিক্রয়ের সময় বিনিময়হার হইবে চার টাকা ডলার। অর্থাৎ এক টাকা ২৫ সেণ্টের সমান, কিন্তু চা বিক্রয়ের সময় বিনিময়হার হইবে ৫ টাকা ডলার অর্থাৎ এক টাকা ২০ সেণ্টের সমান। পাটের থলির চাহিদা বেশি বলিয়া ক্রেতা বেশি ডলার দিয়াও ইহা কিনিবে। কিন্তু চায়ের চাহিদা কম বলিয়া ইহার ক্রেতাকে কম ডলার দিয়া চা কিনিবার সুযোগ দেওয়া হইল। এইরূপ বিভিন্ন বিনিময়হার নির্ধারণ করিয়াও বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সাময়িকভাবে অনেক সুবিধা হয়। বিশেষ করিয়া অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে যাহারা শীঘ্রই নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিতে উৎসুক, তাহাদের পক্ষে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই। কিন্তু ইহার অনেক দোষও আছে। কোন্ জিনিস আবশ্যকীয় ও কোন্‌টি নয়—ইহার বিচার করেন সরকারী কর্মচারীরা। তাঁহারা এই সমস্ত বিষয় নির্ধারণে দক্ষ নহেন ও তাঁহাদের ভুলের ফলে অনেক ক্ষতি হইতে পারে। ইহা দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়। ব্যবসায়ীরা নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী আমদানির অনুমতি লাভের জন্য কর্তৃপক্ষদের ঘুষ দেয় ও নানাভাবে প্রভাবান্বিত করিবার চেষ্টা করে। হয়ত-অনেক অ-দরকারী জিনিস প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইল ও ফলে কোন কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করা সম্ভব হইল না। বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রভেদাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন এবং বিভিন্ন কাজের জন্য বিনিময়হারের পার্থক্য করার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

Exercises

Q. 1. What is meant by (a) the specie points, (b) mint of exchanges ?

Q. 2. What are the limits within which the rate of foreign exchange can normally fluctuate under gold standard ? (C. U. 1949, '44 ; B. Com. 1945).

Q. 3. Discuss the limits of the fluctuations of the rate of exchange under paper standard. (C. U. 1949, '44 ; B. Com. 1945).

Q. 4. How is foreign exchange determined under conditions of (i) gold standard, (ii) inconvertible paper standard ? (Viswa. 1956).

Q. 5. Show how the rate of exchange between two currencies is determined under a system of inconvertible paper standard. (C. U. B.A. 1951 ; B. Com. 1955, '53 ; Viswa. 1952).

Q. 6. Enumerate the influences that bring about fluctuations in the rate of exchange. (C. U. 1957).

Q. 7. Write brief explanatory notes on the objects and mechanism of exchange control. (C. U. B. Com. 1957).

Q. 8. Explain how an excess of exports or imports tends to correct itself. (Viswa. 1957).

Q. 9. In what sense is it true to say that the exports of a country pay for its imports ? (C. U. 1953, B. Com. 1954 ; Viswa. 1954, 1953).

Q. 10. Distinguish between the Balance of Trade and the Balance of payments. How can a continuous deficit in the balance of payments be corrected ? (C. U. B. Com. 1959)

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক মনিটারী ফাণ্ড

(International Monetary Fund)

গত যুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিময়ের সুবিধার জন্য দুইটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমান পরিশিষ্টে তাহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইবে। প্রথম প্রতিষ্ঠানটির নাম আন্তর্জাতিক মনিটারী ফাণ্ড বা সংক্ষেপে I. M. F. ও দ্বিতীয়টির নাম International Bank for Reconstruction and Development বা সংক্ষেপে ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক বলে।

আন্তর্জাতিক মনিটারী ফাণ্ড (International Monetary Fund) : এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন শহরে প্রতিষ্ঠিত আছে; ইহার মোট তহবিলের পরিমাণ ১৪ বিলিয়ন ডলার। সভ্যদের নিকট চাঁদা লইয়া এই টাকা তোলা হইয়াছে। আমেরিকা ৪১২৫ মিলিয়ন ডলার, বৃটেন ১৯৫০ মিলিয়ন ডলার, চীন ৫৫০ মিলিয়ন ডলার, ফ্রান্স ৭৮৭.৫ মিলিয়ন ডলার এবং ভারতবর্ষ ৬০০ মিলিয়ন ডলার চাঁদা দিয়াছে। প্রত্যেক দেশের একজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি Board of Governors আছে। প্রকৃত ক্ষমতা ১২ জন সভ্য লইয়া গঠিত Executive Committee-র হস্তে ন্যস্ত। ইহাদের মধ্যে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ ও চীন দেশ স্থায়ী সভ্য। Executive Committee একজন Managing Director নিয়োগ করে।

এই ফাণ্ডের প্রধান কাজ বিভিন্ন দেশের মধ্যে মুদ্রাবিনিময় হার স্থির রাখার সাহায্য করা। প্রত্যেক দেশ ফাণ্ডের কর্তৃপক্ষকে সোনা বা ডলারের সহিত নিজের মুদ্রার বিনিময় হার জানাইয়া দিবে। সে দেশের বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময়ের কাজ সেই হারে করিতে হয়। তবে প্রয়োজন হইলে, এই বিনিময় হারের পরিবর্তন করা চলিবে। ফাণ্ডের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ও তাহাদের মত লইয়া যে কোন সময়ে বিনিময় হারের শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত পরিবর্তন করা যাইবে এবং কোন মৌলিক কারণ দেখাইতে

পারিলে ইহার চেয়ে বেশি হারেও পরিবর্তন করা যায়। এইখানে স্বর্ণমানের সঙ্গে এই ব্যবস্থার পার্থক্য। স্বর্ণমানে বিনিময়হার বদলান যায় না। কিন্তু এই ব্যবস্থায় সাধারণভাবে মুদ্রাবিনিময়হার স্বর্ণমানের ন্যায় স্থির থাকে। কিন্তু অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে প্রয়োজনমত বিনিময়হারেরও পরিবর্তন করা যাইবে। বিভিন্ন দেশ যদি নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়া মুদ্রা-বিনিময় হারের যদৃচ্ছা পরিবর্তন করে, তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক ফাণ্ডের কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া বিনিময়হারের পরিবর্তন করা হইবে বলিয়া গণ্ডগোলের সম্ভাবনা কম।

ফাণ্ডের দ্বিতীয় কাজ সভ্যদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ঘাটতির সময় সাধ্যমত সাহায্য করা। ধরা যাক, এই বৎসর ভারতবর্ষের আমদানি-রপ্তানির হিসাবে অনেক ঘাটতি হইয়াছে। অর্থাৎ মোট আমদানি দ্রব্যের মূল্য মোট রপ্তানির মূল্য হইতে অনেক বেশি হইয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষকে বিদেশী বণিকদের বহু টাকা দিতে হইবে। টাকা দিবার জন্য ব্যবস্থা না থাকিলে ভারত সরকার আন্তর্জাতিক ফাণ্ডের নিকট কর্জ লইতে পারে। মোট কত টাকা কর্জ দেওয়া হইবে সে সম্বন্ধে নিয়ম আছে। সেই দেশটি ফাণ্ডের তহবিলে মোট যত চাঁদা দিয়াছে, তাহার চার ভাগের এক ভাগের বেশি টাকা বৎসরে কর্জ দেওয়া হয় না এবং মোট কর্জের পরিমাণ কখনও চাঁদার শতকরা ১২৫ ভাগের বেশি হইবে না। ভারতবর্ষের মোট চাঁদার পরিমাণ ৬০০ মিলিয়ান ডলার। যে কোন বৎসরে ভারত সরকার ১২৫ মিলিয়ন ডলারের বেশি টাকা কর্জ পাইবে না ও মোট কর্জের পরিমাণ (সমস্ত বৎসরের হিসাব করিয়া) কখনও ৭৫০ মিলিয়ান ডলারের বেশি হইবে না।

আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (International Bank) : দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটির নাম সংক্ষেপে ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক বা আই. বি. আর. ডি। বিভিন্ন দেশের মধ্যে মুদ্রাবিনিময়হার কাজ সহজ করা ও যে দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দিয়াছে তাহাকে এই ঘাটতি পূরণের জন্য সাময়িক সাহায্য বা ঋণ দেওয়া আই. এম. এফ-এর কাজ। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটির কাজ আরো ব্যাপক। ইহার প্রধান কাজ বিভিন্ন দেশকে আর্থিক উন্নতির জন্য দীর্ঘকালীন ঋণ দেওয়া। ইহা অল্প সময়ের জন্য ঋণ দেয় না ইহার ঋণ

সমস্তই দীর্ঘকালীন। ইহা দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য টাকা ধার দেয়। এই উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক প্রথমের দিকে ইউরোপের যুদ্ধবিদ্ধস্ত অঞ্চলগুলির পুনর্বাসনের জন্য টাকা ধার দিয়াছিল। কয়েক বৎসর হইল অনুন্নত দেশগুলিকেও বহু অর্থ ধার দিতে শুরু করিয়াছে। এই ধার কোন সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্য—যেমন পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহের জন্য দেওয়া হয় না। কোন বিশেষ স্কীম কার্যকরী করিবার জন্য ধার দেওয়া হয়। যেমন ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক আমাদের পরিকল্পনার কাজে টাকা ধার দেয় নাই—আমাদের রেলওয়ের উন্নতির জন্য এবং টাটা স্টীল কোম্পানীকে কারখানা বৃদ্ধির জন্য ধার দিয়াছে। সাধারণত যে দেশকে টাকা দেওয়া হয় সে দেশের সরকারকে ধার শোধ দিবার অঙ্গীকারপত্র সই করিতে হয়। অর্থাৎ সে দেশের সরকার এই ধার শোধ দিবার জন্য দায়ী থাকিবে। ব্যাঙ্ক নিজের তহবিল হইতে ধার দিতে পারে কিংবা অন্য লোক বা প্রতিষ্ঠান যাহাতে ধার দেয় তাহারও ব্যবস্থা করিতে পারে। অনেক সময়ে এই ব্যাঙ্ক দেশীয় ব্যাঙ্ক বা অন্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও টাকা ধার দেয়। যেমন এদেশে ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের উদ্যোগে ও সহায়তায় ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ক্রেডিট এবং ইনভেস্টমেণ্ট করপোরেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানকে ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক প্রয়োজন মত ধার দেয় এবং ইহা আবার শিল্পোন্নতির জন্য টাকা ধার দেয়। ব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক ফিনান্স করপোরেসন ও আন্তর্জাতিক ডেভেলপমেণ্ট এসোসিয়েসন নামে দুইটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে এবং ইহাদের মাধ্যমে অনুন্নত দেশগুলির উন্নতিকল্পে আরো সুবিধাজনক শর্তে টাকা ধার দিতেছে।

Exercises

Q. 1. What are the main functions of the I.B.R.D.? (C. U. B. Com. 1961).

Q. 2. Explain briefly the main functions of the International Monetary Fund. (C. U. B. Com. 1960).

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

সরকারী আয়ব্যয়ের নীতি

(Principles of Public Finance)

এই বিভাগে সরকারী আয়ব্যয়ের নীতির কথা আলোচনা করা হয়। আধুনিক যুগের সরকার শুধু আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট নয়, সরকারের কার্যক্ষেত্র ক্রমশঃই প্রসারিত হইতেছে। পূর্ণনিয়োগের অবস্থা বজায় রাখা, সামাজিক বীমা প্রবর্তন করা, দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রভৃতি বহু কাজ এখন সরকারের কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইতেছে। ইহার ফলে সরকারের ব্যয় বাড়িতেছে। সরকার যেভাবে রাজস্ব আদায় করে ও ব্যয় করে তাহা জাতীয় আয়, নিয়োগ ও উৎপাদন বহু প্রকারে প্রভাবিত করে। সুতরাং সরকারী আয়ব্যয়ের আলোচনার গুরুত্ব বাড়িয়াছে।

সরকারী ও বেসরকারী আয়ব্যয়ের নীতির পার্থক্য (**Difference between public and private finance**) প্রত্যেক দেশের সরকারকে নানা প্রকারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিতে হয়। এই জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। সরকারকে এই উদ্দেশ্যে রাজস্ব আদায় করিতে হয় ও নানাভাবে ব্যয় করিতে হয়। প্রত্যেক লোককেও সারা বৎসর নানা কাজ করিতে হয়। সেইজন্য তাহাকে সাধ্যমত অর্থ সংগ্রহ করিতে ও ইহা ব্যয় করিয়া প্রয়োজন মিটাইতে হয়। সাধারণ লোকের আয়-ব্যয় ও সরকারী আয়-ব্যয় কি একই নীতির দ্বারা নির্ণীত হয়? এই উভয় শ্রেণীর কাজের মধ্যে বহু সাদৃশ্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেক পার্থক্যও আছে। সাধারণ লোককে নিজের আয় অনুযায়ী ব্যয় নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। যে লোক মাসে ৩০০৲ টাকা রোজগার করে, তাহাকে সাধারণত ৩০০৲ টাকার মধ্যেই মাসের ব্যয় ঠিক রাখিতে হয়। কিন্তু সরকারের বেলায় একথা খাটে না। সরকার প্রথমে কত টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন আছে ইহা ঠিক করে ও সেই অনুযায়ী রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা করে। ব্যয় বেশি হইলে বেশি রাজস্ব আদায় করে। ইহাই সবচেয়ে বড় পার্থক্য। কিন্তু ইহাকে যত বড় পার্থক্য হিসাবে মনে

করা হয়, আসলে ততটা নহে। কারণ কোন কোন্ সময়ে বেশি ব্যয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে লোকেরা নানাভাবে বেশি টাকা রোজগার করার চেষ্টা করে। বর্তমান কাজে লোকে হয়ত বেশি ওভারটাইম খাটে; কিংবা দ্বিতীয় কোন পার্টটাইম বা অল্প সময়ের কাজ নেয়। সুতরাং লোকেরাও ব্যয়ের অনুপাতে আয় বাড়াইবার চেষ্টা করে। আবার অনেক সময়ে সরকারের পক্ষেও আয়ের অনুপাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। কারণ তখন হয়ত আরও বেশি রাজস্ব তুলিবার উপায় থাকে না।

দ্বিতীয়ত, কোন বৎসরে যদি আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হয়, তবে সাধারণ লোককে হয়ত পূর্বসঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিতে হয়, নচেৎ অন্যের নিকট টাকা ধার নিতে হয়। সরকারও তাহাই করে। বাজেট ঘাটতি হইলে সরকার বিদেশী কিংবা দেশী লোকের নিকট কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিয়া ধার লইতে পারে। ইহা ছাড়া সরকার আর একটি পন্থা অবলম্বন করিতে পারে যাহা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। সরকার ঘাটতি মিটাইবার জন্য কাগজী নোট ছাপাইয়া বাজারে চালু করিতে পারে। সাধারণ লোকে তাহা পারে না।

সরকারী ও বেসরকারী ব্যয়ের আর একটি পার্থক্য আছে। সাধারণ লোকে এমনভাবে খরচ করে যে সব দফা হইতে সে সমান উপযোগিতা পায়। সরকারের ক্ষেত্রেও একথা সত্য হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা সব সময়ে করা হয় না। সরকার অনেক সময় অযথা অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য হয়। নূতন গণতান্ত্রিক দেশে অথবা যে দেশে সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রবল সেখানে এইরূপ ঘটিতে পারে। কিন্তু সরকারী ব্যয়ের স্বপক্ষে একটি কথা বলার আছে। এই তত্ত্বের দিক দিয়া বলা হয় যে, প্রত্যেক লোক বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য এমন ভাবে ব্যয় করিবে যাহার ফলে সে উভয় ক্ষেত্র হইতেই সমান উপযোগিতা পায়। কিন্তু সাধারণ লোকে ভবিষ্যতের উপর জোর দেয় না ও ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় ঠিকমত করে না। সরকার কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করে।

ইহা ছাড়া আর একটি বড় পার্থক্য এই যে, সরকারী ব্যয় বাড়াইলে জাতীয় আয় বাড়ে এবং সরকারের আয়ও বাড়ে। উৎপাদন, নিয়োগ ও আয়ের উপর সরকারী ও ব্যক্তিগত ব্যয়ের ফল পৃথক। আয় ও নিয়োগের পর ফল দেখিয়া সরকারী ব্যয়ের বিচার করিতে হইবে।

সরকারী আয়ব্যয়ের নীতি (Principle or aims of Public finance): কোন্ নীতি অনুসারে সরকার আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবে? এই সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব করিয়াছেন। কতকগুলি নিম্নে আলোচিত হইল।

ন্যূনতম ব্যয়নীতি (Principle of minimum expenditure): উনবিংশ শতাব্দীতে লেখক বলিয়াছেন যে, সরকারের আয়ব্যয় যত কম হয় তত মঙ্গল। দুইটি কারণে এই মতবাদ সমর্থিত হইত। প্রথমত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রাধান্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদীদের মতে আইন ও শৃঙ্খলা ছাড়া সরকারের অন্য কাজ করা উচিত নয়। সরকারের কার্যক্ষেত্র কম হইলে ব্যয়ের পরিমাণও কম হইবে। নাগরিকদের কাজে ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে সরকার যত কম হস্তক্ষেপ করে ততই সকলের মঙ্গল। দ্বিতীয়ত, অনেকে মনে করিতেন যে, সরকারী ব্যয়ে উৎপাদন বাড়ে না, ব্যক্তিগত ব্যয়ের ফলে উৎপাদন বাড়ে। সরকারী ব্যয় অযথা ব্যয়। সুতরাং সরকার সাধারণের পকেট হইতে যত কম টাকা নেয় ততই ভাল।

এই নীতি ভুল। কর মাত্রই মন্দ নহে। অনেক করের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা আছে। মদের উপর কর ধার্য করিলে মদের দাম বাড়ে ও ফলে মদ খাওয়া কমে। বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করিয়া দেশী শিল্পের উন্নতি করা যায়। সাধারণ লোকে যে সব সময়েই টাকা ঠিকমত খরচ করে তাহা বলা চলে না। আবার সরকারী ব্যয় যে সব সময়েই অযথা ব্যয় তাহাও ঠিক নহে। ধনীর ঘোড়দৌড়ে বা জুয়াখেলায় যে টাকা খরচ করে, ইহার উপর কর বসাইয়া সরকার সেই রাজস্ব যদি দরিদ্রের শিক্ষার জন্য ব্যয় করে তবে তাহা ভাল কি মন্দ কাজ? সরকার কৃষি ও সেচব্যবস্থার উন্নতির জন্য যে ব্যয় করে তাহাতে দেশের উৎপাদনক্ষমতা বাড়ে। আর্থিক উন্নতি হয়। অবশ্য সব রকম সরকারী ব্যয় যে ভাল একথাও ঠিক নহে। দলগত স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকার অনেক সময়েই অকারণে অর্থ নষ্ট করে। অতএব অবিবেচকের মত ক্রমাগত সরকারী ব্যয়বৃদ্ধি করা বাঞ্ছনীয় নয়। এমন অনেক কর আছে যাহা দেশের পক্ষে সত্যই ক্ষতিকর। উচ্চহারে আয়কর অথবা উত্তরাধিকার কর বসাইলে সঞ্চয় ও উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া ন্যূনতম ব্যয়নীতির সমর্থন আজকাল খুব কম লোকেই

করে। সরকারী ব্যয়ের ভালমন্দ দুই দিকই আছে। কাজেই সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি মাত্রই যে মন্দ একথা বলা ঠিক হইবে না।

সর্বাধিক সুবিধানীতি (Principle of maximum advantage): অনেকে বলেন যে সরকারী আয়-ব্যয় এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, যাহার ফলে সমাজের সর্বাধিক লাভ হয়। কর বসাইয়া অথবা ঋণ করিয়া সরকারের হাতে অনেক টাকা আসে এবং সেই টাকা নানা কাজে ব্যয় হয়। ইহার ফলে একশ্রেণীর টাকা অন্য শ্রেণীর হাতে যাইতেছে। এই সরকারী আয় ও ব্যয়ের এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যেন ইহার ফলে সমাজের সর্বাধিক মঙ্গল হয়।

অধিকতম মঙ্গল হইতেছে কিনা তাহা বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিচার করিতে হইবে। প্রথমত, সরকারী ব্যয়ের প্রকৃতি দেখিতে হইবে। যদি মোটা টাকা শিল্পে ও কৃষিকার্যে বিনিয়োগ করা হয়, তবে ভবিষ্যতে সুবিধা হইবে। দেশরক্ষার জন্য যে ব্যয় হয় তাহা অর্থনৈতিক কারণে না হউক, রাজনৈতিক কারণে সমর্থন করা যায়। তবে দেশরক্ষার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় সমর্থনযোগ্য নহে। দ্বিতীয়ত, কর ধার্য করার পদ্ধতি আলোচনা করিতে হইবে। প্রয়োজনমত রাজস্ব একধরনের কর বসাইয়া তুলিতে যে ক্ষতি হয়, অন্য কর বসাইলে হয়ত ইহার চেয়ে কম ক্ষতি হইতে পারে। কর এমনভাবে বসাইতে হইবে যে সর্বসাধারণের মোট ক্ষতি সবচেয়ে কম হইবে। তৃতীয়ত, উৎপাদন ক্ষমতার উপর করের প্রভাবও লক্ষণীয়। উচ্চহারে আয়কর ধার্য করার ফলে যদি সঞ্চয় করার ইচ্ছা ও শক্তি কমে, তবে তাহা সমর্থন করা যায় না। আবার বেশি পরোক্ষ কর বসাইলে দরিদ্রদের উপর অত্যধিক করের চাপ পড়িতে পারে। ইহাও ঠিক নহে। কারণ তাহাতে পরিবারের কর্মক্ষমতা কমিতে পারে।

এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া এ কথা বলা যায় যে যাহাতে জনগণের সর্বাধিক মঙ্গল হইবে সে ভাবেই সরকারী আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রিত করা উচিত। বর্তমানে ইহা ছাড়াও নিম্নলিখিত নীতিগুলি মানিয়া চলার প্রয়োজনীয়তা অনেকে স্বীকার করেন।

পূর্ণ নিয়োগের নীতি (Principle of full employment): এখন সকলেই স্বীকার করেন যে, সরকারী আয়-ব্যয়নীতি এমনভাবে

পরিচালনা করিতে হইবে যেন তাহার ফলে দেশের মধ্যে পূর্ণ-নিয়োগ অবস্থা বজায় থাকে। আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ এমনভাবে ঠিক করিতে হইবে যেন সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগ বাড়িয়া মোট চাহিদা বাড়ে ও পূর্ণ নিয়োগ বজায় থাকে। এই নীতি অনুসারে মন্দার সময় নিয়োগ বাড়াইবার জন্য সরকারী ব্যয় বাড়াইতে হইবে ও মুদ্রাস্ফীতির সময়ে সরকারী ব্যয় কমাইতে হইবে। অর্থাৎ ব্যবসাযচক্রের গতির পরিবর্তন অনুযায়ী সরকারী আয়ব্যয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিতে হইবে। এবং ইহা এমনভাবে করিতে হইবে যে দেশে পূর্ণ নিয়োগ বজায় থাকে।

অনুন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনাগুলি কার্যে পরিণত করার জন্য সরকারকে প্রচুর টাকা খরচ করিতে হইবে। এমনভাবে কর ধার্য করিতে হইবে যেন মূলধন সঞ্চয় বাড়ে, আবার মুদ্রাস্ফীতিও না হয়। মোটের উপর সেই করনীতিই ভাল যাহার দ্বারা বেসরকারী বিনিয়োগ না কমাইয়া সরকারী বিনিয়োগ বাড়ান যায় এবং যাহার ফলে সকল শ্রেণীর লোক ভোগ সংকোচ করিতে বাধ্য হয়। কারণ ভোগ সংকোচের ফলে সঞ্চয় বাড়ে ও সঞ্চয় বাড়িলে মূলধন বৃদ্ধি হয়। মূলধন বৃদ্ধি হইলে আর্থিক উন্নতির পথ সুগম হয়।

জাতীয় আয় বণ্টনের সমতা (Equality in income distribution): অনেক লেখক সরকারী আয়-ব্যয়নীতি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলেন। ধনতান্ত্রিক দেশে জাতীয় আয়ের অধিক অংশ অল্প কয়েকজন লোক ভোগ করে। অধিকাংশ লোককেই কম আয় লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। গরিবের সংখ্যা অগণ্য। কিন্তু ধনীর সংখ্যা কম। ধনী দরিদ্রের এই পার্থক্য বহুদিক দিয়া অবাঞ্ছনীয়। এই লেখকেরা মনে করেন যে, সরকারী আয়ব্যয় এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যে ইহার ফলে ধনী দরিদ্রের আয়ের পার্থক্য কমিবে।

ইহা নানাভাবে করা যাইতে পারে। যেমন উচ্চ আয়ের লোকের উপর উচ্চ হারে আয়কর বসান হয়। যে বৎসরে ৬০ হাজার টাকা আয় করে তাহার নিকট হইতে আয়কর বাবদ ২০।২১ হাজার টাকা রাজস্ব আদায় করিয়া লওয়া হয়। ফলে তাহার আয় ৩৯।৪০ হাজারে দাঁড়াইল। আর যে বৎসরে ১৩ হাজার টাকা আয় করে তাহাকে ৩০০০৲ টাকা আয়কর

দিতে হয়। পূর্বে প্রথম লোকটির আয় দ্বিতীয় লোকের আয়ের ৬ গুণ ছিল। ট্যাক্স দেওয়ার পর উহাদের আয়ের পার্থক্য সাড়ে চার গুণেরও কম হইল। বর্তমানে রাষ্ট্র এই উদ্দেশ্যে উচ্চহারে আয়কর, উত্তরাধিকার কর, সম্পত্তি কর, ব্যয় কর প্রভৃতি বহু প্রত্যক্ষ কর ধার্য করিয়া ধনীদের আয়ের মোটা অংশ আদায় করিয়া লয়।

সরকারী ব্যয় এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায় যে ইহার ফলে দরিদ্রদের সুবিধা বেশি হয়। ধনীর নিকট হইতে আয়করলব্ধ রাজস্ব সরকার যদি স্কুলকলেজের দরিদ্র ভাল ছেলেমেয়েদের বৃত্তি দিতে ব্যয় করে—ফ্রি টিফিন, বই ইত্যাদি দেয়,—বৃদ্ধ বয়সে অবসর ভাতা দেয়—বিনা ব্যয়ে হাসপাতাল ও অন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দেয়—তবে দরিদ্রদের বহু উপকার হইবে। অর্থাৎ একথা বলা যায় যে দরিদ্রের আয় বাড়িবে। ছেলেমেয়েদের স্কুলকলেজের মাহিনা, বই ও টিফিন না কিনিতে হইলে তাহাদের টাকার সাশ্রয় হইল। টাকাটা পকেট হইতে খরচ করিতে হইল না বলিয়া ধরা যায় যে তাহাদের আয় বাড়িল। অসুখ সামান্য হইলেও দরিদ্রকেও কিছু না কিছু ব্যয় করিতে হইত। কিন্তু হাসপাতালে যদি বিনা খরচে ভালভাবে চিকিৎসা করান সম্ভব হয় সেই সামান্য খরচও বাঁচিয়া গেল। বলা যায় যে পরোক্ষভাবে দরিদ্রের আয় বাড়িল। সরকার যদি সকলকে বৃদ্ধ বয়সে অবসর ভাতা দেয়,—যাহা বহু পাশ্চাত্য দেশে করা হয় - তবে ধনীর চেয়ে দরিদ্রের বেশি উপকার হয়

সরকারের উচিত এইভাবে ধনীর নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া ইহা দরিদ্রের উপকারে ব্যয় করা। ইহার ফলে ধনী কম ধনী হইবে ও দরিদ্রের অবস্থার উন্নতি হইবে। পরোক্ষভাবে তাহাদের আয় বাড়িবে বলা যায়। সুতরাং এইরূপ কর নীতি অবলম্বনের ফলে ধনী ও দরিদ্রের আয়ের ও অবস্থার পার্থক্য কমিতে থাকিবে।

আজকাল প্রায় সমস্ত দেশেই এই নীতি পালন করা হইতেছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে এইরূপ ব্যবস্থার সীমা আছে। প্রথমত, ধনীদের উপর অত্যধিক হারে করের চাপ দেওয়া হইলে তাহাদের কাজের ইচ্ছা, সঞ্চয় প্রবৃত্তিরও ক্ষমতা কমিয়া যাইবে। বর্তমানে ধনীরাই বেশি সঞ্চয় করে। কিন্তু তাহাদের যদি উচ্চ হারে কর দিতে হয় তবে তাহাদের সঞ্চয়ের ক্ষমতা

কমিয়া যাইবে। সঞ্চয়ের পরিমাণ কমিলে দেশের আর্থিক উন্নতির বিঘ্ন ঘটিবে। যে টাকায় ৮৭ নয়া পয়সা ট্যাক্স দিতে হয় সেই টাকা রোজগার করিবার জন্য পরিশ্রম করিয়া লাভ কি? ফলে ধনীরা কম কাজ করিবে ও তাহাতে উৎপাদনের ক্ষতি হইতে পারে।

আবার দরিদ্রদের সব প্রয়োজন সরকারী খরচে চলিলে তাহাদের কাজ করিবার ইচ্ছা কমিয়া যাইতে পারে। তাহাদের মধ্যে যাহারা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিত তাহারা আর সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা নাও দেখিতে পারে। ফলে দেশের মোট সঞ্চয় ও উৎপাদন কম হইবে—দেশ আরো দরিদ্র হইয়া যাইতে পারে। কাজেই এই নীতি অবলম্বনের সীমার কথাও মনে রাখা দরকার।

Exercises

Q. 1. What is public finance? Is there any essential difference between public and private finance? (C. U. 1943).

Q. 2. Enunciate the principles that should guide the system of taxation. (C. U. 1954).

Q. 3. Write a short note on the doctrine of maximum social advantage as the aim of public finance. (Ag. 1942).

Q. 4. What are the principles which should guide public expenditure? (C. U. 1958).

Q. 5. To what extent is it possible to bring about greater equality in income distribution through taxation and public expenditure? (C. U. B. Com. 1959).

উনচত্বারিংশ অধ্যায়

সরকারী ব্যয় ও আয়ের বিশ্লেষণ

(Analysis of Public Expenditure and Income)

সরকার ব্যয় অনুযায়ী আয়ের ব্যবস্থা করে। সুতরাং প্রথমে সরকারী ব্যয়ের কথা আলোচনা করা প্রয়োজন।

সরকারী ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Public expenditure): সরকারী ব্যয়ের নানাভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যেমন জাতীয় এবং স্থানীয় ব্যয়, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক ব্যয়, উৎপাদক এবং অনুৎপাদক ব্যয়। একক (unitary) শাসনব্যবস্থায় প্রধান প্রধান বিভাগীয় ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার করে। আর স্থানীয় সরকার জল সরবরাহ, শিক্ষা, রাস্তাঘাট ইত্যাদির ভার নেয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার দেশরক্ষা, ডাকঘর ইত্যাদির দায়িত্ব গ্রহণ করে ও সেই বাবদ রাজস্ব ব্যয় করে। আর রাজ্য সরকার পুলিশ, জেল, শিক্ষা ইত্যাদির ভার নেয়। ইহা ছাড়া স্থানীয় বা আঞ্চলিক সরকার আঞ্চলিক ব্যাপারে খরচ করে। রাজনৈতিক দিক হইতে এই শ্রেণীবিভাগ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও ইহার অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশেষ নাই। উৎপাদক এবং অনুৎপাদক ব্যয়ের সম্পর্কেও এই কথা বলা যায়। যাহাতে আর্থিক লাভ হয় তাহাকে সাধারণত উৎপাদক ব্যয় বলা হয়। যেমন রেলওয়ে নির্মাণে ব্যয় করিলে ইহার ফলে অর্থোপার্জন হয়। আবার আর্থিক লাভের সম্ভাবনা না থাকিলে তাহাকে অনুৎপাদক ব্যয় বলে। যেমন দেশ রক্ষার জন্য ব্যয়। কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্য যে টাকা খরচ হয়, তাহাতে অর্থোপার্জন হয় না বটে, কিন্তু দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। সুতরাং এইরূপ শ্রেণীবিভাগের কোন অর্থ নাই। অধ্যাপক Pigou হস্তান্তরিত ব্যয় (transfer expenditure) এবং প্রকৃত ব্যয় (real expenditure) সরকারী ব্যায়ের এই শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। পুলিশকে যে বেতন দেওয়া হয় তাহার পরিবর্তে কাজ পাওয়া যায়। এ ব্যয় প্রকৃত ব্যয়। কিন্তু বেকার অথবা বাস্তুহারাদের সাহায্যে যে টাকা দেওয়া হয়, ইহার পরিবর্তে তাহারা সরকারের কোন কাজ করে না। সুতরাং এই ব্যয়কে হস্তান্তরিত ব্যয় বলে।

সরকারী ব্যয় ও জাতীয় আয় (Public expenditure and national income) : জাতীয় আয়ের উপর সরকারী ব্যয়ের দুই প্রকারের প্রভাব আছে। আয় বৃদ্ধি এবং আয় বণ্টনের সমতা। সরকারী ব্যয়ের ফলে নিয়োগ বাড়িলে মোট জাতীয় আয় বাড়ে। মন্দার সময় বেকার সমস্যা দেখা দেয়। সরকার নানাভাবে অর্থ বিনিয়োগ করিয়া বেকারদের কাজ দিলে দেশের জাতীয় আয় বাড়ে। সরকারী বিনিয়োগ বাড়াইয়া পূর্ণ নিয়োগ বজায় রাখা যায়। ইহা ছাড়া উৎপাদন ব্যবস্থার উপর সরকারী ব্যয়ের নানারকমের প্রভাব আছে। ব্যয় বৃদ্ধির ফলে যদি আয়করের হার খুব বেশি বাড়ান হয়, তবে মোট উৎপাদন কমিতে পারে। যে ব্যবসায়ীকে টাকায় চৌদ্দ আনা ট্যাক্স দিতে হয় সে ভাবিতে পারে বেশি খাটিয়া তাহার লাভ কি ? সে বেশি উৎপাদন করা ছাড়িয়া দিল ও ফলে মোট উৎপাদন বা জাতীয় আয় কমিয়া যাইবে। আবার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির উন্নতির জন্য ব্যয় শ্রমিক দক্ষতা বাড়ায় ও ফলে উৎপাদন বাড়ে।

সরকারী ব্যয়ের ফলে জাতীয় আয় বণ্টন ব্যবস্থার অসমতা বাড়িতে বা কমিতে পারে। বর্তমান যুগের মত হইতেছে এই যে, ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য যতদূর সম্ভব দূর করিতে হইবে। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সরকারী ব্যয়ের মারফত জাতীয় আয়ের অসাম্য কি করিয়া দূর করা যায় ? এই দিক হইতে ব্যয়কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়,—যে ব্যয়ের দ্বারা দরিদ্রের উপকার হয় এবং যে ব্যয়ের দ্বারা সমাজের উপকার হয়।

প্রথম শ্রেণীর ব্যয় সম্পর্কে বলা যায় যে, অনেক প্রকারের ব্যয় আছে যাহার দ্বারা দরিদ্রশ্রেণী প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হয়। যেমন, বেকার ভাতা বা বার্ধক্য ভাতা (old age pension) দিলে দরিদ্রশ্রেণী উপকৃত হয়। বিনামূল্যে চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা হইলে দরিদ্রেরই উপকার হয়। এইভাবে আয়ের অসাম্য দূর হয়।

রাস্তাঘাট, জল সরবরাহ ইত্যাদি বাবদ ব্যয়ের ফলে সকলেই উপকৃত হয়। কোন্ শ্রেণী কি পরিমাণ উপকৃত হয় তাহা বলা কঠিন।

কিন্তু ব্যয়ের মাধ্যমে অসাম্য দূর করার অসুবিধা এই যে, ইহাতে করদাতাদের এবং যাহারা সাহায্য লাভ করে উভয়ের সঞ্চয় কমিতে পারে। দরিদ্রের সুবিধার জন্য ব্যয় করার ফলে যদি ধনীর উপর অতিরিক্ত হারে কর

ব্যান হয়, তবে তাহাদের সঞ্চয়ের সামর্থ্য ও ইচ্ছা দুই-ই কমিতে পারে। যে টাকায় ৮০ নয়া পয়সা ট্যাক্স দিতে হয় তাহা রোজগারের জন্য পরিশ্রম করিয়া লাভ কি? আবার রোগের চিকিৎসার জন্য, পুত্রকন্যার শিক্ষার জন্য ও বৃদ্ধ বয়সের জন্য লোকেরা সামান্য আয় হইতেও যাহা সঞ্চয় করিতে বাধ্য হইত,—বার্ধক্য ভাতা, সরকারী খরচে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকিলে তাহারা আর এইজন্য সঞ্চয় নাও করিতে পারে। ফলে দেশের মোট সঞ্চয় কমিতে পারে। ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে।

সুতরাং সরকারী ব্যয়ের প্রকৃতি ও পরিমাণ জাতীয় আয়ের পরিমাণকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

সরকারী আয়ের উৎস ও করনীতি

সরকার নানাপ্রকারে রাজস্ব সংগ্রহ করে। ইহাদের মধ্যে চারিটি প্রধান উৎস আছে:—কর, ফিস্, প্রাইস্ বা মূল্য ও স্পেসাল এসেসমেণ্ট বা বিশেষ কর।

বিভিন্ন উৎসের মধ্যে করলব্ধ অর্থের পরিমাণই সবচেয়ে বেশি। করের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, কর দেওয়া না দেওয়া নাগরিকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। কাহারও মাহিনা মাসে ২৫০৲ টাকার বেশি হইলে তাহাকে আয়কর দিতেই হইবে,—তাহার ইচ্ছা থাকুক কি নাই থাকুক ইহাতে কিছু আসে যায় না। অবশ্য আইনে তাহাই বলে যদিও সে কর ফাঁকি দিতে পারে। কিন্তু সে যদি টিকিট অথবা পোস্ট কার্ড না কেনে তবে তাহাকে পোস্ট অফিসে কিছুই দিতে হয় না। সরকার তাহাকে টিকিট বা পোস্ট কার্ড কিনিতে বাধ্য করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, যে সরকারকে কোন ফি দেয়, সে ইহার পরিবর্তে সরকারের নিকট হইতে কিছু সুবিধা পায় এবং সেইজন্যই ফি দেয়। যেমন, মোটর গাড়ি চালাইবার অনুমতি লাভের জন্য লাইসেন্স ফি দিতে হয়। কিন্তু করদাতাকে সরকার কোন পৃথক সুবিধা দেয় না। যে কর দেয়, সে সরকারের সাধারণ ব্যয়নির্বাহের জন্যই টাকা দেয়,—সরকারের নিকট হইতে কোন বিশেষ সুবিধা পাইতেছে বলিয়া নহে। সরকারী ব্যয়নির্বাহের

জন্য প্রত্যেককে বাধ্যতামূলকভাবে সে অর্থ দিতে হয় ও যাহার বিনিময়ে সে বিশেষ কোন সুবিধা পায় না তাহাকে কর বলে।

কোন বিশেষ সুবিধা লাভের পরিবর্তে যে অর্থ সরকারকে দিতে হয় তাহাকে ফি বলে। যেমন মোটর গাড়ি চালাইবার অনুমতির জন্য মোটর লাইসেন্স ফি, আদালতে মকদ্দমা করিবার সুযোগলাভের জন্য কোর্ট ফি ইত্যাদি এই পর্যায়ে পড়ে। কর ও ফি উভয়ই বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ কাহারও বাৎসরিক আয় ৩০০০৲ টাকার বেশি হইলেই তাহাকে আয়কর দিতে হইবে। মোটর গাড়ি কিনিলেই লাইসেন্স ফি দিতে হইবে। কিন্তু করদাতা কর দেয় বলিয়া সরকারের নিকট বিশেষ কোন পৃথক সুবিধা পায় না। যাহাকে ফি দিতে হয় সে ইহার বদলে কিছু সুবিধা পায়।

সাধারণ ব্যবসায়ীদের মত সরকারেরও নানা ব্যবসায় থাকিতে পারে। এইসব ব্যবসায়ে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া সরকার অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। এই উৎসকে প্রাইস্ বা মূল্য বলা হয়। যেমন রেলের টিকিট ও মূল্যের ভাড়া বাবদ সরকার কিছু অর্থ রোজগার করে। সরকারের বনবিভাগ কাঠ বিক্রয় করে; সেচবিভাগ খালের জল চাষীদের নিকট বিক্রয় করে। ইহা প্রাইস্ বা মূল্যের উদাহরণ।

অনেক সময়েই দেখা যায় যে, কোন সরকারী পরিকল্পনার ফলে আশে-পাশের জমির দাম বাড়িয়া যায়। যে যে জমির নিকট দিয়া ডিভিসি খাল কাটা হইতেছে তাহাদের দাম বাড়িবে। কারণ জমিতে স্বচ্ছন্দমত জল দিতে পারিলে ফসল বেশি হইবে। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট যে পাড়ায় ভাল রাস্তা বা পার্ক তৈয়ারি করিয়া দেয়, তাহাদের আশেপাশের জমির দাম বাড়ে। জমির এই বর্ধিত মূল্যের উপর কর বসান হইলে ইহাকে বিশেষ বা স্পেশাল এসেসমেণ্ট বলে।

যদিও কর, ফি, মূল্য বিশেষ করের মধ্যে এইভাবে পার্থক্য করা হয়, তাহা হইলেও অনেক সময়েই ইহা সম্ভব হয় না। সরকার বিশেষ সুবিধা দেয়, কিংবা বিশেষ কাজ করে বলিয়া লোকেরা ইহার পরিবর্তে ফি দেয়। ফি-এর পরিমাণ সাধারণত বিশেষ সুবিধা বা কাজের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু অনেক সময়েই বিশেষ সুবিধার যাহা মূল্য হইতে পারে তাহার চেয়ে বেশি টাকা ফি বাবদ আদায় করা হয়। অর্থাৎ বিশেষ

সুবিধা দেওয়ার সুযোগ লইয়া সরকার এ ক্ষেত্রে কর হিসাবে কিছু অর্থ আদায় করিতেছে। রেল চালাইবার খরচ ও মোটামুটি লাভ বাবদ যে অর্থ প্রয়োজন, রেলের ভাড়া যদি সেই অনুপাতে ঠিক করা হয় তবে রেলের ভাড়াকে মূল্য বলে। কিন্তু সরকার যদি আরো বেশি টাকা তুলিবার জন্য রেলের ভাড়া বাড়াইয়া দেয় তবে ইহার মধ্যে করের অংশ থাকিবে। এই ক্ষেত্রে কোথায় মূল্য শেষ হইয়াছে ও কোথায় কর আরম্ভ হইতেছে ইহা সঠিক হিসাব করা সম্ভব হয় না।

করনীতি

কর ধার্য করার সময় সরকারকে অনেক কথা চিন্তা করিতে হয়। প্রথমত, কর ধার্য করা ন্যায্য হইবে কি না, আদায়ের খরচ কত হইবে, করদাতাদের কি কি অসুবিধা হইবে ইত্যাদি চিন্তা করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত কর্তৃপক্ষকে করনীতি মনে রাখিতে হইবে। যেমন, প্রত্যুপকারের ভিত্তিতে না ক্ষমতার ভিত্তিতে, না ন্যূনতম ত্যাগের ভিত্তিতে কর ধার্য করা হইবে একথা চিন্তা করিতে হইবে। অবশেষে করের হার আনুপাতিক হইবে, কি বর্ধমান হইবে, কি হ্রাসমান হইবে একথা চিন্তা করিতে হইবে।

করসূত্র (Canons of taxation) : Adam Smith করধার্য করার নিম্নলিখিত সূত্রগুলি আলোচনা করিয়াছিলেন।

(১) সামর্থ্য অথবা সাম্যের সূত্র (Canon of ability or equality) : "নিজ নিজ ক্ষমতার অনুপাতে কর দেওয়া প্রত্যেকের উচিত অর্থাৎ রাষ্ট্রের আওতায় বাস করিয়া সে যত আয় করে সেই অনুপাতে কর দেওয়া তাহার কর্তব্য।"

এই সূত্রে ক্ষমতা বা আয় অনুসারে কর ধার্যের কথা বলা আছে। কিন্তু যতই ক্ষমতা বা আয় বাড়ুক না কেন, করের হার কি একই থাকিবে না আয় বেশি থাকিলে করের হার বাড়ান উচিত হইবে? ধনী দরিদ্রের চেয়ে অধিক কর দিতে সমর্থ। অতএব আয় বেশি হইলে বর্ধমান হারে কর ধার্য করা উচিত, ইহাই স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু আদম স্মিথের আলোচনায় এই বিষয়ে পরিষ্কার কিছু জানা যায় না। কেহ কেহ Wealth of Nations পুস্তকের নিম্নলিখিত উক্তি উদ্ধার করেন—"ধনীরা শুধু শক্তির

অনুপাতে নহে, অনুপাতের চেয়ে বেশি হারে কর দিবে"—এবং বলেন যে, Adam Smith বর্ধমান করের সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যেরা "অনুপাত" কথাটির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন যে Adam Smith আনুপাতিক কর সমর্থন করিতেন।

(২) নিশ্চয়তার সূত্র (Canon of certainty): "নাগরিককে যে কর দিতে হইবে তাহা নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। কখন দিতে হইবে, কত দিতে হইবে তাহা করদাতা এবং সকলের কাছে স্পষ্ট হওয়া উচিত।"

কি পরিমাণ কর দিতে হইবে তাহা যদি নাগরিক জানে, তবে সে আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিবে।

রাষ্ট্রের পক্ষেও আয়ের পরিমাণ জানা প্রয়োজন, অথবা বাজেট প্রস্তুত করার অসুবিধা হইবে।

(৩) সুবিধার সূত্র (Canon of convenience): "প্রত্যেক কর করদাতার সুবিধামত সময়ে এবং উপায়ে ধার্য করা উচিত।

এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে করদাতার অনাবশ্যক অসুবিধা হইবে। যেমন ফসল তোলার পর কৃষকদের নিকট কর আদায় করা উচিত।

(৪) মিতব্যয়িতার সূত্র (Canon of economy): "প্রত্যেক কর এমনভাবে বসাইতে হইবে যে, নাগরিকদের নিকট হইতে যাহা আদায় হয়, আর সরকার যাহা পায় তাহার পার্থক্য কম।"

Adam Smith-এর মতে এই সূত্রের অর্থ এই যে, কর আদায়ের ব্যয় যথাসম্ভব কম হওয়া বাঞ্ছনীয়। করের অধিকাংশ যদি আদায়ের জন্য খরচ হইয়া যায়, তবে সে কর ধার্য করায় কোন লাভ হয় না। সেইজন্য একটি ন্যূনতম আয়ের নীচে আয়কর বসান হয় না।

প্রথম সূত্র ও অপর তিনটি সূত্রের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথম সূত্রটির গুরুত্ব অন্য তিনটির চেয়ে অনেক বেশি। প্রথমটি করনীতির পর্যায়ে পড়ে। অন্য তিনটির গুরুত্ব বিভাগীয়। কোন নীতি অনুযায়ী কর ধার্য করা উচিত ইহা প্রথম সূত্রে বলে। করলব্ধ অর্থ কি কি ভাবে আদায় করা উচিত হইবে তাহা অন্য তিনটিতে বলে।

অবশ্য একথা ঠিক যে, কোন্ নীতি অনুযায়ী কর ধার্য করা উচিত সে সম্বন্ধে প্রথম সূত্রে স্পষ্ট কিছু নির্দেশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ক্ষমতা

অনুযায়ী কর দেওয়া উচিত। কিন্তু ক্ষমতা কি ভাবে মাপা যায়? সম্পত্তি না আয়, না নীট আয় দিয়া মাপা হইবে? ইহার মধ্যে কোন্‌টির ভিত্তিতে কর বসান ঠিক হইবে? সূত্রটি আরও অস্পষ্ট এইজন্য যে আনুপাতিক ক্রমবর্ধমান হারে কর বসান হইবে তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই।

আধুনিক লেখকেরা মিতব্যয়িতার সূত্রটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন। আদায়ের খরচ কম হইলেও যে সেই কর বাঞ্ছনীয় তাহা নহে। এমন কর থাকিতে পারে যাহা আদায় করিতে হয়ত বেশি ব্যয় হয় না, কিন্তু ইহার ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষতি হয়। অতি উচ্চ হারে আযকর ধার্য করিলে সরকারের ব্যয় বিশেষ বাড়িবে না বটে, কিন্তু এই জাতীয় উৎপাদন কমিবে। সুতরাং মিতব্যয়িতার নীতি অনুসরণের সময়ে কেবল বর্তমান আয়ের দিকে তাকাইলে চলিবে না, ভবিষ্যতের দিকেও লক্ষ্য করিতে হইবে। ধনিকশ্রেণীর উপর অধিক পরিমাণে কর ধার্য করিলে ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের পথ বন্ধ হইতে পারে। তাহা হইলে মিতব্যয়িতার সূত্র অনুযায়ী সেই কর না বসানই উচিত হইবে।

আধুনিক লেখকেরা অন্য দুইটি সূত্রের আলোচনা করেন, যথা— উৎপাদনশক্তি ও স্থিতিস্থাপকতা। কর উৎপাদনশীল হওয়া চাই, অর্থাৎ রাষ্ট্রের কার্য নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত রাজস্ব আদায় হওয়া চাই। এমন পদ্ধতিতে কর বসাইতে হইবে যেন লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বও বাড়ে। পণ্যের উপর কর ধার্য করিলে এই উদ্দেশ্য খানিকটা সিদ্ধ হয়।

করব্যবস্থা স্থিতিস্থাপক হওয়া উচিত। রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও করদাতার শক্তি অনুসারে করের হার বাড়ান বা কমান যায়—এমন হইলে ভাল হয়। অন্যথা করদাতার কষ্ট বাড়ে।

করনীতি (Principles of taxation): করনীতি সম্পর্কে অনেকগুলি মতবাদ আছে। প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলি নিম্নে আলোচিত হইল।

(১) **সুবিধালাভ তত্ত্ব** (Benefit theory): রাষ্ট্রের নিকট হইতে যে যেমন সুবিধা পায় সেই অনুপাতে কর দেওয়া তাহার উচিত। ইহাই এই তত্ত্বের মূলগত কথা। সরকারের কাজে যে বেশি উপকৃত হয় তাহাকেই বেশি কর দিতে হইবে। কতকগুলি কাজে নাগরিকেরা ব্যক্তিগত উপকার পায়, আবার কতকগুলিতে সামাজিক উপকার হয়। Cohn এই ভিত্তিতে

সরকারী ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। এই তত্ত্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু করনীতি হিসাবে এই তত্ত্বের মূল্য কম। সরকারী কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য কর দিতে হয়। সরকারী কাজের ফলে আমরা সকলেই উপকৃত হই, নানা সুবিধা পাই ইহা সত্য। কিন্তু ব্যক্তিগত সুবিধা বা উপকারের পরিমাণ মাপা যায় না। সৈন্যবাহিনী অথবা পুলিশবাহিনী হইতে যে আমরা প্রত্যেকে যে কত উপকার পাইতেছি তাহা হিসাব করা সম্ভব নয়।

এই অনুসারে কাজ করিতে হইলে ধনীর চেয়ে দরিদ্রকে বেশি কর দিতে হইবে। কেননা সরকারী কাজের দ্বারা দরিদ্ররাই বেশি উপকৃত হয়। ইহা অযৌক্তিক। কিন্তু একটি সত্য এই তত্ত্বে নিহিত আছে। যদি সমস্ত নাগরিকবৃন্দের কথা ধরি, তবে বলা যায় যে মোট করের সহিত মোট সুবিধালাভের একটি সম্পর্ক থাকা উচিত।

(২) **কার্যনির্বাহের ব্যয় তত্ত্ব** (Cost of service principle) এই তত্ত্বের সমর্থকেরা বলেন যে সরকারী কার্য নির্বাহের জন্যই কর আদায় করিতে হয়। সুতরাং বিভিন্ন সরকারী কাজের জন্য যতটুকু খরচ হয় সরকারের ঠিক ততটুকুই কর আদায় করা উচিত। ডাকঘর, রেলপথ ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। সাধারণের উপকারের জন্য যে খরচ হয় তাহা মাথাপিছু হিসাব করা যায় না। তা'ছাড়া এই কর প্রয়োগ করিলে যাহারা বার্ধক্য ভাতা পায় তাহাদের শুধু যে ভাতা ফেরত দিতে হইবে তাহা নয়, এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করার ব্যয়ের কিছু অংশও বহন করিতে হইবে। ইহা হাস্যকর। অতএব এই তত্ত্ব পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

(৩) **করদানের সামর্থ্য তত্ত্ব** (Ability to pay): এই তত্ত্বে বলে যে সকলেরই সামর্থ্য অনুযায়ী কর দেওয়া উচিত। সরকার সকলের প্রতিষ্ঠান। অতএব সকলের উচিত নিজের সামর্থ্যমত সরকারী ব্যয় বহন করা।

ইহা ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু কি দিয়া সামর্থ্যের বিচার করা যায়? পূর্বে অনেকে মনে করিতেন যে সম্পত্তি সামর্থ্যের মাপকাঠি। সম্পত্তি থাকার অর্থ

স্বচ্ছল অবস্থা। কাজেই যাহার অধিক সম্পত্তি আছে তাহাকে অধিক কর দিতে হইবে। কিন্তু সম্পত্তি করদান ক্ষমতার নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি নয়। অনেকের হয়ত কোন সম্পত্তি নাই, কিন্তু তাহারা প্রচুর আয় করিতে পারে। একজন ডাক্তারের হয়ত কোন সম্পত্তি নাই কিন্তু তিনি রুগী দেখিয়া প্রচুর আয় করিতে পারেন। তাঁহার কর দেওয়ার ক্ষমতা বেশি সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্পত্তি নাই বলিয়া এই নীতি অনুযায়ী তিনি কিছুই কর দিবেন না।

কেহ কেহ বলেন যে ব্যয় হইতেছে সামর্থ্যের ভাল মাপকাঠি। যাহার খরচ বেশি তাহার সামর্থ্যও বেশি। সুতরাং সে বেশি কর দিবে। কিন্তু বেশি খরচ করিলেই যে সামর্থ্য বেশি একথা সব সময়ে বলা চলে না। যাহার সংসারের পোষ্য বেশি তাহাকে বেশি খরচ করিতে হয়। অথচ তাহার সামর্থ্যও কম।

সবদিক বিবেচনা করিয়া মনে হয় যে "আয়"ই করদানের নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি। যাহারা বেশি আয় করে, তাহাদের সামর্থ্য বেশি এবং যাহারা কম আয় করে তাহাদের সামর্থ্য কম। ইহা অনেকেই ঠিক মনে করেন। কিন্তু আয়ও সব সময়ে সন্তোষজনক মাপকাঠি নয়। দুইজন লোকের আয় সমান হইতে পারে। কিন্তু একজন হয়ত অবিবাহিত, আর একজনের হয়ত স্ত্রী ও অনেকগুলি পোষ্য আছে। এক্ষেত্রে দুই জনের উপর সমান হারে কর বসান অন্যায় হইবে। দ্বিতীয়ত, একজন হয়ত সম্পত্তি হইতে ১০০০ টাকা আয় করে, আর একজন হয়ত পরিশ্রম করিয়া সেই টাকা রোজগার করে। কিন্তু তাহার কোন সম্পত্তি নাই। যে পরিশ্রম করিয়া আয় করে তাহাকে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিতে হইবে। কিন্তু যাহার সম্পত্তি আছে তাহার অনেক কম সঞ্চয় করিলেও চলে। অতএব সমান আয় করিলেও দুজনের সামর্থ্য সব সময়ে সমান নয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কেবলমাত্র আয়ের পরিমাণ দিয়া করদানের সামর্থ্যের পরিমাপ করা যায় না। ঠিকমত সামর্থ্যের বিচার করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিরও বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রথমত, পরিবারের লোকসংখ্যার হিসাব দেখিতে হইবে। যে অবিবাহিত কিংবা যাহার অন্য কোন পোষ্য নাই, তাহার করদানের সামর্থ্য যে বিবাহিত বা যাহাকে বাড়িতে অনেক পোষ্য প্রতিপালন করিতে হয় তাহার চেয়ে বেশি।

দ্বিতীয়ত, আয়ের কতটা অংশ সম্পত্তি হইতে লব্ধ কিংবা পরিশ্রমার্জিত তাহাও দেখিতে হইবে। যাহার সম্পত্তি নাই, তাহাকে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিতে হয়। কিন্তু যাহার সম্পত্তি আছে তাহার পক্ষে সঞ্চয়ের আবশ্যকতা ততটা বেশি নহে। কাজেই দ্বিতীয় ব্যক্তির করদানের সামর্থ্য প্রথম ব্যক্তির চেয়ে যে বেশি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এইজন্য সাধারণত উপার্জিত আয় (earned income) এর উপর অনুপার্জিত আয় (unearned income) অপেক্ষা কম হারে আয়কর বসান হয়। তৃতীয়ত, আয় হইতে ক্ষয়ক্ষতিবাবদ (depreciation) ন্যায্য প্রয়োজনীয় অর্থ বাদ দিলে তবে প্রকৃত সামর্থ্য মাপা যায়। এইভাবে আয় ছাড়াও অন্য অনেক জিনিসের হিসাব লইয়া তবেই প্রকৃত সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

কর ও ত্যাগনীতি (Taxation and the theory of sacrifice) : কোন কোন লেখক বলেন যে করধার্যের নীতি আর এক ভাবেও ঠিক করা যায়। যে কর দেয় তাহার আয় কমিয়া যায়। আয় কমার অর্থ তাহাকে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইতেছে। কর না দিতে হইলে সেই অর্থ দিয়া সে নানা জিনিস কিনিতে পারিত, অন্য প্রয়োজনে বা প্রমোদে তাহা ব্যয় করিতে পারিত। কিন্তু কর দিতে হইতেছে বলিয়া তাহাকে এইসব ত্যাগ করিতে হইতেছে। কাজেই ত্যাগের পরিমাণ দিয়া করদানের সামর্থ্য নির্ণয় করা যায়।

এই মত অনুযায়ী দুই প্রকারে করধার্যের পরিমাণ ঠিক করা যায়। প্রথমত, এমন ভাবে করধার্য করিতে হইবে যাহার ফলে প্রত্যেক করদাতার ত্যাগের পরিমাণ সমান হইবে। ইহাকে সমত্যাগনীতি (Equal sacrifice theory) বলে। ইহা সাধারণভাবে ন্যায়সঙ্গত মনে হয়। কর দেওয়ার অর্থ যখন ত্যাগ স্বীকার করা তখন সকলেই সমানভাবে ত্যাগ করিবে, ইহাই উচিত।

দ্বিতীয়ত, এমন ভাবে করধার্য করিতে হইবে যাহার ফলে মোট ত্যাগের পরিমাণ সবচেয়ে কম। ইহাকে ন্যূনতম ত্যাগনীতি (Least aggregate-sacrifice theory) বলে। কর দিতে হইলে করদাতাকে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। সমষ্টিগত ভাবে মোট ত্যাগের পরিমাণ সবচেয়ে কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মোট ত্যাগের পরিমাণ যখন সবচেয়ে কম, তখন করভারও

সবচেয়ে কম হইবে। কোন্ অবস্থায় ইহা সম্ভব হইবে? আমরা প্রান্তিক উপযোগ নীতি (marginal utility) হইতে জানি যে, আয় যত বেশি হয় টাকার প্রান্তিক উপযোগও তত কমিয়া যায়। সুতরাং সবচেয়ে যাহারা ধনী তাহাদের আয়ের সর্বোচ্চ স্তরের উপর কর বসাইলে সবচেয়ে কম ক্ষতি হইবে এবং মোট ত্যাগের পরিমাণও কম হইবে। যাহার বাৎসরিক আয় দশ লক্ষ টাকা, তাহার নিকট হইতে কর বাবদ এক লক্ষ টাকা আদায় করিলে মোট ত্যাগের পরিমাণ কম হইবে। কারণ দশম লক্ষ-টাকার উপযোগ নবম লক্ষ টাকার চেয়ে কম এবং নবম লক্ষ টাকার উপযোগ অষ্টম লক্ষ টাকার চেয়ে কম। কাজেই কর যখন দিতেই হইবে তখন দশম লক্ষ টাকার উপর ট্যাক্স বসাইলে এই ধনী লোকটির পক্ষে সবচেয়ে কম ত্যাগ স্বীকার করা হইবে।

সমত্যাগনীতি গ্রহণ করিলে প্রায় সমস্ত লোকের উপরেই কম-বেশি হারে কর বসাইতে হয়। অবশ্য ত্যাগের পরিমাণ সমান করাইতে হইলে গরিবের উপর যে হারে কর বসান হইবে ধনীর উপর ইহার চেয়ে অনেক বেশি হারে কর বসাইতে হইবে। কিন্তু ন্যূনতম ত্যাগনীতি অনুযায়ী কেবলমাত্র অতি ধনী কিংবা ধনী লোকদের উপর কর বসাইলেই চলিবে। সকলের উপর কর বসাইবার কোন সার্থকতা থাকে না। তবে এই নীতিতেও যে যত ধনী তাহার আয়ের উপর তত বেশি হারে কর বসাইতে হইবে।

কিন্তু এই দুইটি নীতির প্রধান অসুবিধা হইতেছে যে, ত্যাগের পরিমাণ নির্ণয় করা সব সময়ে সহজ নয়। দুইজন লোকের মধ্যে একজনের আয় মাসে ৬০০৲ টাকা, আর একজন পাইতেছে মাসে ৫০০৲ টাকা। কি হারে কর বসাইলে আমরা বলিতে পারি যে, তাহাদের ত্যাগ সমান হইবে? আপাত-দৃষ্টিতে মনে হইবে যে, প্রথম ব্যক্তির উপর অপেক্ষাকৃত বেশি হারে ও দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর কম হারে বসান ঠিক হইবে। কিন্তু প্রথম ব্যক্তিকে হয়ত বৃদ্ধ পিতামাতা ও দুইটি সন্তান পালন করিতে হয় ও দ্বিতীয় ব্যক্তির পরিবারে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন পোষ্য নাই। এ অবস্থায় মনে হয় যে, দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর বেশি হারে ও প্রথমের উপর কম হারে কর বসাইলেই দুইজনের ত্যাগ সমান হইতে পারে। কাজেই ত্যাগের পরিমাণ নির্ণয় করা সহজ নহে।

দ্বিতীয় নীতির আরও একটি অসুবিধা আছে। কেবলমাত্র ধনী লোকের উপর ট্যাক্স বসাইলে সমষ্টিগত ত্যাগ ন্যূনতম হইতে পারে। কিন্তু ইহার মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং কর্মের ইচ্ছা কমিয়া যাইতে পারে। যদি সরকার বেশি আয়ের অধিকাংশই ট্যাক্স বসাইয়া লইয়া যায় বেশি পরিশ্রম করিয়া বেশি আয় করার লাভ কি? কাজেই ধনী ব্যবসায়ীরা আরো আয় বাড়াইবার জন্য পরিশ্রম করিবে না, নিত্য নূতন ব্যবসায় খুলিবার চেষ্টা করিবে না। ফলে দেশের ক্ষতি হইবে। আর মোট সঞ্চয়ের অধিকাংশই ধনীদের আয় হইতে সঞ্চিত হয়। ধনীর আয়ের উপর অতি উচ্চহারে কর বসান হইলে তাহাদের সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমিবে ও মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হইবে। সুতরাং এই নীতিদ্বয়ের যতই গুণ থাকুক না কেন ইহাদের অনুসরণ করার অনেক অসুবিধা দেখা যায়।

অন্যান্য করনীতি (Other principles of taxation): উপরোক্ত নীতিগুলি ছাড়াও সরকার অনেক সময়েই অন্য নীতি অনুসরণ করে। যেমন দেশের নবীন শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্য বিদেশ হইতে আমদানি দ্রব্যের উপর শুল্ক বসান হয়। এখানে অন্য উদ্দেশ্য হয়ত থাকিতেও পারে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হইল দেশের মধ্যে শিল্পপ্রসারের ব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত, কোন কোন শ্রেণীর দ্রব্য আছে যাহা লোকের পক্ষে ক্ষতিকর, যেমন মদ, গাঁজা, আফিং ইত্যাদি। এই সব জিনিসের উৎপাদন একদম বন্ধ করিতে গেলে দেখা যায় যে, অনেক সময়েই বে-আইনীভাবে উৎপাদনের কাজ চলে। সেইজন্য উৎপাদন বন্ধ না করিয়া সরকার খুব বেশি হারে ইহাদের উপর ট্যাক্স বসায় বলিয়া ইহাদের দাম চড়িয়া যায়। মদের দাম বেশি বাড়িলে মদ খাওয়া কমিবে। এইখানে উচ্চহারে কর বসাইবার উদ্দেশ্য জিনিসটির ভোগব্যবহার কমান। তৃতীয়ত, জাতীয় আয় বণ্টনের অসমতা প্রায় সকল লোকের মতেই অবাঞ্ছনীয়। দেশের মধ্যে মুষ্টিমেয় লোক ধনী ও অধিকাংশই দরিদ্র থাকিবে ইহা খুব কম লেখকই উচিত বলিয়া মনে করেন। জাতীয় আয় বণ্টনের অসমতা নিবারণ করা আজকাল প্রায় সমস্ত সরকারই অবশ্য করণীয় কার্যের মধ্যে গণ্য করে। সেই উদ্দেশ্যেও করধার্য ব্যবস্থা ও সরকারী ব্যয় নিয়ন্ত্রিত করা হয়। অর্থাৎ ধনীদের উপর অপেক্ষাকৃত বেশি হারে কর বসান হয় ও সেই করলব্ধ রাজস্ব নানাভাবে দরিদ্রদের উপকারে

য় করা হয়। স্কুলের ছেলেদের মধ্যে সরকারী খরচে দুধ ও টিফিন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ইহার ফলে দরিদ্র ছেলেদেরই উপকার হয় বেশি। বৃদ্ধ বয়সে সরকার অবসর ভাতা দেয়। ইহার ফলেই দরিদ্রদের বেশি উপকার হয়। চতুর্থত, আজকাল ক্রমেই এই কথা মানিয়া লওয়া হইতেছে যে, সরকার করব্যবস্থা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবে যাহার ফলে দেশের মধ্যে পূর্ণনিয়োগ অবস্থা বর্তমান থাকে। অর্থাৎ দেশের খুব কম লোকই বেকার বসিয়া থাকিতে বাধ্য না হয়। দেশের মধ্যে যখন ব্যবসায় মন্দ দেখা দিবে ও চারিদিকে ছাঁটাই আরম্ভ হইবে তখন সরকার আয়করের হার কমাইয়া দিবে ও অন্যভাবে সরকারী ব্যয় বাড়াইয়া দিবে যাহার ফলে মোট বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়ে ও বহু বেকার কাজ পায়। আবার ইনফ্লেসনের আশংকা উপস্থিত হইলে ট্যাক্স বাড়াইতে হইবে, সরকারী ব্যয় কমাইতে হইবে। এইভাবে করধার্য ও সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিয়া পূর্ণনিয়োগব্যবস্থা বহাল রাখার চেষ্টা করিতে হইবে।

আনুপাতিক ও বর্ধমান করনীতি

(Principle of Proportional and Progressive Taxation)

করভার কিভাবে বণ্টন করা যায়? এ বিষয়ে তিনটি পদ্ধতির যে কোন একটি অবলম্বন করা চলে। আনুপাতিক হারে (proportional), বর্ধমান হারে (progressive) অথবা হ্রাসমান (regressive) হারে কর বসান চলে। আয় যতই হউক না কেন করের হার যদি একই থাকে, তবে ইহাকে আনুপাতিক করনীতি বলে। যেখানে আয় বাড়িলে করের হারও বাড়ান হয় সেখানে বর্ধমান করনীতি (progressive taxation) বলে। আর যেখানে আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে করের হার বাড়ান হয় বটে, কিন্তু করবৃদ্ধির হার ক্রমে কমিয়া যায় তাহাকে হ্রাসমান (regressive taxation) করনীতি বলে। আমরা বর্তমানে প্রথম দুইটি পদ্ধতির সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আনুপাতিক করনীতি (Proportional taxation): এই নীতির অর্থ আয়ের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন করের হার একই থাকিবে।

অর্থাৎ যাহার বাৎসরিক আয় ৫০০০৲ টাকা তাহাকে যে হারে কর দিতে হইবে, যাহার আয় ৫০,০০০ টাকা তাহার উপরেও সেই হারে কর বসান হইবে। ধরা যাক, সরকারী বাজেটে ঠিক হইল যে, আয়ের উপর শতকরা দশ টাকা হারে কর বসান হইবে। যাহার আয় ৫০০০৲ টাকা, সে দশটাকা হারে কর দিবে এবং যে বৎসরে ৫০,০০০৲ টাকা পায় সেও ১০৲ টাকা হারে কর দিবে।

এই নীতির প্রধান সুবিধা যে ইহা খুব সহজে বুঝা যায় এবং আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় যেন সকলের সঙ্গেই সমান ব্যবহার করা হইল। বিখ্যাত লেখক আদম স্মিথ এই নীতি সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। অবশ্য তিনি যে দুই একস্থানে বর্ধমান করনীতিকে সমর্থন করিয়াছেন এ কথাও অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু সহজে বোধগম্য হইলেই যে সেই করনীতি ভাল একথা বলা চলে না। এই নীতি অনুযায়ী পূর্বের উদাহরণের প্রথম ব্যক্তিকে ৫০০৲ টাকা কর হিসাবে দিতে হইবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দিতে হইত ৫০০০৲ টাকা মাত্র। প্রথম ব্যক্তিকে ৫০০৲ টাকা দিতে যে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, দ্বিতীয়কে ৫০০০৲ টাকা দিতে সে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে না। এইজন্য বর্তমান যুগের সরকার এই নীতি গ্রহণ করে না।

বর্ধমান করনীতি (Progressive taxation) : এই নীতিতে বলে যে আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর দিবার সামর্থ্য অনেক বেশি বাড়ে এবং সেইজন্য করের হারও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ান উচিত হইবে। অর্থাৎ যে ৫০০০৲ টাকা উপার্জন করে তাহার উপর শতকরা ৫ টাকা হারে ট্যাক্স বসান হইল। যে ১০,০০০৲ টাকা উপার্জন করে তাহাকে শতকরা ৭৲ টাকা হারে কর দিতে হইবে ও যে ২০,০০০৲ টাকা আয় করে তাহাকে শতকরা ১৫৲ টাকা হারে কর দিতে হইবে। এইভাবে আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে করের হার ক্রমেই বাড়িতে থাকে।

এই ব্যবস্থার স্বপক্ষে কি কি যুক্তি আছে? প্রথমত, বলা হয় যে, আনুপাতিক করনীতি অপেক্ষা এই ব্যবস্থা অধিক ন্যায়সঙ্গত। পাঁচ হাজার টাকা আয়ের লোকের কর দিবার সামর্থ্য পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের লোকের চেয়ে অনেক কম। আনুপাতিক করনীতির সমর্থকেরা ইহা

স্বীকার করিয়া বলেন যে, সেইজন্য প্রথম লোকটির নিকট হইতে ৫০৲ টাকা ও দ্বিতীয় লোকটির নিকট হইতে ৫০০৲ টাকা কর আদায় করা হইতেছে। কিন্তু ইহা কি ন্যায়সঙ্গত হইবে? যাহার বাৎসরিক আয় মাত্র ৫০০০৲ টাকা তাহার পক্ষে ৫০৲ টাকা দেওয়াতে যে ক্ষতি হইবে পঞ্চাশ হাজারী লোক ৫০০৲ টাকা দিলেও তত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। প্রথম লোকটিকে হয়ত কোন আবশ্যকীয় জিনিস কেনা বন্ধ করিতে হইবে। দ্বিতীয়ের পক্ষে ৫০০৲ টাকা দেওয়ার অর্থ হয়ত সামান্য কোন বিলাস সামগ্রী কেনা বন্ধ করিতে হইতে পারে। আসলে আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর দিবার সামর্থ্য আনুপাতিক হারে বাড়ে না। ইহার চেয়েও বেশি বাড়ে। সেইজন্য আয় বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে করের হারও বাড়ান ন্যায়সঙ্গত হইবে।

দ্বিতীয়ত, সমত্যাগনীতি (Theory of equal sacrifice) অথবা ন্যূনতম ত্যাগনীতির (Least aggregate sacrifice theory) যে কোন নীতি অনুযায়ী কর বসাইতে হইলে আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে করের হার বাড়াইতে হয়। পাঁচ হাজার টাকা আয়ের লোককে ২৫০৲ টাকা কর দিতে যে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, পঞ্চাশ হাজারী আয়ের লোকের হয়ত অন্তত ৫,০০০৲ টাকা ট্যাক্স দিলে সেই পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং ত্যাগের পরিমাণ যদি সমান রাখিতে হয়, অর্থাৎ সমত্যাগ-নীতি গ্রহণ করা হয়, তবে প্রথম ব্যক্তির উপর শতকরা পাঁচ টাকা হারে ও দ্বিতীয়ের উপর শতকরা দশ টাকা হারে ট্যাক্স বসাইতে হইবে। ন্যূনতম ত্যাগনীতি অনুযায়ী উচ্চতম আয়ের উপর অতি উচ্চ হারে কর বসাইতে হইবে। নিম্ন আয়ের উপর কোন কর থাকিবে না।

তৃতীয়ত, প্রান্তিক উপযোগিতা হ্রাসের নীতি (Marginal utility) অনুযায়ীও এই করব্যবস্থা সমর্থন করা যায়। এই নীতিতে বলে আমরা কোন জিনিস যদি বেশি পরিমাণে পাই, তবে আমাদের নিকট জিনিসটির উপযোগিতা ক্রমেই কমিয়া যায়। এই নীতি টাকা সম্বন্ধেও খাটে। লোকে যত বেশি টাকা আয় করে, ততই তাহার নিকট টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা কমিয়া যায়। যে পাঁচ হাজার টাকা আয় করে তাহার নিকট শেষ ৫০৲ টাকার যে উপযোগিতা তাহা পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের লোকের নিকট শেষ ৫০০৲ টাকার উপযোগিতা হইতে বেশি। হিসাব করিলে

হয়ত দেখা যাইবে যে প্রথম ব্যক্তির নিকট শেষ ৫০ টাকার উপযোগিতা দ্বিতীয়ের নিকট শেষ হাজার টাকার উপযোগিতার সমান। তবে প্রথমের উপর শতকরা ১৲ টাকা হারে ও দ্বিতীয়ের উপর ২০৲ টাকা হারে কর ধার্য করাই ঠিক হইবে।

চতুর্থত কোন কোন লেখকের মতে বর্ধমান করনীতির স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি হইতেছে জাতীয় আয় বণ্টনের সমতার প্রয়োজনীয়তা। ধনী দরিদ্রের আয়ের অত্যধিক প্রভেদ কোনদিক দিয়াই বাঞ্ছনীয় নহে। কিছুটা আয়ের পার্থক্য থাকা প্রয়োজন সন্দেহ নাই। কারণ তাহা না হইলে কর্মদক্ষতা কমিয়া যাইবে। কিন্তু অত্যধিক পার্থক্য সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হয় না। এইজন্য অধিকাংশ লেখকই জাতীয় আয় বণ্টনব্যবস্থার অসাম্যতা কমাইবার পক্ষপাতী। তাহাদের মতে ধনী দরিদ্রের আয়ের মধ্যে বর্তমানে যে প্রভেদ আছে ইহা কমাইতে হইবে। ইহা কমাইবার সহজ উপায় হইতেছে বর্ধমান হারে কর বসান। তাহা হইলে ধনীকে অনেক বেশি কর দিতে হইবে ও ফলে তাহার আয় কমিবে। পূর্বের উদাহরণোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে দ্বিতীয় লোকটির আয় প্রথম লোকের আয়ের দশগুণ। কিন্তু প্রথম লোকের উপর শতকরা পাঁচ টাকা হারে কর বসান হইলে তাহার আয় দাঁড়াইল ৪৭৫০৲ টাকা। দ্বিতীয়ের উপর শতকরা ২০৲ টাকা হারে কর বসাইলে তাহার আয় হইতে মাত্র ৪০,০০০ টাকা থাকিবে। দ্বিতীয় ব্যক্তির আয় প্রথম ব্যক্তির আয়ের নবগুণেরও কম হইবে। অর্থাৎ এই নীতি অনুযায়ী কর বসান হইলে আয়ের অসমতা কমিবে।

বর্ধমান করনীতির স্বপক্ষে বহু যুক্তি আছে সন্দেহ নাই। অবশ্য ইহার একটি অসুবিধার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আয়বৃদ্ধির সঙ্গে কর দিবার সামর্থ্য বাড়ে একথা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সামর্থ্য কি হারে বাড়িবে ইহার মাপকাঠি কি? যে পঞ্চাশ হাজার টাকা রোজগার করে তাহার কর দিবার সামর্থ্য পাঁচ হাজারের আয়ের লোক হইতে বেশি হইতে পারে। কিন্তু কত বেশি? দেড়গুণ না দ্বিগুণ, না আড়াই গুণ, কি তিন গুণ না পাঁচ গুণ বেশি ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার কোন উপায় নাই।

এককর ব্যবস্থা বনাম বহুকর ব্যবস্থা (Single vs. multiple tax system): আগেকার লেখকদের মধ্যে অনেকের মত ছিল যে সরকারের

উচিত মাত্র একটি কর বসান এবং এই একটি কর বসাইয়া প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহ করা উচিত। ফরাসী দেশের ফিজিয়োক্রোট নামধারী লেখকদের মত ছিল যে একমাত্র খাজনার উপর কর বসান বাঞ্ছনীয়। অন্য কোন কর ধার্য করা ঠিক হইবে না। ইংরাজ লেখক Henry George জমির উপর করধার্য করার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে জমির উপর কর ধার্য করিলে শিল্পের ক্ষতি হয় না একথা ঠিক। কিন্তু এই নীতি অনুসরণ করিলে কোন শিল্পপতিকে কর দিতে হইবে না, অথচ দরিদ্র কৃষককে কর দিতে হইবে।

অনেকে শুধু আয়কর ধার্য করার পক্ষপাতী, কিন্তু ইহার দোষ আছে। প্রথমত, কম আয়ের উপর কর ধার্য করা ও আদায় করার খরচ বেশি। দ্বিতীয়ত, সমস্ত রাজস্ব যদি কেবলমাত্র আয়কর হইতে তুলিতে হয়, তবে করের হার খুব বেশি করিতে হইবে। ইহার ফলে সঞ্চয় কমে। তৃতীয়ত, ইহাতে আকস্মিক লাভ (windfalls) এর উপর কর বসান সম্ভব হয় না। অথচ ইহা করার কোন অর্থ হয় না।

একটি করব্যবস্থা যাঁহারা সমর্থন করেন তাঁহারা বলেন যে ইহাতে আদায়ের খরচ কম হয় এবং সেই কর ব্যবস্থা সহজে বোঝা যায়। কিন্তু একটিমাত্র করের উপর নির্ভর করিতে গেলে কতকগুলি দোষ দেখা যায়। (১) তত্ত্বের দিক দিয়া যে কর খুব ভাল মনে হয় প্রায়ই দেখা যায় যে, কার্যকালে তাহার অনেক ত্রুটি বাহির হয়। একটি করের যে সব ত্রুটি হয় তাহা অন্য করের দ্বারা দূর করা যায়। (২) আধুনিক সরকারের রাজস্বের প্রয়োজন এত বেশি, অর্থাৎ এত বেশি রাজস্ব তুলিতে হয় যে কোন একটি কর ধার্য করিয়া তাহা পাওয়া সম্ভব নহে। (৩) একটি কর থাকিলে ফাঁকি দেওয়া সহজ, বহুপ্রকার কর থাকিলে ফাঁকি দেওয়া তত সহজ হইবে না। যেমন আয়করের ফাঁকি মৃত সম্পত্তি করের সময় অনেকটা ধরা যায়।

বহু করব্যবস্থার (Multiple tax system) সমর্থনে Arthur Young বলিয়াছেন "যে করপ্রথা অসংখ্য বিন্দুতে চাপ দেয়, অথচ কোনটির উপর অত্যধিক চাপ দেয় না সেই প্রথাই ভাল"। কিন্তু এই মত বা তত্ত্ব কোনভাবেই সমর্থন করা যায় না। সব জিনিসের উপর কর ধার্য করার অসুবিধা অনেক এবং তাহা ক্ষতিকরও বটে।

সুতরাং দুইটি মতের কোনটিই ঠিক নয়। এই বিষয়ে মধ্য পন্থা অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়। ইহাকে (plural) কর প্রথা বলা যায়। ধনিক শ্রেণীর উপর কয়েকটি বড় কর, আর বাকী কর সকল শ্রেণীর উপর ধার্য করা উচিত। আয়কর, মৃতের সম্পত্তি কর ইত্যাদি ধনীর উপর এবং বিক্রয় কর ইত্যাদি সকল শ্রেণীর উপর বসান হয়।

উত্তম করব্যবস্থা (Characteristics of a good tax-system) : পূর্বের আলোচনা হইতে এ বিষয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্ত করা যায়। প্রথমত, করের সূত্রগুলি ঠিকমত মানিয়া চলিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকটি করের ভার কিভাবে বণ্টন করা হইয়াছে তাহা দেখা দরকার। যে সমস্ত করে ন্যূনতম ক্ষতি হয় এবং যাহা আদায় করার ব্যয় কম তাহাই ধার্য করা উচিত। যতদূর সম্ভব করদাতার সামর্থ্য অনুসারে করভার বণ্টন করা উচিত। সব রকম করের মিলিত ভার এমন হওয়া উচিত যাহার ফলে জাতীয় আয় বণ্টনের অসমতা কমে, ধনীর অর্থ কমে কিন্তু গরিব আরো গরিব হয় না। সেইদিক দিয়া দেখিলে পরোক্ষ করের চেয়ে প্রত্যক্ষ করের উপর বেশি নির্ভর করা উচিত। তবে যে পরোক্ষ কর মাত্রেই খারাপ এ ধারণা ভুল।

করদানের সমষ্টিগত ক্ষমতা (Taxable capacity) : দেশের সমস্ত লোকের করদানের ক্ষমতা কতখানি তাহা কি ভাবে নির্ণয় করা যায়? ইহা করিতে হইলে প্রথমে করদানের সমষ্টিগত ক্ষমতার সংজ্ঞা কি ইহা জানিতে হইবে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, দেশের জাতীয় আয় হইতে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি (depreciation) বাবদ অর্থ এবং লোকের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই করদানের সমষ্টিগত ক্ষমতা। অর্থাৎ প্রয়োজন হইলে জাতীয় আয়ের এই অংশটুকু সরকার ট্যাক্স বাবদ আদায় করিয়া লইতে পারে। ধরা যাক যে, ভারতবর্ষের জাতীয় আয় এক হাজার কোটি টাকা। এদেশের সকল লোকের জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন হয় ৮৩ হাজার কোটি টাকা ও মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ১০ হাজার কোটি টাকা রাখিয়া দেওয়া উচিত। সুতরাং আমাদের করদানের সমষ্টিগত ক্ষমতা হইতেছে সাত হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ জাতীয় আয়ের শতকরা সাত ভাগ। ইহার বেশি অংশ কর বসাইয়া তোলার চেষ্টা

রিলে হয় লোকেদের জীবনধারণের জন্য টাকার অকুলান হইবে, নচেৎ মূলধনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইবে। ইহার যে কোন একটিতে দেশের ক্ষতি হইবে। ঠিকমত মূলধন বজায় না রাখিতে পারিলে ভবিষ্যতে জাতীয় আয় কমিয়া যাইবে। আর জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকিলে অন্নবস্ত্রের অভাবে বহু লোকের কর্মদক্ষতা কমিবে। ইহার ফলেও জাতীয় আয় কমিবে।

এই সংজ্ঞার সার্থকতা যাহাই থাকুক না কেন, ইহা প্রয়োগের অনেক অসুবিধা আছে। যেমন মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ কত টাকা রাখা দরকার ইহা ঠিক করা খুব শক্ত। এ সম্বন্ধে এক এক লোকের এক একরকম মত আছে। দ্বিতীয়ত, শুধু মূলধন ঠিকমত বজায় রাখিলেই চলিবে না, তাহা বাড়াইবার জন্য টাকা সরাইয়া রাখা দরকার। কারণ মূলধন না বাড়িলে জাতীয় আয় বাড়িবে না। কিন্তু জাতীয় আয়ের কত অংশ নূতন মূলধন বাবদ রাখা ঠিক হইবে ইহা নির্ণয় করিবার কোন মাপকাঠি নাই। এইরূপ জীবনধারণের জন্য কত টাকা দরকার এ সম্বন্ধেও মতভেদ থাকার সম্ভাবনা বেশি।

শুধু এই সংজ্ঞা নয়, অন্য যে কোন সংজ্ঞারই নানা অসুবিধা দেখা যায়। কাজেই অনেকের মতে করদানের সমষ্টিগত ক্ষমতার ঠিকমত সংজ্ঞা করা যায় না। বড়জোর সাধারণভাবে এই পর্যন্ত বলা চলে যে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা না কমাইয়া লোকে যতটুকু কর দিতে পারে তাহাই করদানের সমষ্টিগত ক্ষমতা। এই ক্ষমতার ঠিকমত সংজ্ঞা না করা গেলেও ইহা সাধারণভাবে কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহা কিছু কিছু বলা যায়। যেমন, করদানের ক্ষমতা কিছুটা জাতীয় আয়বণ্টনব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। জাতীয় আয়বণ্টনের ব্যবস্থা যত বেশি অসম হইবে, অর্থাৎ ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ থাকিবে ততই করদানের ক্ষমতা বেশি হইবে। আর জাতীয় আয় বণ্টন যতই সমান হইবে ততই করদানের ক্ষমতা কমিতে পারে। অবশ্য ইহার দ্বারা জাতীয় আয়ের অসম বণ্টনব্যবস্থা সমর্থন করা হয় না। কারণ করদানের ক্ষমতা বেশি থাকার কিছু কিছু সুবিধা আছে বটে, কিন্তু জাতীয় আয়বণ্টনের অসমতার দোষ অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, লোকসংখ্যাবৃদ্ধির হারের উপরেও করদানের ক্ষমতা নির্ভর করে, যে হারে

জাতীয় আয় বাড়িতেছে ইহার চেয়ে বেশি হারে যদি লোকসংখ্যা বাড়ে, তবে করদানের ক্ষমতা কমিতে থাকিবে। তৃতীয়ত, করধার্য ব্যবস্থার উপরেও করদানক্ষমতা নির্ভর করে। যদি সরকার কেবলমাত্র পরোক্ষ কর ধার্য করে, তবে করদানক্ষমতা যাহা হইবে, প্রত্যক্ষ কর বসাইলে ইহা তাহার বেশি হইবে। উত্তম করব্যবস্থায় করদানক্ষমতা বাড়ে। চতুর্থত, সরকারী রাজস্ব কিভাবে ব্যয় হইবে, ইহার উপরেও করদানের ক্ষমতা নির্ভর করে। সরকার যদি জনশিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির উন্নতির জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করে, তবে করদানক্ষমতা বাড়িয়া যাইবে। আর রাজস্বের মোটা অংশ যদি অ্যাটম বোমা নির্মাণে কিংবা এইরূপ অন্য অকাজে ব্যবহার করা হয়, তবে ইহার ফলে করদানক্ষমতা কমিবার সম্ভাবনাই অধিক। পঞ্চমত, করদানক্ষমতা করদাতাদের মনোভাবের উপর কিছুটা নির্ভর করে। যুদ্ধের সময় দেশরক্ষার জন্য লোকেরা যত ট্যাক্স দিতে রাজী থাকে শান্তির সময় তাহা থাকে না। যদি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আসল উপযোগিতা জনসাধারণের মধ্যে ঠিকমত প্রচার করা হয় এবং তাহাদের মনে যদি এই ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া যায় যে, দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াও আমরা ভবিষ্যতের আশায় পরিকল্পনা সফল করিয়া তুলিব তাহা হইলে বেশি কর দিতে অনেকেই আপত্তি করিবে না। ফলে এদেশের করদানক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপ নানা বিষয়ের উপর নানা বিষয়ের উপর করদানক্ষমতা নির্ভর করে।

Exercises

Q. 1. On what grounds would you justify the principles of progressive taxation? (Viswa. 1956, 1954; C. U. B. Com. 1953; B.A. 1957).

Q. 2. Write short notes on the taxable capacity. (C. U. 1956).

Q. 3. Enunciate the principles that should guide the system of taxation. (C. U. 1954, 1950, 1947).

চত্বারিংশ অধ্যায়

করের ভার ও চালন

(Shifting and Incidence of taxation)

সরকার যখন কোন লোকের উপর কর ধার্য করে, তখন সে প্রথমে করের ভার অন্য কাহারও স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা করে। ইহা করা যদি সম্ভব না হয় তবে নিজেই শেষ পর্যন্ত করের ভার বহন করে। অনেক সময়ে সে করের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে সক্ষম হয়। যেমন বিক্রয়করের বেলাতে হয়। সরকার দোকানদারদের নিকট হইতে বিক্রয়করের টাকা আদায় করিয়া নেয়। অর্থাৎ কর দেওয়ার প্রথম ধাক্কা বা চাপ দোকানদারদের উপর পড়ে। ইহাকে impact বা ধাক্কা বলে। দোকানদার আবার খরিদ্দারের নিকট হইতে বেশি দাম আদায় করিয়া করের ভার খরিদ্দারের ঘাড়ে চাপাইতে চেষ্টা করে। করের ভার চালাইবার প্রণালীকে shifting বা করভার চালন বলে। খরিদ্দার বেশি দাম দিয়া জিনিসটি কিনিলে করের আসল ভার তাহার স্কন্ধে পড়িল। এই আসল ভারকে ইংরাজীতে incidence বলে। Impact হইতেছে করের প্রথম ধাক্কা বা চাপ। প্রথম যাহার উপর চাপ পড়ে, সে অন্যের ঘাড়ে বোঝা সরাইবার চেষ্টা করে। এই বোঝা সরাইবার প্রণালীকে বলে shifting। যে শেষ পর্যন্ত বোঝা ঘাড়ে নিতে বাধ্য হয়, তাহার উপর করের incidence বা আসল ভার পড়িয়াছে বলা হয়। করের টাকা শেষ পর্যন্ত কাহার পকেট হইতে আসিতেছে? কিংবা কর তুলিয়া দিলে শেষ পর্যন্ত কাহার পকেটে টাকা থাকিবে? এই প্রশ্নের উত্তর জানিলে কে করভার বহন করিতেছে অর্থাৎ কাহার উপর incidence পড়িয়াছে ইহা বলা যায়।

করের প্রথম চাপ যাহার উপর পড়ে অর্থাৎ যে প্রথমে কর দেয়, সে এই বোঝা অন্যের ঘাড়ে সরাইবার চেষ্টা করে। সে হয়ত সফল হইতে পারে, কিংবা নাও হইতে পারে। অথবা আংশিকভাবে সফল হইতে পারে। কাপড়ের উপর সরকার উৎপাদনশুল্ক (excise duty) বসাইল। টাকাটা

সরকার মিলের মালিকের নিকট হইতে আদায় করিয়া নেয়। করের প্রথম চাপ মিলওয়ালার স্কন্ধে পড়িল। মিলের মালিক কাপড়ের দাম বাড়াইয়া টাকা ক্রেতাদের নিকট হইতে তুলিতে চেষ্টা করিবে। ক্রেতারা যদি বেশি দাম সত্ত্বেও পূর্বের ন্যায় একই পরিমাণ কাপড় কেনে, তবে এই শুল্কের আসল ভার (incidence) ক্রেতাদের ঘাড়ে পড়িল। কিন্তু ক্রেতারা যদি কাপড়ের দাম বাড়াইবার জন্য পূর্বের চেয়ে কম কাপড় কেনে, তবে মিলের মালিকের বিক্রয় ও লাভ কমিয়া যাইবে। অর্থাৎ করের ভার আংশিকভাবে তাহার স্কন্ধে থাকিয়া যাইবে। বাকিটা ক্রেতাদের ঘাড়ে পড়িতেছে। এই স্থলে উৎপাদনশুল্কের incidence কিছুটা মিলের মালিক ও কিছুটা ক্রেতাদের উপর পড়িল। আবার কাপড়ের বাজারের অবস্থা খুব খারাপ হইলে কাপড়ের দাম বাড়ান সম্ভব হইল না, ফলে করের সম্পূর্ণ ভার মিলের মালিকদের উপর রহিয়া যাইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে করের ভার সম্পূর্ণ চালনা করা যাইতে পারে, কিংবা তাহা আংশিকভাবে চালনা করা যায়। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, সুচতুর ব্যবসায়ীরা করের বোঝা ঘাড়ে পড়িলে জিনিসটির দাম না বাড়াইয়া ইহার গুণ (quality) খারাপ করিয়া দেয়। দাম বাড়াইলে ক্রেতারা হয়ত অসন্তুষ্ট হইতে পারে। ইহা অবাঞ্ছনীয় মনে করিলে ব্যবসায়ীরা দাম একই রাখে। কিন্তু গুণের সামান্য পার্থক্য খরিদ্দার ধরিতে পারিবে না এই আশায় পূর্বের চেয়ে একটু নিকৃষ্ট জিনিস তৈয়ারি করিতে পারে। ইহার ফলেও করের আসল বোঝা ক্রেতাদের স্কন্ধে পড়িল—যদি তাহারা গুণের তফাৎ না বুঝিয়া পূর্বের ন্যায় জিনিসটি কিনিয়া যায়।

করের ভার চালন (shifting) সামনের দিকে কিংবা পিছনের দিকেও হইতে পারে। যে সব ব্যবসায়ী বিদেশ হইতে পণ্য আমদানি করিতেছে, সরকার আমদানি শুল্ক বসাইয়া তাহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া দেয়। এই ব্যবসায়ীরা আমদানি পণ্যটি দেশে বেশি দামে বিক্রয় করিতে পারে। ক্রেতারা যদি বেশি দাম সত্ত্বেও জিনিসটি পূর্বের ন্যায় কিনিয়া যায় তবে করের ভার ক্রেতাদের ঘাড়ে পড়িল। ইহাকে সম্মুখ চালন বলা হয়। কিন্তু দেশে জিনিসটির চাহিদা যদি বেশি না

থাকে, তবে ব্যবসায়ীরা বেশি দাম আদায় করিতে পারিবে না। তখন সামনের ক্রেতাদের স্কন্ধে বোঝা সরান যাইতেছে না দেখিয়া ব্যবসায়ীরা পশ্চাতের উৎপাদকদের ঘাড়ে বোঝা চালান দিবার চেষ্টা করিতে পারে। তাহারা বিদেশী উৎপাদকদের ঘাড়ে করের বোঝা চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে। অর্থাৎ বিদেশী উৎপাদককে কম দাম দিতে চেষ্টা করিতে পারে। বিদেশী উৎপাদক যদি কম দামে জিনিসটি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় তবে আমদানি শুল্কের আসল ভার তাহাদের স্কন্ধে পড়িবে। যখন ক্রেতাদের ঘাড়ে করভার পড়ে, তখন ইহাকে সম্মুখ চালন (forward shifting) বলে। আর যখন বিদেশী উৎপাদকদের ঘাড়ে করভার পড়ে, তখন ইহার পশ্চাৎ চালন (backward shifting) হইয়াছে বলা হয়।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর (Direct and Indirect Tax) **:** সরকার প্রথম যাহার নিকট হইতে কর আদায় করে সে করের বোঝা বহন করিতে পারে, আবার নাও করিতে পারে। করের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চালান যাইবে কিনা ইহা অনেক সময়ে করের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কোন কোন করের বোঝা যে প্রথমে কর দেয় শেষ পর্যন্ত তাহাকেই বহন করিতে হয়। এই করের ভার অন্যের স্কন্ধে চাপান সম্ভব হয় না। এই ধরনের করকে প্রত্যক্ষ কর (Direct Tax) বলে। আয়কর প্রত্যক্ষ করের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যাহার উপর আয়কর বসান হয়, সে সাধারণত এই করের ভার অন্যের উপর চাপাইতে পারে না। উত্তরাধিকার কর (Inheritance Tax) বা মৃতসম্পত্তি কর (Death Duty) প্রত্যক্ষ করের আর একটি নিদর্শন। এই করের বেলাতে বলা হয় যে, এখানে করের প্রথম ধাক্কা (Impact) ও করের আসলভার (Incidence) একই লোকের উপর থাকে।

যে করের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপান যায় ইহাকে পরোক্ষ (Indirect) কর বলে। পরোক্ষ কর প্রথমে যাহার উপর ধার্য করা হয়, সে সাধারণত এই করের বোঝা অন্যের ঘাড়ে সরাইয়া দিতে পারে। এখানে যে করের প্রথম ধাক্কা খায় অর্থাৎ যে প্রথমে কর দেয় সে করের বোঝা বহে না। বিক্রয়কর, উৎপাদনশুল্ক (Excise Duty), আমদানি-রপ্তানি শুল্ক প্রভৃতি পরোক্ষ করের নিদর্শন। যে ব্যবসায়ী বা দোকানদারের উপর এই কর

প্রথম ধার্য করা হয়, সে নিজের পকেট হইতে প্রথমে কর দেয় বটে, কিন্তু সাধারণক্ষেত্রে এই করের ভার সে ক্রেতাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিতে পারে।

প্রত্যক্ষ করের গুণাগুণ: প্রত্যক্ষ করের অনেক গুণ আছে। প্রথমত, লোকের করদান ক্ষমতা বুঝিয়া এই করের হার নির্ণয় করা যায়। যাহার আয় বেশি কিংবা সামর্থ্য বেশি, তাহার উপর বেশি হারে ও যে অপেক্ষাকৃত কম অর্থশালী তাহার উপব কম হারে আয়কর ধার্য করা হয়। কিংবা যে যত বেশি মূল্যের সম্পত্তি উত্তরাধিকারী হিসাবে পায় তাহার উপর তত বেশি হারে উত্তরাধিকার কর বসান চলে। এইজন্য এই করগুলিকে ন্যায়সঙ্গত বলা হয়। দ্বিতীয়ত, অনেক সময়েই এই কর হইতে যত রাজস্ব আদায় হয় আদায়ের খরচ তাহা হইতে অনেক কম হয়। টাকায় ছয় আনা হিসাবে আয়কর আদায় করিতে যে খরচ লাগে, টাকায় আট আনা হিসাবে ট্যাক্স তুলিতে ইহার চেয়ে বিশেষ বেশি ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। তৃতীয়ত, এই করেব আয় স্থিতিস্থাপক। অর্থাৎ দেশের লোকের আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই রাজস্বের পরিমাণও বাড়িয়া যায়। আবার প্রয়োজন হইলে করের হার ইচ্ছামত বাড়াইয়া বেশি রাজস্ব তোলা যায়। চতুর্থত, অনেকে বলেন যে প্রত্যক্ষ কর দিবার জন্য করদাতার রাজনৈতিক চেতনা বাড়ে। কারণ কর দিতে হয় বলিয়া সরকার কেন এত টাকা ট্যাক্স বসাইবে এ বিষয়ে সে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করিবে। অর্থাৎ সে সরকারী নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবে ও এই নীতি ঠিক কিনা ও করলব্ধ রাজস্ব ঠিকমত ব্যয় হইতেছে কিনা এই সমস্ত বিষয়ে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলিবে। আসলে তাহার পকেটে হাত পড়িতেছে বলিয়া সে সরকারী কার্যকলাপ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিবে।

প্রত্যক্ষ করের প্রধান দোষ হইতেছে যে ইহার ফলে সরকারের জনপ্রিয়তা কমিতে পারে। ট্যাক্স দিতে বিশেষ কেহ পছন্দ করে না। গণতান্ত্রিক দেশের সরকার কোন একটি বা কয়েকটি দলের লোক দিয়া গঠিত। যে দলের সরকার বেশি বেশি ট্যাক্স বসায় ইহার জনপ্রিয়তা কমিতে পারে। দ্বিতীয়ত, লোকে ট্যাক্স দিতে পছন্দ করে না বলিয়া

ট্যাক্স ফাঁকি দিবার মনোবৃত্তি (evasion of taxes) বাড়িয়া যায়। যেমন আয়করের বোঝা এড়াইবার উদ্দেশ্যে বহুলোক ও ব্যবসায়ী নিজের আয় সম্বন্ধে মিথ্যা হিসাব দাখিল করে। কাজেই প্রত্যক্ষ করব্যবস্থায় দেশের লোকের মধ্যে অসাধুতা বৃদ্ধি পায়। অসৎ লোক ও চোরা ব্যবসায়ী ট্যাক্স ফাঁকি দেয় বলিয়া সৎলোকদের বেশি হারে কর দিতে হয়। ধরা যাক যে, সরকারকে আয়কর বসাইয়া দেড়শ কোটি টাকা রাজস্ব তুলিতে হইবে। সবাই যদি ঠিকমত আয়কর দিত অর্থাৎ তাহাদের সত্যিকারের আয়ের হিসাব দিত, তবে হয়ত টাকায় চার আনা হারে ট্যাক্স আদায় করিলেই সব রাজস্ব পাওয়া যাইত। কিন্তু বহু লোক ট্যাক্স ফাঁকি দিবার জন্য নিজের আয়ের ঠিক হিসাব দেয় না বা অনেক কম করিয়া দেয়। সেইজন্য যাহারা ঠিকমত আয়ের হিসাব দেয় তাহাদের উপর বেশি হারে অর্থাৎ হয়ত টাকায় পাঁচ আনা হারে ট্যাক্স বসাইতে হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে, যে সত্য কথা বলে তাহারই বিপদ—তাহার ঘাড়ে করের বোঝা বাড়িবে। আর যে মিথ্যা বলে সে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়া লাভ করিল। এই ব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গত নহে।

পরোক্ষ করের গুণাগুণ (Merits and demerits of indirect tax) : পরোক্ষ করের কয়েকটি গুণ আছে। আয়কর একটি প্রত্যক্ষ কর। প্রত্যেক লোকের আয়ের উপর কর বসাইতে অবশ্য তত্ত্বের দিক দিয়া বিশেষ বাধা নাই, কিন্তু ব্যয়ের কথা ভাবিলে ইহা করা সম্ভব হয় না। যাহাদের অল্প আয় (এবং অধিকাংশ লোকেরই আয় অল্প), তাহাদের উপর আয়কর অতি কম হারে ধরা হয় এবং প্রত্যেকে অতি কম কর দেয়। এত লোকের নিকট হইতে সামান্য সামান্য টাকা তুলিতে যে ব্যয় হয় সেই তুলনায় রাজস্ব কমই আদায় হয়। অল্প আয়ের লোকের উপর আয়কর বসান লাভজনক হয় না। কিন্তু সরকার সকলেরই যুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী ব্যয়নির্বাহের জন্য সামান্য হইলেও প্রত্যেকের উচিত কিছু অর্থ কর হিসাবে দেওয়া। প্রত্যক্ষ করে ইহা সম্ভব হয় না। কিন্তু পরোক্ষ কর বসাইয়া সকলের নিকট হইতেই রাজস্ব সংগ্রহ করা যায়। যেমন দিয়াশলাইএর উপর উৎপাদনশুল্ক বসাইয়া সকল লোকের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করা যায়। ইহাই পরোক্ষ করের সর্বাপেক্ষা বড় সুবিধা। দ্বিতীয় সুবিধা হইতেছে যে কর-

দাতারা সব সময়ে বুঝিতে পারে না যে, তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করা হইতেছে। পরোক্ষ কর বসাইলে জিনিসের দাম বাড়ে। কিন্তু জিনিস-পত্রের দাম নানা কারণে বাড়িতে পারে। সেইজন্য সাধারণ লোক কর দিবার কথা নাও জানিতে পারে। পার্টি গভর্ণমেণ্টের দিক দিয়া ইহা কিছুটা সুবিধাজনক। কারণ, আয়কর বা উত্তরাধিকারকর (অর্থাৎ প্রত্যক্ষকর) বসাইলে সরকার করদাতার নিকট যতখানি অপ্রিয় হয়, পরোক্ষ করে ইহার চেয়ে অনেক কম অপ্রিয় হইবে। অবশ্য এই সুবিধাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া ঠিক হইবে না। বরঞ্চ ইহার বিরুদ্ধে এই কথা বলা যায় যে, পরোক্ষ করে করদাতার রাজনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ হয় না। কারণ, কর দিবার সময় তাহারা বুঝিতে পারে না তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করা হইতেছে। সুতরাং সরকারী আয়-ব্যয় বৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে না।

পরোক্ষ করে করদাতারা কিছু সুবিধা পায়। আয়করে বা উত্তরাধিকার করে একসঙ্গে বেশি টাকা দিতে হয়। ইহা অনেক সময়েই অসুবিধাজনক হইতে পারে। কিন্তু পরোক্ষকর জিনিসপত্র কেনার সময় দিতে হয়। কাজেই ইহা সারা বৎসর ধরিয়া অল্প অল্প করিয়া দিতে হয়। এই করলব্ধ রাজস্ব স্থিতিস্থাপক হইতে পারে। অর্থাৎ অস্থিতিস্থাপক জিনিসের উপর কর বসাইলে বেশি রাজস্ব পাওয়া যায় ও প্রয়োজন হইলে করের হার বাড়াইয়া বেশি বেশি রাজস্ব সংগ্রহ করা যায়। লবণের উপর শুল্ক বসাইলে লবণের দাম বাড়িবে। কিন্তু ইহার চাহিদা অস্থিতিস্থাপক বলিয়া বিক্রয়ের পরিমাণ কমিবে না ও ফলে প্রয়োজনমত রাজস্ব সংগ্রহ করা যায়। ইচ্ছা হইলে শুল্কের হার দ্বিগুণ করিয়া প্রায় দ্বিগুণ রাজস্ব তোলা যায়। পরোক্ষ করের আর একটি সুবিধা আছে। মদ ইত্যাদি ক্ষতিকর জিনিসের উপর উচ্চহারে পরোক্ষ কর বসাইয়া একদিকে যেমন কিছু রাজস্ব সংগ্রহ করা যায়, আবার অন্যদিকে ইহাদের দাম অত্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া যায় যাহার ফলে মদ খাওয়া কমিয়া যাইবে। মদ তৈয়ারি ও খাওয়া একদম বন্ধ করা (prohibition) ঠিক সমীচীন হয় না। কারণ ইহা কার্যকরী রাখা খুবই শক্ত। কিন্তু উচ্চহারে পরোক্ষ কর বসাইয়া মদ খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

পরোক্ষ করের দোষ (Limitations of Indirect tax): কিন্তু পরোক্ষ করের প্রধান অসুবিধা হইতেছে এই যে, সাধারণত ইহার চাপ

গরিবের উপর যতখানি পড়ে ধনীর উপর সেই তুলনায় কম পড়ে। লবণের উপর কর বসাইলে লবণের দাম বাড়িবে। যে ১০০৲ টাকা রোজগার করে তাহার সংসারে যতটুকু লবণের দরকার হয়, ৫০০০৲ হাজার টাকা আয়ের লোকের সংসারেও হয়ত ততটুকুই লবণ কেনা হয়। দুইজনে প্রায় একই পরিমাণ লবণ কিনিবে বলিয়া একই পরিমাণ কর দিবে। বরং উল্টাও হইতে পারে। গরিবের উপর সাধারণত মা ষষ্ঠীর কৃপা বেশি বলিয়া তাহারও পরিবারে পোষ্যসংখ্যা হয়ত বেশি ও ফলে তাহাকে ধনী পরিবারের চেয়ে বেশি লবণ কিনিতে হয়; অর্থাৎ গরিবকে লবণকর হিসাবে বেশি টাকা দিতে হইতে পারে। ইহা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। প্রত্যক্ষ করের হার লোকের করদানক্ষমতা অনুযায়ী ঠিক করা যায়। কিন্তু পরোক্ষ করে ইহা করা চলে না। অবশ্য কোন কোন পরোক্ষ কর কিছুটা বর্ধমান হারে (progressive rate) ধার্য করা যায়। যেমন বিক্রয়করের বেলাতে করা যায়। সাধারণের নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের উপর এই কর না বসাইলে গরিব মধ্যবিত্তের উপর চাপ কমে। আবার বিলাসদ্রব্যের উপর উচ্চহারে বিক্রয়কর বসান যায়। যেমন, ধর, বিক্রয় করের সাধারণ হার যদি টাকায় পাঁচ নয়া পয়সা হয়, মোটর গাড়ি, রেডিও সেট, গহনা প্রভৃতি বিলাসদ্রব্যের উপর টাকায় দশ নয়া পয়সা, কি বার নয়া পয়সা হারে বিক্রয়কর বসান যায়, তাহা হইলে ধনীর নিকট বেশি হারে কর আদায় করা সম্ভব হয়। কিন্তু সব পরোক্ষ করে ইহা করা চলে না।

পরোক্ষ করের দ্বিতীয় অসুবিধা হইতেছে যে, এই কর হইতে বেশি রাজস্ব আদায় করিতে হইলে ইহা অস্থিতিস্থাপক চাহিদার জিনিসের উপর বসাইতে হইবে। সাধারণত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের (যেমন লবণের) চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়। অথচ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর কর বসাইলে ধনীর তুলনায় গরীব মধ্যবিত্তের উপর চাপ বেশি পড়ে। ইহা অন্যায়। এদিকে আবার অস্থিতিস্থাপক চাহিদার জিনিসের উপর কর না বসাইলে বেশি রাজস্ব পাওয়া যায় না। জিনিসের চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয়, তাহার উপর কর বসাইলে ইহার দাম বাড়িবে। দাম বাড়িলে চাহিদা কমিবে ও কম বিক্রয় হইবে। ফলে কম রাজস্ব পাওয়া যাইবে। সরকারের তাহাতে লোকসান হয়। সুতরাং সরকারকে হয় গরিব ও মধ্যবিত্তের উপর

বেশি করভার চাপাইতে হয়, নচেৎ কম রাজস্ব লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। পরোক্ষ করে সরকারকে এই উভয় সংকটে পড়িতে হয়।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোন জিনিসের উপর পরোক্ষ কর বসাইলে ইহার দাম করের চেয়েও বেশি বাড়ে। অর্থাৎ জিনিস প্রতি যে হারে কর বসান হয় জিনিসটির দাম ইহার চেয়ে বেশি বাড়ে। ধরা যাক যে, সিগারেটের প্যাকেটের বর্তমান দাম ৫৬ নয়া পয়সা। সরকার উহার উপর নয় নয়া পয়সা ট্যাক্স বসাইল। ইহার ফলে প্যাকেটের দাম বাড়িয়া ৬৫ নয়া পয়সা হইল। এই দাম বাড়ার জন্য খরিদ্দারের (বা করদাতার) লোকসান হইল। কিন্তু সরকারের রাজস্ব একই রহিল। শুধু ব্যবসায়ীদের পকেট ভর্তি করা হইল। কোন কোন পরোক্ষ করের আদায়কারীর খরচ বেশি পড়িয়া যায়। লাভের গুড় পিঁপড়ে খাইয়া যায়।

পরোক্ষকর ও আর্থিক উন্নতি (Indirect taxes and economic development): এই সমস্ত দোষের জন্য অধিকাংশ লেখকই পরোক্ষ-করের সমর্থন করেন না। অধিকাংশ লেখকের মত যে পরোক্ষকরের উপর যত কম সম্ভব নির্ভর করা উচিত এবং রাজস্বের বেশি অংশ প্রত্যক্ষ কর বসাইয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু বর্তমানে এই মনের বিরুদ্ধে কিছুটা প্রতিক্রিয়া (reaction) দেখা দিয়াছে। প্রত্যক্ষ করের অনেক গুণ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমানে সরকারের রাজস্বের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। তাই প্রত্যক্ষ কর বসাইয়া রাজস্ব তুলিতে গেলে খুব উচ্চহারে কর বসাইতে হয়। আয়কর খুব বেশি উচ্চহারে বসাইলে লোকের কাজকর্মের ইচ্ছা ও সঞ্চয়ের পরিমাণ কমিয়া যায়। ইহাতে দেশের ক্ষতি হয়। সেইজন্য বাধ্য হইয়া পরোক্ষ করের শরণাপন্ন লইতে হয়। যেমন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে হইলে বহু রাজস্বের প্রয়োজন। ইহার সবটাই প্রত্যক্ষকর বসাইয়া তুলিতে গেলে আয়করের হার অত্যন্ত বাড়াইতে হইবে। উচ্চ আয়ের উপর এখনই এত বেশি হারে কর আছে, ইহার উপর আরো বোঝা চাপাইলে ধনী উটের পিঠ হয়ত ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। যেখানে টাকা প্রতি ৮৭ নয়া পয়সা হারে আয়কর ধার্য করা আছে অর্থাৎ আর একটি টাকা রোজগার করিলে তাহা হইতে সরকারকে ৮৭ নয়া পয়সা ট্যাক্স দিতে হইবে—সেখানে আর করের বোঝা বাড়ান চলে না। ইহার ফলে কর্মের

ইচ্ছা ও সঞ্চয়ের পরিমাণ যদি বেশি হারে কমে তবে পরিকল্পনা কার্যকরী করা যাইবে না। কাজেই প্রয়োজনীয় রাজস্ব পরোক্ষ কর বসাইয়া যতটা সম্ভব তুলিতে হইবে। আর একটি বিষয়ও ভাবিবার আছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কাজে ধনীদরিদ্র সকলেরই অংশ গ্রহণ করা উচিত। ধনীর সামর্থ্য বেশি। সুতরাং সে বেশি টাকা দিবে। কিন্তু দরিদ্রের সামর্থ্য অতি ক্ষুদ্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাকে এই মহৎ কাজে অংশ গ্রহণ করিতে ডাকিতে হইবে। ধনীর নিকট হইতেই ভাল চাল, ঘি, তেল সমস্তই সংগ্রহ করিতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া দরিদ্রের খুদকুড়া বাদ দিলে তাহাকে অসম্মান দেখান হইবে। কাজেই আর্থিক উন্নতির জন্য উপযুক্ত মূলধন সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে শুধু প্রত্যক্ষ কর নহে, পরোক্ষ করও বসাইতে হইবে।

করভার সম্পর্কে সাধারণ নীতি (General principles governing incidence of taxes): করভার সম্পর্কে দুইটি সাধারণ নিয়ম বলা যায়। প্রথমত, জিনিসের চাহিদা যত বেশি স্থিতিস্থাপক হয়, করভার ততই বিক্রেতার উপর পড়ার সম্ভাবনা বেশি। দ্বিতীয়ত, জিনিসের সরবরাহ যত বেশি স্থিতিস্থাপক হয়, করভার ততই ক্রেতার উপর পড়ার সম্ভাবনা বেশি। চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও বিক্রয় কমে না; সুতরাং করভার ক্রেতারা বহন করে। কিন্তু স্থিতিস্থাপক চাহিদার বেলায় মূল্যবৃদ্ধি হইলেই বিক্রয় কমিয়া যায়। ফলে করভার বিক্রেতার উপর পড়ে। তেমনি আবার সরবরাহ স্থিতিস্থাপক হইলে বিক্রেতারা সরবরাহ কমাইয়া দাম বাড়ায় এবং ক্রেতার উপর করভার চাপাইবার চেষ্টা করে। বিক্রেতারা সরবরাহ কমাইয়া এবং ক্রেতারা চাহিদা কমাইয়া করভার অন্যের উপর ফেলিতে চেষ্টা করে। চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর শেষ ফল নির্ভর করে। সরবরাহের স্থিতিস্থাপকতা হিসাব করিতে গেলে সময়ের কথাও ধরিতে হইবে। অল্পকালে সরবরাহ সাধারণত অস্থিতিস্থাপক, কিন্তু দীর্ঘকালে ইহা স্থিতিস্থাপক হইবার সম্ভাবনা বেশি। সুতরাং অল্পকালে করভার বিক্রেতার উপর পড়িলেও দীর্ঘকালে ক্রেতার উপর পড়িতে পারে। সুতরাং কোন জিনিসের উপর কর ধার্য করা হইলে দেখিতে হইবে,—ইহার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কিরূপ ও দ্বিতীয়ত, ইহার

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বেশি না কম। স্থিতিস্থাপক চাহিদা ও অস্থিতিস্থাপক যোগান হইলে করের ভার প্রায় সম্পূর্ণ ই বিক্রেতা বা উৎপাদকের স্কন্ধে পড়িবে। আবার অস্থিতিস্থাপক চাহিদা ও স্থিতিস্থাপক যোগান হইলে ক্রেতাকেই সব বোঝা বহিতে হইবে।

পণ্যকরের ভার (Incidence of a commodity tax): পণ্যকরের ভার সাধারণ সূত্র অনুসারে অর্থাৎ জিনিসটির চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। ইহা ছাড়া অন্য কয়েকটি বিষয়েও আলোচনা করা যাইতে পারে।

বিক্রেতা অথবা উৎপাদক প্রথমে কর দেয়; পরে দাম বাড়াইয়া ক্রেতার নিকট হইতে সে কর আদায় করে। কিন্তু সে চেষ্টা কতটা সফল হইবে তাহা চাহিদা ও সরবরাহের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে।

উৎপাদন বাড়ান কমান সত্ত্বেও গড়পড়তা উৎপাদনব্যয় যদি সমান থাকে, তবে যতটা কর বাড়িয়াছে দামও ততটা বাড়িবে। কিন্তু হ্রাসমান নিয়ম অনুসারে উৎপাদন হইলে কর যত বাড়িয়াছে, দাম ইহার চেয়ে কম বাড়িবে। ধর, ১০,০০০টি জিনিস তৈয়ারি হয় ও প্রত্যেক জিনিসের খরচ ৫৲ টাকা পড়ে। এক টাকা করিয়া কর বসাইলে প্রথমে দাম ৬৲ টাকা হইবে। কিন্তু দাম বাড়িলে চাহিদা কমিয়া ৯০০০ হইল। উৎপাদন কমিলে খরচ কমিয়া গড়পড়তা ৪·৫০ নয়া পয়সা হইবে এবং কর সহ দাম ৫·৫০ নয়া পয়সা হইবে, অর্থাৎ করের চেয়ে দাম কম বাড়িবে। আবার বর্ধমান নিয়ম অনুসারে উৎপাদন হইলে কর যত বাড়ে দাম ইহার চেয়ে বেশি বাড়ে। কারণ দাম বাড়িলে চাহিদা কমে ও উৎপাদন কমিলে উৎপাদনব্যয় বাড়িবে। ফলে জিনিসের দাম আরও বাড়িয়া যাইবে। তাই বলা হয় যে হ্রাসমান নিয়ম অনুসারে উৎপাদিত জিনিসের উপর কর ধার্য করা এবং বর্ধমান নিয়ম অনুসারে উৎপাদিত জিনিসের উদ্যোক্তাকে অর্থ সাহায্য করা উচিত।

জমি এবং বাড়ির উপর করের ভার (Incidence of a tax on land and buildings): খাজনার উপর করের ভার জমির মালিকের উপর পড়ে। খাজনা ব্যয়ের উদ্বৃত্ত। যে কর উদ্বৃত্ত হইতে দেওয়া হয় তাহা রায়তের উপর চালান যায় না, কারণ স্বাভাবিক আয়ের চেয়ে সে

কিছু উদ্বৃত্ত পায় না। অবশ্য জমির মালিক যদি পুরা (অর্থনৈতিক) খাজনা আদায় না করে, তবে সে রায়তের ঘাড়ে করের ভার চাপাইতে পারে। কিন্তু ধর, শুধু পাটের জমির উপর কর বসান হইল। লোকে পাটের চাষ ছাড়িয়া ধান চাষ করিবে। পাটের সরবরাহ কমিয়া দাম বাড়িবে। অতএব পাট ক্রেতাদের ঘাড়ে করভার পড়িবে।

বাড়ির উপর করের ভার নির্ণয় করা শক্ত। করভার শুধু যে মালিকের উপর পড়ে তাহা নয়, ভাড়াটিয়া অথবা মিস্ত্রীর উপরও পড়ে।

বাড়ির চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে ভাড়াটিয়াদের উপর করভার পড়ে। বাড়ির চাহিদা যদি কম হয়, তবে মালিকেরা সে ভার বহন করে। কিন্তু এক্ষেত্রে মালিকেরা আর নূতন বাড়ি তৈয়ারি করে না। নূতন বাড়ি তৈয়ারি কম হইলে মজুর মিস্ত্রীদের কাজ কম হইবে ও বেতনের হার হয়ত কমিয়া যাইবে, কিংবা তাহাদের হয়ত বেশি সময় বেকার থাকিতে হইবে। অর্থাৎ করের কিছু ভার তাহাদের উপরেও আসিয়া পড়ে।

একচেটিয়া কারবারের উপর করভার (Incidence of a tax on monopoly): একচেটিয়া কারবারী সর্বাধিক লাভ করার জন্য এত বেশি পরিমাণ জিনিস তৈয়ারি করে যে তাহার প্রান্তিক আয় ও ব্যয় সমান হয়। লাভের উপর একটি মোটা টাকা (lump sum) কর হিসাবে বসান হইলে সে দাম বাড়াইতে পারে না। কারণ কর দেওয়ার আগে যে দামে সর্বাধিক লাভ হয়, কর দেওয়ার পরেও সেই দামেই তাহার সর্বাধিক লাভ হইবে। অতএব একচেটিয়া কারবারীর ঘাড়েই করের সম্পূর্ণ বোঝা পড়িবে। তারপর ধর, বর্ধমান হারে আয়-কর বসান হইল। এক্ষেত্রেও একচেটিয়া কারবারী করের সম্পূর্ণ ভার বহন করিবে। যদি উৎপাদনের উপর কর বসান হয় তবে তাহার প্রান্তিক ব্যয় বাড়িবে। প্রান্তিক আয়কে প্রান্তিক ব্যয়ের সমান করিতে হইলে দাম বাড়াইতে হইবে। কিন্তু কতটা দাম বাড়িবে তাহা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করিবে।

আমদানি ও রপ্তানিশুল্কের ভার (Incidence of export and import duty): পরস্পরের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অনুসারে আমদানি ও রপ্তানিশুল্কের ভার দুইটি দেশের মধ্যে ভাগ করা যায়। ভারতীয়

জিনিসের জন্য ইংলণ্ডের চাহিদা যদি বেশি হয় এবং ইংলণ্ডের জিনিসের জন্য যদি ভারতীয়দের চাহিদা কম থাকে, তবে ইংলণ্ডের ক্রেতারা রপ্তানিশুল্কের ভার বহন করিবে।

আমদানিশুল্কের ভার দেশ এবং বিদেশের সরবরাহ ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অনুসারে নির্ণীত হয়। পণ্যের সরবরাহ যদি স্থিতিস্থাপক হয় তবে যে দেশ শুল্ক বসাইয়াছে সে দেশে দাম কম বাড়িবে এবং শুল্কের ভার বিদেশীদের উপর পড়িবে। দাম বাড়ার ফলে যদি দেশীয় উৎপাদন বাড়ে, তবে দেশে দাম বাড়িবে এবং বিদেশে বেশি কমিবে। তেমনি বিদেশী সরবরাহের স্থিতিস্থাপকতা যদি কম হয়, তবে যে দেশে শুল্ক বসাইয়াছে সেখানে দাম কম বাড়িবে। যদি বিদেশী উৎপাদক উৎপাদন কমাইতে না পারে বা অন্য বাজার না পায়, তবে সে কমদামে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইবে। তৃতীয়ত, দেশের মধ্যে জিনিসটির চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয়, তবে সে দেশে দাম কম বাড়িবে। পরন্তু বিদেশী চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয়, তবে যে দেশ আমদানি করে সে দেশে দাম বেশি বাড়ে।

প্রথমে মনে হয় যে, আমদানি শুল্কের ভার দেশীয় ক্রেতারা বহন করে। কারণ যে ব্যবসায়ী পণ্য আমদানি করিতেছে সে স্বাভাবিক লাভ করিতেছে। যদি করভার তাহাদের উপর চাপান হয় তবে, সে অন্য ব্যবসায়ে চলিয়া যাইবে। তখন জিনিসের সরবরাহ কমিয়া যাইবে এবং দাম বাড়িবে। অতএব সাধারণত আমদানিশুল্কের ভার ক্রেতাদের উপর পড়ে। কিন্তু কোন কোন সময়ে বিদেশীরাও আমদানিশুল্কের ভার বহন করিতে বাধ্য হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, দেশীয় সরবরাহ যদি খুব স্থিতিস্থাপক হয় এবং বিদেশী সরবরাহ যদি অস্থিতিস্থাপক হয় অথবা দেশী চাহিদা যদি খুব স্থিতিস্থাপক হয় এবং বিদেশী চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে যে দেশ শুল্ক বসায় সে দেশে দাম কম বাড়ে। এ সব ক্ষেত্রে বিদেশী উৎপাদকের উপর করভার পড়ে। তেমনি আমদানিকৃত পণ্য যদি বিদেশী উৎপাদনের বৃহৎ অংশ হয় এবং আমদানিকারা দেশের উৎপাদনের তুলনায় কম হয়, তবে করভার বিদেশীর উপর পড়ে।

তেমনি যে দেশ কাঁচামাল রপ্তানি করে, এবং শিল্পজাত মাল আমদানি করে, সে দেশ বিদেশীদের ঘাড়ে শুল্কের ভার চাপাইতে পারে। কারণ

কাঁচামালের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক অথচ শিল্পজাত মালের চাহিদা স্থিতিস্থাপক। কিন্তু বিদেশীর যদি অন্য বাজার থাকে অথবা সরবরাহের অন্য উৎস থাকে, তবে করভার তাহার উপর পড়ে না।

Exercises

Q. 1. Write short notes on the shifting and incidence of taxation. (C. U. B. Com. 1958, 1957 ; B.A. 1956).

Q. 2. Examine the limitations of raising revenue by indirect taxes. (C. U. 1952).

Q. 3. Examine the case for the imposition of income tax and death duty (*i.e.*, Direct taxation). (Viswa. 1957).

একচত্বারিংশ অধ্যায়

করের ফলাফল

(Effects of Particular taxes)

করের ফলাফল (Effects of a tax) : করের ভার এবং ফলাফলের মধ্যে পার্থক্য আছে। করের আর্থিক ভার অর্থাৎ করের টাকা শেষ পর্যন্ত কে বহন করে ইহাই করভার অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু করের ফলাফল আলোচনা করিতে গেলে উৎপাদন বণ্টন, সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও শক্তির উপর করের প্রভাব কি ইহা আলোচনা করিতে হয়। করের ফল আলোচনার সময় প্রধানত তিনটি বিষয় লক্ষ্য করা হয়। কর বসাইবার পরে লোকের (১) কাজ ও সঞ্চয় করার ইচ্ছা (২) কাজ ও সঞ্চয় করার সামর্থ্য, (৩) উৎপাদন উপকরণের বণ্টনব্যবস্থা কি ভাবে প্রভাবান্বিত হয়।

আয়কর (Income tax) : আজকাল প্রায় সর্বত্রই আয়করের গুরুত্ব বাড়িতেছে। প্রত্যেক লোকের আয়ের পরিমাণ অনুযায়ী এই কর ধার্য করা হয়। তবে এই সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম মানা হয়। প্রথমত, লোকের আয় একটি নিম্নতম আয়ের বেশি হইলেই তবেই তাহাকে আয়কর দিতে হয়। ভারতবর্ষে বর্তমানে যাহাদের বাৎসরিক আয় ৩০০০৲ টাকার কম অর্থাৎ যাহারা প্রতি মাসে ২৫০৲ টাকার কম রোজগার করে তাহাদের আয়কর দিতে হয় না। ইহার বেশি আয় করিলে তবেই আয়কর দিতে হইবে। সর্বনিম্ন আয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাণে ঠিক করা হয়। যেমন যুদ্ধের পূর্বে বাৎসরিক আয় ২০০০৲ টাকার কম হইলে আয়কর দিতে হইত না। সর্বনিম্ন আয় বাদ দিবার দুইটি কারণ আছে। প্রথমত, যাহারা এই পর্যন্ত আয় করে তাহাদের আয়ের প্রায় সমস্ত অর্থই সাধারণ জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিতে ব্যয় হয়। এই আয়ের লোকের হাতে এমন কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না যাহার উপর কর বসান ঠিক হইবে। দ্বিতীয়ত, যাহাদের আয় ইহারও কম, তাহাদের উপর কর বসাইতে হইলে করের হার খুবই কম রাখিতে হইবে। সুতরাং ইহারা প্রত্যেকে খুব কম কর দিবে এবং সে কর আদায় করার ব্যয় বেশি পড়িয়া যাইবে।

আয়কর বর্ধমান হারে ধার্য করা হয়। অর্থাৎ আয় বেশি হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে করের হার বাড়ান হয়। অর্থাৎ যাহাদের আয় বৎসরে ৫০০০৲ টাকা তাহাদের উপর টাকায় ৭ নয়া পয়সা হিসাবে কর বসান হইল। আবার যাহারা বৎসরে ৭৫০০৲ টাকা আয় করে তাহাদের টাকায় ১২ নয়া পয়সা হারে, যাহারা বৎসরে ১০,০০০৲ টাকা রোজগার করে তাহাদের টাকায় ১৮ নয়া পয়সা হারে কর দিতে হয়। এইভাবে আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে করের হার বৃদ্ধি হয়।

অনেক সময়ে একটু বেশি আয় হইলে আয়ের উপর সুপারট্যাক্স বা অতিরিক্ত কর বসান হয়। যাহার বাৎসরিক আয় ২০,০০০৲ টাকার বেশি তাহাকে সাধারণ হারে ধার্য আয়কর দিতেই হয়। ইহা ছাড়া তাহাকে সুপারট্যাক্স দিতে হয়। বর্তমানে যাহাদের বাৎসরিক আয় কুড়ি হাজার হইতে পঁচিশ হাজার টাকার মধ্যে তাহাদের টাকায় ছয় নয়া পয়সা হারে সুপারট্যাক্স দিতে হয়। যাহারা ২৫,০০০৲ টাকা হইতে ৪০,০০০৲ টাকা পর্যন্ত আয় করে, তাহাদের টাকা প্রতি ১৯ নয়া পয়সা সুপারট্যাক্স দিতে হয়। আয় বাড়িবার সঙ্গে সুপারট্যাক্সের হারও বাড়ে।

আয়কর বসাইবার সময় অন্য নীতিও অবলম্বন করা হয়। যেমন করদাতা বিবাহিত না অবিবাহিত তাহা দেখা হয়। বিবাহিতের উপর একটু কম হারে ও অবিবাহিতের উপর একটু বেশি হারে কর বসান হয়। দ্বিতীয়ত, করদাতার কয়টি সন্তান তাহারও হিসাব দেখা হয়। যাহারা নিঃসন্তান তাহাদের পুরাপুরি আয়কর দিতে হয়। যাহাদের ছেলেমেয়ে আছে তাহাদের ট্যাক্স হইতে কিছু রিবেট বা বাদ দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, যাহারা জীবনবীমা করিয়াছে তাহাদের এইজন্য যে প্রিমিয়াম দিতে হয় তাহার উপর আয়কর দিতে হয় না।

আয়করের ফলাফল (Effects of income tax): আয়কর ধার্য করা হইলে ইহা দেশের অর্থনৈতিক সংস্থাকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করে? আয়করের ফলাফলকে তিন দিক দিয়া বিচার করা যায়।

প্রথম, ইহার ফলে কাজ ও সঞ্চয় করার সামর্থ্য কতটুকু কমে? যাহারা আয়কর দেয় তাহাদের সঞ্চয় ক্ষমতা কমে সন্দেহ নাই। কর দিবার ফলে তাহাদের আয় কমে ও তদনুযায়ী ব্যয় না কমাইলে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমিতে

বাধ্য। সাধারণত অপেক্ষাকৃত বড় লোকেরাই সঞ্চয় করে। কিন্তু তাহাদের উপরেই আবার উচ্চহারে আয়কর বসান হয়। কাজেই সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমিবার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু আয়করের রাজস্ব সরকার যদি কোম্পানীর কাগজের সুদ দিবার জন্য ব্যয় করে, তবে এই কাগজগুলির মালিকের সঞ্চয় ক্ষমতা বাড়িবে। ইহারা সাধারণত বড লোক। সুতরাং ইহাদের সুদের অধিকাংশই সঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। মূলধন বিনিয়োগের জন্য সঞ্চয় করা হয়। আয়কর দেওয়ার ফলে ধনীদের সঞ্চয় কমিতে পারে। কিন্তু আয়করলব্ধ অর্থ সরকার যদি নানাভাবে শিল্পপ্রসারের কার্যে ব্যয় করে তবে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ নাও কমিতে পারে। করদাতার সঞ্চয় কমিবে, কিন্তু সরকারের সঞ্চয় বাড়িবে। সুতরাং মোট সঞ্চয় নাও কমিতে পারে।

আয়করের প্রভাবে কাজের সামর্থ্য যে কমিবে তাহা মনে হয় না। প্রথমত, নিম্ন আয়ের উপর এই কর বসান হয় না। কাজেই আয়কর দিবার জন্য কাহারও আয় এত কমে না যে তাহার জীবনধারণের মান খুব বেশি নামিয়া যায়। অর্থাৎ আয়কর দিবার ফলে কাহারও এমন অবস্থা হয় না যে, সে জীবনধারণের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিতে পারে না। জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীর ডিরেক্টারদেরও কর্মক্ষমতা কমিবার কোন কারণ নাই।

দ্বিতীয়ত, আয়করের ফলে লোকের কর্ম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা কমে কি? অনেকের মতে আয়কর বর্তমানে যে হারে বসান হইয়াছে ইহার ফলে কর্ম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা কমিযা যায়। যে টাকার উপর শতকরা ৮৭ নয়া পয়সা কর দিতে হয় সে টাকা রোজগারের জন্য পরিশ্রম করিয়া লাভ কি হয়? প্রায় সবই ত সরকার কর বাবদ লইয়া যায়। কাজেই মনে হয় যে ধনীরা আর বেশি কাজ করিতে চাহিবে না। তাহাদের সঞ্চয়ের ইচ্ছাও কমিবে। কিন্তু এ বিষয় এত সহজে নিষ্পত্তি করা চলে না। কারণ, যাহারা অতিধনী, অনেক সময়েই তাহাদের এমন অবস্থা থাকে যে কোন চেষ্টা না করিযাও আয় বাড়িয়া চলে। জলেই জল বাঁধে। তাহাদের বেলায় বেশি টাকা রোজগারের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন প্রশ্ন উঠে না। আর যাহারা বৃদ্ধ বয়সের সংস্থানের জন্য কিংবা ছেলেমেয়েদের জন্য বেশ কিছু টাকা জমাইতে চাহে, আয়করের ফলে তাহাদের কর্ম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা বাড়িবে। কারণ আয়করের ফলে আয়

কমিবে। সুতরাং বেশি পরিশ্রম করিয়া আরো বেশি রোজগার না করিলে ও আরো বেশি টাকা না জমাইলে ভবিষ্যতের আয় বজায় রাখা যাইবে না। একজন লোক ঠিক করিল যে, সে এমন টাকা জমাইবে যাহা হইতে বৃদ্ধ বয়সে প্রতি মাসে অন্তত ৪০০৲ টাকা আয় করা যাইবে। ধরা যাক, যে সুদের হার চার টাকা। তবে বৎসরে ৪৮০০৲ টাকা আয় করিতে হইলে তাহাকে মোট ১১,২০,০০০৲ টাকা জমাইতে হইবে। কিন্তু তাহাকে যদি এই আয়ের উপর আয়কর দিতে হয় তবে নীট ৪৮০০৲ টাকা আয় বজায় রাখিতে হইলে তাহাকে আরো বেশি টাকা জমাইতে হইবে। ৫০০০৲ টাকা আয়ের উপর যদি ২০০৲ টাকা আয়কর দিতে হয়, তবে কর দিবার পর তাহার থাকে ৪৮০০৲ টাকা। সুতরাং তাহাকে এমন টাকা জমাইতে হইবে যাহা হইতে অন্তত ৫০০০৲ টাকা আয় হয়। সুদের হার ৪৲ টাকা থাকিলে তাহাকে মোট ১,২৫,০০০৲ টাকা জমাইতে হইবে। ইহার জন্য তাহাকে নিশ্চয়ই আরো বেশি রোজগারের চেষ্টা করিতে হইবে। অর্থাৎ এইরূপক্ষেত্রে আয়করের ফলে কর্ম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আয়কর দিবার জন্য একদিকে যেমন কর্ম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা কমিতে পারে, আবার অন্যদিকে তাহা বাড়িতেও পারে। এই দুইটি প্রবণতার মধ্যে কোনটি কোন সময়ে বলবৎ হইবে তাহা পূর্ব হইতে নিশ্চিত বলা যায় না।

এই সঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। পুরাতন ব্যথা অনেক সময়েই গাসহা হইয়া যায়। সেইরূপ অনেকদিন ধরিয়া লোকেরা আয়কর দিতে অভ্যস্ত হইয়া গেলে করের বোঝা আর আগের মত ভারী মনে হয় না। যাহারা ৫৲ টাকা চালের মণ দেখিয়া আসিতেছে তাহাদের নিকট ২০৲ টাকা দর অসহ্য মনে হইবে। কিন্তু যাহারা শিশুকাল হইতেই ২০৲ টাকা মণ দাম দেখিতে অভ্যস্ত, তাহাদের নিকট চালের এই দাম ততটা অসহ্য মনে হয় না। কাজেই উচ্চহারে আয়কর বসান হইলে প্রথম প্রথম যতটা reaction বা ক্ষতিকর প্রভাব পাইতে পারে, কয়েক বৎসর পরে আর হয়ত ততটা নাও থাকিতে পারে। সব ব্যথাই পরে গাসহা হইয়া যায় এবং লোকে তাহা লইয়াই হাসিমুখে কাজ করিয়া যায়।

তৃতীয়ত, আয়করের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ কি কমিয়া যাইবে?

এই প্রশ্নের উত্তর পূর্বের দুইটি প্রশ্নের উত্তর হইতে অনেকটা জানা যায়। যদি মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ না কমে বা সঞ্চয় ও কর্মের ইচ্ছা না কমে, তবে উৎপাদনের পরিমাণ কমিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু যদি সঞ্চয় ও কর্মের ইচ্ছা কমিয়া যায় তবে ভবিষ্যতে এবং হয়ত অদূর ভবিষ্যতেই উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। অবশ্য আমরা দেখিয়াছি যে এবিষয়ে নির্দিষ্ট কোন মতামত দেওয়া শক্ত; আয়করের ফলে যদি উৎপাদন কিছু কমেও তবে এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে প্রয়োজনীয় রাজস্ব তুলিবার জন্য সরকারকে আয়করের পরিবর্তে অন্য কর বসাইতে হইবে। উৎপাদনকর কিংবা বিক্রয়কর বসান হইলেও জিনিসপত্রের দাম বাড়িবে। ইহাদের চাহিদা কমিবে ও ফলে উৎপাদন কমিবে। আর এই সমস্ত পরোক্ষ করের ফলে দরিদ্রদের উপর করের ভার বেশি মাত্রায় পড়িবে ও ধনীরা অপেক্ষাকৃত কম দর দিবে। ইহারও অনেক কুফল আছে। আয়করলব্ধ রাজস্ব সরকার যদি দেশের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্যের উন্নতি প্রভৃতি জনহিতকর কার্যে ব্যয় করে, তবে দরিদ্রদের কর্মদক্ষতা বাড়িবে। ইহার ফলেও উৎপাদন বাড়িতে পারে। উচ্চ হারে আয়কর দিতে হয় বলিয়া ধনীদের বিলাস ব্যয় কমাইতে হয়। সুতরাং বিলাস দ্রব্যের চাহিদা কমে। আবার সেই রাজস্ব দরিদ্রদের জন্য ব্যয় হয় ও ফলে তাহাদের নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের চাহিদা বাড়ে। সাধারণত বিলাস দ্রব্য প্রস্তুত করার কাজে ঝুঁকি বেশি ও নিত্য ব্যবহার্য জিনিস প্রস্তুতের কাজেও ঝুঁকি কম। সুতরাং বেশি ঝুঁকির ব্যবসায় কমে ও কম ঝুঁকির ব্যবসায় বাড়ে। ইহার ফলে উদ্যোক্তাদের লাভ হয়। কারণ ব্যবসায়ে ঝুঁকি কমিলে সকলেরই লাভ বাড়ে।

উত্তরাধিকার কর বা মৃতসম্পত্তি কর (Inheritance Tax or Death Duty): আয়কর একটি প্রত্যক্ষ কর। দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ কর হইতেছে উত্তরাধিকার কর (Inheritance Tax) বা মৃতসম্পত্তি কর (Death Duty or Estate Duty)। কোন লোক মরিবার পর তাহার সম্পত্তির উপর এই কর বসান হয়। আয়করের সহিত ইহার দুইটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। প্রথমত আয়করের বেলাতে যেমন একটি নিম্নতম আয় আছে যাহার উপর কর বসান হয় না, তেমনি মৃতসম্পত্তিকরের বেলাতেও একটি নিম্নতন পরিমাণের সম্পত্তির উপর কোন কর বসান হয় না।

আমাদের দেশে বর্তমানে এস্টেট্ ডিউটি আইন অনুযায়ী যাঁহারা এক লাখ টাকার কম সম্পত্তি রাখিয়া যান, তাঁহাদের সম্পত্তির উপর কোন কর বসান হয় না। এক লাখ কিংবা ততোধিক টাকার সম্পত্তি থাকিলে তবেই এই কর ধার্য হয়। দ্বিতীয়ত, আয়করের ন্যায় ইহাও বর্ধমান হারে বসান হয়। তেমনি বর্তমানে যাহাদের মোট সম্পত্তির মূল্য এক লাখ টাকা, তাহাদের পাঁচ পারসেণ্ট কর বাবদ দিতে হয়। আবার যাহাদের সম্পত্তির মূল্য দুই লাখ টাকা তাহাদের সম্পত্তির উপর দশ পারসেণ্ট ট্যাক্স ধরা হয়। পাঁচ লাখ টাকার সম্পত্তি থাকিলে শতকরা পনের টাকা হারে ট্যাক্স দিতে হইত না। কিন্তু আয়করের সহিত ইহার প্রধান পার্থক্য এই যে আয়কর শুধু আয়ের উপর ধার্য হয়। কিন্তু উত্তরাধিকার কর মৃতব্যক্তির আয়ের উপর নহে, সমস্ত সম্পত্তির উপর ধার্য করা হয়। সম্পত্তি বলিতে বাড়ি-ঘর, জমি-জমা, কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার, এমন কি গহনা, আসবাবপত্র, মূল্যবান ছবি প্রভৃতির দামও ধরা হয়।

এই কর সাধারণত মৃতব্যক্তির মোট সম্পত্তির পরিমাণের উপর বর্ধমান হারে ধার্য করা হয়। আবার অনেক সময়ে মৃতব্যক্তির সহিত উত্তরাধিকারীর কি সম্পর্ক এই অনুসারেও করের হার বেশি-কম করা হয়। উত্তরাধিকারী যদি মৃতব্যক্তির সন্তান হয়, তবে সেই সম্পত্তির উপর যে হারে কর বসান হয় উত্তরাধিকারী দূর সম্পর্কের লোক (যেমন ভাইপো কি ভাগ্নে ইত্যাদি) হইলে করের হার ইহার চেয়ে বেশি নির্দিষ্ট করা থাকে। অর্থাৎ সম্পর্ক যত দূরের হইবে করের হার তত বেশি ধরা হইবে। ছেলেকে যদি শতকরা ১০৲ টাকা হারে কর দিতে হয়, ভাগ্নেকে সেখানে হয়ত শতকরা ১৯৲ টাকা হারে কর দিতে হইবে—অবশ্য ভাগ্নে যদি মামার সম্পত্তি পায়।

এই করের ফলাফল (Effects of the Death Duty) : এই কর বসাইলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও ক্ষমতা এবং কাজ করিবার ইচ্ছা কমিয়া যায় কি? ইহা বুঝিতে হইলে প্রথমে এই করের ভার কাহার উপর পড়ে তাহা জানা প্রয়োজন। এই কর উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে আদায় করা হয়। সুতরাং সাধারণত ইহার বোঝা উত্তরাধিকারীকেই বহন করিতে হয়। মৃতব্যক্তির উপর এই করের বোঝা চাপে না। তবে মৃতব্যক্তি যদি হিসাব করে যে সে যত টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যাইবে তাহার উপর ছেলেদের

প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা উত্তরাধিকার কর দিতে হইবে এবং ছেলেদের যাহাতে অসুবিধা না হয় সেইজন্য সে এই উদ্দেশ্যে আরো ৫০ হাজার টাকার জীবনবীমা করিল। তাহা হইলে তাহার মৃত্যুর পর ছেলেরা জীবনবীমা কোম্পানীর নিকট হইতে ৫০ হাজার টাকা পাইবে ও ইহা উত্তরাধিকার কর বাবদ সরকারকে দিয়া অন্য সম্পত্তি খালাস করিয়া লইতে পারে। মৃতব্যক্তি জীবদ্দশাতে এই জীবনবীমার জন্য প্রতিবৎসর প্রিমিয়াম দিয়া যান বলিয়া এই করের ভার তাহার উপর গিয়া পড়িল। উত্তরাধিকারীরা কর বাবদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিল বটে, তবে এই করের বোঝা তাহাদের বহন করিতে হইল না।

এই করেব জন্য দরিদ্র সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের কিছু আসে যায় না। কারণ ইহারা এত মূল্যের সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারে না যাহার উপর কর ধার্য করা হইয়া থাকে। এদেশে লাখ টাকার সম্পত্তি খুব কম লোকই রাখিয়া যায়। বাকি যাহাদের এই কর দিতে হয় তাহাদের সঞ্চয়ের ক্ষমতা অবশ্য কমিয়া যায়। তাহাদের হাতে এই টাকা থাকিলে তাহারা হয়ত বেশি সঞ্চয় করিতে পারিত। কিন্তু একথা শুধু উত্তবাধিকার করের বেলাতে নহে, অন্য সব করের বেলাতেও খাটে। এই সমস্ত কর দিতে হয় বলিয়াও করদাতার সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমিয়া যায়। সুতরাং সেই হিসাবে উত্তরাধিকার কর ও অন্য করের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই স্বীকার করিতে হইবে। উত্তরাধিকার করের ভার সাধারণত মৃতব্যক্তিকে বহন করিতে হয় না। সেইজন্য তাহার সঞ্চয়ের ক্ষমতা ইহার দ্বারা কমে না। উত্তরাধিকারীর সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার সঞ্চয়ের ইচ্ছা ইহার ফলে বাড়িতে পারে। পিতার সম্পত্তির কিছু অংশ কর দিবার জন্য চলিয়া যাইতেছে বলিয়া সে হয়ত বেশি পরিশ্রম বা হিসাব করিয়া টাকা জমাইবে এবং এইভাবে সম্পত্তির অংশ পূরণ করিবার চেষ্টা করিবে। বাপের টাকা হাতে আসিবার সম্ভাবনা থাকিলে অনেকে আলস্যে জীবনযাপন করিতে পারে। কিন্তু উত্তরাধিকার কর বাবদ সরকার যদি এই সম্পত্তির মোটা অংশ হস্তগত করে, তবে আলস্য ত্যাগ করিয়া উত্তরাধিকারীকে আয় করিবার চেষ্টা দেখিতে হইবে।

অনেকে বলেন যে, উত্তরাধিকার কর অপেক্ষা আয়কর ভাল। কারণ

য়কর আয় হইতে দেওয়া হয়। কিন্তু উত্তরাধিকার কর মূলধন হইতে দেওয়া হয়। এই যুক্তি ঠিক নয়। উচ্চহারে কর বসাইলে সঞ্চয় ক্ষমতা কমে,—একথা আয়কর ও উত্তরাধিকার কর উভয়ের বেলাতেই খাটে। আয়কর আয় হইতে দেওয়া হয় বটে; কিন্তু কর না দিতে হইলে করদাতা সেই টাকাটা জমাইতে পারিত। কাজেই বলা চলে যে, উত্তরাধিকারকর যদি বর্তমান মূলধন হইতে দেওয়া হয়, তবে আয়কর ভাবী মূলধন হইতে দেওয়া হয়। বরঞ্চ অনেক দিক দিয়া উত্তরাধিকারকর আয়কর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আয়কর সঞ্চয়ের ইচ্ছাকে যতটা কমায়, উত্তরাধিকার ততটা কমায় না। আয়কর বর্তমানে দেয়, আর উত্তরাধিকারকর ভবিষ্যতে (অর্থাৎ মৃত্যুর পর) দেয়। আমরা ভবিষ্যতের কথা বর্তমানের তুলনায় কম ভাবি। আর সঞ্চয়কারী নির্বিবাদে তাহার সম্পত্তি ভোগ করে। তাহাকে উত্তরাধিকারকর দিতে হয় না। ইহা সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর দেয়। এই সমস্ত কারণে বলা যায় যে, আয়করের তুলনায় উত্তরাধিকার-করের কুফল কম হয়।

রিগ্‌নানো স্কীম (Rignano Scheme of death duty): ইতালীর অধ্যাপক রিগ্‌নানো উত্তরাধিকারকর সম্বন্ধে একটি নূতন ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে এই ব্যবস্থার দ্বারা কয়েক পুরুষ পরে মৃতব্যক্তির সম্পত্তি সমস্তই সরকার কর বাবদ লইতে পারিবে, কিন্তু ইহার ফলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা না কমিয়া বাড়িবে। রাম যদি জানে যে তাহার সম্পত্তির প্রায় সমস্তই উত্তরাধিকার কর দিতে সরকারের কুক্ষিগত হইবে, তবে সে জীবদ্দশাতেই সমস্ত সম্পত্তি খরচ করিবার চেষ্টা করিবে। ইহার ফলে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। কিন্তু অধ্যাপক রিগ্‌নানোর স্কীম অনুযায়ী কর বসাইলে এই দোষ থাকিবে না। অধ্যাপক রিগ্‌নানো বলেন যে, রাম যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইল, তখন তাহার সম্পত্তির (ধর) এক তৃতীয়াংশ কর হিসাবে সরকার আদায় করিয়া লইল। তাহার ছেলে শ্যাম পিতৃসম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাইল। শ্যাম সারাজীবন রোজগার করিয়া কিছু সম্পত্তি করিল। তাহার মৃত্যুর পর রামের সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ ও শ্যামের নিজ অর্জিত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ করবাবদ দিতে হইবে। শ্যামের ছেলে যদু তাহার জীবদ্দশায় আরো কিছু সম্পত্তি

করিল। যদুর মৃত্যুর পর সে রামের সম্পত্তি যাহা পাইয়াছে ইহার সমস্তই, শ্যামের অর্জিত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ ও যদুর অর্জিত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ করবাবদ সরকার আদায় করিয়া লইল। অর্থাৎ রামের সম্পত্তির সবটুকুই তৃতীয় পুরুষের পর সরকারের হাতে চলিয়া গেল। কিন্তু ইহার ফলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা কমিবে না, বাড়িবে। কারণ শ্যাম জানে যে, তাহার মৃত্যুর পর পৈতৃকসম্পত্তির অতি সামান্য অংশই তাহার ছেলের হাতে যাইবে। সুতরাং সে ছেলের জন্য বেশি সম্পত্তি রাখিয়া যাইবার চেষ্টা করিবে। অবশ্য কোন দেশেই এই স্কীম গ্রহণ করা হয় নাই।

ব্যয়কর (Expenditure tax): আয়কর লোকের আয়ের উপর ধার্য করা হয়। ব্যয়কর লোকে যে যত টাকা ব্যয় করে ইহার উপর বসান হয়। আয়করে যেরূপ একটি সর্বনিম্ন আয় ঠিক করা থাকে—যাহার কম আয় হইলে কোন কর দিতে হয় না—ব্যয়করেও এইরূপ সর্বনিম্ন ব্যয়ের পরিমাণ ঠিক করিয়া দেওয়া থাকে। মোট ব্যয়ের পরিমাণ ইহার বেশি হইলে কর দিতে হয়—কম হইলে কর দিতে হয় না। ব্যয়করও বর্ধমান হারে ধার্য করা হয়। সুতরাং ইহাকে প্রত্যক্ষকরের পর্যায়ে ফেলা হয়। কেম্ব্রিজের অধ্যাপক ক্যাল্ডর ব্যয়করের পক্ষপাতী ও তাঁহার প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতবর্ষে ১৯৫৭-৫৮ সালে এই করের প্রবর্তন করা হইয়াছে।

ব্যয়করের স্বপক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় যুক্তি হইতেছে এই যে, ইহার ফলে ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যয় কমাইবার প্রবণতা দেখা দিবে। ঠিক করা হইল যে, যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন হাজার টাকার বেশি ব্যয় করে তাহাদের উচ্চহারে ব্যয়কর দিতে হইবে। করভার এড়াইবার জন্য ধনীব্যক্তিরা মাসে তিন হাজার টাকা বেশি যাহাতে ব্যয় না হয় সেই চেষ্টা করিবে। যদি নিতান্তই ইহার অধিক ব্যয় করিতে হয় তবে যতটা কম করা সম্ভব ইহাই করিবে। ব্যয়ের পরিমাণ কমিলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িবে। ইহাতে দেশের মোট সঞ্চয় বাড়িবে। অনাবশ্যক বিলাসব্যসনে ব্যয়ের পরিমাণ কমিলে দেশের সব দিক দিয়া লাভ হইবে। বিশেষ করিয়া অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে এই করের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই সব দেশের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ কম এবং ইহা দ্রুত না বাড়াইলে আর্থিক

ন্নতি সম্ভব নহে। ব্যয়করে সঞ্চয় বাড়ে। ইহাতে এ দেশের আর্থিক উন্নতির পথ সুগম হইবে।

অধ্যাপক ক্যালডরের মতে আয়করের বিরুদ্ধে দুইটি কথা বলা যায়। প্রথমত, লোকের আয়ের উপর করদানের ক্ষমতা নির্ভর করে না। এমন লোক আছে যাহাদের কলিকাতায় তিনটি বাড়ি আছে ও ভাড়া বাবদ মাসে মাসে ১০০০৲ টাকা আয় হয়। আবার একজন বড় উকিল কি ডাক্তার ভাড়া বাড়িতে থাকে। কিন্তু মাসে মাসে ১০০০৲ টাকা রোজগার করে। দুইজনের আয় সমান হইলেও করদানের ক্ষমতা সমান নহে। দ্বিতীয় ব্যক্তির সঞ্চিত সম্পত্তি নাই। কাজেই তাহাকে প্রতি মাসেই কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে হয়। প্রথম ব্যক্তির প্রচুর সম্পত্তি আছে বলিয়া আয়ের সমস্ত অর্থ ব্যয় করিতে পারে। অধ্যাপক ক্যাল্‌ডরের মতে আয় অপেক্ষা ব্যয়ই করদানক্ষমতার ভাল মাপকাঠি। প্রথম ব্যক্তির করদানের ক্ষমতা বেশি। সে খুব সম্ভব আয়ের অধিকাংশই ব্যয় করিবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিবে ও ফলে তাহার ব্যয়ের পরিমাণ কম হইবে। তাহার করদানক্ষমতাও প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা কম।

দ্বিতীয়ত, বর্তমানে যে রকম উচ্চহারে আয়কর বসান হয় তাহাতে লোকের আয় করিবার স্পৃহা কমিয়া যাইতেছে। যে টাকা হইতে ৮৭ নয়া পয়সা ট্যাক্স দিতে হয় সে টাকা রোজগারে পরিশ্রম করিয়া লাভ কি? উচ্চহারে কর দিতে হইলে কর্মের স্পৃহা ত কমিবেই—সঞ্চয়ের পরিমাণও কম হইবে। কারণ আয়কর দিয়া লোকের হাতে আর এমন টাকা থাকিবে না যে সে তাহা হইতে নিজের অবস্থা অনুযায়ী ব্যয় করিয়া অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিবে। আয়করে সঞ্চয় কমে। ব্যয়করে সঞ্চয় বাড়ে। এইজন্য অধ্যাপক ক্যাল্‌ডর ভারতবর্ষে আয়করের হার কমাইয়া ব্যয়কর বসাইবার প্রস্তাব করেন।

এই সব যুক্তির বিরুদ্ধে অনেক কথা বলা যায়। আয় দিয়া লোকের করদানক্ষমতা ঠিকমত নির্দিষ্ট করা যায় না ইহাই সত্য। কিন্তু ব্যয় দিয়াও কি ইহা করা যায়? এক পরিবারে স্বামীস্ত্রী মাত্র দুইটি লোক ও রোজগার মাসে হাজার টাকা। আর একটি পরিবারের মাসিক আয় হাজার টাকা। কিন্তু দ্বিতীয় লোকটির বৃদ্ধ পিতামাতা, বিধবা বোন, ভাগ্নে ও নিজের

ছেলেমেয়ে আছে। সুতরাং প্রথম লোকটি অপেক্ষা তাহার সাংসারিক আবশ্যকীয় ব্যয় অনেক বেশি হইবে। তাহা হইলে কি একথা বলা চলে যে দ্বিতীয় ব্যক্তির ব্যয় বেশি বলিয়া তাহার করদানক্ষমতা বেশি? বরং ইহার বিপরীত দিকটাই সত্য। উচ্চহারে আয়কর দিতে হয় বলিয়া ধনীদের সঞ্চয় কম হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এমন অনেক ধনী আছে যাহাদের সঞ্চয়প্রবৃত্তি এত প্রবল যে তাহারা ব্যয় কমাইয়াও সঞ্চয়ের পরিমাণ ঠিক রাখিবে। আবার আয়করলব্ধ রাজস্ব সরকার দেশের শিল্পপ্রসারের কাজে বিনিয়োগ করিতে পারে। তাহা হইলে ধনীদের সঞ্চয় কমিলেও দেশের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ কমিবে না।

যাহাদের আয়কর দিতে হয় তাহারা বার্ষিক কত আয় করে ইহার একটি হিসাব সরকারের নিকট দাখিল করে। ব্যয়করের বেলাতেও ধনীদের ব্যয়ের হিসাব দাখিল করিতে বলিতে হইবে। আয়ের হিসাব অনেকেই রাখে। কিন্তু ব্যয়ের হিসাব রাখার অভ্যাস কম লোকেরই আছে। কাজেই বহু লোক ব্যয়ের হিসাব দাখিল করিতে গিয়া নাজেহাল হইবে। আয়লব্ধ অর্থ অধিকাংশ লোকের পক্ষে মাত্র দুএকটি স্থান হইতে আসে। সুতরাং ইহার হিসাব রাখা তত শক্ত কাজ নয়। কিন্তু ব্যয় হয় প্রতিদিন সামান্য সামান্য পরিমাণে। মাসিক আয়ের হিসাব খাতায় হয়ত এক পৃষ্ঠায় সামান্য দুএকটি লাইন লিখিলেই চলে। কিন্তু ব্যয়ের খাতায় প্রত্যহের স্নানস্পর্শ লাগিবে,—তিলে তিলে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের কথা লিখিয়া রাখিতে হইবে। সুতরাং করদাতাদের হাঙ্গামাও অনেক বাড়িবে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য অধ্যাপক ক্যাল্‌ডর বলিয়াছেন যে, করদাতাকে ব্যয়ের হিসাব আলাদা করিয়া দিতে হইবে না। তাহাকে প্রতি বৎসর আয়ের হিসাব ও সঞ্চিত অর্থের সম্পত্তির পরিমাণ জানাইয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে। সে বৎসর যাহা আয় হইয়াছে তাহা হইতে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাদ দিলেই ব্যয়ের পরিমাণ জানা যাইবে। কাজেই করদাতাকে নূতন কোন হাঙ্গামা ভোগ করিতে হইবে না।

কোন কোন লেখক বলিয়াছেন যে ব্যয়করের ফলে ধনীরা আরো ধনী হইবে। কর এড়াইবার জন্য তাহারা ব্যয় কমাইবে ও ফলে তাহাদের সঞ্চয় ও সম্পত্তি বাড়িবে। অর্থাৎ ধনী আরো ধনী হইবে। ইহা মোটেই

বাঞ্ছনীয় নয়। আয়করে ধনীদের উচ্চহারে কর দিতে হয় বলিয়া তাহাদের আয় কমে ও ফলে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য কমিতে থাকে। ইহা আয়করের একটি প্রধান গুণ। আয় দিয়া করদানক্ষমতা নির্ণয় করা যায় না—একথা ঠিক। কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ দেখিয়া করদানক্ষমতা কি আরো নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায়? এ বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সকলের সাংসারিক অবস্থা সমান নহে। ব্যয়প্রবণতার মধ্যেও যথেষ্ট প্রভেদ থাকে। সুতরাং করদানক্ষমতার মাপকাঠি হিসাবে আয় অপেক্ষা ব্যয় হইতে যে বেশি ফল পাওয়া যাইবে—ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

পরোক্ষকর
(Indirect Taxes)

কাস্টম্‌স্ বা আমদানি-রপ্তানিকর (Customs): আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের উপর সরকার কর বসায়। ইহাকে ইংরাজীতে এককথায় কাস্টম্‌স্ বলে। সাধারণত রপ্তানিশুল্ক হইতে আমদানিশুল্কের প্রচলন বেশি। সেইজন্য প্রথমে আমদানিশুল্কের কথা আলোচনা করা হইতেছে।

আমদানিশুল্ক দুইটি কারণে ধার্য করা হয়। প্রথমত, ইহা রাজস্ব তুলিবার জন্য বসান হয়। দ্বিতীয়ত, ইহা অনেক সময়ে দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে বসান হয়। সরকার ঠিক করিল যে, ভারতবর্ষে চিনিশিল্পের প্রসার হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ইহা বিদেশী চিনিকলের মালিকের প্রতিযোগিতায় সম্ভব হইতেছে না। বিদেশ হইতে যে দামে চিনি আমদানি হইতেছে, দেশী চিনির কল সে দামে চিনি বেচিয়া লাভ করিতে পারে না। সরকার তখন বিদেশ হইতে আমদানি চিনির উপর উচ্চহারে আমদানিশুল্ক বসাইল। ইহার ফলে বিদেশী চিনির দাম বাড়িবে ও ফলে দেশী শিল্পের সুবিধা হইবে। রাজস্বের উদ্দেশ্যে যে হারে শুল্ক বসান হয় সংরক্ষণের জন্য ইহার চেয়ে বেশি হারে শুল্ক বসান হয়।

রপ্তানিশুল্কও এই দুই উদ্দেশ্যে ধার্য করা হয়। আমাদের দেশ হইতে কাঁচামাল আমদানি করিয়া বিদেশে শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই শিল্পের প্রতিযোগিতায় আমাদের শিল্পের হয়ত নানা অসুবিধা হইতেছে। তখন সরকার রপ্তানি কাঁচামালের উপর শুল্ক বসাইয়া দিল। ইহার ফলে বিদেশে

কাঁচামালের দাম বাড়িবে ও বিদেশী শিল্পপতির উৎপাদনব্যয় বাড়িয়া যাইবে। অবশ্য সংরক্ষণমূলক রপ্তানিশুল্কের অনেক বিপদ আছে। কারণ বিদেশীরা তখন অন্যদেশে কাঁচামাল কিনিবার চেষ্টা করিবে ও সেই চেষ্টা হইলে আমাদের লোকসান হইবে। আমরা আমাদের তৈয়ারি দ্রব্যের বড় ক্রেতা হারাইব। অথচ আমাদের শিল্পপতিদের একই রকম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইতেছে।

সাধারণত আমদানি-রপ্তানিশুল্কের ভার পণ্যশুল্কের ন্যায় ক্রেতাদের বহন করিতে হয়। অর্থাৎ আমদানিশুল্কের ফলে আমদানি পণ্যের দাম বাড়ে ও এদেশের ক্রেতাদের বেশি দাম দিয়া তাহা কিনিতে হইতেছে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আমদানিশুল্কের ভার বিদেশী-বিক্রেতার ঘাড়ে পড়িতে পারে। অর্থাৎ বিদেশী পণ্যের জন্য আমাদের চাহিদা যদি সেরকম জরুরী না হয়, অথচ বিদেশী উৎপাদক আমাদের নিকট জিনিসটি বিক্রয় করিতে না পারিলে অন্য বাজার খুঁজিয়া পাইবে না। সেই অবস্থায় এই শুল্কের ভার বিদেশী উৎপাদককে বহন করিতে হইতে পারে।

আমাদের রপ্তানি পণ্য যদি বিদেশে অন্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিক্রয় করিতে হয়, তবে রপ্তানিশুল্কের ভার আমাদের দেশের উৎপাদকদের বহন করিতে হইবে। কারণ তাহারা যদি দাম বাড়াইয়া দেয়, তবে বিদেশী ক্রেতা অন্য দেশের উৎপাদকদের নিকট হইতে মাল কিনিবে। অবশ্য রপ্তানি পণ্যে আমাদের যদি একচেটিয়া কারবার থাকে, অর্থাৎ বিদেশী ক্রেতা যদি অন্য দেশে এই জিনিসটি না পায়, তবে রপ্তানিশুল্কের ভার বিদেশীকে বহন করিতে হইতে পারে।

উৎপাদন কর (Excise Duty): দেশের মধ্যে উৎপন্ন ও ব্যবহৃত দ্রব্যের উপর যে কর ধার্য করা হয়, ইহাকে উৎপাদনকর বলে। এই কর সাধারণত উৎপাদকের নিকট হইতে আদায় করা হয়। যেমন, এদেশের চিনির কলে যত চিনি উৎপন্ন হইতেছে ও দেশের মধ্যেই বিক্রয় হইতেছে তাহার উপর সরকার উৎপাদনকর বসাইয়াছে। উৎপাদনকর তিনটি উদ্দেশ্যে বসান হয়। প্রথমত, কেবলমাত্র রাজস্ব আদায় করার উদ্দেশ্যে উৎপাদনকর বসান হয়। এই করের প্রধান উদ্দেশ্য রাজস্ব তোলা। দ্বিতীয়ত, যখন রাজস্ব তোলার জন্য আমদানি পণ্যের উপর আমদানিশুল্ক বসান হয় এবং

যখন সঙ্গে দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে বলিয়া সরকার মনে করে না, তখন আমদানিশুল্ক বসাইবার সময় দেশীয় শিল্পে উৎপন্ন জিনিসের উপরেও উৎপাদনকর ধার্য করা হয়। ইহাকে countervaling উৎপাদনকর বলে। তৃতীয়ত, অনেক সময়ে মাদকদ্রব্য প্রভৃতি সমাজের ক্ষতিকর দ্রব্যের উৎপাদন ও ভোগ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্যও ইহাদের উপর উচ্চহারে উৎপাদনকর বসান হয়। এদেশে, মদ, গাঁজা, আফিম প্রভৃতির উপর এই ধরনের উৎপাদনকর বসান আছে। ইহার উদ্দেশ্য দুইটি। এই সব দ্রব্যের ভোগ নিয়ন্ত্রণ ও কমাইবার ব্যবস্থা করা ও সঙ্গে সঙ্গে যতটা সম্ভব রাজস্ব তোলা। ভারতীয় সংবিধানে প্রথম দুই প্রকারের উৎপাদনকর কেন্দ্রীয় সরকারের ও তৃতীয় শ্রেণীর উৎপাদনকর রাজ্যসরকার ধার্য করে।

উৎপাদনকরের ভার কে বহন করিবে, ইহা দ্রব্যগুলির চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। সাধারণভাবে বলা যায় যে ইহাদের ভার ক্রেতাদের স্কন্ধেই পড়ে। বিশেষ করিয়া যে সব উৎপাদনকরের মূল উদ্দেশ্য রাজস্ব তোলা, তাহা অস্থিতিস্থাপক চাহিদার জিনিসের উপর ধার্য করা হয়। কারণ তাহা হইলে জিনিসটির মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও চাহিদা ও বিক্রয় কমিবে না। ফলে সরকারও বেশি রাজস্ব পাইবে। মূল্যবৃদ্ধির পরে যদি চাহিদা কমে, তবে সেই কর হইতে কম রাজস্ব উঠিবে। কিন্তু যে জিনিসের চাহিদা বেশ স্থিতিস্থাপক ইহার উপরে উৎপাদনকর বসান হইলে করের ভার উৎপাদকদের স্কন্ধে পড়িবে। উৎপাদকেরা অবশ্য মূল্য বৃদ্ধি করিয়া কর আদায়ের চেষ্টা করিবে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির ফলে চাহিদা বিশেষ কমিলে তাহাদের বিক্রয় কমিবে ও লাভ কমিয়া যাইবে। সুতরাং করের ভার তাহাদের উপর আসিয়া পড়িবে। বিশেষ করিয়া জিনিসটির যোগান যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে করের ভার পূর্ণভাবেই উৎপাদকের উপর পড়িবে।

বিক্রয় কর (Sales Tax) : উৎপাদনকর যেমন উৎপাদকের উপর ধার্য করা হয়, বিক্রয়কর সেইরূপ জিনিসের বিক্রেতার উপর বিক্রয়ের সময় ধার্য করা হয়। যখন দু-একটি বিশেষ বিশেষ জিনিসের উপর বিক্রয়কর বসান হয়, তখন ইহাকে বিশিষ্ট বিক্রয়কর (particular sales tax) বলে। যেমন আমাদের দেশে পেট্রোলের উপর আলাদা করিয়া বিক্রয়কর বসান আছে। আবার যখন বহু জিনিসের উপর বিক্রয়কর বসান হয় তাহাকে

সাধারণ বিক্রয়কর (general sales tax) বলে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় সমস্ত জিনিসের উপর টাকায় তিন পয়সা হিসাবে বিক্রয়কর ধার্য করিয়াছে। যখন শেষ বিক্রয়ের সময় অর্থাৎ যে জিনিসটি ব্যবহার বা ভোগ করিবে তাহার নিকট বিক্রয়ের সময় কর বসান হয় তখন ইহাকে single point tax বলে। আবার কোন জিনিস যতবার বিক্রয় হয় ততবারই যদি ইহার উপর বিক্রয়কর বসান হয় তবে তাহাকে Multipoint বিক্রয়কর বলে। একটি জিনিস,—যেমন একখানি ধুতি কিংবা শাড়ী—কয়েকবার বিক্রয় হইতে পারে। প্রথমে মিলের মালিকের নিকট পাইকারী ব্যবসায়ী কিনিয়া লয়। তাহার নিকট হইতে হয়ত আবার অন্য পাইকার কিনিল। খুচরা দোকানদার আবার পাইকারী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে মাল কিনিল। সবশেষে খুচরা দোকানদারের নিকট হইতে সাধারণ ক্রেতারা ধুতি কি শাড়ী কিনিয়া নিল। প্রথম ব্যবস্থায় বিক্রয়কর কেবলমাত্র সর্বশেষের খুচরা দোকানদারের নিকট হইতে আদায় করা হয়। এই শ্রেণীর বিক্রয়কর পশ্চিমবঙ্গে বহাল আছে। আর দ্বিতীয় ব্যবস্থায় পাইকারী ব্যবসায়ী কি খুচরা দোকানদার, প্রত্যেকবার বিক্রয়ের সময় কর বসান। বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে এই শ্রেণীর বিক্রয়কর ধার্য হইয়াছে।

বিক্রয় করে করের ভার উৎপাদনকরের ন্যায় নির্ণীত হয়। অর্থাৎ সাধারণত ইহা ক্রেতার স্কন্ধে পড়ে। তবে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় যেমন চাহিদা কম ও গোপন অস্থিতিস্থাপক হইলে করের ভার বিক্রেতাকে বহন করিতে হইতে পারে।

Exercises

Q. 1. Examine the effect of the imposition of high income taxes on the will to work and save.

Q. 2. Discuss the validity of the statement that death duties injure capital.

Q. 3. Write notes on the expenditure Tax.

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

সরকারী ঋণ

(Public Debt)

অন্য পাঁচজন লোকের মধ্যে সরকারও ব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণ করিতে পারে। তবে সরকারী ঋণ ও সাধারণ লোকের ঋণের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। প্রথমত, সাধারণ লোক অন্য লোক বা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ করে। সরকার দেশের লোকের নিকটে ঋণ লইতে পারে। আবার বিদেশেও টাকা ধার করিতে পারে। কিংবা কাগজী নোট ছাপাইয়া জিনিস কিনিয়া লইতে পারে। কাগজী নোট সরকারের ঋণপত্রস্বরূপ। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। প্রয়োজন মনে করিলে লোকের নিকট হইতে জোর করিয়া টাকা ধার নিতে পারে। সাধারণ লোকের সে ক্ষমতা বা সুবিধা নাই। তৃতীয়ত, রাষ্ট্র চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠান বলিয়া দীর্ঘদিনের মেয়াদী কিংবা চিরস্থায়ী ঋণ করিতে পারে। সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। চতুর্থত, সাধারণ লোকে ঋণ করিলে বা শোধ দিলে অর্থনৈতিক সংস্থার উপর যে প্রভাব হয় সরকারী ঋণ আদায় বা শোধের প্রভাব ইহার চেয়ে অনেক সুদূরপ্রসারী। সরকারী ঋণ শোধ করিলে অনেক সময়ে জাতীয় আয় কমিয়া যাইতে পারে ও দেশের আর্থিক অবস্থাও খারাপ হইতে পারে। এইজন্য সরকারী ঋণব্যবস্থার পৃথক আলোচনা করা প্রয়োজন।

বিভিন্ন প্রকারের সরকারী ঋণ (Different type of public debt) : সরকার দেশের লোকের নিকট হইতে যখন ধার নেয় তখন ধারের নিদর্শন স্বরূপ ঋণপত্র বিক্রয় করে। ঋণপত্র বিভিন্ন ধরনের হয়। সরকার তিন মাসের জন্য ধার নিয়া যে ঋণপত্র বিক্রয় করে ইহাকে ট্রেজারী বিল বলে। ট্রেজারী বিলের টাকা ঠিক তিন মাস পরে শোধ দেওয়া হয়। ইহাতে সুদের হার অনেক কম থাকে। সরকার এক বৎসর কিংবা দুই বৎসরে দেয় এই মেয়াদে ধার দিতে পারে। এই ঋণপত্রগুলিকে মিডিয়াম-টার্ম বণ্ড বা মধ্যম-মেয়াদী ঋণপত্র বলা হয়। ইহা ছাড়া পাঁচ বৎসর দশ

বৎসর কিংবা আরো দীর্ঘ দিনের জন্যও ধার নেওয়া হয়। এই ঋণপত্রগুলিকে এ দেশে কোম্পানীর কাগজ এই নাম দেওয়া হয়। কোম্পানী অর্থাৎ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই রকম ঋণপত্র দিয়া ধার করিয়াছিল বলিয়া এই নামকরণ হইয়াছে। সরকার আবার চিরস্থায়ী ঋণ করিতে পারে। অর্থাৎ কত বৎসর পরে এই ধার শোধ দেওয়া হইবে ইহা নির্দিষ্ট না করিয়া শুধু ঠিকমত সুদ দিয়া যাইব এই অঙ্গীকারে ধার করা হয়। ঋণপত্রে হয়ত শুধু বলা থাকে যে ধার শোধ লইবার পূর্বে সরকার এক বৎসরের নোটিশ দিবে। সরকার অনেক সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ধার নেয়। এই ধার অল্পদিনের মধ্যেই শোধ দেওয়া নিয়ম। এই প্রকারের ধারকে ways and means advances বলা হয়। ভারত সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ট্রেজারি বিল বিক্রয় করিয়াও ধার নেয়। সরকার পোস্ট অফিসের মাধ্যমেও ধার নেয়। আমাদের দেশে ন্যাশনাল সেভিং সার্টিফিকেট, ন্যাশনাল প্ল্যান সার্টিফিকেট ইত্যাদি ঋণপত্র পোস্ট অফিসে বিক্রয় করা হয়।

সরকারী ঋণের শ্রেণীবিভাগ (Classification of public debts): সরকারী ঋণের নানা শ্রেণীবিভাগ আছে। প্রথমত ইহা স্বেচ্ছাকৃত ও বাধ্যতামূলক এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। পূর্বে রাজারা কোন কোন সময়ে প্রজাদের নিকট হইতে জোর করিয়া টাকা ধার লইতেন। ইহাকে বাধ্যতামূলক ঋণ (Forced loan) বলে। আজকাল এই শ্রেণীর ঋণ বিশেষ নাই। আজকালকার সরকারী ঋণ স্বেচ্ছাকৃত (voluntary loans)। প্রজাসাধারণ ইচ্ছা করিলে সরকারকে টাকা ধার দিতে পারে, আবার নাও দিতে পারে।

অনেক সময়েই সরকারী ঋণকে উৎপাদক ও অনুৎপাদক এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যে ঋণলব্ধ অর্থ এমন কাজে লাগান হয় যাহা হইতে প্রতি বৎসর সরকারের আয় হয়, সেই ঋণকে উৎপাদক ঋণ (productive loans) বলে। এদেশে রেলওয়ে নির্মাণের সময় সরকার বহু অর্থ ধার করিয়াছিল। এই টাকায় রেলওয়ে তৈয়ারি হইয়াছে ও রেলওয়ে হইতে সরকারের বৎসর বৎসর আয় হয়। এইরূপ ধারে বহু অর্থ তুলিয়া সরকার বিভিন্ন সেচখাল খনন করিয়াছে এবং এই খালের জল বিক্রয় করিয়া প্রতি বৎসর কিছু কিছু আয় হয়। এই ধরনের ঋণ উৎপাদক। কিন্তু যুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনীর

ব্যয় নির্বাহের জন্য যে টাকা ধার নেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণই অনুৎপাদক (unproductive)। এই টাকা যুদ্ধের কাজেই ব্যয় করা হইয়াছে ও এই বাবদ সরকার বর্তমানে কিছু আয় করে না।

দেশী ও বিদেশী ঋণ এইভাবেও শ্রেণী বিভাগ করা হয়। যখন দেশের লোকের নিকট হইতে টাকা ধার নেওয়া হয় তখন ইহাকেও দেশী বা আভ্যন্তরীণ ঋণ (Internal loan) বলে। কিন্তু সরকার বিদেশেও টাকা ধার করিতে পারে। আমরা পূর্বে বহু টাকা ইংলণ্ডে ধার লইয়াছিলাম। ইহাকে আমাদের স্টার্লিং ঋণ বলা হইত। ইহাকে বিদেশী ঋণ (External loans) বলা হয়। বিদেশী ঋণ সাধারণত বিদেশী মুদ্রায় নেওয়া হয় ও সেই মুদ্রা দিয়া শোধ দিতে হয়।

যে সময়ের জন্য ধার নেওয়া হয় সেই অনুযায়ী সরকারী ঋণকে অল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। ট্রেজারী বিলের টাকা তিন মাসের মধ্যে শোধ দেওয়া হয়। ইহাকে অল্পমেয়াদী ঋণ বলা হয়। ইংরাজীতে ইহাকে Floating বা unfunded debt বলে। আবার যে ঋণ দীর্ঘকাল অর্থাৎ এক বৎসরের পরে শোধ দেওয়ার কথা থাকে ইহাকে দীর্ঘকালীন ঋণ বা Funded debt বলা হয়। ইংলণ্ডে Funded ও unfunded debt এই দুইটি শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। যে ঋণের টাকা সরকার কোন নির্দিষ্ট সময়ের পরে শোধ দিবার অঙ্গীকার করে তাহাকে unfunded debt বলা হয়। আর যে ঋণের টাকা শোধ দেওয়া হইবে এ-সম্বন্ধে কোন নির্দেশ দেওয়া থাকে না তাহাকে funded debt বলা হয়।

সরকার আরো নানা ধরনের ঋণ লইয়া থাকে। যেমন লটারী ঋণ, বার্ষিকবৃত্তি (annuity) ঋণ ইত্যাদি। লটারী ঋণে সুদ বা আসল টাকা হইতে প্রতি বৎসর লটারীতে যে যে খাতকের নাম উঠে তাহাদের পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রতি বৎসর বৃত্তি হিসাবে কিছু টাকা দেওয়া হইবে এই অঙ্গীকারে সরকার টাকা ধার নেয়। যে ধার দেয় তাহাকে দীর্ঘদিন ধরিয়া সরকার প্রতি বৎসর এমনভাবে টাকা দেয় যাহাতে আসল টাকা ও সুদ উঠিয়া আসে।

সরকারের কখন ধার করা উচিত? (When to borrow): সাধারণ লোকে নিজে যে টাকা রোজগার করে সেই অনুযায়ী ব্যয় করে।

সাধারণভাবে ইহাই ঠিক। তবে হঠাৎ জরুরী কোন কারণে প্রয়োজন হইলে টাকা ধার দিতে পারে। সরকারের বেলাতেও এই কথা খাটে। সরকার সাধারণত কর বসাইয়া ও অন্যান্য উৎস হইতে যে পরিমাণে রাজস্ব তুলিতে পারে তদনুযায়ী ব্যয় করিবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে ধার নিতে পারে। কোন্ কোন্ সময়ে বা অবস্থায় সরকারের টাকা ধার নেওয়া ঠিক হইবে?

প্রথমত, অনেক সময়েই দেখা যায় যে, কর বসাইয়া টাকা তুলিতে সময় লাগে। কিন্তু সরকারের হয়ত এমন জরুরী প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে যে এখনই টাকা চাই। এ অবস্থায় ঋণ করায় কোন দোষ নাই। তখন কর ধার্য করিয়া টাকা তোলার অসুবিধা থাকিতে পারে। কিংবা যত টাকা প্রয়োজন তাহা সমস্ত কর বসাইয়া তোলা সম্ভব হয় না। তাহা করিতে হইলে হয়ত আয়-করের হার এত বেশি বাড়াইতে হইবে যে ইহার ফলে লোকের কাজ ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা বিশেষভাবে কমিয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় টাকা ধার করিয়া ব্যয় নির্বাহ করা সমীচীন হইবে। যুদ্ধের সময় যে পরিমাণ টাকার দরকার হয় ইহা সমস্তই কর ধার্য করিয়া তোলা সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় ধার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। যুদ্ধের ন্যায় আসন্ন বিপদের সময় টাকা ধার নিয়া প্রয়োজন মিটান হয়। পরে ধীরে ধীরে টাকাটা শোধ দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, যখন ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয় সে সময়ে সরকারের উচিত করভার কমান ও ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ান। ইহাকে ব্যবসায়চক্রবিরোধী সরকারী আয়ব্যয় নীতি (compensatory fiscal policy) বলে। মন্দা হওয়ার প্রধান কারণ দেশের মধ্যে উৎপন্ন জিনিসের চাহিদার অপ্রাচুর্য। পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থা বজায় রাখিতে হইলে চাহিদার পরিমাণ বাড়াইতে হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যে মূলধন বিনিয়োগ ও ভোগ্যদ্রব্যের জন্য ব্যয় বাড়াইতে হইবে। এইজন্য সরকারের উচিত করের ভার কমান ও স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, রেলওয়ে প্রভৃতি নির্মাণের কাজে অর্থ বিনিয়োগ করা। সুতরাং মন্দার সময় সরকার টাকা ধার নিয়া সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইবে। পরে ব্যবসায়ে তেজীর ভাব দেখা দিলে বেশি কর বসাইয়া ও ব্যয়সংকোচ করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থে ধার শোধ দিবে।

তৃতীয়ত, ব্যবসায়ীরা যেমন ব্যবসায় বাড়াইবার জন্য ধার নিতে পারে, সরকারও সরকারী ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা ও বৃদ্ধির জন্য ধার নেয়। ব্যবসায় যদি লাভজনক হয় তবে সেই লাভের টাকা হইতে পরে সুদ ও আসল শোধ দেওয়া হয়।

চতুর্থত, অনুন্নত দেশগুলিতে আর্থিক উন্নতির জন্য ধার নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই স্বীকার করেন। এই দেশগুলির জাতীয় আয় বর্তমানে এত কম যে ইহাদের পক্ষে কর বাবদ বেশি টাকা তোলা সম্ভব হইয়া উঠে না। যতদূর সম্ভব দেশের ধনীদের নিকট হইতে ও বিদেশ হইতে ধার লইয়া সেই টাকাটা যদি বিভিন্ন শিল্পোন্নতির কাজে ব্যয় করা হয় তবে জাতীয় আয় বাড়িবে। আয় বাড়িলে সুদ ও আসল শোধ দেওয়া তত কঠিন হইবে না। অথচ ইহা না করিলে সে দেশ হয়ত আরও বহুদিন দরিদ্র ও অনুন্নত থাকিয়া যাইবে। কাজেই আর্থিক উন্নতির জন্য ধার নেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন।

ঋণং কৃত্বা আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করা ভাল কথা সন্দেহ নাই। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে সর্বং অত্যন্তং গর্হিতং। সরকারী ঋণের পরিমাণ যদি খুব বেশি বাড়ে তাহা হইলে নানা দিক হইতে বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। বেশি ঋণের অর্থ সুদ ও আসল শোধ বাবদ প্রতি বৎসর বহু টাকার দরকার হইবে। ইহার জন্য বেশি কর বসাইতে হইবে। করভার বাড়িলে কাজ ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা কমিয়া যায়। ফলে আর্থিক উন্নতির পথে বাধা দেখা দিবে। সুতরাং প্রয়োজনমত ধার নিতে হইবে। কিন্তু ধারের পরিমাণ যাহাতে খুব বেশি না হয় সে দিকেও কড়া নজর রাখিতে হইবে।

যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য ধার বনাম কর (Loan vs. *taxes* in war finance) : যুদ্ধের সময় বহু অর্থের প্রয়োজন হয়। অর্থের সমস্তই কিংবা অধিকাংশই কি কর ধার্য করিয়া তোলা উচিত? না ইহা ধার করিয়া তোলা ঠিক হইবে? কর বসাইয়া টাকা তুলিবার স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেওয়া হয়। প্রথমত, উচ্চহারে কর ধার্য করিলে অযথা ভোগ বন্ধ হইবে। ধনীদের ভোগের জন্য ব্যয় কমিলে সকলেরই মঙ্গল। এই ব্যয় কমিলে ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন কমিবে এবং যে সমস্ত শ্রমিক ও কলকব্জায় এই দ্রব্যাদি তৈয়ারি হইত তাহাদের যুদ্ধের কাজে লাগান হইবে। দ্বিতীয়ত, উচ্চহারে

কর বসাইলে মুদ্রাস্ফীতির আশংকা কম থাকে। যুদ্ধের সময় দেশের উন্নত জিনিসের অধিকাংশই যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করিতে হয়। যেমন দেশের মধ্যে মিলগুলিতে যত কাপড় তৈয়ারি হয় ইহার মোটা অংশ সরকার সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য লইয়া যায়। সাধারণ লোকের ব্যবহারের জন্য কম কাপড থাকে। সেই অনুপাতে লোকের চাহিদা না কমিলে কাপড়ের দাম অত্যন্ত বাড়িবে। চাহিদা কমাইতে হইলে লোকদের আয় কমাইতে হইবে। অর্থাৎ তাহাদের উপর বেশি করিয়া ট্যাক্স বসাইতে হইবে। সরকার ট্যাক্স বসাইয়া যদি লোকেদের আয়ের বেশি অংশ আদায় করিয়া নেয় তবে তাহাদের চাহিদা কমিয়া যাইবে ও জিনিসপত্রের দাম কম বাড়িবে। ফলে মুদ্রাস্ফীতির আশংকা কমিয়া যায়। তৃতীয়ত, ধার করিয়া যুদ্ধের খরচ চালাইলে বর্তমানে অর্থাৎ যুদ্ধের সময় উচ্চহারে কর বসাইতে হয় না সত্য, কিন্তু যুদ্ধের পরে ধার শোধ দেওয়ার জন্য উচ্চহারে কর বসাইতে হয়। যুদ্ধের পরে কর ধার্য করার চেয়ে যুদ্ধের মধ্যে ইহা করার কিছু কিছু সুবিধা আছে। যুদ্ধের পর অনেক সময়েই জিনিসপত্রের দাম কমিয়া যায়। তখন করের ভার বাড়ে। আবার যুদ্ধের সময় লোকে জয়লাভের জন্য যতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকে, যুদ্ধের পরে সেই মনোভাব চলিয়া যায়। কাজেই যুদ্ধের সময়ে উচ্চহারে কর দিতে যে আপত্তি করিবে না, যুদ্ধের পরে সে আর বেশি কর দিতে ততটা রাজী না-ও থাকিতে পারে। যুদ্ধের সময় সাধারণ লোকে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়া নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত থাকে। সুতরাং ধনীরা যাহারা দেশেই রহিয়া গেল, সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিল না তাহাদের যখন জীবনদান করিতে হইতেছে না তখন অন্তত নিজেদের আয় ও সম্পত্তির অধিকাংশ কর বাবদ দেওয়া তাহাদের পক্ষে উচিত হইবে। তবেই হয়ত তাহাদের ত্যাগ সাধারণ লোকের ত্যাগের কাছাকাছি পৌঁছিতে পারিবে।

৬.

কিন্তু এই যুক্তি সত্ত্বেও এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে বর্তমান যুগের যুদ্ধে এত বেশি অর্থের প্রয়োজন যে ইহার সমস্তই কর ধার্য করিয়া তোলা সম্ভব হয় না। প্রথমত, যুদ্ধ বাধিলেই সঙ্গে সঙ্গে বহু অর্থের প্রয়োজন হয়। নূতন কর ধার্য করিয়া এত তাড়াতাড়ি টাকা তোলা যায় না। আর সমস্ত কর ধার্য করিয়া তুলিতে গেলে অতি উচ্চহারে কর বসাইতে হইবে। তাহা

দিলে ব্যবসায়ীদের কাজ ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা কমিয়া যাইবে। অর্থাৎ উৎপাদন ও সঞ্চয়ের পরিমাণ কমিবার আশংকা দেখা দিবে। কিন্তু যুদ্ধের সময় উৎপাদন ও সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ান দরকার। কমিলে ক্ষতি হইবে। যুদ্ধে জয়লাভ হইবে না। দ্বিতীয়ত, কোন কোন লেখকের মতে যুদ্ধের খরচ যদি ধার করিয়া চালান যায় তবে একটি সুবিধা হয়। আমরা প্রাণ দিয়া লড়াই করিয়া জয়লাভ করিয়াছি। সুতরাং যুদ্ধের খরচ আমাদের ছেলেমেয়েরা দিলে আমাদের ত্যাগের সহিত তাহাদের ত্যাগ মিলিবে। আমরা প্রাণ দিয়াছি ও অন্য নানা প্রকারে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াছি। তাহারা অর্থ দিবে। যুদ্ধের ব্যয় ধারে চালাইলেই যুদ্ধের আর্থিক বোঝা ছেলেমেয়েদের উপর ফেলা যাইবে। যুদ্ধের খরচ ধারে চালাইলেই যে মুদ্রাস্ফীতি উপস্থিত হইবে একথা বলা ঠিক হইবে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রায় সমস্ত দেশই বহু টাকা ধার করে। কিন্তু ইহার ফলে বিশেষ মুদ্রাস্ফীতি হয় নাই। সরকার নানা পন্থা অবলম্বন করিয়া মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

সুতরাং কেবলমাত্র করের উপর বা ধারের উপর নির্ভর করিয়া বর্তমান কালের যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করা যায় না। আসলে প্রত্যেক সরকার দুইটি পন্থাই অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। উৎপাদক ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা না কমাইয়া যতদূর সম্ভব উচ্চহারে কর বসাইতে হইবে এবং বাকী টাকা ধার করিয়া তুলিতে হইবে। একদিকে উৎপাদন না কমে সেই ব্যবস্থা দেখিতে হইবে। আবার অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি না দেখা দেয় ইহাও দেখিতে হইবে। এইভাবে কর ও ধারের সামঞ্জস্য করিয়া যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে।

সরকারী ঋণের ভার (Burden of public debts): সরকারী ঋণের ভার দুই রকমের হইতে পারে। প্রথমত, সুদ বাবদ যে টাকা বৎসরে বৎসরে দিতে হয় ইহার একটি ভার আছে। দ্বিতীয়ত, সুদ দেওয়ার জন্য কর বসাইতে হয়। ইহার ফলেও কিছু অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়। ইহা সরকারী ঋণের পরোক্ষ ভার। সরকারী ঋণের ভারের কথা আলোচনা করিবার সময় দেশী ও বিদেশী ঋণের মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন।

কোন কোন লেখক মত প্রকাশ করিয়াছেন যে দেশী ঋণের বোঝা বোঝাই নয় (An internal public debt has no burden)। দেশীয় ঋণের জন্য যে সুদ দিতে হয় ইহা পরে কর ধার্য করিয়া তোলা হয়।

একদল লোক কর দেয়। আবার অন্য একদল লোক অর্থাৎ যাহারা সরকারকে টাকা ধার দিয়াছে তাহারা সুদ পায়। একদলের পকেট হইতে টাকা নিয়া অন্যদের পকেটে দেওয়া হয় মাত্র। হয়ত অনেক সময় করদাতা নিজেই সরকারী ঋণপত্র কিনিয়া রাখিয়াছে। সে কর বাবদ যে টাকা দিতেছে সুদ বাবদ হয়ত সেই টাকা ফেরত পাইতেছে। যাহারা কোম্পানীর কাগজ কেনে তাহারা সাধারণত বড় লোক ও যাহারা উচ্চহারে কর দেয় তাহারাও বড় লোক। সুতরাং কর আদায় ও সুদ দেওয়ার অর্থ এক শ্রেণীর বড় লোকের নিকট হইতে টাকা আয়, এক শ্রেণীর কিংবা হয়ত সেই শ্রেণীরই বড় লোককে দেওয়া। এই জন্য তাঁহারা দেশীয় ঋণের যে কোন বোঝা আছে ইহা স্বীকার করেন না।

কিন্তু একথা সব সময়েই জোর করিয়া বলা যায় না। কোম্পানীর কাগজের ক্রেতা সাধারণত ধনীরা। ইহার সুদ দিবার জন্য সরকারকে বেশি রাজস্ব সংগ্রহ করিতে হয়। বেশি রাজস্বে সব সময়ে আয়করের হার বাড়াইয়া তোলা হয় না। সরকার নূতন পরোক্ষ কর বসাইতে পারে কিংবা কোন পরোক্ষ করের হার বাড়াইয়া দিতে পারে। তাহা হইলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর বেশি চাপ পড়িবে। আর যদি আয়করের হার বাড়াইয়াও অধিক রাজস্ব সংগ্রহের চেষ্টা করা হয় তবে এই বর্ধিত হারের কিছুটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্কন্ধে পড়িতে পারে। সুদের টাকা প্রায় সমস্তই ধনীর পকেটে যাইতেছে। অথচ দরিদ্র ও মধ্যবিত্তকে অধিক কর দিতে হইতেছে। এ অবস্থায় দেশীয় ঋণের যে কোন ভার নাই ইহা বলা ঠিক হইবে না। দ্বিতীয়ত, আয়করের হার বেশি উচ্চ হইলে ইহার ফলে করদাতার কাজের ইচ্ছা কমিতে পারে। তাহা হইলে উৎপাদন কমিবে। সুতরাং দেশীয় ঋণের বোঝাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা ন্যায়সঙ্গত নহে। এই ঋণের বোঝা মোট ঋণের পরিমাণ ও করের হারের উপর অনেকটা নির্ভর করে। কোন কোন শ্রেণীর লোক কোম্পানীর কাগজ কিনিয়াছে ও অতিরিক্ত করের বোঝা কাহাদের উপর পড়িতেছে—এই বিষয়ের উপরেও করের ভার নির্ভর করে।

বৈদেশিক ও দেশীয় ঋণের ভারের পার্থক্য (Burden of external and internal loans) : বিদেশে যে ঋণ লওয়া হইয়াছে ইহার

ভার কি দেশীয় ঋণ হইতে বেশি? সাধারণ লোক যে ধার নেয় ইহা তাহাকে অন্যের নিকট হইতে লইতে হয়। এই বাবদ তাহাকে নিয়মিত সুদ দিতে হয় ও ঠিকমত সময়ে আসল শোধ দিতে হয়। সুদ দেওয়ার অর্থ তাহার আয় কমিয়া গেল ও মহাজনের আয় বাড়িল। বিদেশী ঋণের বেলাতেও ঠিক ইহাই ঘটে। এই ঋণের সুদ বাবদ দেয় টাকা সমস্তই বিদেশে পাঠাইয়া দিতে হয়। ফলে আমাদের জাতীয় আয় কমিয়া যায়। কিন্তু দেশীয় ঋণের সুদ বাবদ টাকা দেশের মধ্যেই থাকে। শুধু টাকার পকেট পরিবর্তন হয় এই মাত্র। অর্থাৎ করদাতার নিকট কর আদায় করিয়া ঋণদাতাকে ধার শোধ দেওয়া বা সুদ দেওয়া হয়। দুইজনেই এই দেশের লোক এবং অনেক সময়ে হয়ত দুইজনেই এক লোক। যে ধনী সে হয়ত আয়কর বাবদ হাজার টাকা দিল। আবার সে হয়ত কোম্পানীর কাগজের মালিক ও ইহার সুদ বাবদ সরকারের নিকট হইতে ১ হাজার পাইল। দেশীয় ঋণের সুদ দেওয়ার জন্য জাতীয় আয় কমে না। এইজন্য বলা হয় যে বৈদেশিক ঋণের ভার দেশী ঋণের ভার হইতে বেশি। অবশ্য বিদেশী ঋণের সুদ বাবদ দেয় অর্থ যদি প্রধানত ধনীদের উপর কর ধার্য করিয়া আদায় করা হয় তবে এই ঋণের ভার কিছুটা কম হইতে পারে। তাহা হইলেও একথা ঠিক যে বৈদেশিক ঋণের ভার দেশীয় ঋণ হইতে বেশি সন্দেহ নাই।

সরকারী ঋণের অর্থনৈতিক ফল (Economic effects of public debts): সরকার যখন ধার নেয় তখন কোম্পানীর কাগজের ক্রেতাদের পকেট হইতে টাকা সরকারের তহবিলে জমা হয়। আবার যখন সুদ দেয় ও আসল শোধ দেওয়া হয় তখন সরকারী তহবিলের টাকা কোম্পানীর কাগজের ক্রেতাদের পকেটে যায়। সুদ এবং আসলের জন্য দেয় টাকা সরকার কর বসাইয়া তোলে। কর বসাইবার অর্থ করদাতাদের পকেট হইতে টাকা হস্তান্তর হওয়ার ফলে দেশের অর্থনৈতিক সংস্থা নানাপ্রকারে প্রভাবান্বিত হয়।

সরকারী ঋণের অর্থনৈতিক ফলাফল, ঋণের পরিমাণ ও ঋণলব্ধ অর্থ যে ভাবে ব্যয় হয় ইহাদের উপর অনেকটা নির্ভর করে। ঋণের পরিমাণ কম হইলে ইহার ফলাফলও অনেক কম হইবে। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সমস্ত

দেশেই সরকারকে নানাকাজে বহু টাকা ধার করিতে হইতেছে। ঋণের পরিমাণ বেশি হইলে ইহার ফলাফল নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে।

প্রথমত, ধারের টাকা কি কাজে ব্যয় হইতেছে তাহা দেখিতে হইবে। যদি ধারের টাকা নানাভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে ব্যয় করা হয় তবে ইহার ফলে জাতীয় আয় বাড়িবে ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হইবে। কিন্তু টাকাগুলি যদি যুদ্ধের জন্য খরচ করা হয় তবে ইহার ফলে জাতীয় আয় কমিয়া যাইবে ও দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অবশ্য একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে যুদ্ধের সময় সাধারণ হিসাব চলে না। কারণ যুদ্ধে পরাজয় ঘটিলে ইহার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফল আরো খারাপ হইবে।

সুদের হারের উপরেও সরকারী ঋণের অনেক প্রভাব রহিয়াছে। সরকার বাজার হইতে যে সুদে টাকা ধার নেয় তাহাই সাধারণ হার হইয়া দাঁড়ায়। অন্যান্য ধার প্রার্থীকে ইহার চেয়ে বেশি হারে সুদ দিতে হয়। কারণ বাজারে সরকারের চেয়ে অন্য সকলেরই ক্রেডিট কম থাকে।

ধারের টাকা প্রধানত কাহাদের নিকট হইতে আসিতেছে ইহার উপরেও ফলাফল অনেকটা নির্ভর করে। যদি ধারের বেশি বা মোটা অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আসে,—অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠানগুলি ঋণপত্র কেনে—তবে মুদ্রাস্ফীতির আশংকা আছে। বিশেষত সেখানে ধারের পরিমাণ বেশি থাকে। সাধারণ লোক বা প্রতিষ্ঠান যদি ঋণপত্র কেনে তবে তাহাদের হাতের বাড়তি টাকা সরকারের তহবিলে জমা হয়। ইহার ফলে তাহাদের হাতে কম নগদ টাকা থাকে ও তাহারা নিজেদের ব্যয় কমাইতে চেষ্টা করে। ইহা হইলে জিনিসপত্রের চাহিদা এবং মূল্য কমিতে পারে। কিন্তু ব্যাঙ্ক যখন ঋণপত্র কেনে ব্যাঙ্কের তহবিলের টাকা কমিয়া যায় বটে, কিন্তু ব্যাঙ্ক প্রয়োজন বোধ করিলেই কোম্পানীর কাগজগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জামানত রাখিয়া টাকা কর্জ করিতে পারে। ফলে সক্রিয় টাকার পরিমাণ (active money supply) কমে না। বরং বাড়ার সম্ভাবনা বেশি বলিয়া মুদ্রাস্ফীতির আশংকা থাকে।

ধার শোধ দিবার সময় ও প্রতি বৎসর সুদের টাকা কাহাদের নিকট

হইতে আদায় করা হইতেছে ইহাও দেখিতে হইবে। এই সমস্ত টাকা কর ধার্য করিয়া তোলা হয়। যদি পরোক্ষ করের উপর বেশি নির্ভর করা হয় অর্থাৎ উৎপাদনকর, বিক্রয় কর প্রভৃতি ধার্য করিয়া বেশি রাজস্ব আদায় করা হয় তবে দরিদ্র মধ্যবিত্তের উপর বেশি চাপ পড়িবে। জাতীয় আয় বন্টনব্যবস্থার অসমতা বাড়িবে। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। আর যদি প্রত্যক্ষ-কর অর্থাৎ আয়কর বা উত্তরাধিকার কর হইতে বেশি রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা হয় তবে টাকাটা মোটামুটি ধনীদের পকেট হইতে আসিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু করের হার যদি ইহার ফলে বেশি উচ্চ হয় তবে কাজের ইচ্ছা কমিতে পারে। তাহা হইলে জাতীয় আয় কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে।

মূল্যস্তরের উপর সরকারী ঋণের কি কোন প্রভাব আছে? এই সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা শক্ত। ব্যাঙ্কগুলি যদি কোম্পানীর কাগজের অধিকাংশ কিনিয়া থাকে তবে ইহার ফলে মোট টাকার যোগান (money supply) বাড়িবার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা যায়। আবার সুদ ও আসল শোধ দিবার জন্য যদি উচ্চ হারে কর ধার্য করা হয় তবে মোট উৎপাদনের পরিমাণ হয়ত কিছুটা কমিতে পারে। ইহার ফলে মূল্যস্তর বাড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু ধারের টাকার বেশি অংশ যদি সাধারণ লোক বা প্রতিষ্ঠানের পকেট হইতে আসিয়া থাকে তবে মূল্যস্তর বিশেষ প্রভাবান্বিত না-ও হইতে পারে। ধারের পরিমাণ যদি বেশি হয় তবে ইহার ফলে মুদ্রাস্ফীতির আশংকা থাকে সন্দেহ নাই। কিন্তু ধারের টাকা যদি উৎপাদনবৃদ্ধির কাজে ব্যয় হয় তবে নিয়োগ (employment) ও উৎপাদন বাড়িবে এবং মূল্যস্তর সমানই থাকিয়া যাইতে পারে। যাঁহারা লর্ড কেন্‌সের মতের সমর্থক তাঁহারা বলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত লোক ও যন্ত্র বেকার বসিয়া আছে ততক্ষণ সরকারী ঋণলব্ধ অর্থব্যয়ের ফলে নিয়োগ ও উৎপাদন বাড়িবে। মূল্যস্তর বিশেষ বাড়িবে না। কিন্তু পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় পৌঁছিলে বা অন্তত কাছাকাছি গেলে তাহার পর ঋণলব্ধ অর্থব্যয়ের ফলে মূল্যস্তরের দ্রুতবৃদ্ধি ঘটিবে।

ঋণ-পরিশোধের পদ্ধতি (Methods of debt repayment): সাধারণত আর পাঁচজন লোকের ন্যায় সরকারও বাজেট তৈয়ারি করিবার সময় ব্যয়ের কাটছাট করিয়া ও রাজস্ব বাড়াইয়া কিছু উদ্বৃত্ত সঞ্চয় করে ও তাহা দিয়া ঋণ শোধ দেয়। কিন্তু এই পদ্ধতির দ্বারা নিয়মিতভাবে

দেনা শোধ দেওয়া সম্ভব হইয়া উঠে না বলিয়া সরকার নিম্নোক্ত দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করে।

প্রথমত, ঋণ পরিশোধের জন্য সরকার একটি পৃথক তহবিল রাখে। ইহাকে ইংরাজীতে Sinking Fund বলে। প্রতি বৎসর রাজস্বের একটি অংশ এই তহবিলে জমা দেওয়া হয়। পূর্বে ধারণা ছিল যে নিয়মিত ভাবে এই তহবিলে টাকা জমা হইলে চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়িয়া আসলের সমান যখন হইবে তখন ইহা দিয়া ঋণ শোধ দেওয়া হইবে। কিন্তু বর্তমানে আর ঠিক এইভাবে কাজ করা হয় না। অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের সময় পর্যন্ত সব টাকা জমা রাখা হয় না। তহবিলে কিছু টাকা জমা হইলেই তাহা দিয়া বাজারের অবস্থা বুঝিয়া ঋণপত্র কেনা হয় ও সেই ঋণপত্র নাকচ করা হয়। অর্থাৎ বাজারে যদি কোন সময়ে সেই ঋণপত্রের দাম পড়িয়া যায় তখন ইহা কেনা হয়। সেই পদ্ধতি প্রায় সব দেশেই প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহার বড় অসুবিধা এই যে, অভাবের সময় কোন অর্থসচিব এই তহবিলের টাকা ভাঙ্গিয়া সরকারী ব্যয় নির্বাহ করিতে পারেন। সরকারী ব্যয় বাড়িলে অতিরিক্ত কর ধার্য করিতে হয়। কিন্তু কর ধার্যের প্রস্তাব চিরকালই অপ্রীতিকর এবং যে অর্থসচিব এই প্রস্তাব করেন তাঁহাকে (কিংবা তাঁহার দলকে) করদাতাদের নিকট অপ্রিয় হইতে হয়। কাজেই বিপন্ন অর্থসচিব নূতন কর ধার্যের প্রস্তাব না তুলিয়া ঋণ-তহবিলে জমান টাকা খরচ করিয়া ব্যয় নির্বাহ করিতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহাকে জনসাধারণের অপ্রিয় হইতে হয় না। কিন্তু এই তহবিল রাখার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল।

দ্বিতীয় পদ্ধতির নাম **ঋণের রূপান্তরকরণ** (Conversion of loans)। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা ঠিক বোঝা যাইবে। ধরা যাক যে, কোন সময়ে সুদের হার উচ্চ ছিল ও তখন সরকার শতকরা পাঁচ টাকা হারে সুদ দেওয়ার অঙ্গীকারে বাজার হইতে ধার নিয়াছে। কিছু সময় পরে দেখা গেল যে বাজারে সুদের হার নামিয়া শতকরা তিন টাকা হইয়াছে। কেহ এই সময়ে যদি টাকা লগ্নী করিতে চায় তবে শতকরা তিন টাকার বেশি সুদ পাইবে না। সরকার তখন ঋণদাতাদের নিকট এই প্রস্তাব করিতে পারে যে পুরাতন ঋণপত্রের পরিবর্তে তাহাদের নূতন ঋণপত্র দেওয়া হইবে এবং ইহাতে শতকরা সওয়া তিন টাকা হারে সুদ দেওয়া হইবে। কেহ যদি এই

যাবে রাজী না হয় তবে সরকার এখনই তাহার ঋণ শোধ করিয়া দিবে। ঋণদাতাদের পক্ষে নূতন ঋণপত্র লইলেও লাভ থাকে। কারণ টাকা শোধ নিলে সেই টাকায় বাজারে শতকরা মাত্র তিন টাকা হারে সুদ পাওয়া যাইবে। ঋণদাতারা রাজী হইলে তাহাদের পুরাতন ঋণপত্রের বদলে নূতন ও কম সুদওয়ালা ঋণপত্র দেওয়া হয়। ইহাকে ঋণের রূপান্তকরণ বলে। অর্থাৎ বাজারে সুদের হার কমার সুযোগ লইয়া উচ্চ সুদের কাগজের বদলে কম সুদের কাগজ (অর্থাৎ ঋণপত্র) দেওয়া।

অবশ্য ইহার ফলে মোট ঋণের পরিমাণ বিশেষ কমে না। শুধু সুদের হার কমে। কিন্তু ইহার ফলে ঋণের ভার কমিবে ও প্রতি বৎসর সুদ বাবদ কম টাকা খরচ হইবে। বাকী টাকা দিয়া সরকার ধীরে ধীরে ঋণপরিশোধের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

কিন্তু এই দুই পদ্ধতিতে ঋণ শোধ দিতে বহু সময় লাগে। বর্ত্তমানে সরকারী ঋণের পরিমাণ এত বাড়িয়াছে ও সেই বাবদ এত বেশি সুদ দিতে হয় যে বহু লেখক আরো দ্রুত হারে ঋণ-পরিশোধের পদ্ধতি অবলম্বনের কথা আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে মূলংন কর বা capital levy-র আলোচনা উল্লেখযোগ্য।

মূলধনকরের প্রস্তাব প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধের সময় সরকারকে বহু টাকা ধার নিতে হইয়াছিল ও তখন সুদের হারও খুব বেশি ছিল। যুদ্ধের পর এই ঋণের বোঝা অত্যন্ত ভারী মনে হওয়াতে প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে আয়করের ন্যায় মূলধনের উপরে ক্রমবর্দ্ধমান হারে কর বসাইয়া প্রয়োজনমত রাজস্ব তোলা হউক এবং ইহা দিয়া ধার শোধ দেওয়া হউক। আয়কর বাৎসরিক আয়ের উপর ধার্য করা হয়। কিন্তু মূলধনকর যাহার যত মূলধন আছে ইহার উপর ধার্য করা হইবে। ইহা এমন হারে ধার্য করা হইবে যে ধার শোধ দিবার মত রাজস্ব তোলা সম্ভব হয়। এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক যুক্তি দেখান হইয়াছে।

এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে বলা হয় যে ইহার ফলে সরকারী ঋণ খুব তাড়াতাড়ি শোধ দেওয়া যাইবে। সাধারণ পদ্ধতিতে ঋণ শোধ দিতে গেলে বহু দিন লাগিবে এবং অনেক বৎসর ধরিয়া সুদ টানিয়া যাইতে হইবে।

যুদ্ধের সময় সাধারণত উচ্চ হারে সুদ দিয়া ধার করিতে হয়। কাজেই সুদের বোঝাও বাড়ে। বহু বৎসর ধরিয়া বেশি করিয়া কর দেওয়ার চেয়ে একসঙ্গে একটু বেশি ত্যাগ স্বীকার করিয়া ধার শোধ দেওয়াই ভাল। বহুদিন রোগভোগের চেয়ে একবার অস্ত্রোপচার করা বাঞ্ছনীয়। আজ এই মহৎ প্রচেষ্টার দ্বারা ধার শোধ দিতে পারিলে একটি বড বোঝা ঘাড হইতে নামিবে। ইহার পর বৎসর সুদ দেওয়ার জন্য অনর্থক বহু অর্থ নষ্ট হইবে না। ইচ্ছা করিলে করের হার কমান যাইবে। কিংবা সেই টাকা অন্য কোন জনহিতকর কার্যে ব্যয় করা চলিবে। দ্বিতীয়ত, অনেকে বলেন যে যুদ্ধের সময় সকলে সমান ত্যাগ করে না। যুবকেরা যুদ্ধে যোগ দেয় ও জীবন দান করিয়া দেশরক্ষা করে। কিন্তু ধনী ব্যক্তিরা যুদ্ধের সুযোগে বহু অর্থ উপার্জন করে। ধনী পুঁজিপতিরা যদি পরে মূলধনকর দিয়া যুদ্ধের ঋণ শোধ দেয় তবে ত্যাগের হিসাবে তাহারা হয়ত যুবকদের পাশে দাঁড়াইতে পারে।

কিন্তু অনেক লেখক ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন। প্রথমত, একথা সত্য নয় যে যুদ্ধের সময়ে কেবলমাত্র যুবক ও গরিব লোকেরাই ত্যাগ করে। ধনীদেরও যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় এবং তাহারাও নানা ধরনের যুদ্ধের কাজে যোগ দেয়। দ্বিতীয়ত, মূলধনকরের প্রধান দোষ হইতেছে যে এই পদ্ধতিতে যাহার আয় কম কিন্তু হয়ত সামান্য কিছু মূলধন আছে তাহাকে কর দিতে হইবে। আবার যাহার আয় অনেক বেশি কিন্তু কোন মূলধন নাই তাহাকে কোন কর দিতে হইবে না। ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে। তৃতীয়ত, এই কর একবার বসাইলে ভবিষ্যতে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। কারণ ধনী লোকদের মনে এই ভয় থাকিবে যে ভবিষ্যতে আবার কোন দিন হয়ত এই কর বসান হইতে পারে। সুতরাং সঞ্চয়ের পরিমাণ কম করিয়া বরঞ্চ এখনই ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করিলে ভবিষ্যতে মূলধন করের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হইলে দেশের ক্ষতি হইবে। চতুর্থত, সরকারী ঋণের যেমন বোঝা আছে তেমনই আবার অনেক সুবিধাও আছে। সরকারী ঋণপত্রগুলি বর্তমান আথিক জগতের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বিশেষ। ইহা সম্পূর্ণ শোধ দিলে নানা প্রকারের আর্থিক অসঙ্গতি দেখা দিবে।

মূলধনকরের পদ্ধতি প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের কোন কোন দেশে অবলম্বন করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা কম।

সমতাযুক্ত বনাম সমতাহীন বাজেট (Balanced vs. unbalanced budget): অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বহু লেখকের মত ছিল যে প্রতিবৎসরই সরকারী বাজেটে আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিয়া চলা উচিত। অর্থাৎ সরকারের মোট রাজস্বের পরিমাণ মোট ব্যয়ের সমান থাকিবে। কোন বৎসর হয়ত বিশেষ জরুরী অবস্থার জন্য বর্ধিত ব্যয় অনুযায়ী রাজস্বের পরিমাণ বাড়ান সম্ভব না হইলে অবশ্য ধার করা যাইতে পারে। কিন্তু পর বৎসর হইতে বেশি কর ধার্য করিয়া রাজস্বের পরিমাণ এমন বাড়াইতে হইবে যে, ধারের সুদ ছাড়াও আসল শোধ দেওয়ার জন্য কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ হাতে থাকিবে। এইরূপ জরুরী অবস্থার কথা বাদ দিয়া সাধারণভাবে সরকারী আয় এবং ব্যয়ের সমতা বজায় রাখিয়া বাজেট তৈয়ারি করিতে হইবে এবং সরকারী ঋণের পরিমাণ যতটা সম্ভব কম রাখাই বাঞ্ছনীয়।

এই মতের পিছনে নানা যুক্তি আছে। যেমন সরকারী রাজস্ব অপেক্ষা অধিক ব্যয় করা অনুচিত মনে না করিলে ঘাটতি পূরণের জন্য হয় বাজারে ধার নিতে হইবে কিংবা কাগজী নোট ছাপাইয়া খরচ মিটাইতে হইবে। এই দুইটি পথেই মুদ্রাস্ফীতির উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী হইবে। বিজ্ঞ লোক যেমন আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিয়া চলে, সরকারেরও তাহাই করা উচিত। তাহা না হইলে সরকারী ঋণের পরিমাণ বাড়িবে ও ইহার ফলে দেশের মধ্যে নানা অনর্থ উপস্থিত হইবে। আয়-ব্যয়ের সমতানীতি মানিয়া চলার অভ্যাস যদি একবার চলিয়া যায়, তবে অর্থসচিব দলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য নানাভাবে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে। অকাজের কুফল সব সময়ে হাতে হাতে না-ও পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং ব্যয়বৃদ্ধির কুফল যে মাঝে মাঝে উপস্থিত হইবে ইহা বলা চলে না। কিন্তু দেরী হইলেও ইহার বিষময় ফল দেখা দিবেই।

আজকালকার বহু লেখক এই মত সমর্থন করেন না। ইঁহাদের মধ্যে লর্ড কিনস্, অধ্যাপক হ্যানসেন ও লার্ণারের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের

মতে আয়-ব্যয়ের সমতাহীন বাজেট ব্যবস্থার (unbalanced budget); যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা রহিয়াছে। সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ রাজস্ব হইতে বেশি হইলে বাজেটে ঘাট্‌তি হয়। এই ঘাট্‌তি পূরণের জন্য হয় সরকারকে ধার নিতে হইবে, নচেৎ কাগজী নোট ছাপাইয়া অতিরিক্ত ব্যয় মিটাইতে হইবে। ইহাকে ঘাট্‌তি বাজেট (Deficit budget বা Deficit finance) বলে।* অনেক সময়েই বাজেট ঘাট্‌তি হওয়া সত্ত্বেও সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইবার আবশ্যকতা আছে। যেমন দেশের মধ্যে ব্যবসায় মন্দা দেখা দিলে সরকারের উচিত করের হার কমাইয়া দেওয়া ও বেশি করিয়া অর্থ ব্যয় করা। অর্থাৎ সজ্ঞানে বাজেট ঘাট্‌তি করিয়া সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ এমনভাবে বাড়ান হয় যে ইহার ফলে ব্যবসায়মন্দা দূর হয়। সুইডিস্ লেখকদের মতে ব্যবসায় মন্দার সময় সরকারী বাজেট প্রয়োজনমত ঘাট্‌তি করিতে হইবে ; আবার তেজীর সময় বাজেটে উদ্বৃত্ত (surplus) রাখিতে হইবে। করের হার বাড়াইতে হইবে ও সরকারী ব্যয় কমাইতে হইবে। মন্দার সময়কার বাজেট ঘাট্‌তি, তেজীর সময়কার বাজেট উদ্বৃত্ত দিয়া পূরণ করিতে হইবে অর্থাৎ একটি ব্যবসায়চক্র ঘুরিয়া আসিতে যে সময় লাগে সেই সময়ের মধ্যে বাজেটে আয়-ব্যয়ের সমতা আনিতে হইবে। প্রত্যেক বৎসর ইহা করিবার কোন প্রয়োজন ত নাই-ই, বরং ইহাতে ক্ষতি হইতে পারে। শুধু ইহাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ব্যবসায়চক্র ঘুরিতে যে সাত আট বৎসর সময় লাগে সেই সময়ের মধ্যে তেজী মন্দা মিলিয়া সরকারী বাজেটে আয়-ব্যয়ের সমতা যেন থাকে।

কোন্ কোন্ সময়ে ঘাট্‌তি বাজেট নীতি (Deficit financing) অবলম্বন করা ঠিক হইবে ? যুদ্ধের সময় অবশ্য বাজেট ঘাট্‌তি না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু শান্তির সময়েও কি এই নীতি সমর্থন করা যায় ? লর্ড কিন্‌সের মতে যখন দেশে ব্যাপকভাবে বেকার সমস্যা দেখা দেয়, তখন সরকার বাজেট ঘাট্‌তি করিয়াও বিভিন্ন পরিকল্পনায় এমনভাবে অর্থ ব্যয়

* আমাদের দেশে ঘাট্‌তি পূরণ (Deficit finanee) ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যখন মোট সরকারী রাজস্ব এবং ঋণলব্ধ অর্থের পরিমাণ হইতে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হয় তখন ঘাট্‌তি বাজেট বলা হয়। ঘাট্‌তি বাজেট পূরণ করিবার জন্য, সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কাগজী নোট ছাপাইয়া ইহা সরকারকে ধার দেয়। ফলে মোট অর্থের পরিমাণ বাড়ে।

[illegible] যাহার ফলে পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় (full employment) পৌঁছান যায়। আবার অনুন্নত দেশের পক্ষে এই নীতি অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর না-ও থাকিতে পারে। এই সব দেশে যদি অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পপ্রসার, কৃষির উন্নতি প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া জাতীয় আয় বাড়াইতে হয়, তবে ঘাটতি বাজেটে নীতির পথ অনুসরণ করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। ভারত সরকারও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য এই পথ বাছিয়া লইয়াছে।

ঘাটতি বাজেট নীতির (Deficit financing) পন্থা বিপদসঙ্কুল সন্দেহ নাই। একবার বাজেট ঘাটতি অভ্যাস হইয়া গেলে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে ইহা কেহ বলিতে পারে না। একটু আধটু মদ শরীরের পক্ষে হয়ত ক্ষতিকর না-ও হইতে পারে। বরং কোন কোন সময়ে ইহার ফল ভাল হইতে পারে। কিন্তু এইভাবে যদি একবার মনের সংকোচ কাটিয়া যায় এবং বিবেকের দংশন অকেজো হইয়া যায়, তবে ক্রমে মদ খাওয়ার অভ্যাস হইতে রক্ষা পাইবার কিছু থাকে না। সেইজন্য পূর্ব হইতে সাবধান হওয়া ভাল। যদি ঘাটতি বাজেট করিতেও হয়, তবে সে পথে খুব সাবধানে চলা প্রয়োজন। অর্থাৎ ঘাটতির পরিমাণ যতদূর সম্ভব কম রাখার চেষ্টা করিতে হইবে। দেশের উৎপাদন অদূর ভবিষ্যতে যে পরিমাণ বাড়ান সম্ভব হইবে তাহা হিসাব করিয়া বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ঠিক করা উচিত।

Exercises

Q. 1. What are the different forms of public debt ? Suggest means by which the burden of public debt may be diminished. (C. U. 1951, 1939 ; Mad. 1936, '35, '34).

Q. 2. Examine the purposes for which public debt is generally incurred. (C. U. B. Com. 1954, 1949, '46, '43 ; Viswa. 1955 ; Dacca 1943).

Q. 3. State the purposes for which public debts may be legimately incurred by the government. (C. U. B. Com. 1954).

Q. 4. Discuss the main purposes for which loans and taxes should be used by the State. (C. U. 1940 ; Dacca 1944).

Q. 5. Write notes on deficit financing. (C. U. B.A. 1956 ; B. Com. 1957).

Q. 6. What are Public Debts ? How do they affect our economic life ? (C. U. 1953).

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ

(Economic Activities of the State)

আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের যুগে লোকে অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ পছন্দ করিত না। কিন্তু সেদিন অতীত হইয়াছে। বস্তুত সর্বযুগেই রাষ্ট্র কোন না কোন প্রকারে অর্থনৈতিক সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করিত। তবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদের প্রাধান্য হেতু উনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ন্যূনতম ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার পূর্বেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বাড়িতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে এই নিয়ন্ত্রণের পরিধি বিস্তৃত হয়। সর্বপ্রকার উপকরণ যুদ্ধের প্রয়োজনে লাগাইবার জন্য সরকার অর্থনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হয়। ১৯৩০ সালের পরে পৃথিবীব্যাপী মন্দার (Great Depression) সময় বেকারসমস্যা দেখা দেয়, এবং ইহার সমাধানের জন্য রাষ্ট্রকে বহু প্রকারের কাজ করিতে হয়। ক্রমশ লোকে বুঝিতে পারিল যে, পূর্ণনিয়োগ বজায় রাখা রাষ্ট্রের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা করার প্রয়োজন। অতএব বর্তমানের রাষ্ট্র ক্রমেই অর্থনৈতিক কার্যকলাপে যোগদান করিতে বাধ্য হইতেছে।

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায় :— শিল্প নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিকস্বার্থ রক্ষা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক বীমাব্যবস্থা প্রবর্তন, ধনসাম্য প্রতিষ্ঠা, ব্যবসায়চক্র নিয়ন্ত্রণ এবং বেকারসমস্যা সমাধান ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ।

রাষ্ট্র ও শিল্প (The State and Industry): রাষ্ট্র শিল্প নিয়ন্ত্রণের জন্য যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করে ইহাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়— নিয়ন্ত্রণ, একচেটিয়া ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয়করণ।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনার ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ক্রমশঃই বাড়িতেছে। সাধারণত ব্যবসায় আরম্ভ করার পূর্বে সরকারের নিকট

হইতে লাইসেন্স বা অনুমোদনপত্র লইতে হয়। যদি যৌথব্যবসায় হয়, কোম্পানী আইন অনুসারে গঠনতন্ত্র ও কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়। ফ্যাক্টরী আইন অনুসারে কারখানা প্রস্তুত করিতে হয়। যদি যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হয় অথবা পণ্য রপ্তানি করিতে হয় তবে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের (Exchange Control) নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে হয়। সরকারী নিয়ন্ত্রণের তালিকা ক্রমেই দীর্ঘ হইতেছে। এই সব নিয়ন্ত্রণের প্রধান উদ্দেশ্য—(১) সমাজনীতি বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করা, (২) প্রতিযোগিতার কুফল বন্ধ করা, (৩) সুপরিকল্পিত ভাবে অর্থনৈতিক উপকরণগুলির উন্নতি করা।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করে। একচেটিয়া কারবার বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রায় সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা কমিয়া যাইতেছে এবং কয়েকটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ক্রেতাদের শোষণ করিতেছে। অতএব রাষ্ট্র বাধ্য হইয়া মূল্য ও বিক্রয়ের অন্যান্য শর্ত নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। আমেরিকায় একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপ অনুসন্ধান করিবার জন্য Federal Trade Commission আছে।

শিল্পের জাতীয়করণ (Nationalisation of industry): রাষ্ট্র কর্তৃক শিল্প জাতীয়করণের প্রশ্ন বর্তমান জগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। শিল্প জাতীয়করণের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। সমাজতান্ত্রিকদের মতে উৎপাদনের সব উপকরণ রাষ্ট্রের মালিকানায় আনা উচিত। ইহা ছাড়া একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতেছে এবং ইহাদের কার্যকলাপ ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ ক্রমেই শক্ত হইয়া উঠিতেছে। অতএব এইগুলিকে জাতীয়করণ করা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। তৃতীয়ত, দেশরক্ষার জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিতে হইলে কোন কোন শিল্পের জাতীয়করণ সমর্থন করা যায়। অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা এই পর্যায়ে পড়ে। অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে এত বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয় যে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইহা বহন করা সম্ভব নহে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রই শিল্প পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

অতএব দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে শিল্প জাতীয়করণ সমর্থনযোগ্য। কিন্তু শিল্প জাতীয়করণের পথে কতদূর অগ্রসর হওয়া উচিত হইবে, ইহা

অনেকটা রাষ্ট্রের অর্থাৎ রাষ্ট্রনিযুক্ত কর্মচারিবৃন্দের কর্মদক্ষতা এবং সাধুতার উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রের কর্মচারিবৃন্দ সাধু ও দক্ষ না হইলে জাতীয়করণ নীতি বিফল হইবে। তাহা ছাড়া জাতীয়করণের ফলে নানাপ্রকার সমস্যা দেখা দেয়। জাতীয় শিল্প পরিচালনা করার সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি কি? সাধারণত বিশেষজ্ঞ ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি লইয়া পরিচালকসমিতি গঠিত হয়। কিন্তু জাতীয় শিল্পের আকার যদি "সর্বোত্তম" (optimum) আকারের চেয়ে বেশি হয়, তবে দক্ষতা কম হইবে এবং ব্যয় বাড়িবে। ইহাতে আর একটি বিপদ আছে। যে সব সরকারী কর্মচারী শিল্প পরিচালনা করে, তাহাদিগকে আইনসভার নিকট জবাবদিহি করিতে হয়। অতএব তাহারা বেশি ঝুঁকির কাজ লইতে চাহিবে না।

রাষ্ট্র ও শ্রমিক (The State and Labour): শ্রমিকস্বার্থ রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্র বহু উপায় অবলম্বন করিয়াছে। অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতার ফলে শ্রমিকেরা শোষিত হয়। তাই অল্পবয়স্ক শিশুদের কারখানায় নিয়োগ করা বন্ধ করা হইয়াছে, রাত্রিতে স্ত্রীলোকদের কাজ করান বন্ধ করা হইয়াছে, কাজের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্র তাহাদের সর্বনিম্ন বেতনের হার ঠিক করিবার ভার নিয়াছে, শ্রমিক সংগঠন আইনসঙ্গত করা হইয়াছে এবং সংঘের মারফত বেতন নির্ধারণ করিতে মালিককে বাধ্য করিয়াছে।

রাষ্ট্র এবং সমাজসেবামূলক কার্য (The State and social services): অনেক রাষ্ট্র নাগরিকদের দারিদ্র্য-মুক্তির আশ্বাস দিয়াছে; তাহাদের জন্য সমাজ সেবামূলক কার্যের ব্যবস্থা করিয়াছে। সামাজিক বীমার মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা, অসুস্থতার সময় আর্থিক সাহায্য, বেকারভাতা, বার্ধক্য ভাতা ইত্যাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। বিধবা এবং অভিভাবকহীনেরাও রাষ্ট্র হইতে সাহায্য পায়। সর্বনিম্ন জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা এবং জীবনের নিরাপত্তা রক্ষা করাই এই সব পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (The State and foreign trade): রাষ্ট্রের সহিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্পর্ক বহুদিকের। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে Mercantilist লেখকেরা বলিতেন যে বাণিজ্য উদ্বৃত্তের

জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। আমদানি কমাইবার জন্য আমদানি শুল্ক এবং রপ্তানি বাড়াইবার জন্য নানাপ্রকারের সাহায্যের কথা তাঁহারা বলিতেন। তখনকার রাষ্ট্র এই নীতি অনুসরণ করিত। Adam Smith প্রভৃতি লেখকেরা Mercantilistদের চিন্তাধারার সমালোচনা করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে তুলিয়া লওয়া হইল এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোন নিয়ন্ত্রণ রহিল না। কিন্তু তারপর সর্বত্র বিশেষত আমেরিকায়, প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। অবশেষে ১৯২৯ সালের ব্যবসায় মন্দার পর ইংল্যাণ্ড অবাধ বাণিজ্যনীতি পরিত্যাগ করিল। দেশীয় শিল্পের উন্নতি এবং বাণিজ্য ঘাটতি কমাইবার জন্য রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিল। যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধের পরে বাণিজ্যঘাটতি কমাইবার জন্য, অতি আবশ্যকীয় কাঁচা মাল ও ঘাটতি কমাইবার জন্য এবং dollar ঘাটতি পূরণ করার জন্য রাষ্ট্র আমদানি এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে।

রাষ্ট্র ও আয়ের অসাম্য (The State and inequality of incomes): ধন ও আয় বণ্টনের অসাম্যের কুফল সম্পর্কে পূর্বের একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে এই অসাম্য দূর করা সর্বত্রই রাষ্ট্রের বিশেষ দায়িত্ব বলিয়া বিবেচিত হয়। জাতীয় আয় বণ্টনের অসাম্য দূর করার জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা হইয়াছে—(ক) বর্ধমান হারে আয়কর এবং উত্তরাধিকারকর ধার্য করিয়া ধনিকসম্প্রদায়ের নিকট রাজস্বের অধিক অংশ আদায় করা হয়। আবার দরিদ্রশ্রেণীর জন্য সমাজসেবামূলক কাজে ব্যয় করা হয়। অবশ্য এইসব পদ্ধতির সীমা আছে। আয়করের হার বেশি বাড়াইলে সঞ্চয় এবং ব্যবসায়ের উদ্যোগ কমিতে পারে। ইহাছাড়া যে দেশে নৈতিক আবহাওয়া উন্নত নহে, সেখানে লোকে প্রভূত পরিমাণে কর ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে। ইহার ফলে সাধু করদাতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর অসাধু ব্যক্তিরা লাভ করে।

যুদ্ধ ও রাষ্ট্র (The State and war): যুদ্ধের প্রয়োজনে রাষ্ট্র নানা প্রকারে অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ভিত্তিতে যুদ্ধ চালান যায় না। যুদ্ধ চালাইতে হইলে সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ

দিতে হয়। মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ এবং উৎপাদনের উপকরণ যুদ্ধের কাজে লাগাইবার জন্য রাষ্ট্র মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং রেশনিং প্রথা প্রবর্তন করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র বিনিয়োগ ও বৈদেশিক বিনিময়ও নিয়ন্ত্রণ করে।

যুদ্ধের পরেও এই প্রকার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয় না। প্রথমত, হঠাৎ এইসব নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, সুপরিকল্পিতভাবে যুদ্ধের উপকরণগুলিকে শান্তির কাজে লাগাইতে হয়। সেইজন্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা আছে। তৃতীয়ত, যুদ্ধের সময় যে সব জিনিসের ঘাটতি দেখা দেয়, যুদ্ধের পরেও কিছুদিন ঘাটতি চলিতে থাকে। সেইজন্য যুদ্ধের পরেও কিছুদিন পর্যন্ত রেশনিং ব্যবস্থা চালু রাখিতে হয়।

রাষ্ট্র ও ব্যবসায়-চক্র (The State and the Business cycle) : প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে সর্বত্র যে বেকার সমস্যা এবং ব্যবসায়ের উত্থান-পতন দেখা দেয় তাহা সমাধান করার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র নানা উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। বহু আলোচনার ফলে ব্যবসায়চক্র সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান অনেক বাড়িয়াছে। আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে ব্যবসায়-চক্র নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে। ঠিকমত আর্থিক ও সরকারী আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণনীতি অবলম্বন করিয়া ব্যবসায়-চক্র নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইতে পারে। এ বিষয়ে আর্থিক নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা বহুদিন যাবৎ স্বীকৃত হইয়াছে। ১৯৩৪ সালের পর লর্ড কিনসের আলোচনার প্রভাবে লোকেরা সরকারী আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কার্যকারিতা উপলব্ধি করিয়াছে। মোট চাহিদার ঘাটতির জন্যই ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়। কর কমাইয়া বা ব্যয় বাড়াইয়া এই ঘাটতি পূরণ করা যায়। তেজীর সময় করবৃদ্ধি ও ব্যয়হ্রাস করা উচিত। ব্যবসায়ীরা কম মূলধন বিনিয়োগ করিলে সরকারী মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইয়া ঘাটতি পূরণ করা উচিত।

Exercises

Q. 1. What are the considerations that should determine the nationalisation of industries in a country? (C. U. 1954).

Q. 2. Account for the growth of state interference in the field of industry. In what cases is it desirable for the state to engage directly in production ? (C. U. B. Com. 1950, 1944).

Q. 3. What steps are being taken to build the Socialistic Pattern of Society ? (Viswa. 1956).

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

(The State and economic planning)

পরিকল্পনার সংজ্ঞা (Definition of economic planning): আজকাল বহু দেশেই রাষ্ট্র অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য নানারূপ পরিকল্পনা করিয়া তদনুযায়ী কাজ আরম্ভ করিয়াছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কাহাকে বলে? কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে সমাধান করার ব্যবস্থাকে পরিকল্পনা বলা হয়। যেমন কোন জায়গায় যাইতে হইলে কোন্ ট্রেনে গেলে সুবিধা হয়, কি কি মাল সঙ্গে লইতে হইবে, কত টাকা লইয়া যাওয়া ভাল ইত্যাদি বহু বিষয় পূর্ব হইতে ঠিক করিয়া রাখিলে যাত্রাপথে সুবিধা হয়। ইহাকে যাত্রা সম্বন্ধীয় পরিকল্পনা বলা চলে। সেই রকম অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অর্থ হইতেছে যে, কোন বিশেষ বিশেষ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উৎপাদনের উপকরণগুলির সুষ্ঠু ব্যবহারের ব্যবস্থা করা। যেমন ধরা যাক, ঠিক করা হইল যে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমাদের জাতীয় আয় অন্তত ৫০ ভাগ বাড়াইতে হইবে। উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণগুলি কিভাবে প্রয়োগ করিলে, কত পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করিলে এবং কত লোককে কিভাবে কাজে লাগাইলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, সে সম্বন্ধে সুচিন্তিত স্কীম তৈয়ারি করা হইল। এই ধরনের স্কীমকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (economic planning) বলা হয়।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রধান উপাদান (Elements of planning): অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কয়েকটি প্রধান উপাদান আছে। স্কীমগুলি তৈয়ারি এবং সেই অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান (central authority) গঠন করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যে সাধারণত একটি প্লানিং কমিসন গঠন করা হয়। প্লানিং কমিসনের কাজ হইল বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈয়ারি করা ও তদনুযায়ী কাজ করা। কমিসনের প্রথম কাজ হইল দেশের কৃষিজাত, খনিজ ও অন্যান্য সম্পদ সম্বন্ধে একটি হিসাব তৈয়ারি করা। অর্থাৎ আমাদের হাতে বর্তমানে কি কি

সম্পদ বা উৎপাদনের উপকরণ আছে ইহার হিসাব-নিকাশ করিতে হইবে। ইহা আমাদের বর্তমানের সামর্থ্য নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন। আমাদের বর্তমানে কত মূলধন আছে বা বৎসরে কত মূলধন সঞ্চয় করিতেছি ইহা জানা থাকিলে আরো কতটা করিতে হইবে তাহা নির্ণয় করার সুবিধা হয়। প্লানিং-এর দ্বিতীয় কথা হইল, কোন্ শিল্পে কতটা মূলধন বিনিয়োগ করিলে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হইবে ও আমাদের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে ইহা পূর্বে ঠিক করিয়া দেওয়া হইবে। মূলধনের পরিমাণ সীমাবদ্ধ এবং নানা শিল্পে ইহার চাহিদা আছে। এইগুলির মধ্যে কোন্‌টিতে কতটা বিনিয়োগ করিলে আমাদের জাতীয় আয় ৫০ পারসেণ্ট বাড়ান সম্ভব হইবে? প্লানিং কমিসনকে সমস্ত দিক বিচার করিয়া ইহা ঠিক করিতে হইবে? প্লানিং-এর তৃতীয় কথা হইল সমস্ত দিকে একসঙ্গে প্রয়োজনমত অগ্রসর হওয়ার ব্যবস্থা করা (simultaneous advance on all fronts)। যেমন চিনির কলের সংখ্যা বাড়াইবার স্কীম করিলে সঙ্গে সঙ্গে আখের চাষ বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইভাবে কোন্ শিল্পের সহিত কোন্‌টির কি সম্বন্ধ সেই অনুযায়ী বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা করিতে হইবে।

পরিকল্পনাকারী বনাম পরিকল্পনাহীন অর্থনৈতিক সংস্থা (Planned vs. Private Enterprise or unplanned economy): যে-দেশে সরকার বা প্লানিং কমিসন একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্পের প্রসার নিয়ন্ত্রণ করে সে দেশের অর্থনৈতিক সংস্থাকে পরিকল্পনাকারী অর্থনৈতিক সংস্থা বলা হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা সব দেশে প্রচলিত নাই। কিংবা যে দেশে আজ প্রচলিত আছে, কিছুদিন পূর্বে ইহা ছিল না। পরিকল্পনাহীন অর্থনৈতিক সংস্থায় (unplanned economy) কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের বা সরকারের নির্দেশমত শিল্পপ্রসার হয় না। যে-কোন ব্যবসায়ী নিজের ইচ্ছামত যেখানে সে সবচেয়ে বেশি লাভ পাইবে আশা করে, সেখানেই মূলধন বিনিয়োগ করিতে পারে। এ সম্বন্ধে তাহাকে কোন সরকারী পরিকল্পনা মানিয়া চলিতে হয় না। কেবলমাত্র নিজের লাভ কিংবা অন্যান্য সুবিধার কথা হিসাব করিয়া সে ঠিক করে কোন্ শিল্পে মূলধন খাটাইবে, কোন্ জিনিস তৈয়ারি করিবে এবং কিভাবে তাহা বিক্রয়

করিবে। এই ব্যবস্থাকে অনেক সময়ে স্বাধীন উদ্যোগ সংস্থা বা private enterprise economy বলা হয়।

এই unplanned বা private enterprise economy বা পরিকল্পনাহীন স্বাধীন উদ্যোগ সংস্থার অনেক গুণ আছে সন্দেহ নাই। ইহার ফলে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রচুর অর্থনৈতিক উন্নতি হইয়াছে এবং তাহাদের ধনসম্পদবৃদ্ধিও কম হয় নাই। স্বাধীন উদ্যোগ সংস্থার বলেই আজ আমেরিকা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ধনী বলিয়া গণ্য হইয়াছে। সেখানকার দরিদ্র ও আমাদের মধ্যবিত্ত ও অনেক ধনী লোক অপেক্ষা স্বচ্ছল জীবনযাপন করে। এই ব্যবস্থায় উপযোগী পুরুষসিংহ নিজের উন্নতির পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে গিয়া নূতন নূতন শিল্প ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবে এবং এইভাবে নানাপ্রকারে দেশকে সমৃদ্ধ করিবে। সুতরাং এই ব্যবস্থার যে বহু গুণ আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার যে, সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীর দেশ আমেরিকাতে ১৯৩০ সালের যুগে বেকারের সংখ্যাও সবচেয়ে বেশি ছিল। লর্ড কীন্স বহু পূর্বেই দেখাইয়াছেন যে, এই ধরনের অর্থনৈতিক সংস্থার সবচেয়ে বড় দোষ হইতেছে under employment equilibrium। অর্থাৎ পূর্ণনিয়োগের অবস্থায় পৌঁছিবার বহুপূর্বেই এই সমস্ত দেশে যাহাকে অর্থশাস্ত্রীরা equilibrium বা ভারসাম্যাবস্থা বলেন তাহা বজায় থাকিতে পারে। ফলে এই সব দেশে চিরকালই বহু লোক বেকার থাকিয়া যাইবে। বেকারসমস্যা এ যুগের গুরুতর সমস্যার মধ্যে একটি। দেশ যতই ধনী হউক না কেন, সেখানে বহু লোক বেকার বসিয়া থাকিবে—এ অবস্থা জনসাধারণ ও তাহাদের সরকার কোনমতেই মানিয়া লইতে পারে না। কাজেই বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারকে নানাপ্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছে। সরকার যদি একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনানুযায়ী দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির নিয়ন্ত্রণ করে, তবে বেকারসমস্যার সমাধান হইতে পারে।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীন উদ্যোগসংস্থার আর একটি দোষ হইল যে ইহাতে ব্যবসায়চক্রের পরিবর্তন সর্বদাই ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ আজ ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল চলিল, বুম বা তেজীর ভাব দেখা দিল। ফলে উৎপাদন বহু প্রকারে বাড়িল ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটিল। আবার দুই-এক বৎসরের মধ্যেই হয়ত

দুর্যোগ উপস্থিত হইল। তখন ব্যবসায় ফেল করিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং উৎপাদন কমিল ও ছাঁটাই শুরু হইল। পরিকল্পনাহীন অর্থনৈতিক সংস্থায় ব্যবসায়চক্রের ঘূর্ণন বন্ধ করা সহজ নহে। সেইজন্য সরকারকে বাধ্য হইয়া ঠিকমত পরিকল্পনা করিয়া এমনভাবে কাজ চালাইতে হয় যাহাতে ব্যবসায়চক্রের উত্থান-পতন বন্ধ হইয়া যায়।

তৃতীয়ত, private enterprise economy-র আর একটি দোষ এই যে, ইহাতে আয়ের বড় বেশি বৈষম্য দেখা যায়। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আয়ের এত পার্থক্য অর্থনৈতিক বা সামাজিক কোনদিক দিয়াই বাঞ্ছনীয় নহে। সুতরাং বর্তমান যুগের সরকারকে আয় বণ্টনের বৈষম্য কমাইবার জন্য অর্থনৈতিক উন্নতির পথ নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিকমত ব্যবস্থা করিলে অর্থনৈতিক প্রগতির পথেও কোন বাধা দেখা দিবে না। অথচ ধনী দরিদ্রের প্রভেদ অনেক কমিয়া যাইবে।

আসল কথা এই যে, প্রায় সর্ববিষয়েই private enterprise বা পরিকল্পনাহীন ব্যবস্থা অপেক্ষা planned বা পরিকল্পনাযুক্ত ব্যবস্থা ভাল। কাশ্মীর যাওয়ার পথে কোন প্লান না করিয়া যদৃচ্ছভাবে যাতায়াত করিলে হয়ত লক্ষ্যস্থলে পৌছান অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব হইতে হিসাব করিয়া ঠিকমত প্লান অনুযায়ী যাওয়ার ব্যবস্থা করিলে যাত্রাপথ সহজ হয় ও অতি অল্প সময়ে ও কম অর্থব্যয়ে কাশ্মীর ভ্রমণ শেষ করা যায়। বিশেষ করিয়া অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে প্ল্যান করিয়া অগ্রসর হওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নাই। সাধারণ পথে স্বাধীন উদ্যোগ সংস্থার ভিতর দিয়া যতটা অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হইবে আমরা ইহার চেয়ে অনেক বেশি হারে দেশের উন্নতি চাই, অনেক বেশি মাত্রায় জাতীয় আয়বৃদ্ধি করাইতে চাই। সামান্য মূলধন ও সঞ্চিত অর্থের যে কোন অপব্যবহার না হয়, কিংবা ভুলের জন্য নষ্ট না হইয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হওয়াই আমাদের পক্ষে ঠিক হইবে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যে উন্নতি করিতে ৫০ বৎসর লাগিয়াছে, আজ তাহাদের অভিজ্ঞতার সুযোগ লইয়া আমরা যদি সেই উন্নতিটুকু ১৫।২০ বৎসরে করিতে চাই, তবে ঠিকমত প্ল্যান অনুযায়ী করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার গুণাগুণ (Merits and demerits of economic planning) **:** অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার অনেক সুবিধা আছে। অল্প সময়ে উপকরণগুলির সদ্ব্যবহার ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করার পরিকল্পনা অপরিহার্য। ইহার দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান, প্রতি-যোগিতার সমাজবিরোধী ফল এবং অসাম্য দূর করা যায়। কিন্তু পরিকল্পনা করার অসুবিধাও আছে। প্রথমত, একটি কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রতিষ্ঠানের উপর পরিকল্পনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকার ফলে শাসনব্যবস্থা জটিল হয় এবং সব কাজে দেরি হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার নষ্ট হইতে পারে ও স্বাধীনভাবে আমরা আমাদের অধিকার ভোগ করিতে পারি না। সরকারী কর্মচারী দ্বারা জীবনের সব দিক নিয়ন্ত্রিত হয়। তৃতীয়ত, পরিকল্পনার ফলে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষমতা প্রভূত পরিমাণে বাড়ে। ইহার ফলে দুর্নীতি, কালো-বাজার ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। পরিকল্পনার ফলে দেশের নৈতিক মান নামিয়া যাওয়ার আশংকা আছে। চতুর্থত, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ভুলভ্রান্তির জন্য দেশের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে।

আধুনিক রাষ্ট্রগুলি এইজন্য উভয় সংকটে পড়িয়াছে। কতকগুলি সামাজিক লক্ষ্য পূর্ণ করা এবং সামাজিক কুফলগুলি দূর করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এইগুলির দূর করিতে যাইয়া রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বাড়িতেছে। যদি দুর্নীতিপূর্ণ ও অনিপুণ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং ব্যক্তিস্বাধানতা হ্রাস পায় তবে কোনদিকে লাভ বেশি ইহা সমস্যার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই সব দুর্ভাবনা ও দুর্বিপাক সত্ত্বেও অধিকাংশ রাষ্ট্রই পরিকল্পনা করিয়া দ্রুত আর্থিক উন্নতির পথ বাছিয়া লইয়াছে। বোধ হয় অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে অন্য আর কোন পন্থা নাই।

Exercises

Q. 1. Discuss the characteristic features of a Private Enterprise Economy and a Planned Economy. (C. U. 1957).

Q. 2. What do you mean by economic planning ? Discuss the arguments for and against economic planning.

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

সমাজতন্ত্রবাদ

(Socialism)

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহা পরিবর্তন করার জন্য নানাধরনের প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহার মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদ একটি বিশিষ্ট মতবাদ। রাসিয়ায় সোভিয়েট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সমাজতন্ত্রবাদের আলোচনার বাস্তব গুরুত্ব বাড়িযাছে। এই অধ্যায়ে সমাজতন্ত্রবাদেব কয়েকটি দিক আলোচনা কবা হইবে।

সমাজতন্ত্রবাদ কি ? (What is socialism ?) : সমাজতন্ত্রবাদের সর্ববাদীসম্মত কোন সংজ্ঞা নাই। কিন্তু ইহার কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে। সর্ববিধ উপকরণের সামাজিক মালিকানাই সমাজতন্ত্রবাদ। ধনতন্ত্রবাদে জমি, খনি, কারখানা, রেলপথ ইত্যাদি উৎপাদনের উপকরণগুলি মুষ্টিমেয় লোক ভোগ করে। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না। রাষ্ট্র উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক এবং সর্বসাধারণের উপকারার্থে সেগুলি পরিকল্পনা করে। তাহার ফলে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি দরিদ্র জনসাধারণকে শোষণ করিতে পারে না। Dr. Tugan-Barano Wskey বলিযাছেন যে, সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি শোষনমুক্ত হয়। লাভের ইচ্ছার স্থলে সমাজের সর্বাধিক কল্যাণের দ্বারা উৎপাদনব্যবস্থা চলিতে থাকে। কোন্ জিনিস কি পরিমাণে তৈয়ারি হইবে তাহা লাভের দ্বারা নির্ধারিত হয় না, সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের ভিত্তিতে নির্ণীত হয়। অনিয়ন্ত্রিত উৎপাদনের স্থলে সমগ্র উৎপাদন সুপরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ সমাজের কল্যাণের জন্য উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় সামঞ্জস্য বিধান করেন।

মার্ক্স ও সমাজতন্ত্রবাদ (Marx and socialism) : সমাজতন্ত্রবাদের ইতিহাস বহু পুরাতন হইলেও Karl Marx-এর নামের সহিত ইহা বিশেষভাবে জড়িত। Marx-এর পূর্বে ইংল্যাণ্ডে Robert Owen এমন সমাজের কল্পনা করিয়াছিলেন যেখানে সম্পত্তি ও লাভ সমানভাবে বণ্টন

করা হইবে। ফ্রান্সের Charles Fourier-এরও অনুরূপ মতবাদ ছিল। ইহাদিগকে কল্পনাবিলাসী সমাজতন্ত্রবাদী বলা হয়। Marx এবং Engles-এর রচনাগুলি আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি। ১৮৪৮ সালে তাঁহারা Communist Menifesto রচনা করেন। এই পুস্তকে তাঁহারা ধনতন্ত্রবাদের ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করিয়াছেন। ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যাই (Materialistic interpretation of history) Marx-এর তত্ত্বের ভিত্তি। শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফলেই সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস রচিত হয়। যেখানেই অর্থ নৈতিক অসাম্য আছে, সেখানেই দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্বের ফলে যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে তাহাই দেশের ইতিহাস। উৎপাদন ব্যবস্থার ফলেই শ্রেণীবৈষম্য দেখা যায়। ইতিহাসের সব স্তরেই শ্রেণীবৈষম্য ছিল। পুরাকালে দাস, সাধারণ ও অভিজাত শ্রেণী ছিল। মধ্যযুগে ভূমি-দাস, দাস, Knight, ভূমধ্যকারী শ্রেণী ছিল। এই শ্রেণীগুলির মধ্যে বাদ-বিসম্বাদের ফলে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা গঠিত হইয়াছিল। ধনতান্ত্রিক সমাজ এই ক্রমবিকাশের শেষ ধাপ। পুঁজিপতিরা ভূমধ্যকারীদের ক্ষমতাচ্যুত করে। পুঁজিপতিদের ক্ষমতাবৃদ্ধি হইল ধনতন্ত্রের মূলকথা।

কিন্তু ধনতন্ত্রের বিকাশের মধ্যেই তাহার বিনাশের বীজ নিহিত আছে। ধনতান্ত্রিক সমাজ পুঁজিপতি ও শ্রমিক এই দুইভাগে বিভক্ত এবং এই দুই শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব বর্তমান। দুইটি কারণে ধনতান্ত্রিক সমাজের অবসান ঘটিবে। প্রথমত, মুষ্টিমের লোকের হাতে অর্থসম্পদ কেন্দ্রীভূত হইবে। বৃহৎ শিল্পের বিকাশের ফলে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়ত, শ্রমিকদের সংখ্যা ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে উৎপাদনব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হইলে শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে। শুধু শ্রমিকদের সংখ্যাই বাড়িবে না, তাহাদের শোষণও বাড়িবে। অবশেষে শ্রমিকশ্রেণী সংঘবদ্ধ হইয়া বিদ্রোহ করিবে। সরকার উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক হইবে এবং শ্রমিকদের স্বার্থে শিল্প পরিচালিত হইবে। এই বিদ্রোহের ফলে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ইতিহাসের গতির ইহাই মার্কসীয় ব্যাখ্যা। এই সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করা যাইতে পারে। ধনতন্ত্রের বিকাশের ফলে উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উৎপাদন পুঞ্জীভূত হওয়ার ফলে মালিকানা কেন্দ্রীভূত হয় নাই।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সংখ্যা অবশ্য কমিতেছে। কিন্তু যৌথ কোম্পানী ব্যবস্থার ফলে বৃহৎ ব্যবসায়ের ক্ষুদ্র মালিকানা সম্ভব হইয়াছে। ইহাছাড়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে শ্রমিকদের দারিদ্র্য বাড়ে নাই। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় অসাম্য আছে, কিন্তু Marx-এর পর তাহা বাড়ে নাই।

সমাজতন্ত্রের প্রকারভেদ (Types of socialism) : ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা অনুসারে ধনতন্ত্রের পর সমাজতন্ত্র আসিবে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সমাজতন্ত্রবাদীরা বুঝিতে পারিল যে Marx-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সমস্ত বিষয় ঘটিতেছে না। ইতিমধ্যে সমাজতন্ত্র-বাদীদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়িতেছে। ইহার ফলে সমাজতন্ত্রবাদীরা দুইভাগে বিভক্ত হইল—অভিব্যক্তিবাদী ও বিপ্লবী। অভিব্যক্তিবাদীরা ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মারফত ক্ষমতালাভের পক্ষপাতী। ইংল্যাণ্ডের Fabian Socialist-রা এই পর্যায়ে পড়ে। বিপ্লবীরা সংগ্রাম ও বিপ্লবের দ্বারা ধনতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটাইয়া শ্রমিকতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী।

ক্রমশ সমাজতন্ত্রবাদের আরও শ্রেণীবিভাগ দেখা গেল। উৎপাদন উপকরণের রাষ্ট্রায়াত্বকরণ ছাড়াও ফ্রান্সে আরও একটি বৈপ্লবিক মতবাদ দেখা দিল। ইহা Syndicalism নামে অভিহিত। এই মত অনুসারে রাষ্ট্র সব রকমের শিল্প পরিচালনা করিবে না; শিল্পগুলি সেই শিল্পের শ্রমিকসংঘ দ্বারা পরিচালিত হইবে। অতএব রাষ্ট্র হইবে স্বতন্ত্র শিল্পগোষ্ঠীর সমষ্টি। Syndicalist-রা স্থানীয় ধর্মঘট, সাধারণ ধর্মঘট ইত্যাদির দ্বারা ধনতন্ত্রের অবসান করিতে চায়।

ইংল্যাণ্ডে আর একটি মতবাদ দেখা দিল। এই মত অনুসারে রাষ্ট্র থাকিবে এবং উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু পরিচালনার ভার রাষ্ট্রের হাতে থাকিবে না; শ্রমিক, সুদক্ষ কর্মী ও পরিচালকদের হাতে থাকিবে। যেমন রেলওয়ে গোষ্ঠীর (guild) দ্বারা রেলওয়ে পরিচালিত হইবে। এই মতবাদকে Guild Socialism বলে। ইহা Syndicalism এবং Collectivism-এর সমন্বয়ের ফল।

সাম্যবাদীরা (Cammunists) তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। সাম্যবাদীরা মনে করে যে, বলপ্রয়োগের দ্বারা অবিলম্বে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সমাজতন্ত্রবাদীদের মত সাম্যবাদীরা রাজনৈতিক গণতন্ত্র, সার্বজনীন

ভোটাধিকার অথবা অধিকাংশের শাসনে বিশ্বাস করে না—অবশ্য ১৯৩৬ সালের পর রাসিয়ায় ঐগুলি প্রবর্তিত হইয়াছে। বিপ্লবের দ্বারা "শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব" (dictatorship of the proletariat) প্রতিষ্ঠা করাই সাম্যবাদীদের উদ্দেশ্য। অন্যান্য সাম্যবাদের তুলনায় বণ্টনব্যবস্থাও পৃথক। "প্রত্যেকে ক্ষমতা অনুসারে উৎপাদন করিবে এবং প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করিবে।" ইহাই সাম্যবাদী বণ্টনের প্রধান সূত্র।

সোভিয়েট রাসিয়ার সাম্যবাদ (Communism in Soviet Russia): রাসিয়ার সাম্যবাদীসমাজের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ১৯১৭ সালে ক্ষমতালাভ করার অব্যবহিত পরে সাম্যবাদীরা কৃষিজমি জাতীয়করণ করিয়াছিল। উদ্বৃত্ত ফসল সরকারকে দেওয়ার শর্তে কৃষকদের জমি দেওয়া হইয়াছিল। ১৯১৯ সালের মধ্যে খনি, কারখানা, ব্যাঙ্ক, যানবাহন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জাতীয়করণ করা হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতে অসুবিধা দেখা দিল। কৃষিনীতির ফলে উৎপাদন কমিয়া গেল। বিদেশ হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণ যন্ত্রপাতি, রেলপথ ইত্যাদি পাওয়া যায় নাই; পূর্ববর্তী বিশেষজ্ঞ এবং পরিচালকদের সাহায্য পাওয়া যায় নাই। উৎপাদনব্যবস্থা এত বিপর্যস্ত হইল যে, সরকার পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইল। নূতন অর্থনৈতিক নীতি (NEP—New Economic Policy) প্রয়োগ করা হইল। কৃষকদের উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রয় করার অধিকার দেওয়া হইল। দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও ক্ষুদ্রশিল্পে ব্যক্তিগত উদ্যোগ চলিতে দেওয়া হইল। বিদেশী অথবা দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ীদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইল (যেমন Lena স্বর্ণখনি)। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত এই নীতি অনুসরণ করা হইল, তাহার পর বিরাট পরিবর্তন হইল। শিল্পায়ন ও কৃষি উন্নতির জন্য পরিকল্পনা করা হইল। একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইল এবং তাহাতে শিল্প, কয়লা, বৈদ্যুতিক শক্তি, যন্ত্রপাতি ও ট্রাকটর তৈয়ারির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইল। ১৯২৯ সালে যৌথ কৃষি (Collectiv-sation) নীতি অনুসরণ করা হইল। বড় বড় যৌথ খামারের হাতে জমি, পশু, ট্রাকটর ও কৃষির অন্যান্য যন্ত্রপাতি দেওয়া হইল। অনেক কৃষক এই নীতির বিরোধিতা করিল, কিন্তু বলপ্রয়োগ করিয়া ইহা চালু করা হইল। ১৯৩৩ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ হইল এবং ইহাতে হাল্কা

কারখানা শিল্প এবং ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হইল এইভাবে প্রাথমিক পণ্যের অভাব মিটান হইল। ১৯৩৫ সালে রেশনিং প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইল।

মনে রাখিতে হইবে, রাসিয়ায় সকলকে সমান বেতন দেওয়া হয় না। সামাজিক মূল্য (অর্থাৎ অভাব) অথবা দক্ষতা অনুসারে বেতন দেওয়া হয়। সাধারণ শ্রমিকদের ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার মত বেতন দেওয়া হয়, সুদক্ষ শ্রমিকদের অনেক বেশি বেতন দেওয়া হয়। রাসিয়ায় বেতনের পার্থক্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মত। অনেকে বলেন যে ইহা সাম্যবাদের আদর্শ বিরোধী, কিন্তু ইহা সত্য নহে। Marx বলিযাছেন যে, সমাজতন্ত্রের প্রথম অবস্থায় কর্মের গুণ ও পরিমাণ অনুসারে বেতনের পার্থক্য হইবে। যখন উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বাড়িবে এবং সমাজে শ্রেণীবিভাগ আর থাকিবে না, তখন "সকলকে প্রযোজন অনুসারে বণ্টন" করার নীতি অনুসরণ করিতে হইবে। এই অসাম্য সত্ত্বেও এই প্রথা ভাল। কারণ এই সমাজে বিনা পরিশ্রমে উপার্জন করিতে পারে না এবং ভূসম্পত্তির আয় হইতে খাওয়ার উপায় নাই।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দ্রব্যমূল্য নির্ণয় (Pricing in a socialist economy)ঃ কয়েক বৎসর পূর্বে কয়েকজন লেখক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মূল্যসমস্যার কথা আলোচনা করেন। অর্থনীতিতে আমরা মূল্য নিরূপণ সম্বন্ধে যে তত্ত্ব আলোচনা করি তাহা কি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রযোজ্য? প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্য ও উপকরণের মূল্য অনুসারে উৎপাদকেরা উৎপাদন করে। প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় ও মূল্য সমান না হওয়া পর্যন্ত তাহারা উৎপাদন করিবে। বিভিন্ন শিল্পে উপকরণগুলি এমনভাবে বণ্টন করা হইবে যেন বেতন ও নীট উৎপাদন সমান হয়। প্রান্তিক ব্যক্তিগত নীট উৎপাদন ও প্রান্তিক সামাজিক নীট উৎপাদনের পার্থক্য না থাকিলে ইহাতে সর্বাধিক উপযোগিতা পাওয়া যাইবে। অধ্যাপক Mises বলিয়াছেন যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উপকরণের প্রতিযোগিতামূলক বাজার নাই। প্রতিযোগিতামূলক বাজার না থাকায় তাহাদের মূল্য স্থির করা যায় না। উপকরণের মূল্য স্থির করিতে না পারিলে ব্যয় ও পণ্যমূল্য স্থির করা যায় না। অতএব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উৎপাদন সর্বাধিক হইতে পারে না।

H. D. Dickinson, Lange, Taylor এবং অন্যান্য লেখকেরা এই অভিযোগ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও সর্বাধিক উৎপাদন হয় না। Marshall এবং Pigou বহুদিন পূর্বে বলিয়াছেন যে, প্রান্তিক ব্যক্তিগত নীট উৎপাদন ও প্রান্তিক সামাজিক নীট উৎপাদন পৃথক হইতে পারে। ইহা ছাড়া বাজারমূল্য অনুসারে উৎপাদন করা সর্বদা নিরাপদ নয়। ক্রেতাদের বর্তমান যাহা আয় সেই ভিত্তিতে পণ্যের বাজার-মূল্য স্থির হয়। অতএব দরিদ্রশ্রেণীর অতি প্রয়োজনীর পণ্য উৎপাদিত না হইয়া ধনিকশ্রেণীর বিলাসদ্রব্য উৎপাদিত হয়। ধনতন্ত্রে প্রচুর অপব্যয় হয়। ১৯০৮ সালে ইতালীয় অর্থশাস্ত্রী Barone দেখাইয়াছেন যে সমাজতন্ত্রের হিসাবমূল্য (accounting prices) ধনতন্ত্রের বাজারমূল্যের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শ্রেণীবদ্ধ সহ-সমীকরণের (Series of simulteneous equation) সাহায্যে তিনি দেখাইয়াছেন যে ধনতন্ত্রের মত সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন শিল্পে উপকরণ বণ্টন সম্ভব। Dickinson, Oscar Lange, Durbin প্রভৃতিও অনুরূপ সিদ্ধান্ত করিযাছেন। "কোন সমাজব্যবস্থার সহিত মূল্য নির্ণয়ের কোন সম্বন্ধ নাই। মূল্য নির্ণয়ের মূল পদ্ধতি ও ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পার্থক্য Mises বুঝিতে পারেন নাই।" সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার অভাবের জন্য মৌলিক কোন পরিবর্তন হয় না। বিভিন্ন শিল্পে উপকরণ বণ্টনের জন্য হিসাবমূল্য যথেষ্ট। প্রত্যেক উপকরণের আর্থিক মূল্য ধরা যাইতে পারে। শিল্পপতিদের মত পরিকল্পনা কমিসন, বাজারমূল্য ধরিয়া লইয়া হিসাব করিতে পারে। তারপর সংখ্যা-তাত্ত্বিক উপায়ে চাহিদা ও সরবরাহ তালিকা স্থির করিয়া এবং ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়া যথার্থ হিসাবমূল্য বাহির করা যায়। যদি দেখা যায় যে, সরবরাহের চেয়ে চাহিদা বেশি তবে মূল্য পরিবর্তন করিতে হয়। নূতন করিয়া মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে এবং উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। এইভাবে ভুল-ভ্রান্তির ভিতর দিয়া চাহিদা ও সরবরাহের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ধনতন্ত্রেও এইভাবে মূল্য নির্ণীত হয়।

গুণাগুণ (Merits and defects of socialism): বিভিন্ন শিল্পে উপকরণ বণ্টন শুধু সম্ভব নহে, অনেক বিষয়ে ধনতন্ত্রের চেয়ে ইহা উন্নত-ধরনের। চাহিদা ও সরবরাহ সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের তুলনায় কেন্দ্রীয়

পরিকল্পনা কমিসনের জ্ঞান বেশি। সুতরাং সহজে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্রের অসাম্য কম বলিয়া সন্তোষ বেশি। ধনীদের বিলাসের আকাঙ্খা চরিতার্থ না করিয়া সাধারণের ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদিত হয়। শেষত, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যবসায়চক্রের অধীন। কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উৎপাদন করা হয় বলিয়া সমাজতন্ত্রে ব্যবসায়চক্র নাই ; প্রতিযোগিতার ঝুঁকি এবং অপব্যয় সমাজতন্ত্রে নাই।

কিন্তু সমাজতন্ত্রে কতকগুলি অসুবিধা আছে। অধ্যাপক Pigou বলিয়াছেন যে, হিসাবমূল্যের ভিত্তিতে উপকরণ বণ্টন করা সম্ভব হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে ইহার অনেক অসুবিধা আছে। কেবলমাত্র অতিমানব এই অসুবিধা দূর করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্রে কি উৎপাদকের দক্ষতা বজায় থাকিবে ? লাভের আশা এবং ক্ষতির আশংকা উৎপাদকের দক্ষতা বজায় রাখে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিচালক নির্দিষ্ট বেতন পাইবে। ক্ষতি হইলে তাহাতে সমগ্র সমাজের ক্ষতি হয়। তাহার নিজের চিন্তার কোন কারণ ঘটে না। অতএব সে অসতর্ক হয়। ইহা সমাজতন্ত্রের দুর্বলতা। জাতির প্রশংসা অথবা নিন্দা এবং উন্নত আদর্শ অনুসরণ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া সোভিয়েট রাসিয়া এই সমস্যার সমাধান খুঁজিতেছে।

পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন সঞ্চয় করা আর একটি সমস্যা। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিসনের সিদ্ধান্ত ভুল হইলে মূলধনের সঞ্চয়ের পরিমাণ কম বা বেশি হইবে। অবশ্য একথা ঠিক যে ধনতান্ত্রিক সুদের হার পরিকল্পনা কমিসন কর্তৃক নির্দিষ্ট সুদের হার অপেক্ষা অধিক কার্যকরী নহে। চতুর্থত, বিভিন্ন কাজের জন্য উপযুক্ত কর্মচারী পাওয়া কষ্টকর। এই বিষয়ে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আদর্শ নহে। কিন্তু ইহাতে সুদক্ষ লোক বাছিয়া লইবার একটি উপায় আছে। এই উপায়ের ত্রুটি আছে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বাভাবিক দক্ষতাসম্পন্ন লোক বাছিয়া লওয়ার উন্নততর কোন পদ্ধতি নাই। অবশেষে সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ভয় আছে।

কিন্তু সমাজতন্ত্রের ত্রুটিগুলি নির্দেশ করার অর্থ এই নয় যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। আদর্শ ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে নির্বাচন করিতে হইবে না। ধনতন্ত্রে যে সব সুবিধা আছে বলিয়া বলা হয়, সে সব

সুবিধা বাস্তবিক পাওয়া যায় না। সুতরাং অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে তাহার ত্রুটিসমূহের তুলনা করা উচিত। সর্ববিষয়ে ধনতন্ত্র ভাল একথা বলা চলে না।

মিশ্রতন্ত্র বা মিশ্র অর্থনৈতিক সংস্থা (Mixed Economy) : ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয়বিধ আন্তর্জাতিক সংস্থায় নানা অসুবিধা দেখা যায়। ধনতন্ত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যবসায়ে লাভ করিবার সুযোগ দেওয়া হয় বলিয়া উৎপাদনের পরিমাণ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আবার ধনতন্ত্রে ধনীর সংখ্যা অল্প ও দরিদ্রের সংখ্যা অধিক থাকাতে এই সমাজব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় নহে; ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকার প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার ফল যদি দরিদ্র ও শ্রমিকের অবাধ শোষণ হয় তাহা হইলে ইহা মানিয়া লইতে অনেকেই রাজী নহেন। আবার সমাজতন্ত্রের পথেও অনেক বিপদ দেখা যায়। ইহাতে ক্রমে ক্রমে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ও ব্যক্তিস্বাধীনতা কমিয়া যায়। লাভের সুযোগ থাকে না বলিয়া হয়ত উৎপাদনের পরিমাণ সেইরূপ বাড়ে না।

এই দুই শ্রেণীর সমাজব্যবস্থার ত্রুটি দেখিয়া আজকাল কোন কোন রাষ্ট্র মিশ্রতন্ত্র প্রবর্তনের নীতি অবলম্বন করিযাছে। এই ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয়েরই দোষগুলি পরিহার করার চেষ্টা হইতেছে। মিশ্রতন্ত্র সমাজতন্ত্রের পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়। কিন্তু সমস্ত পথ যায় না। আবার ধনতন্ত্রের ভাল বৈশিষ্ট্যগুলি যতদূর সম্ভব রাখিবার চেষ্টা করে। দেশের উৎপাদনের সমস্ত উপকরণই রাষ্ট্রাধীন করে না। জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানাস্বত্ব অনেকটা স্বীকার করে। কয়েকটি মূল এবং বিশিষ্ট শিল্প ব্যতীত অন্য শিল্পের পরিচালনার দায়িত্ব সাধারণ ব্যবসায়ীদের হস্তেই ছাড়িয়া দেয় অর্থাৎ মিশ্রতন্ত্রে রাষ্ট্রপরিচালিত ও লাভান্বেষী সাধারণ ব্যবসায়ী পরিচালিত শিল্প পাশাপাশি থাকে। ধনতন্ত্রের যে প্রধান দোষ আয়ের বৈষম্য ইহা মিশ্রতন্ত্র নানা প্রকারে সংশোধন করিবার চেষ্টা করে। যেমন ধনীর উপর উচ্চহারে আয়কর সম্পত্তিকর ও মৃতসম্পত্তি কর বসান হয় যাহাতে তাহাদের আয় যথেষ্ট কমে। যৌথ কোম্পানীগুলি যে লভ্যাংশ বিতরণ করে ইহার পরিমাণও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। সরকার নানা প্রকারে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যনিয়ন্ত্রণ করে যাহাতে ইহারা সমাজ বিরুদ্ধ

কাজ কম করিতে পারে। শ্রমিকদের সংঘগঠনের কার্যে সরকার নানাভাবে সাহায্য করে, তাহাদের মজুরীর হার নির্দিষ্ট করিয়া দেয় ও কাজের সময় কমাইয়া দেয়। সামাজিক বীমাপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শ্রমিকদের ও জনসাধারণের রোগে চিকিৎসা, বার্ধক্যে অবসর ভাতা, বেকার অবস্থায় সাহায্য ও কাজ পাইবার সুবিধা সৃষ্টি, অক্ষম ও অসমর্থকে উপযুক্ত সাহায্য, সব কিছুরই ব্যবস্থা করিয়া দেয়। এইজন্য অনেকে মিশ্রতন্ত্র পথযাত্রী রাষ্ট্রকে কল্যাণ রাষ্ট্র (welfare state) নাম দিয়াছেন। এইতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা কিছুটা ক্ষুণ্ন হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু একেবারে নিঃশেষ হয় না। ব্যক্তিগত মালিকানা তুলিয়া দেওয়া হয় না—ইহাকে সকলের মঙ্গলের জন্য নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

ভারতবর্ষ মিশ্রতন্ত্রের পথ বাছিয়া নিয়াছে। ইহা যে নিখুঁত এবং সর্বগুণান্বিত তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ধনতন্ত্রের সমর্থকেরা মিশ্রতন্ত্রকে দাসতন্ত্রেরই নিকটবর্তী অঞ্চল বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে এই ধরনের অর্থনৈতিক অবস্থায় যেটুকু ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সম্পত্তির মালিকানাস্বত্ব অবশিষ্ট থাকে তাহা রক্তহীন ও নির্জীব। ব্যবসায়ীদের শিল্পপ্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়া হইবে বটে, কিন্তু ডাইনে-বাঁয়ে, সম্মুখে-পশ্চাতে সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাধা ঠেলিয়া তাঁহারা যে বিশেষ কিছু করিতে পারিবেন ইহা মনে হয় না। আবার সমাজতন্ত্রীরাও ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য মিশ্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভাল চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মতে মিশ্রতন্ত্র অবলম্বন করার অর্থ ত্রিশঙ্কুর ন্যায় অর্ধপথে ঝুলিয়া থাকা। দুই দিকেই কিছু সত্য আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে পূর্ণধনতন্ত্র বাছিয়া নেওয়া সম্ভব নহে। আবার পূর্ণসমাজতন্ত্রের অনিশ্চিত আশংকার পথে যাইতেও মন সায় দেয় না। কাজেই সব দোষগুণ সত্ত্বেও ইহাদের পক্ষে মিশ্রতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়াই স্বাভাবিক।

Exercises

Q. 1. Indicate the distinguishing features of the Communist experiment in Soviet Russia. Explain in what important respect it deviates from the Marxian Socialism. (C. U. 1948).

Q. 2. Examine the distinguishing features of a Socialist Society and discuss the difficulties that are likely to arise in such a society. (Viswa. 1952).

Q. 3. Bring out the distinction between Capitalism, Socialism and Communism. (C. U. 1955).

Q. 4. Write short notes on the Mixed Economy. (C. U. B Com. 1957).